সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজমশাহ
ও তাতার আগ্রাসনের গোড়ার কথা

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস

মাওলানা ইসমাইল রেহান
আলমগীর মুরতাজা
অনূদিত

সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজমশাহ
ও তাতার আগ্রাসনের গোড়ার কথা

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল
মাওলানা ইসমাইল রেহান
অনুবাদ
আলমগীর মুরতাজা



নাশাত

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস -২

প্রথমপ্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২০
পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮৪১৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

বিনিময় : ৫০০ (পাঁচশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

ISBN : 978-984-97763-7-6

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : হিন্দুস্থানের মাটিতে

সময়ের ডাক।। ১৭
হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক হালচাল।। ১৯
সিন্ধুনদের পারে।। ১৯
নিরস্ত্র সিপাহি।। ২১
হিন্দু রাজাদের সাথে জিহাদ।। ২২
প্রথম যুদ্ধ।। ২২
দ্বিতীয় যুদ্ধ।। ২৪
হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ।। ২৪
সুলতানের পশ্চাদ্ধাবন।। ২৫
কুদরতি বাধা।। ২৫
প্রত্যাবর্তন।। ২৬
শিক্ষার উপাদান।। ২৭
দিল্লির বাদশাহর দোরগোড়ায়।। ২৭
ইলতুৎমিশের ফিরতি জবাব।।২৮
পাঞ্জাব ও সিন্ধুতীরের তাজা বিজয়।। ২৯
গিয়াসুদ্দীনের গড়ে-ওঠা নতুন রাজত্ব।। ৩০
কিবাছার অপকর্ম।। ৩১
কিবাছার সাথে লড়াই।। ৩৩
লাহোর, উচ ও সিদিস্তান বিজয়।। ৩৫
দেবল অঞ্চলে।। ৩৬
একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ।। ৩৬
নতুন বিজয়ের ধারা।। ৩৭
সুলতান ইলতুৎমিশের সাথে মনোমালিন্যের কারণ।। ৩৭
খানসারের যুদ্ধক্ষেত্র।। ৩৮
সন্ধি স্থাপন ও মনোমালিন্য দূরীকরণ।। ৩৯
খোরাসান ও ইরাকে তাতারদের নয়া লুটতরাজ।। ৩৯
দিল্লির রাজদরবারের প্রশস্ততা।। ৪০
ফেরা।। ৪১
সফরে আপতিত বিপদ।। ৪৪

বুরাক হাজিব।। ৪৭
বুরাক হাজিবকে শায়েস্তা।। ৪৮
কৌশল কৌশল খেলা।। ৪৯
নতুন বন্ধু।। ৫০
ইস্পাহানে...।। ৫২
গিয়াসুদ্দীনের কুধারণা।। ৫২
গিয়াসুদ্দীনের সাথে লড়াই।। ৫৩
মাথার উপর ঝলকে ওঠে উন্নয়নের তারা।। ৫৪
খুজিস্তানের যুদ্ধাভিযান।। ৫৫
বৈশ্বিক চালচিত্র।। ৫৫
উম্মাহর ঐক্যভাবনা : সুলতানের চিন্তাদর্শন।। ৫৭
খলিফার দরবারে সুলতানের দূতের রওনা : একটি ব্যর্থতার গল্প।। ৫৮
বাগদাদ বাহিনীর আক্রমণ।। ৫৯
সুলতানের বার্তা।। ৫৯
যুদ্ধের শুরু।। ৫৯
যুদ্ধের পরিণতি।। ৬০
খলিফার হতভম্বতা।। ৬১
বাকুবা ও দাকুকা দখল।। ৬১
ইরবিলের হাকিমের সাথে লড়াই এবং সন্ধিচুক্তি।। ৬২
নয়া সংকল্প।। ৬২
মারাগেহ দখল।। ৬৩
মুসলিম শাসকদের সাথে যোগসূত্রতার শুরু।। ৬৩
আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সাথে ঐক্য।। ৬৩
সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের চিঠি।। ৬৪
সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের জবাব।। ৬৬
সুলতান জালালুদ্দীনের নামে আলাউদ্দীন কায়কোবাদের চিঠি।।৬৬
শামের শাসক আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের সাথে সম্পর্ক।। ৬৮
সুলতানের প্রতি মুয়াজ্জমের মৌলিক বিশ্বাস।। ৬৯
খলিফা নাসির সম্পর্কে মুয়াজ্জমের কাছে সুলতানের চিঠি।। ৬৯
আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের উদ্দেশ্যমালা।। ৭০
এক নতুন ফেতনা ও এর প্রতিকার।। ৭২
তিবরিজ অভিযান।। ৭৩
বেগম বিনতে তুগরুলের চিঠি।। ৭৪

বিজয়ীবেশে তিবরিজে প্রবেশ।। ৭৬
মহাপ্রাচীর।। ৭৭
পৃথিবী নকশা : ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ।। ৭৮

তৃতীয় অধ্যায় : জর্জিয়ার বিজয়সমূহ

এক নয়া চ্যালেঞ্জ।। ৮১
জর্জিয়ান কারা?।। ৮২
শালুহের ঔদ্ধত্য।। ৮৩
আক্রমণের প্রস্তুতি।।।। ৮৪
যুদ্ধের আহ্বান।।।। ৮৪
সুলতানের প্রজ্ঞাদীপ্ত পরিকল্পনা।। ৮৫
জর্জিয়ানদের সাথে প্রথম যুদ্ধ।। ৮৬
সুলতানের চাল।। ৮৮
শালুহ ও ইওয়ানি।। ৯০
সাম্রাজ্যের উজিরের চিঠি।। ৯১
তিবরিজে প্রত্যাবর্তন।। ৯২
মাহে রমজানের কর্মব্যস্ততা।। ৯২
বেগম বিনতে তুগরুলের সঙ্গে বিবাহ।। ৯৩
গনজা বিজয়।। ৯৩
খলিফা নাসিরের ইনতেকাল।। ৯৩
নতুন খলিফা।। ৯৫
খলিফা জাহিরের বন্ধুত্বের চিঠি।। ৯৫
জর্জিয়ার পথে দ্বিতীয় যাত্রা।। ৯৬
জর্জিয়ার সম্রাজ্ঞীর সাথে আলোচনা।। ৯৬
চক্রান্তের জাল।। ৯৭
চক্রান্তের বিস্তার।। ৯৮
মুনাফিকদের পরিণাম।। ৯৯
তুমুল যুদ্ধ।। ১০০
জর্জিয়ানদের কবলে সুলতান জালালুদ্দীন।।১০১
সুলতানের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা।। ১০৩
তিফলিস বিজয়।। ১০৪
আমার যদি হতো কভু ফিদিয়া নেবার শখ।। ১০৬
আল্লামা ইবনুল আসিরের প্রশংসা-বচন।। ১০৭
বাগদাদের দূতের জিহাদি জজবা।। ১০৮

চতুর্থ অধ্যায় : সম্মিলিত প্রতিরোধ-শক্তির বিধ্বস্ততা

খলিফাতুল মুসলিমিনের ক্রোধ।। ১১১
আল-মালিকুল আশরাফের সাথে দ্বন্দ্ব।। ১১২
সুলতানের থেকে আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের বিচ্ছিন্নতা।। ১১২
কয়েকটি ঘটনা ও যুদ্ধাভিযানের কথা।। ১১৪
আকস্মিক অভিযান।। ১১৪
খলিফা জাহেরের মৃত্যু।। ১১৪
জর্জিয়ায় সুলতানের তৃতীয় আক্রমণ।। ১১৫
তুর্কমানি দস্যুদলকে শায়েস্তা।। ১১৫
বাহাদুরির এক আজিব ঘটনা।। ১১৬
মালিক খামুশের তোহফা।। ১১৬
বিধ্বস্ত তিফলিস।। ১১৬
জর্জিয়ানদের সাথে আরো কয়েকটি যুদ্ধ।। ১১৭

পঞ্চম অধ্যায় : বাতেনিদের (ইসমাইলিয়া) সাথে জিহাদ

বাতেনিদের নতুন হাঙ্গামা।। ১২১
খাওয়ারিজমি আমিরের সাহসিকতা।। ১২২
বাতেনি দূতকে কঠিন জবাব।। ১২২
আওর খান নিশাপুরির শাহাদাত।। ১২৩
নতুন বৈঠক।। ১২৪
উজিরে আজমের ভয় ও কাপুরুষতা।। ১২৪
কঠিন সাজা।। ১২৫
জিহাদের ঘোষণা।। ১২৫
খঞ্জর ও তলোয়ার।। ১২৬
ঐতিহাসিক ইবনুল আসিরের প্রশংসমালা।। ১২৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : তাতারদের সাথে জিহাদের দ্বিতীয় পর্ব

মুসলিমবিশ্বে তাতারদের দ্বিতীয় দফা আগ্রাসন।। ১২৯
তাতার-বাহিনীর অগ্রযাত্রা।। ১৩০
তিবরিজের বিদ্রোহ।। ১৩০
রায় নগরীর প্রথম যুদ্ধ।। ১৩১
কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা : কায়কোবাদের সাহায্য।। ১৩৪
একটি অশুভ ধারণা।। ১৩৫
আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের মৃত্যু।। ১৩৬
রায় নগরীর দ্বিতীয় যুদ্ধ।। ১৩৬

ইস্পাহানে সুলতান।। ১৩৭
জিহাদের প্রস্তুতি।। ১৩৯
জিহাদের সাধারণ ঘোষণা।। ১৪০
অতর্কিত আক্রমণকারীদের কাণ্ডকীর্তি।। ১৪১
যুদ্ধের ময়দানে..।। ১৪১
গিয়াসুদ্দীনের গাদ্দারি।। ১৪১
রণাঙ্গনের নকশা।। ১৪২
শত্রুপক্ষের পরাজয়।। ১৪৩
বদলে গেছে দৃশ্যপট।। ১৪৫
ঘেরাও দিয়েছে ভেঙে।। ১৪৬
যুদ্ধের বিস্ময়কর পরিণতি।। ১৪৭
ইসলামি বাহিনীর অজানা অবস্থা।। ১৪৮
আবু বকর ইবনে সাআদের প্রত্যাবর্তন।। ১৪৯
আতাবেগ আলাউদ্দৌলার কোরবানি।। ১৪৯
ইস্পাহান অবরোধ।। ১৫০
বাতেনিদের উচ্ছ্বাস।। ১৫০
সুলতানের বর্তমান অবস্থা।। ১৫১
ইস্পাহানবাসীকে সুলতানের চিঠি।। ১৫১
ঈদগাহে সুলতান জালালুদ্দীনের আগমন।। ১৫২
শেষযুদ্ধ, স্পষ্ট বিজয়।। ১৫৩
চেঙ্গিজ খানের স্থলাভিষিক্তের অবমুক্তি।। ১৫৪
তাতারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত এসব যুদ্ধের ফল।। ১৫৪

সপ্তম অধ্যায় : সম্মিলিত বাহিনীর সাথে জিহাদ

অন্যান রাজ্যের সাথে জর্জিয়ানদের ঐক্য।। ১৫৭
সুলতানের যুদ্ধবিষয়ক পরামর্শসভা।। ১৫৮
জিহাদে শরিক হওয়ার জন্য সাধারণ ঘোষণা।। ১৫৯
সুলতান জালালুদ্দীনের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা।। ১৬০
আরো একটি কৌশল।। ১৬১
আছে কি কোনো মল্লযোদ্ধা।। ১৬১
আল্লাহর সাহায্য অবতরণ।। ১৬৪

অষ্টম অধ্যায় : আপন লোকের শত্রুতা

আল-মালিকুল আদিলের সাথে যুদ্ধ।। ১৬৭
কায়কোবাদের প্রস্তাব।। ১৬৭
খিলাতে সুলতান জালালুদ্দীনের সিদ্ধান্ত-নিরূপক যুদ্ধ।। ১৬৮

বিগড়ে যাওয়া অবস্থা।। ১৮০
সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ।। ১৮৪
সুলতান ইয়াসি চমনে...।। ১৮৬
অগ্রবর্তী দলের আঘাত।। ১৮৭
রোকনুদ্দীনের অভিমত।। ১৮৭
কায়কোবাদকে আল-মালিকুল আশরাফের দেওয়া প্রবোধ।। ১৮৯
বাড়তি আক্রমণ।। ১৮৯
যুদ্ধ এড়ানো যায়নি।। ১৮৯
শেষযুদ্ধ।। ১৮৯
সুলতান জালালুদ্দীনের অশ্রু।। ১৯০
যুদ্ধের শুরু।। ১৯১
তাকদিরের ফায়সালা।। ১৯২
স্পষ্ট পরাজয়।। ১৯৩
নিরুপায় সুলতান।। ১৯৪
সন্ধি।। ১৯৫
হিন্দুস্থানের দখলীকৃত রাজ্যে ইলতুৎমিশের কর্তৃত্ব।। ১৯৫
আমির-উজিরদের মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ।। ১৯৭
তিবরিজ ও গনজায় চক্রান্ত।। ১৯৭

নবম অধ্যায় : নিভে গেল আশার প্রদীপ

তাতারদের অগ্রযাত্রা।। ১৯৯
আলামুতের হাকিমের চক্রান্ত।। ২০০
সীমান্তে তাতারদের উৎপাত।। ২০০
মুজাহিদের ডাক।। ২০৩
সৈন্যদলের একরোখা মনোভাব।। ২০৪
সুলতানের আবাসস্থলে তাতারদের হামলা।। ২০৫
তাতারদের অতর্কিত আক্রমণ।। ২০৭
মাহানে অবস্থান।। ২০৮
শারফুল মুলকের কুকর্ম, খারাপ পরিণতি।। ২০৮
গাদ্দারদের তিবরিজ দখল।। ২১০
বসন্তের শুরু, তাতারদের আগমন।। ২১১
এক তাতার কয়েদিকে জিজ্ঞাসাবাদ।। ২১১
শেষপ্রচেষ্টা।। ২১২
গনজার বিদ্রোহ।। ২১৩

শাসকদের নতুন জিহাদের ডাক।। ২১৪
আল-মালিকুল আশরাফের ধৃষ্টতা।। ২১৫
মুসলিম শাসকদেরকে তাতারদের ধমকি।। ২১৮
ভবিষ্যতের ফয়সালা।। ২১৯
দূতদের প্রত্যাবর্তন।। ২২০
ভয়ংকর স্বপ্ন।। ২২১
আতর খানের গাফলতি।। ২২২
আমাদ-এর শাসকের প্রতারণা।। ২২৪
তাতারদের অবরোধের ভেতর।। ২২৫
শেষধাওয়া।। ২২৭
মনজিল হ্যাঁয় কাহাঁ তেরি?।। ২৩০
আতর খানের অসাধুতা ও পরিণতি।। ২৩০
মায়াফারকিনের উপকণ্ঠে রাত্রিযাপন।। ২৩১
আতর খানের গাদ্দারি ও পরিণতি।। ২৩১
মুসাফির হেঁটে যায় একা।।২৩২
সুলতানের পরিণতি : বিপরীতমুখী বিভিন্ন অভিমত।। ২৩৪
দ্বিতীয় অভিমত।। ২৩৮

দশম অধ্যায় : জালালুদ্দীনের তিরোধানের পর মুসলিমবিশ্বের বিপন্ন অবস্থা

সুলতান জালালুদ্দীনের পর...।। ২৪৩
সুলতানের সঙ্গীদের পরিণতি।। ২৪৭
বাগদাদ-ট্রাজেডি।। ২৪৮

একাদশ অধ্যায় : জীবন ও অবদান

বীরত্ব।। ২৫৩
পরীক্ষা ও উৎসর্গের সাতকাহন।। ২৫৪
হিম্মত।। ২৫৭
সৈনিকসুলভ বৈশিষ্ট্য।। ২৫৭
রাষ্ট্র পরিচালনার ধরন।। ২৬১
নতুনভাবে শহর আবাদ।। ২৬২
শিক্ষাদীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির আয়োজন, মাদরাসা ও খানকার আলোচনা।। ২৬২
ন্যায়বিচার।। ২৬৩
খরচের ধরন।। ২৬৫
ক্ষমাশীলতা।। ২৬৬
অকৃত্রিমতা ও সাদাসিধে মনোভাব।। ২৬৮

অনর্থ কর্ম থেকে বিরত থাকা : কল্যাণকর কাজে যুক্ত হওয়া।। ২৭০
ভুল সংশোধনের চেষ্টা।। ২৭১
বড়দের আনুগত্য।। ২৭৩
খলিফাকে দেওয়া সম্মান।। ২৭৫
কাজের দ্রুততা।। ২৭৬
পরিণামদর্শিতা, সতর্কতা ও সন্দেহ।। ২৭৭
সত্তাগত কিছু গুণাবলি : তোষামোদি ও চাটুকারিতার প্রতি ঘৃণা।। ২৭৮
কোমলপ্রাণতা।। ২৭৮
সুন্নি হানাফি মুসলমান।। ২৭৯
চরিত্র, দৈহিক সৌষ্ঠব ও অভ্যাস-প্রকৃতির কিছু ঝলক।। ২৮০
মানকাবিরাতি শব্দের প্রকৃত অর্থ।। ২৮২
সুলতান জালালুদ্দীনকে নিয়ে ইতিহাসবিদদের প্রশংসা।। ২৮৩
বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া।। ২৮৪

দ্বাদশ অধ্যায় : সুলতান জালালুদ্দীনের আপন-পর

সুলতানের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ শ্রেণি।। ২৮৭
দাদি তুর্কান খাতুন।। ২৮৭
সুলতান জালালুদ্দীনের ভ্রাতৃবৃন্দ।। ২৮৮
গিয়াসুদ্দীন।। ২৮৮
সুলতানের ভগ্নীগণ।। ২৯৩
তৃতীয় বোন : শাহজাদি খান সুলতান।। ২৯৩
সুলতানের পত্নীগণ।। ২৯৬
সুলতানের স্ত্রীদের পরিণতি।। ৩০১
সুলতানের সন্তানসন্ততি।। ৩০২
তুর্কান খাতুন বিনতে সুলতান জালালুদ্দীন।। ৩০২
সুলতানের জানবাজ বিশ্বস্ত সাথি তৈমুর মালিক।। ৩০৩
জাহাঁ পাহলোয়ান উজবুক।। ৩০৫
আওর খান আলি নিশাপুরি।। ৩০৬
মালিক নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ।। ৩০৭
আমান মালিক।। ৩০৭
আতাবেগ আবু বকর বিন সাআদ।। ৩০৮
আওর খান।। ৩০৯
সুলতানের দরবারে আলেম ও সাহিত্যিকগণ।। ৩১০
শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আন-নাসাবি।। ৩১০
আল্লামা সাক্কাকি।। ৩১২

জামিয়া নাদিয়া মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স
স্থাপিতঃ ২০২০ইং

শামসুল মুলক শিহাবুদ্দীন আলপ।। ৩১৪
কামালুদ্দীন ইসমাইল।। ৩১৪
মুনশি নুরুদ্দীন।। ৩১৭
ফাতাহনামা।। ৩১৮
মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ তরজুমান ও বিবি মুনজিমা।। ৩২০
তাজুদ্দীন কালিজ।। ৩২১
বদরুদ্দীন হেলাল।। ৩২২
নাসিরুদ্দীন কাশাতমুর।। ৩২২
কিছু অজ্ঞাত গোলাম।। ৩২২
সুলতানের গাদ্দারশ্রেণি।। ৩২৩
কিতলুগ খান।। ৩২৩
সাইফুদ্দীন আগরাক খলজি ও তার অনুগত বাহিনী।। ৩২৩
বুরাক হাজিব।। ৩২৬
শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন।। ৩২৬
আতর খান।। ৩২৭
শারফুল মুলক খাজা জাহাঁ।। ৩২৭
ওয়াফা মালিক।। ৩৩১

ত্রয়োদশ অধ্যায় : আল-মালিকুল মুজাফফর সাইফুদ্দীন মাহমুদ কুতুজ

টুকরো-টুকরো বিক্ষিপ্ত ইতিহাস।। ৩৩৩
তোর বাপ কে?।। ৩৩৪
আল-মালিকুস সালিহের খেদমতে...।। ৩৩৫
বরকতপূর্ণ স্বপ্ন।। ৩৩৫
নিষ্পাপ প্রতিশ্রুতি।। ৩৩৬
দাস থেকে বাদশাহ হয়ে ওঠার কাহিনি।। ৩৩৬
সাইফুদ্দীন মাহমুদ কুতুজের সিংহাসনারোহণ।। ৩৩৮
কিতবুগা নৈয়ানের রক্তপাত।। ৩৩৮
তাতারদের দামেশক দখল।। ৩৪১
যুদ্ধের দামামা।। ৩৪১
আইনজালুতের যুদ্ধ।। ৩৪২

চতুর্দশ অধ্যায় : কষ্টিপাথরে সুলতান জালালুদ্দীন

সুলতান জালালুদ্দীনকে নিরীক্ষণের প্রেক্ষাপট।। ৩৪৯
ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টকারী, স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন ও অপরিণামদর্শী।। ৩৫২
খলিফার সাথে শত্রুতা : আপত্তিটুকুর বাস্তবতা।। ৩৫৩

অন্যান্য শাসকের সাথে শত্রুতা : বাস্তবতার আলোকপাত।। ৩৫৫
'জুলুম, নিপীড়ন ও কষ্টদান'র অপবাদ : স্পষ্ট জবাব।। ৩৫৬
খিলাত ট্রাজেডি।। ৩৫৭
'বালকের সাথে কামভাব চরিতার্থ করা'র জঘন্য অপবাদ ও তার জবাব।। ৩৫৯
মদ্যপান ও নৃত্যগানের অপবাদ : স্পষ্ট জবাব।। ৩৬০
ধোঁকাবাজি ও ওয়াদাখেলাফি : আসল বাস্তবতা।। ৩৬৪
সুলতান জালালুদ্দীন কি একজন ব্যর্থ নেতা ছিলেন?।। ৩৬৫
সুলতানের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হবার কারণ।। ৩৬৬
অনৈচ্ছিক কার্যকারণ।। ৩৬৬
ইচ্ছাগত কার্যকারণ।। ৩৭০
কোনো স্থলাভিষিক্ত না-থাকা।। ৩৭৭
একটি ভুল প্রতিক্রিয়া ও তার খণ্ডন।। ৩৭৭

পরিশিষ্ট

ইতিহাসের শিক্ষা।। ৩৮২
হৃদয়ের আকুতি।। ৩৯৩
একনজরে ঘটনাপ্রবাহ।। ৩৯৫
গ্রন্থপঞ্জি।। ৩৯৭



Click Here To Join Our Telegram channel-
``````ASTANA_E_MUSAFIR``````
``````

প্রথম অধ্যায়

হিন্দুস্থানের মাটিতে



সময়ের ডাক

সুলতান জালালুদ্দীন এখন হিন্দুস্থানের মাটিতে অবস্থান করছেন। এই হিন্দ-ভূমিতে তার বংশগত আত্মীয়তা রয়েছে। তার মা ছিলেন হিন্দুস্থানি নারী। আর এই মুলুকের সীমান্তেই জীবনের পিঞ্জিরা ভেঙে উড়ে গেছেন সেই মা। তারই পুত্রধন আজ মাতুলালয়ের দেশে খানিক আশ্রয় খুঁজতে লেগেছে।

এই উদ্বাস্তু দিনগুলিতে, সিন্ধুর তীর-সংলগ্ন বনজঙ্গলে অবস্থানরত সুলতান জালালুদ্দীন লুণ্ঠিত কাফেলার এক সরদারের মতো তার জীবনে ঘটে-যাওয়া এই দুর্ঘটনা নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে উঠলেন। এইসব দুর্ঘটনায় স্রেফ দু-বছরের ভেতর পালটে গিয়েছিল পুরো মুসলিমবিশ্বের মানচিত্র। দু-বছর পূর্বে যে খানদানের সাম্রাজ্য ইরানের উত্তরদিকের আল-বুরজ পর্বতশ্রেণি থেকে পেশোয়ার, সাইহুন-নদী থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আজ সেই প্রভাব-প্রতিপত্তির জানাজা ঘটে গেছে। আরগেঞ্চ থেকে সিন্ধুতট পর্যন্ত সমস্ত ইসলামি শহর ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দক্ষিণে রাজ্যের সর্বশেষ সীমান্ত থেকেও বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন খাওয়ারিজমের এই শেষ সম্রাট।

সেদিন সুলতানের খুব মনে হতে লাগল পিতার কথা, যার মাহাত্ম্য ও আতঙ্কে পানি হয়ে যেত দুনিয়ার শাসকদের ক্ষমতার দম্ভ। আজ তার সমাধি সেই সুদূর উপত্যকার ভেতর মানবজাতির জন্য শিক্ষার এক উপকরণ হয়ে পড়ে রয়েছে। মনে পড়তে লাগল সেই দাদির কথা, যার গাম্ভীর্য ও প্রতিপত্তিতে তুর্কমান সরদারদের ভেতর কাঁপুনি শুরু হয়ে যেত। সুলতান ভাবছিলেন, আজ সেই দাদি নিষ্ঠুর তাতারদের মুঠোর ভেতর তড়পাচ্ছেন। প্রিয় বোন সেই খান সুলতান, যে তার ভাইকে খুব মহব্বত করত, তার কথাও খুব মনে পড়ছিল। এই খান সুলতান ছিল সুলতানের সকল দুঃখকষ্টের ভাগীদার। আজ সে কোনো গোঁয়ার তাতার শাহজাদার হাতে বন্দি। কুতুবুদ্দীন, আক সুলতান ও রোকনুদ্দীন, এরা সকলেই তার প্রিয় ভাইবেরাদর। সবাই সেই কবেই শহিদ হয়ে গেছে। মা, বিবি, সন্তান, নিকটাত্মীয় ও প্রিয়ভাজনেরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোরবান হয়ে গেছেন পদে পদে সঙ্গে-থাকা জানবাজ সিপাহসালারগণ। জীবনের প্রথমভাগে নিরাপদ স্বস্তির মধ্যে থাকা সমস্ত মুসলিম জনসাধারণের মস্তকও নেমে গেছে ধড় থেকে। স্থানে-স্থানে মাথার খুলির সুউচ্চ মিনার আকাশ স্পর্শ করে আছে। কিন্তু এদের সবার এই কোরবানিতে উম্মাহর জন্য কী অর্জিত হয়েছে? স্রেফ এক পরিপূর্ণ পরাজয়। শত্রুর লাঞ্ছনাকর গোলামি।

এখন কি তবে আমার সমস্ত মেহনত-মুজাহাদায় সফলতার কোনো আশা রাখা যাবে না? এ পরাজয়কে উম্মতে মুসলিমার ধ্বংস ও পতনের সুনিশ্চিত তাকদির ভেবে ছুড়ে ফেলতে হবে হাতের তলোয়ার?

এইসব প্রশ্ন জট পাকাতে লাগল সুলতানের মাথার ভেতর। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে নতুন সংকল্পের উপজাত হিসেবে তার মনে জেগে উঠল একটা উত্তর—না, তা কখনো হতে পারে না।

উম্মাহর নেতৃবৃন্দ যদি হয়ে উঠতেন বিপুল সাহসী, অলসতার ঘুম ভেঙে মুসলিম শাসকগণ তরবারি ধারণ করে হয়ে উঠতেন যদি মুজাহিদদের শক্তিশালী বাহু, তা হলে নিশ্চিত এরকম মহাবিপর্যয় থেকে বেঁচে ওঠা যেত। কিন্তু সহস্র আফসোস, খাওয়ারিজমের (কম করে হলেও) এক কোটি মুসলমানের গণহত্যাও এই পাথর মনের শাসকদের ভেতর কোনো চোট লাগাতে পারেনি। সহমর্মিতা জাগাতে পারেনি।

বাগদাদের খলিফা, রোমের সুলতান, মিশরের শাসক, শাহে দিল্লি ও শামের শাসকসহ ক্ষমতাধর সমস্ত রাজা-বাদশাহ দেখছিলেন দুশমনের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়েছে খাওয়ারিজমি বাহিনী ও সাধারণ জনতা। তবু তাদের কেউ সেই মজলুমদের সহযোগিতায় এগিয়ে যাননি। কেউ-ই মনে করেননি তাদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। অথচ তখন তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া ও মজলুম খাওয়ারিজমি জনতার প্রতিরক্ষায় তলোয়ার ওঠানো শরিয়াহর দৃষ্টিতে আশপাশের সমস্ত ইসলামি সাম্রাজ্যের উপর ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন এমন অবস্থায় তলোয়ার উঠিয়েছিলেন, যখন খাওয়ারিজমের তরবারি ধারণের শক্ত বাহু কেটে পড়ে গেছে। কিন্তু নিরুপায় শক্তিহীনতার কালে সুলতানের প্রচেষ্টা-মুজাহাদার কারণে মহান আল্লাহ তার সাহায্যের সব দরজা খুলে দিয়েছিলেন। ফলে তাতাররা অনেকগুলো রণাঙ্গনে পরাজিত হয়ে ভেগেছিল। কিন্তু বড় আফসোসের কথা—হয়তো জয় নাহয় পরাজয়, এমনতরো সিদ্ধান্ত নিরূপণ করে-দেওয়া চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বেই ভেঙে গেছে সুলতানের তলোয়ার। আমিরদের গাদ্দারি তার পরাজয়ের কারণ বনেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে পূর্বের এইসব বিষয় ভেবেচিন্তে সুলতান জালালুদ্দীন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন—সামগ্রিকভাবে আমরা যেমন কর্ম সম্পাদন করেছি, সেই কর্মের ফল হিসেবে আমাদের উপর ঘটে চলেছে আসমানি ফয়সালা। তবে, যদি একটিবার বাগদাদ ও সিরিয়া পর্যন্ত সকল শাসক মুসলিম উম্মাহর সাহায্য ও প্রতিরক্ষায় আমাকে সঙ্গ দেবেন বলে রাজি হয়ে যান, তা হলে উম্মাহর উদ্দীপ্ত সিপাহিদের একত্র করে তাতারদের থেকে বদলা নেওয়া এখনো কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। একসঙ্গে সবাই জেগে উঠলে পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে ফেলা সম্ভব।

সুলতান খুব গভীরভাবে অনুভব করে উঠলেন যে, উম্মাহর শহিদদের প্রত্যেকটি রক্তকণিকা তার নিকট প্রতিশোধ কামনা করছে। ভেতর থেকে তাকে বিপুলভাবে নাড়িয়ে তুলছে। সুলতানের মনে তখন জেগে ওঠে নতুন সংকল্প—না, এই শহিদদের একফোঁটা রক্তও বৃথা যেতে দেওয়া যায় না। শূন্যহস্ত সুলতান ফের বুকভরা সাহস নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি চাচ্ছিলেন—হিন্দুস্থানের মাটিতে জিহাদি অভিযানের নতুন এক কেন্দ্র গড়ে তুলবেন।

হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক হালচাল

সুলতান জালালুদ্দীনের হিন্দুস্থান প্রবেশের বিস্তারিত কাহিনি পড়বার আগে, সে-কালের হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক হালচিত্র কী ছিল, তাতে খানিক নজর বুলিয়ে নেওয়া সমীচীন মনে করছি।

হিন্দ-বিজেতা সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরির শাহাদাতের পর, ঘুর থেকে আরম্ভ করে বাঙলা দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত তার সেই বিশাল সাম্রাজ্য টুকরো-টুকরো হয়ে পড়েছিল। ৬০২ হিজরির ১৮ জিলকদ (জুন, ১২০৬) মঙ্গলবারে শিহাবুদ্দীনের নায়েব কুতুবুদ্দীন একজন স্বাধীন শাসকরূপে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করলেন। হিন্দুস্থানে তিনিই প্রথম স্বাধীন ইসলামি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

কুতুবুদ্দীন আইবেকের মৃত্যুর পর, ৬০৬ হিজরিতে (১২১০ খ্রিষ্টাব্দ) তার আজাদকৃত দাস ও জামাতা শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ হন দিল্লির বাদশাহ। খোরাসানে তখন ঘুরি সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট নায়েবরা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের নিকট অবনতি স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু তারপর খুব বেশি দিন কাটেনি—তাতারদের হাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য। ৬১৮ হিজরিতে সুলতান জালালুদ্দীন যখন সিন্ধুনদী পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানের মাটিতে পা রাখলেন, তখন সিন্ধুর পূর্বতীর-সংলগ্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল দিল্লির আধিপত্যমুক্ত ছোট-ছোট হিন্দু-রাজ্য। সিন্ধুতে শাসন ছিল নাসিরুদ্দীন কিবাছার, আর দিল্লির ক্ষমতা ছিল ইলতুৎমিশের।[১]

সিন্ধুনদের পারে

সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধুতীরের পূর্বদিকের গা-ছমছমে গহীন অরণ্যে দুই দিন কাটালেন। তার যে-সমস্ত বিক্ষিপ্ত সহযোদ্ধা নদী পেরোতে সক্ষম হয়েছিল, এবং পারে উঠে পাগলের মতো সুলতানকে খুঁজে ফিরছিল, তারা এক-দুজন করে সুলতানের সঙ্গে এসে শামিল হতে লাগল। এভাবে ধীরে-ধীরে তাদের সংখ্যা ৫০ হয়ে গেল।[২]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি, ১৯/৪৭৪-৪৮৬, ২০/৪৯০, ২১/৫২০; তারিখে মিল্লাত, ৩/৩৩৪-৩৫২; খাওয়ারিজমশহি, ১৪৮;

[২] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৪২, ১৪৩;

নাসাবির বর্ণনা-মোতাবেক—তাদের মধ্য থেকে তিনজনের নাম সাদুদ্দীন আলি, কালাব্রাস বাহাদুর ও কাবকাহ।

তাফসিরে কাবির গ্রন্থে হাফেজ যাহাবি কাজি ইবনে ওয়াসেলের সূত্রে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেই বর্ণনা থেকে জানা যায়—সুলতানের সঙ্গে এসে মিলিত-হওয়া বহু সিপাহি কোনোক্রমে নৌকা জোগাড় করে নদীর এ-পারে এসে উঠেছিল।

নাসাবির বর্ণনা অনুযায়ী—সুলতানের অসংখ্য সিপাহি তার দেখাদেখি পেছন থেকে নদীতে ঝাঁপ মেরেছিল। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নদীর উত্তাল ঢেউ কয়েক মাইল দূরের তটে নিয়ে আছড়ে ফেলেছিল; মাছের পেটের ভেতরের আহার উগরে দেবার মতো। সুলতান বেঁচে আছেন কিনা তারা জানত না। তারা উন্মাদের মতো ছুটছিল এদিক-ওদিক। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ, ভাগ্যক্রমে শুকনো পাতার স্তর পড়ে-যাওয়া সেই গহীন জঙ্গলের ভেতর আচমকা পেয়ে গিয়েছিল সুলতানকে।

তাদের ভেতর জিয়াউল মুলক আরিজ আন-নাসাবিও ছিলেন। নদীতে সুলতানের লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে তিনিও ঝাঁপ মেরেছিলেন। নিজের গল্প তিনি নিজেই বলেছেন—আমি পানিতে লাফিয়ে পড়লাম। অথচ আমি জানতামই না সাঁতার কী জিনিস। আমি ক্রমাগত হাবুডুবু খেতে লাগলাম। ডুবেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি বাতাসে ফোলানো এক চামড়ার মশকে ভর করে গা ঠেলে ঠেলে সাঁতরাচ্ছে একটি বাচ্চা। আমি আনাড়ির মতো হাত-পা ছুড়ে ছুড়ে তার মশক ধরবার চেষ্টা করলাম। তখন কান পর্যন্ত আমার পুরো দেহ পানির ভেতর। এই মুহূর্তে বাচ্চাটা বলে উঠল—শোনো, বাঁচতে চাইলে আমার কাছ থেকে মশক একেবারে ছিনিয়ে নিও না। বরং আমার সাথে মশকে তুমিও ঝুলে পড়ো। কিনারায় পৌঁছে দেব। তারপর সে আমাকে নদীর কিনারায় নিয়ে এল এবং গায়েব হয়ে গেল। আমি তাকে অস্থির হয়ে খুঁজতে আরম্ভ করলাম। আমাদের খুব কমসংখ্যক সিপাহিই জীবিত এ-পারে আসতে পেরেছিল। এই অল্পসংখ্যকের ভেতরেও সে একদম নজরে পড়েনি। হুলস্থুল বেশি হলে তা-ও একটা কথা ছিল।[৩]

এটাকে গায়েবি মদদ ছাড়া কী বলা যায়? নদীর এই তেজি ধারাপ্রবাহের ভেতর একজন দক্ষ সাঁতারুকেও একাকী খুব মুশকিলের সাথে সাঁতরাতে হয়। হতভম্ব হতে হয়—পিচ্চি একটা বাচ্চা কীভাবে আরেকজনকে সহায়তা করে নিরাপদে পারে নিয়ে তুলল!

যা হোক, বেঁচে পারে-ওঠাদের এই ছোট্ট দলটি প্রিয় রাহনুমাকে তাদের মাঝে জীবিত পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। অপরিসীম ক্লান্তি ও শক্তিহীনতা সত্ত্বেও এই দুঃসাহসিক সিপাহিরা ফের নতুন করে কঠিন সব পরীক্ষা ও বিপদের পাহাড়

---

[৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ১৬১

গুঁড়িয়ে দেবার উদ্দেশে নবায়ন করতে লাগল নিজেদের সংকল্প। মুজাহিদদের বিপুল উদ্দীপনার এই মুহূর্তটা ছিল এমন—তখন তাদের হাতে সওয়ারি কিংবা অস্ত্রশস্ত্র তো দূরের কথা, নিজেদের সতর ঢাকবার উপযুক্ত কাপড় ও আহারের দু-তিনটে লোকমাও সহজলভ্য ছিল না। তার উপর অনেকের শরীরেই তখন বসে গেছে দগদগে ঘা। তাদের চিকিৎসারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

এর ভেতর একসময় জামালযারদ নামের এক লোক গায়েবি মদদগার হয়ে সুলতানের দরবারে এসে হাজির হল। এই লোক ছিল সুলতানের একজন বিত্তবান অফিসার। চেঙ্গিজ খানের সাথে সুলতানের যুদ্ধ বাধার পূর্বেই ধনসম্পত্তি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু সে যখন সুলতানের পরাজয় ও সিন্ধুপারে তার আগমনের খবর জানল, খুব চিন্তান্বিত হয়ে উঠল তার মন। প্রিয় কায়েদের প্রয়োজনের কথা আন্দাজ করে একটি নৌকায় বিপুল পরিমাণ খোরাকি, কাপড় ও বিভিন্ন জাতের দ্রব্য নিয়ে সুলতানের খেদমতে এসে উপস্থিত হল। এতে করে সুলতানের সঙ্গীদের প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য ও সতর ঢাকার কিছু পোশাক মিলে গিয়েছিল। খুশি হয়ে সুলতান জালালুদ্দীন জামালের পূর্বের অপরাধই শুধু ক্ষমা করেননি; বরং তাকে নৈকট্যভাজন গণ্য করে এখতিয়ার উদ্দীন উপাধিও প্রদান করেন।

বিস্ময়জাগানিয়া এই ঘটনা وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকি বান্দাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন, যা তার কল্পনায়ও আসে না) এরই বহিঃপ্রকাশ এবং আল্লাহর গায়েবি সাহায্যের জ্বলন্ত প্রমাণ।

নিরস্ত্র সিপাহি

সুলতান দ্রুত তাতার-ফেতনার মোকাবেলা করার জন্য দিল্লির বাদশাহ সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের কাছে সাহায্য তলবের উদ্দেশে দিল্লি যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু রাস্তায় হঠাৎ অজানা আশঙ্কার মুখোমুখি হয়ে যেতে পারতেন। তাই ভাবলেন—ইলতুৎমিশের কাছে যাবার আগে এইরকম অজানা বিপদগুলোর মোকাবেলা করে-ওঠার মতো ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাখা জরুরি। কারণ, তাতারদের পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা তখনও রয়ে গেছে। তা ছাড়া হিন্দুস্থানের শাসকরাও কম শঙ্কাজনক ছিল না।

সুলতান আশপাশের এলাকা ও পরিপ্রেক্ষিত যাচাইয়ের জন্য গুপ্তচর হিসেবে কিছু মুজাহিদকে অগ্রে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে গেলেন—কাছেই হিন্দু সিপাহিদের একটি দল আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করছে। সুলতান এই সংবাদটি এক অপ্রত্যাশিত নেয়ামত ভেবে সিপাহিদের জন্য যুদ্ধাস্ত্র ও সওয়ারি লাভের পরিকল্পনা আঁটলেন। কয়েকজন সৈন্যকে আদেশ দিলেন—জঙ্গল থেকে বৃক্ষের কিছু শাখা কেটে আনো।

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম বাস্তবায়িত হল। তারপর যখন রাতের অন্ধকারে চারপাশ ছেয়ে গেল, এই লাঠিয়াল মুজাহিদরা চুপি চুপি হিন্দু বাহিনীর কাছে পৌঁছে তাদের উপর সরাসরি আক্রমণ করে বসল। এই সফল গেরিলাযুদ্ধে মারা গেল অনেক হিন্দু সেনা। অবশিষ্টরা অস্ত্রশস্ত্র, মহিষ-সহ অন্যান্য রসদপত্র ফেলে পালিয়ে গেল। গনিমতের এই মাল মুজাহিদদের জন্য গায়েবি মদদ থেকেও কম ছিল না।[৪]

হিন্দু রাজাদের সাথে জিহাদ

সিন্ধুনদের পারে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটে গেছে, সেই যুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীন পরাজিত হয়ে নদী পেরিয়ে এ-পারে চলে এসেছেন—একথা সিন্ধুতীরের হিন্দু রাজারা পূর্বেই শুনতে পেয়েছিল। সুলতানের বীরত্ব ও সাহসিকতার শোহরত দূরদূরান্তের সাম্রাজ্যগুলো পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্য হিন্দুস্থানের সীমান্তে সুলতান জালালুদ্দীনের আগমনে হিন্দু রাজারা ভারী শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাদের এই শঙ্কা ছিল দুই তরফা। একদিকে ভাবছিল—আগত দিনে হিন্দুস্থানে এই মর্দে মুজাহিদ যদি ফের রচনা করে বসে গজনবি ও ঘুরির সেই জ্বলন্ত ইতিহাস! অন্যদিকে এ নিয়ে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যে—সুলতান জালালুদ্দীনকে ধাওয়া করতে এসে তাতাররা যদি আমাদের এই হিন্দুস্থানে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলে!

বুকের ভেতর এইসব চাপা শঙ্কা জেঁকে বসায় হিন্দু রাজারা সুলতান জালালুদ্দীনের সঙ্গে মোকাবেলা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। ফলে, সুলতান জালালুদ্দীন ও স্থানীয় হিন্দু রাজাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের এক লম্বা সিলসিলা। প্রত্যেকটি যুদ্ধে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তিনি হিন্দু রাজাদের বহুগুণ বড় ও জমাটবদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করতে লাগলেন।

প্রথম যুদ্ধ

রানা চিত্রা নামে একজন হিন্দু রাজা ছিল। তার রাজ্যের উপকণ্ঠেই ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের বর্তমান অবস্থান। এই রাজা এক হাজার পদাতিক ও ৫০০ অশ্বারোহী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুলতান জালালুদ্দীনের সন্ধানে।

সুলতানের জন্য এবারকার মুহূর্তগুলো হয়ে উঠেছিল কঠিন পরীক্ষার। কারণ, তার সহযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল এমন যে, মুহূর্তের ভেতর আঙুলে তাদের গুনে ফেলা যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার সিন্ধুর যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেই আঘাতের জ্বলন্ত ব্যথায় অবিরাম কাতরে চলছিল এখনো। অধিকাংশের নিকট অস্ত্রও ছিল না। এই অবস্থায় এক পেশাদার ও সুবিন্যস্ত বাহিনীর সাথে উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ করে- ওঠা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

---

[৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৬০; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৬; তারিখে কাবির যাহাবি, ৬২/৬১৮;

নিরুপায় সুলতান অতি সত্বর বর্তমান অবস্থানস্থল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। সহযোদ্ধাদের আদেশ দিলেন—আহতদের মধ্যে যাদের গায়ে নড়বার শক্তিও নেই, তাদেরও সঙ্গে নেওয়া হোক।

এতে সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল—তিনি একদম সিন্ধুর কিনার পর্যন্ত পিছপা হয়ে যাবেন, সেখান থেকে নৌকায় নদী পেরিয়ে এমন কোনো পর্বতশ্রেণির ভেতর গিয়ে লুকোবেন, যা হবে তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে অনেক দূরবর্তী। তাকে খুঁজতে এসে রাজা যখন হতাশ হয়ে ফিরে যাবে, পুনরায় তিনি এ-পারে চলে আসবেন।

যদিও এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মিশন আঞ্জাম দিতে গিয়ে কোনোভাবে তাতারদের কবলে পড়ে যাবারও আশঙ্কা রয়েছে; কিন্তু এই মুহূর্তের আশঙ্কা থেকে বাঁচতে এ ছাড়া কোনো উপায় চোখে পড়ছে না। তাতারদের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, নদীর ওপারে সুলতানের অনুসন্ধানে এখন আর তারা নেই। তাদের ধারণামতে—নদী পেরিয়ে সুলতানের এইপারে ফিরে আসতে-পারা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার।

সুলতান এই দুঃসাহসিক ও বিস্ময়কর পরিকল্পনা এঁটে উঠলেন তো ঠিকই, কিন্তু এ অনুসারে কাজ আঞ্জাম দেবার সুযোগ মিলল না তার। এর মধ্যেই রাজার বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়ে গেল। সুলতান সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে পিছু হটে কাছের এক ঘন জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেলেন। জঙ্গলের এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন পদাতিকদের। অশ্বারোহীদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের ওদিকে এক পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে রাজার সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

রাজার বাহিনী আসছিল সুলতানের পেছন-পেছন। পাহাড়ের পাদদেশে সংকল্পবদ্ধ সহযোদ্ধাদের নিয়ে কামানের উপর তির চড়িয়ে হিন্দু সৈন্যদের অপেক্ষায় রইলেন সুলতান। সুলতানকে দূর থেকেই দেখে ফেলল আগুয়ান হিন্দু রাজা। তাকে দেখামাত্র রাজার চেহারায় ফুটে উঠল উত্তেজনা। তুফানের বেগে হুড়মুড় করে আরোহী ও পদাতিকদের নিয়ে সুলতানের দিকে অগ্রসর হতে লাগল সে।

সুলতান জালালুদ্দীন পাহাড়ের ভারী পাথরের মতো আপন জায়গায় স্থির, নিষ্কম্প। রাজাকে আরও কাছাকাছি আসতে দিচ্ছিলেন তিনি। মাঝখানের দূরত্ব যখন একেবারে কমে এল, রাজার দিকে কামান তাক করে সাঁই করে একটি তির নিক্ষেপ করলেন সুলতান। সেই ছুটন্ত তির সোজাসুজি রাজার সিনায় গিয়ে বিদ্ধ হল। তিরের আঘাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে ধপ করে রাজা লুটিয়ে পড়তেই হিন্দু বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল এদিক-ওদিক।[৫]

---

[৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৬২; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২২/২৪০; তারিখে কাবির যাহাবি, ৬২/৬১৮

من عهد عاد كان لنا معروفا، اسر الملوك وقتلها وقتالها

রাজা-বাদশাহদের বন্দি করা, হত্যা করা, তাদের সঙ্গে মোকাবেলায় মেতে ওঠা আমাদের সুপ্রসিদ্ধ অভ্যাস।

এই বিজয়ে সুলতানের সিপাহিরা গনিমত হিসাবে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ও রসদপত্র অর্জন করে।

দ্বিতীয় যুদ্ধ

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। সুলতানের বার্তাবাহক সংবাদ নিয়ে এল—একটু দূরেই শিবির গেড়ে আছে ৪ হাজার হিন্দু সেপাই। সংবাদটা শুনে ভাবিত হয়ে পড়লেন সুলতান। পরক্ষণে পরিকল্পনা সাজালেন—এদের উপর তিনি অতর্কিত আক্রমণ চালাবেন। তারপর ১২০ জন জানবাজকে সঙ্গে নিয়ে আকাশের বজ্রের মতো ফেটে পড়লেন বেখবর দুশমনদের উপর। অনেক হিন্দু সৈন্য মারা গেল। বাকিরা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গেল এদিক-ওদিক। এই সফল অভিযানে মুজাহিদদের চাহিদা পরিমাণ গনিমত অর্জিত হল। এতে পূরণ হয়ে গেল তাদের যুদ্ধাস্ত্রের স্বল্পতা।[৬]

হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ

এই নিরুপায় অবস্থায় সৈন্যদের নিয়ে অন্যের দেশে লড়ে-যাওয়া এসব যুদ্ধের ধারাবাহিক সফলতায় যেখানেই সুলতানের সৈন্যদের শক্তি হাসিল হয়েছে, সেখানেই স্থানীয় রাজাদের জন্য বেজে উঠেছে শঙ্কার দামামা। কুহে বালালা ও কুহে রাকালার হিন্দু রাজারা সুলতানের এই যুদ্ধ-সফলতায় ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করতে লাগল যে, কীভাবে এই বিপদের মোকাবেলা করা যায়?

শেষে তারা ৬ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সুলতানের মোকাবেলায় পাঠিয়ে দিল। উদ্দেশ্য ছিল—সুলতানকে হত্যা করা, নয়তো গ্রেফতার।

সিন্ধুপারের যুদ্ধের পর সুলতানের বিক্ষিপ্ত হয়ে-যাওয়া সেই সিপাহিদের আগমনের ধারা তখনও অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন দিক থেকে একে-একে অনেকে এসে শামিল হচ্ছিল। কিন্তু সুলতানের এই সৈন্যদের সংখ্যা তখনও ৫০০ অতিক্রম করেনি। ঐক্যবদ্ধ হিন্দু বাহিনী যখন সামনে চলে এল, সুলতান এই ৫০০ সৈন্যকেই সারিবদ্ধ করলেন এবং এমন প্রচণ্ডতার সাথে আক্রমণ করলেন যে, সেদিন বারোগুণ অধিক হিন্দুও 'পা মাথায় তুলে' ছুটে পালিয়েছিল দিগ্বিদিক।

---

[৬] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৪৩;

কাছাকাছি সময়ের এইসব যুদ্ধ-জয়ে দ্বিগুণ বেড়ে গেল সুলতানের গ্রহণযোগ্যতা ও শক্তিমত্তা। তখনও সুলতানের পথহারা সিপাহি ও স্বেচ্ছাসেবক দল দূরদূরান্ত থেকে এসে বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। এভাবে তার পতাকাতলে ধীরে-ধীরে জমায়েত হয়ে গেল ৪-৩ হাজার লোক।[৭]

সুলতানের পশ্চাদ্ধাবন

চেঙ্গিজ খান তখনও সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরেই ছাউনি খাটিয়ে ছিলেন। হিন্দুস্থানে সুলতানের এই যুদ্ধ-সফলতার খবর পেয়ে তিনি অধিক কালক্ষেপণ ক্ষতিকর ভেবে বালা নৈয়ানের নেতৃত্বে তৎক্ষণাৎ একটি ভারী সৈন্যদল প্রদান করে সুলতানকে ধাওয়া করতে পাঠিয়ে দিলেন। তাতারদের আসার সংবাদ পেয়ে দিল্লির দিকে যাত্রা করেন সুলতান জালালুদ্দীন। তার এই ক্ষুদ্র সেনাদল যোগ্য ছিল না একই সময়ে তাতার ও হিন্দু সেনাদের সাথে লড়বার।[৮]

কুদরতি বাধা

বালা নৈয়ান সুলতানের খোঁজে রওনা দিয়ে দিয়েছে। পথে-পথে বিভিন্ন শহর বরবাদ করতে-করতে সামনে অগ্রসর হচ্ছে সে। বালা নৈয়ানের ত্রাসজনক নিপীড়নের শিকার হল লাহোর, মুলতান ও শাহপুর (বর্তমান সারগোধা)। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন ওর থেকে আরও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এদিকে গ্রীষ্মকালের আগমনের সাথে-সাথে হিন্দুস্থানের প্রচণ্ড গরম গোবি মরুভূমির আলো-বাতাসে বসবাস করে অভ্যস্ত তাতার-সেনাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠল। হিন্দুস্থানের গরমে তাতার-বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ধীরে-ধীরে অসুস্থ হয়ে যেতে লাগল। বালা নৈয়ান ব্যর্থ মনোরথে ফের উলটোপথে ফিরে এল। চেঙ্গিজ খানের কাছে এসে বলল—এখানকার জলবায়ুর প্রভাবে আমাদের সেপাইরা মরে যাচ্ছে। খাওয়ার পানিও তাজা ও পরিষ্কার নয়।[৯]

শাহজাদা চোগতাই খানের নেতৃত্বে তাতাররা মুলতানে হামলা করেছিল। সেখানে তখন রাজত্ব ছিল নাসিরুদ্দীন কিবাছার। তাতাররা অবরোধ করে ফেলেছিল সারা শহর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় করে উঠতে পারেনি। ৪০ দিন পর সেখান থেকে ফিরে গিয়েছিল। এতে নিশ্চয় শহরবাসীর উন্নত হিম্মতের পাশাপাশি, মধ্য-পাঞ্জাবের প্রচণ্ড গরমকালেরও একটা বিরাট ভূমিকা ছিল।[১০]

---

[৭] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৪৪; খাওয়ারিজম শাহি, ১৪৭;

[৮] চেঙ্গিসখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫৪;

[৯] চেঙ্গিসখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫৪;

[১০] তারিখে ফারিশতা (২/৮৯৬) গ্রন্থে এই কারণটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

মুলতানের পর চোগতাই খানের এই বাহিনী যাত্রা করেছিল বেলুচিস্তানের দিকে। মাকরান ও খাজদারে অসংখ্য মানুষের রক্ত ঝরিয়ে সিন্ধুর তীরে এসে ছাউনি স্থাপন করেছিল। আর সেখানে চোগতাই খান হিন্দুস্থানের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েদকৃত হাজারও লোককে স্রেফ এ-কারণে হত্যা করে ফেলেছিল যে—এদের উপস্থিতির কারণে তাতার-বাহিনীর ভেতর দুর্গন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এটা ছিল হিন্দুস্থানের গরম মৌসুমের প্রাদুর্ভাব।[১১]

যা হোক, সিন্ধুপারের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে তাতারদের সৈন্যশক্তিতে সুলতান একটা বড় ঝটকা লাগাতে পেরেছিলেন। এবার মৌসুমের প্রতিকূলতায় ক্ষয়ক্ষতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। চেঙ্গিজ খান তাই পরিত্যাগ করেন অগ্রযাত্রার তাবৎ ইচ্ছা। এতে করে হিন্দুস্থানের উত্তরাংশ ব্যতীত সমস্ত এলাকা তাতারদের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হয়ে যায়।[১২]

কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে—হিন্দুস্থানে চেঙ্গিজ খানের আর অগ্রসর না-হবার পেছনে তার কিছু সংশয় ও অশুভ ধারণারও বড় দখল ছিল।[১৩]

প্রত্যাবর্তন

চেঙ্গিজ খান এবার নিজ দেশে ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন। তার জন্য চীন ও মোঙ্গলিয়ায় ফিরে যাওয়া এ-কারণে জরুরি হয়ে উঠেছিল যে, ক'দিন আগেই ওখানে মারা গিয়েছিল তার নায়েব মাকুলি বাহাদুর। বিজিত, হিয়া সাম্রাজ্যে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের আগুন। ফেরার জন্য প্রথমে তিনি কাশ্মিরের রোখ নিলেন। কিন্তু সামনে অনতিক্রমণীয় পর্বতশ্রেণি দেখে পুনরায় সেই পথেই ফিরে গেলেন, পূর্বে যেদিক থেকে এসেছিলেন।[১৪]

ফেরার পথে পেশোয়ার বরবাদ করে যাত্রা আরম্ভ করলেন সমরকন্দের দিকে। পথিমধ্যে গজনির লোকদের হত্যা করে বিধ্বস্ত করে দিলেন শহর। সুলতান মাহমুদ গজনবির কবরের ভেতর থেকে তার হাড্ডি বার করে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। তদ্রুপ যাবেল, গজনি, ঘুরসহ খোরাসানের ছোটখাট জনগোষ্ঠীকেও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন তিনি, যাতে এই এলাকাগুলো থেকে সুলতান জালালুদ্দীনের সাহায্য পাবার কোনো সম্ভাবনা বাকি না-থাকে।[১৫]

---

[১১] রওজাতুস সফা, ৫/৪০;

[১২] চেঙ্গিজখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫৪; রওজাতুস সফা, ৫/৪০;

[১৩] জামিয়ে তারিখে হিন্দ, বর্ণনা করেছেন খালেক আহমাদও হাবিব আহমাদ, মুদ্রণ লাহোর।

[১৪] চেঙ্গিসখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫৪;

[১৫] রওজাতুস সফা, ৫/৪০; আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ, ২২৫;

শিক্ষার উপাদান

এখনো পর্যন্ত মুসলিম কয়েদিদের একটা বড় সংখ্যা বাধ্যতামূলকভাবে তাতারদেরকে সেবা-শুশ্রূষা প্রদানের জন্য তাদের সাথে-সাথে ঘুরে ফিরছিল। চেঙ্গিজ খান দেখলেন, এখন এদের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই তিনি গণহত্যার নির্দেশ দিলেন।[১৬] কিছু সময় সমরকন্দে কাটিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন। বিজয়ের আনন্দ দ্বিগুণ করে তুলতে খাওয়ারিজম শাহের মা তুর্কান খাতুন ও শাহি খানদানের অন্যান্য বেগম-শাহজাদিকে হুকুম করলেন—চলো, তোমরা বাহিনীর আগে আগে চলতে থাকো। উচ্চ আওয়াজে হা-হুতাশ করতে-করতে খাওয়ারিজম শাহ ও তার হারানো রাজ্যের কথা ভেবে-ভেবে বুক চাপড়ে মর্সিয়া গাইতে থাকো![১৭]

সাইহুন-নদীর তীরে, চেঙ্গিজ খান যেখান থেকে খাওয়ারিজম রাজ্যে ঢুকেছিলেন, সেখানে ছিল শস্য-শ্যামল বিশাল প্রান্তর। চেঙ্গিজ খান বিজয়োৎসব করার জন্য বাহিনীর সব সরদারকে এই প্রান্তরে তলব করলেন।

হ্যারল্ড ল্যাম্ব এই উৎসবের একটা নকশা টেনেছেন। সেখান থেকে শিক্ষামূলক একটা উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি—এ-সময় চেঙ্গিজ খান মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের ময়ুর-সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এই সিংহাসন তিনি সঙ্গে করে সমরকন্দ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। এবং তার কাছে মৃত খাওয়ারিজম শাহের মুকুট ও শাহি লাঠিও সংরক্ষিত ছিল। মাঠের ভেতর আরম্ভ হল জমকালো উৎসব। খাওয়ারিজম শাহের মাকে (তুর্কান খাতুন) হাতকড়া পরিয়ে টেনে-হিঁচড়ে অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসা হল।[১৮]

উৎসব শেষে চেঙ্গিজ খান গোবি মরুভূমির দিকে রওনা দিলেন। তার মন খুবই প্রশান্ত যে, তার বিরোধীপক্ষের শক্তি এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সিন্ধুতীর থেকে কাসপিয়ান সাগর পর্যন্ত উড়ে চলেছে কেবল তাতারদের বিজয়পতাকা। মুসলিমদের এই বিরাট সাম্রাজ্যের কয়েক শতাংশ লোক, যারা আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তারাও হয়ে গেছে তাতার-বিজেতাদের দাসানুদাস।

দিল্লির বাদশাহর দোরগোড়ায়

সুলতান জালালুদ্দীন দিল্লি থেকে দুই-তিন মনজিল দূরত্বে ডেরা স্থাপন করে সাইয়েদ আইনুল মুলক নামের এক বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাকে পত্রবাহক হিসেবে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের দরবারে পাঠালেন, যাতে ইলতুৎমিশকে তাতার-ফেতনার সর্বগ্রাসী আগ্রাসন ও গণহত্যা সম্পর্কে সতর্ক করে তোলা যায়

---

[১৬] চেঙ্গিজ খান; রওজাতুস সফা, ৫/৪০

[১৭] রওজাতুস সফা, ৫/৪১;

[১৮] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় : ২১, পৃষ্ঠা : ১৫৯

এবং ক্রমাগত সয়লাবের মতো নেমে আসছে যেসব বিপদ, সে ব্যাপারে তার সামনে একটা চিত্র উপস্থাপন করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য তার থেকে সাহায্যের আবেদন করা যায়।

ইলতুৎমিশের নিকট প্রেরিত চিঠিতে সুলতান লিখেছিলেন, 'নিশ্চয় শরিফ আদমি সম্মানিত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ান। কালের দুর্যোগ আমাকে আপনার প্রতিবেশিত্বে আসবার ও সাক্ষাৎ করবার একটা অধিকার দিয়ে দিয়েছে। এমনতরো মেহমান খুব কমই আসে। আমরা যদি পবিত্র মহব্বত ও পরিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করি, সুখ-দুঃখের কালে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে উঠি, তা হলে আমাদের দু'পক্ষের সমস্ত উদ্দেশ্য খুব সহজেই আমরা স্বার্থক করতে পারব। মুসলিমদের দুশমন যখন আমাদের ঐক্যবদ্ধতার সংবাদ শুনতে পাবে, ভোঁতা হয়ে যাবে তাদের আক্রমণাত্মক দন্ত।[১৯]

ইলতুৎমিশের ফিরতি জবাব

সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন অতি সতর্কপ্রকৃতির শাসক। তিনি ভাবলেন, সুলতান জালালুদ্দীনকে প্রকাশ্যে সাহায্য করতে গেলে আমার জন্য তৈরি হয়ে যেতে পারে অনেক ঘোরপ্যাঁচ ও শঙ্কামূলক বিষয়।

তিনি নিজেই রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্ত চক্রান্ত দাবিয়ে রেখে খুবই কষ্টে রাজসিংহাসন সামলাচ্ছিলেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে কিবাছা ও তার মতো কিছু বিদ্রোহী নেতা ইলতুৎমিশের কর্তৃত্বের বাইরে অবস্থান করছিল তখনও। প্রতিবেশী স্বাধীন হিন্দু রাজারা প্রথমেই সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে যুদ্ধ করে বসেছিল। এমনকি, সুলতান জালালুদ্দীনের বীরত্ব, যুদ্ধকৌশল ও দিগন্তজোড়া প্রসিদ্ধি দেখে স্বয়ং ইলতুৎমিশেরও ভয় হচ্ছিল—আচ্ছা, সুলতান যদি ক'দিন পরে হিন্দুস্থানে পা মজবুত করে স্বয়ং দিল্লির সিংহাসনের জন্যই নতুন এক শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে!

এইসব বিষয় বাদ দিলেও, সুলতান ইলতুৎমিশের সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা হচ্ছিল আরেকটা ব্যাপার নিয়ে। তা হল—সুলতানকে যদি আমি মদদ করতে যাই, তাতাররা তা হলে আমাদের হিন্দুস্থানে হামলে পড়বার শক্ত একটা বাহানা পেয়ে যাবে।

এ ছিল এমন এক শঙ্কা, যার স্রেফ কল্পনাই ইলতুৎমিশের মতো নিজের আখের গোছানো নিয়ে ব্যস্ত শাসকের গায়ে কম্পন ধরিয়ে দেবার জন্য ছিল যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও, যেহেতু সুলতান এখন তার একজন প্রতিবেশী ও মুসলিম

---

[১৯] জাহাঁকুশা, ২/১৪৪;

শাসক, এবং তার কাছে তিনি ইসলাম ও মিল্লাতের নামে সাহায্য তলব করতে এসেছেন, এজন্য সুলতান ইলতুৎমিশ ভাবলেন—জালালুদ্দীনকে সাফ-সাফ অস্বীকৃতি জানিয়ে দেওয়াটাও কেমন যেন অভদ্রতা।

শেষমেশ কয়েকদিনের চিন্তাভাবনার পর তিনি সুলতান জালালুদ্দীনের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন এবং তার বাহিনীর জন্য রসদপত্রের বিপুল ভান্ডারসহ প্রত্যুত্তরমূলক একটি চিঠি পাঠালেন। লিখলেন—হিন্দুস্থানের আবহাওয়া আপনার জন্য প্রতিকূল। এখানে অবস্থান করতে গেলে আপনার বাহিনীর স্বাস্থ্যে অনেক মন্দ প্রভাব পড়বে। উত্তম হবে অন্যকোনো এলাকাকে আপনার অভিযানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু আপনি যদি এখানেই থাকতে পছন্দ করেন, তা হলে আমি আপনার অবস্থানের জন্য দিল্লির উপান্তে একখণ্ড ভূমি বরাদ্দ করতে সম্মত আছি। এমনকি এই মুলুকের যে-সমস্ত এলাকা অবিজিত রয়ে গেছে, সেখান থেকে যে অঞ্চলই আপনি নিজ শক্তিবলে বিদ্রোহী ফেতনাবাজদের থেকে পবিত্র করতে পারবেন, সেখানেও আমরা আপনার শাসন মেনে নেব।'

সুলতান জালালুদ্দীন ইলতুৎমিশের এই জবাবি পত্র পেয়ে বুঝে গেলেন—দিল্লির বাদশাহ আমাদের এই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

ফলে সুলতান এদিক থেকে নিরাশ হয়ে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধ এলাকাগুলোর দিকে নিবিষ্ট হলেন। সংকল্প করলেন—বাহুর জোরে সেখানকার কিছু এলাকা জয় করে আগত সমস্ত ঝড়ের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটা উপায় বের করবেন তিনি।[২০]

পাঞ্জাব ও সিন্ধুতীরের তাজা বিজয়

সিন্ধুপারের শাসকরা যখন সুলতান জালালুদ্দীনের এই অগ্রাভিযান সম্পর্কে অবগত হল, ভয়ানকভাবে ঘাবড়ে গেল তারা। সিন্ধুনদের উপত্যকার সবচেয়ে বড় রাজা ছিল রাও খোখর সিনকিন। সে সুলতানের চকচকে তরবারি দেখে নতি স্বীকার করে জালালুদ্দীনের আজ্ঞাবহ হয়ে ওঠে। এবং তার এই আজ্ঞাবহতাকে সুদৃঢ় করে তুলতে নিজের পুত্রকে সে সুলতান জালালুদ্দীনের খেদমতে প্রেরণ করে দেয়। সুলতান এতে আনন্দিত হয়ে রাজার ছেলেকে কিতলুগ খান উপাধি ও রাজকীয় পোশাক প্রদান করেন। এদিকে পাঞ্জাবের শাসক কিবাছার নায়েব কমরুদ্দীনও সুলতানের কাছে বিভিন্ন তোহফা পাঠিয়ে তার হিতাকাঙ্ক্ষিতা প্রকাশ করে।[২১]

কুহেজুদের শাসক তখন সুলতানের শক্তি নিঃশেষ করে দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি বাহিনীও গঠন করে ফেলেছিল

---

[২০] জাহাঁকুশা, ২/১৪৫; খাওয়ারিজম শাহি, ১৪৮;

[২১] জাহাঁকুশা, ২/১৪৫; সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৬২;

সে। সুলতান জালালুদ্দীনের অবস্থান তখনও যথেষ্ট দুর্বল; এজন্য এই শাসকের সাথে মোকাবেলার জন্য মাঠে নামছিলেন না তিনি। কেবল এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দিল্লি থেকে ফিরে আসার পথে সুলতানের সৈন্যসংখ্যা পৌঁছে গেল ১০ হাজারের কোঠায়। ফলে তিনি তখন প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করা জরুরি মনে করলেন। সেনাপতি তাজুদ্দীন মালিকের হাতে বাহিনীর একাংশ প্রদান করে তাকে কুহেজুদের শাসকের মোকাবেলায় রওনা করিয়ে দিলেন। তাজুদ্দীন মালিক প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভ করেন।[২২]

গিয়াসুদ্দীনের গড়ে-ওঠা নতুন রাজত্ব

সুলতান জালালুদ্দীনের সৈন্যদল হঠাৎ করেই প্রবৃদ্ধি ঘটার বড় একটা কারণ হল, ইরাক থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে খাওয়ারিজমি সিপাহিদের তাজা সেনাসাহায্য এসেছিল। হয়েছিল এই—সুলতান জালালুদ্দীনের ভাই গিয়াসুদ্দীন তাতারদের অস্থায়ী প্রত্যাবর্তনের পর ইরাক ও ইরানের কিছু অংশ ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। তাতারদের আক্রমণের সময় ইরানের ইস্পাহান শহরের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল সে। সৌভাগ্যের বিষয় হল—তাতাররা তখন এই শহর দখল করতে পারেনি। দীর্ঘ অবরোধের পর তারা ফিরে গিয়েছিল। তাদের চলে যাবার পর খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের হাজারও বিক্ষিপ্ত সৈনিক এসে গিয়াসুদ্দীনের কাছে সমবেত হয়েছিল। এবং তার জন্য তারা অনুগত করে ফেলেছিল কিরমান থেকে খোরাসান পর্যন্ত বিপুল-বিস্তৃত এলাকা। কিন্তু শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন ছিল অনভিজ্ঞ ও বিলাসপ্রবণ লোক। সাম্রাজ্যের তাবৎ বিষয়ে সে এতটা অমনোযোগী ও বেপরোয়া ছিল যে, রাজ্যের সমস্ত কিছুর দেখভাল তখন একা তার মাকেই করতে হচ্ছিল।

এই অবস্থাপট দেখে অভিজ্ঞ সরদাররা নিজেদের মধ্যে অভিমত ব্যক্ত করল যে, এখন এখানে সুলতান জালালুদ্দীনের ফিরে আসা দরকার। আমরা চাই, তিনি এসে মজবুত হাতে এই নতুন সাম্রাজ্য সামলে নিন। আর শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন সুলতানের নায়েব হয়ে থাকুক।

ফলে, এই আমির-সরদাররা সুলতানের কাছে প্রথমত এ বিষয়ে চিঠি পাঠাল। তারপর তাদের কিছু আমির, যেমন : সাঞ্জকান খান, এলচি পাহলোয়ান, আওর খান ও তার্কশাক জিনাকশি নিজেদের সেপাইদের নিয়ে সুলতানের কাফেলায় এসে মিলিত হয়। সুলতানের সামনে তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে থাকে। এই টাটকা সেনাসাহায্য পেয়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় সুলতানের শক্তি।

---

[২২] জাহাঁকুশা, ২/১৪৫; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

নাসাবির বর্ণনা—এই সৈনিকদের আগমনে সুলতানের এতটা শক্তি মিলল যে, তৎক্ষণাৎ তিনি কিবাছার সাথে সেই যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, যার সমস্ত কার্যকারণ পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।[২৩]

কিবাছার অপকর্ম

পাঠক, ইতিপূর্বে পড়ে থাকবেন—সিন্ধুতীরের যুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীনের সিপাহসালার আমান মালিক তাতারদের হাতে পরাজিত হয়ে পেশোয়ারের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পালাবার কালে আমান মালিকের মেয়েকে—যাকে তিনি সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন—সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পেশোয়ারের কাছাকাছি স্থানে পথিমধ্যে তাতাররা আমান মালিকের কাফেলা ঘেরাও করে ফেলে।[২৪] তাদের হাতে শহিদ হয়ে যান আমান মালিক ও তার অধিকাংশ সাথি। তার অল্পবয়সি পুত্র কারিন খান ও কন্যা (সুলতানের স্ত্রী) কোনোভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে এক দিকে ভেগে যান।

কিন্তু সবদিকে তখন হা করে দাঁড়িয়ে ছিল মৃত্যু। মাথার উপর ভরসার একটা হাত রাখবার কেউ ছিল না। সুলতানেরও খোঁজ ছিল না তিনি কোথায় আছেন। শেষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নানা রকমের দুঃখকষ্ট সয়ে এই দুই নিরুপায় ভাইবোন সিন্ধুতে পৌঁছে গেল। সেখানে তখন রাজত্ব ছিল নাসিরুদ্দীন কিবাছার।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে তারা একদল লোলুপ লোকের খপ্পড়ে পড়ে গেল। কারিন খানের কানের লতিতে মূল্যবান একটি মোতি ছিল। এক বদবখত এসে এই নিষ্পাপ এতিম ছেলেটাকে হত্যা করে সেই মোতি ছিনিয়ে নিল। কিবাছার কাছে গিয়ে এই মোতিটি সে উপঢৌকনস্বরূপ পেশ করল। নির্দয় কিবাছা এই হন্তারকের অপরাধে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। সে এই তোহফা তো গ্রহণ করলই, উলটো হন্তারককে বিপুল অর্থ প্রদান করে সম্মানিত করল। তবে আমান মালিকের মেয়ের জন্য এতটুকু অবশ্য করল যে, সে তাকে তার ওখানে থাকবার জায়গা করে দিল।

এর মধ্যেই কিবাছার দরবারে সুলতান জালালুদ্দীনের পরাজিত বাহিনীর বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও এসে পৌঁছেছিল। তাদের ভেতর একজন ছিল শামসুল মুলক শিহাবুদ্দীন। আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের জামানায় সুলতান জালালুদ্দীনের উজির ছিল সে। অন্যজন ছিল নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ। সে হেরাতের ঘুরি শাসক হাসান ইবনে খিরমিলের পুত্র।

---

[২৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ১৬৪

[২৪] জাহাঁকুশা, ২/১৪৭;

নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ যখন জানতে পারে—কিবাছার এখানে আমান মালিকের পুত্রের হত্যাকারীকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, ক্রোধে সে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু অবস্থার বাধ্যবাধকতার দরুন কিছু করে উঠতে পারে না। চুপ করে থাকে।

অন্যদিকে কিবাছা ভেবেছিল—সুলতান জালালুদ্দীন এখন চিরতরে রাজত্ব-বঞ্চিত হয়ে পথহারা এক উন্মাদে পরিণত হয়েছেন। এজন্য সুলতানের উজিরের উপস্থিতিতেও তার শানে অত্যন্ত আপত্তিজনক কথাবার্তা বলে যাচ্ছিল সে। শামসুল মুলক ছিল এই ঔদ্ধত্যের চাক্ষুষ সাক্ষী। কিন্তু সংকটময় পরিস্থিতি দেখে সেও নিশ্চুপ রইল।

এই দুটো ঘটনাই কিবাছাকে সুলতানের কাছে তিরস্কারযোগ্য বানিয়ে ফেলেছিল। পরিণামে ঘটেছিলও তা-ই।

সুলতান জালালুদ্দীন যখন দিল্লি থেকে ফিরে সিন্ধুতীরে এসে আক্রমণ করলেন, তখনই জানলেন—তার এক স্ত্রী (আমান মালিকের মেয়ে), সহযোদ্ধা নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ ও খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে উজির শামসুল মুলক এ মুহূর্তে কিবাছার আশ্রয়ে রয়েছে।

সুলতান কিবাছার উদ্দেশে দ্রুত চিঠি লিখলেন—এক্ষুনি এদের সবাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

চিঠি পাওয়ামাত্র কিবাছা সুলতানের স্ত্রীকে মূল্যবান উপঢৌকনসহ (তাতে একটি যোদ্ধা হাতিও ছিল) সুলতানের খেদমতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু শামসুল মুলকের ব্যাপারে কিবাছার আশঙ্কা ছিল যে, শামসুল মুলক তার কুৎসিত কথাবার্তা সুলতানকে জানিয়ে দেবে। এই ভয়ে সে শামসুল মুলককে মেরে ফেলল। এটা ছিল কিবাছার তৃতীয় অন্যায়।

নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদের ব্যাপারে কিবাছার স্বস্তি ছিল যে, নুসরাত উদ্দীন হয়তো আমার জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠবে না। কারণ, কিবাছা ও নুসরাত উদ্দীন দুজনের খানদানই ছিল ঘুরি সুলতানদের অনুগত। এই পুরোনো সম্পর্কের কথা ভেবেই নুসরাতের ব্যাপারে কিবাছার মনে কোনো শঙ্কা জাগেনি। তাকে সুলতানের কাছে এ মর্মে একটি লিখিত চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিল যে, শামসুল মুলক স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।[২৫]

কিন্তু, নুসরাতের ব্যাপারে কিবাছা যে ধারণা পোষণ করেছিল, তা ছিল ভুল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নুসরাত উদ্দীনের খানদান ঘুরি শাসকদের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছিল।[২৬] এবং তারা প্রতিপক্ষ ছিল খাওয়ারিজম শাহি খানদানের।

---

[২৫] নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৭; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৪৯; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

[২৬] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ৮৩;

স্বয়ং নুসরাত উদ্দীনের পিতা হাসান ইবনে খিরমিলও খাওয়ারিজম শাহি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল। এতকিছুর পরেও নুসরাত উদ্দীন সুলতান জালালুদ্দীনের একজন প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ও ওয়াফাদার হিসেবেই রইল। সুলতানকে মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষক মনে করে তার একটিমাত্র ইশারায় জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকত সে।

কিবাছার সাথে লড়াই

নুসরাত উদ্দীন সুলতান জালালুদ্দীনের দরবারে পৌঁছে খুলে বলল কিবাছার সব ঘটনা। আমান মালিকের পুত্রের হত্যাকারীকে কিবাছা যে বাহবা দিয়েছে, সে-কথা এবং শামসুল মুলকের হত্যার কথা শুনে রক্ত লাল হয়ে উঠল সুলতানের চোখ। ততক্ষণে সুলতানের ভ্রাতা গিয়াসুদ্দীনের কিছু প্রতিপক্ষ-আমির নিজ-নিজ সৈন্যদের নিয়ে ইরান থেকে হিন্দুস্থানে চলে এসেছিল। এতে সুলতানের বেড়ে গিয়েছিল যথেষ্ট সেনাশক্তি। ফলে, কিবাছার সাথে এখন টক্কর দেওয়া মুশকিল কিছু ছিল না।

সুলতান প্রথমত কিবাছার মজবুত দুর্গ কলুরে (বর্তমান কলুরকোট) আক্রমণ করলেন। এই শহরেই ছোট্ট কারিন খানকে হত্যা করা হয়েছিল। শক্ত অবরোধ ও দিনরাত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পর পদানত হল কলুর। এ যুদ্ধ চলাকালে এক ধাওয়ার ভেতর একটি বিষাক্ত তির লেগে সুলতানের বাহু জখমি হয়ে গিয়েছিল। তারপর বারনুযাজ দুর্গে আক্রমণ করে সেখানটাও কবজা করে নিলেন তিনি। এখানেও সুলতানের গায়ে এসে বিদ্ধ হল একটি উড়ন্ত তির। এর কারণ— বারনুযাজ এলাকাতেও সাধারণ এক সিপাহির মতোই যুদ্ধে শামিল ছিলেন সুলতান।[২৭]

এইসব বিজয়ের পর আহত সুলতান খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন তো দূরের কথা, দ্রুতই সেনাপতি জাহাঁ পাহলোয়ান উজবুকের হাতে ৭ হাজার সিপাহি প্রদান করে কিবাছাকে শায়েস্তা করতে পাঠালেন। এই বাহিনীতে রাজা খোখর সিনকিনের পুত্রও অংশগ্রহণ করেছিল। কিবাছা ২০ হাজার সেপাই-সমৃদ্ধ একটি বাহিনী-সমেত সিন্ধুতট থেকে এক ফারসাখ দূরের 'উচ' নামক স্থানে এসে ছাউনি স্থাপন করল।[২৮] জাহাঁ পাহলোয়ান তার সৈনিকদের নিয়ে রাত্রিবেলা এসে কিবাছার বাহিনীর উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।[২৯] কিবাছার সৈন্যরা এই আচানক আক্রমণে হুড়োহুড়ি ও ছুটোছুটি শুরু করে দিল সন্ত্রস্ততায়। কিবাছার সেনা-শিবির থেকে প্রচুর গনিমত লাভ

---

[২৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৬৪, ১৬৫; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭৬;

[২৮] জাহাঁকুশা, ২/১৪৬; ইবনে খালদুন, ৫; তারিখে ফারিশতা, ২/৮৯৫;

[২৯] জাহাঁকুশা, ২/১৪৬; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

করল জাহাঁ পাহলোয়ান। তারপর সুলতানের কাছে সে পাঠিয়ে দিল যুদ্ধ-সফলতার সংবাদ।[৩০] সুলতান তখন নিজে অগ্রযাত্রা আরম্ভ করলেন। উচ এলাকায় পৌঁছে কিবাছার সাবেক সেনাশিবিরে ডেরা গড়ে নিলেন তিনি। কিবাছা জাহাঁ পাহলোয়ানের মোকাবেলা থেকে পালিয়ে নদীর দ্বীপে অবস্থিত বাখার[৩১] দুর্গে গিয়ে উঠল। সেখানে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকল সে। একদিন মওকা পেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে মুলতান পৌঁছে যেতে সক্ষম হল।[৩২]

গরমকাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড গরমে পাঞ্জাবের ময়দানি এলাকা যেন ক্রোধে স্ফূলিঙ্গ ছিটাচ্ছিল। সুলতান জালালুদ্দীন বালালা, রাকালা ও জুদ পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য হল—সেখানে তিনি গরমকালটা কাটাবেন। রাস্তায় বসরাওয়ার (পাসরুর) নামক এক দুর্গ অবরোধকালে আবার তিনি আহত হলেন। কারণ, এই হামলায় সাধারণ সৈনিকদের সাথে শরিক ছিলেন তিনিও। তার বাহুতে একটি তির এসে বিঁধেছিল।[৩৩]

শেষে দুর্গটি বিজিত হল। সুলতান গরমকালের কিছু সময় নিজের পাহাড়ি ছাউনিতে এসে কাটালেন।[৩৪] ক'দিন পরে সংবাদ এল—তাতার-সেনাদের একটি দল তার অন্বেষায় এই উঁচু এলাকার কাছাকাছি-দূরত্বে উৎপাত আরম্ভ করেছে।

ঐতিহাসিক ফারিশতার বর্ণনায় রয়েছে, তাতারদের এই দলটির নেতৃত্ব ছিল চোগতাই খানের হাতে। যুক্তি বলে, এই তাতার-বাহিনী সুলতানের কবজাকৃত এলাকাগুলোর আশপাশেই ভ্রমণ করছিল।

---

[৩০] জাহাঁকুশা, ২/১৪৬; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

[৩১] এখন এখানে পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ শহর ভাকার অবস্থিত। শহরটি মুলতানের কাছাকাছি

[৩২] জাহাঁকুশা, ২/১৪৬, ১৪৭;

[৩৩] জাহাঁকুশা, ২/১৪৭; রওজাতুস সফা, ২/৮২৮; পাসরুর সিয়ালকোটের উপান্তবর্তী একটি শহর। স্মর্তব্য যে, আন-নাসাবির বর্ণনা অনুযায়ী কলুর ও বারনুযাজ অবরোধেও সুলতানের হাতে তিরের আঘাত লেগেছিল।

[৩৪] কলুরকাহার পাহাড়ি উপত্যকার চিনজি নামক গ্রাম থেকে ১৮ কিলোমিটার পশ্চিমে নিরামা নামে একটি ছোট্ট গ্রাম আছে। সেখান থেকে ১ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে গেলে একটি পাহাড় চোখে পড়ে। এই পাহাড়ের উপর ৬০০ মিটার লম্বা ও ৩০০ মিটার চওড়া একটি প্রাচীন দুর্গ রয়েছে, যা সমরকন্দ দুর্গ নামে প্রসিদ্ধ। অভিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদদের বর্ণনা অনুযায়ী এই দুর্গ খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। তার সেনাছাউনি এই পাহাড়ি এলাকার এমনই এক নিরাপদ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। উরদু ডাইজেস্ট ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত এক আলোচনায় পাকিস্তানি ভূগোলবিদ জনাব সালমান রাশেদ উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সমরকন্দ দুর্গই ছিল মূলত সুলতান জালালুদ্দীনের গ্রীষ্মকালীন সেনাছাউনি। এই দুর্গ নির্মাণ বা মেরামতের পর সুলতান জালালুদ্দীন তার দেশের সমরকন্দ শহরের স্মরণে এই দুর্গটির নাম দিয়েছিলেন সমরকন্দ-দুর্গ।

যা হোক, সুলতান এদের সাথে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হওয়া মুনাসিব মনে করলেন না। ফের দ্বিতীয়বার পাঞ্জাবের দিকে চলে গেলেন।

ঐতিহাসিক ফারিশতা বলেন—তখন সুলতানের সন্দেহ হচ্ছিল, পাঞ্জাবের হাকিম কিবাছা হয়তো তার বিরুদ্ধে চোগতাই খানকে মদদ যোগাচ্ছে। এজন্য তাতারদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না-হয়ে তিনি স্বয়ং কিবাছাকে ধ্বংস করতে পাঞ্জাবের দিকে এগিয়ে গেছিলেন।[৩৫]

লাহোর, উচ ও সিদিস্তান বিজয়

মুলতানের পাশ দিয়ে যাবার সময় কিবাছার কাছে সুলতান জালালুদ্দীন নালবাহা (একপ্রকার ট্যাক্স, যা করদাতাদের থেকে গ্রহণ করা হতো) তলব করলেন। কিবাছা তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাল। দম্ভভরে সুলতানের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল সে।

সুলতান ভাবলেন—এখন কিবাছার সাথে যুদ্ধে নামার ব্যাপারটা কল্যাণকর মনে হচ্ছে না। এজন্য তিনি কিছুক্ষণ অবস্থানের পর লাহোরের দিকে যাত্রা করলেন। কিবাছার এক পুত্র ছিল লাহোরের স্বাধীন শাসক। সে সুলতানের সামনে আনুগত্য প্রকাশ করে নিজেকে হেফাজত করে নিল।[৩৬]

ওদিকে উচের বাসিন্দারা ধীরে-ধীরে মাথা ওঠাচ্ছিল সুলতানের বিরুদ্ধে। সুলতান তার অসামান্য দক্ষতায় উচ এলাকাকেও অধীনস্থ করে ফেললেন। সেখান থেকে তিনি সিন্ধুপ্রদেশের সিদিস্তান (সিহওয়ান) অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলেন। কিবাছার পক্ষ থেকে নিযুক্ত এখানকার হাকিম ফখরুদ্দীন সুলতানের বাহিনীর মোকাবেলার জন্য ছিল পুরোপুরি তৈরি। সুলতান জালালুদ্দীনের অগ্রবর্তী দলটি (যারা ছিল সেনাপতি আওর খানের নেতৃত্বে) যখন এখানে এসে পৌঁছল, তখন সিদিস্তানের সিপাহসালার লাজিন খাতাই তাদের সাথে শক্ত সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রাণ হারাল সে। আওর খান আগে বেড়ে অবরোধ করে ফেলল সারা শহর।

সুলতান জালালুদ্দীন অবশিষ্ট সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে যখন এখানটায় এসে পৌঁছেন, সিদিস্তানের হাকিম ফখরুদ্দীন তখন হাতে তির ও কাফনের একটা কাপড় নিয়ে অত্যন্ত অসহায়ভাবে সুলতানের খেদমতে এসে উপস্থিত হয়। সে সুলতানের সামনে ওজরখাহি করে তার আনুগত্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ওঠে। সুলতান এবারকার মতো তাকে ছাড় দিয়ে দেন এবং সিদিস্তানের সিংহাসনে তাকেই বহাল রাখেন।[৩৭]

---

[৩৫] তারিখে ফারিশতা, ২/৮৯৫,

[৩৬] তারিখে ফারিশতা, ২/৮৯৫, ৮৯৬; জাহাঁকুশা, ২/১৪৭; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

[৩৭] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৪৭; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৫০;

দেবল অঞ্চলে

সিদিস্তানে একমাস অবস্থানের পর দেবলের দিকে যাত্রা করেন সুলতান জালালুদ্দীন।[৩৮] বাহিনীর একাংশ তিনি উৎকৃষ্ট সেনাপতিদের নেতৃত্বে প্রদান করে নহরওয়ালার দিকে পাঠিয়ে দেন।

দেবল ছিল আরব-উপসাগরের পারে অবস্থিত এক গুরুত্বপূর্ণ ফৌজি ও বাণিজ্যিক শহর। প্রথমে উমাইয়া খেলাফতের সময় একে জয় করেছিলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। আব্বাসি খেলাফতকালেও এই শহর ইসলামি খেলাফতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন ইঙ্গিত ও আলামত দেখে মনে হয় হিজরি সপ্তম শতকে (খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) যখন সুলতান জালালুদ্দীন এই শহরে আক্রমণ করেছিলেন, তখন এখানে রাজত্ব ছিল হিন্দু রাজাদের।

জাহাঁকুশা জুয়াইনির বর্ণনা থেকে জানা যায়—সে-সময় এ শহরে কোনো মসজিদ পর্যন্ত ছিল না। সুলতান জালালুদ্দীন তরবারির জোরে দেবল কবজা করে শহরের মন্দিরের স্থলে প্রথমবারের মতো একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন।[৩৯] শহর যেহেতু যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল, এ-কারণে হিন্দুদের সাথে এরকম কোনো সন্ধিচুক্তির জন্য সুলতান বাধ্য ছিলেন না, যার জের ধরে বলা যাবে যে, মন্দিরের স্থলে তার মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারটা আপত্তিকর কিছু হয়েছে।

একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

করাচি থেকে ৪০ মাইল দূরের হায়দারাবাদ যাওয়ার পথের পাশে 'বানভুর' নামের এক বিধ্বস্ত শহরের ধ্বংসাবশেষের দেখা মেলে। পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ-এর উদ্যোগে এই প্রাচীন শহরটি নিয়ে 'বানভুর' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই গ্রন্থে বিভিন্ন ইঙ্গিত ও প্রেক্ষাপটের সহায়তায় অনুমান করা হয়েছে যে, বানভুর মূলত দেবলেরই অপর নাম। কীভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে এই বানভুর? এ সম্বন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মনে হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বানভুরের পতন ঘটেছে। এর একটি কারণ তো ছিল এই—ওই যুগে নদী তার যাত্রাপথের বাঁক পালটে নিয়েছিল (সিন্ধুনদ তখন এই শহরের খানিক দূর দিয়েই প্রবাহিত হতো)।

আরেকটি কারণ হল, সেকালে এখানে এক প্রবল হাঙ্গামা বেধেছিল। সেই হাঙ্গামার আলামত এখনো পুরো ভগ্নস্তূপেই মেলে। বিভিন্নাংশে যত্রতত্র জমিন গর্ত হয়ে গেছে। সেখান থেকে অসংখ্য কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে।

এক্ষেত্রে আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল—খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝিতে যখন সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধুতে আক্রমণ করেছিলেন, তখন তিনি

---

[৩৮] জাহাঁকুশা জুয়াইনি ২/১৪৮

[৩৯] জাহাঁকুশা, ২/১৪৮

জয় করে নিয়েছিলেন এখানকার তীরবর্তী কয়েকটি গ্রাম। এমনকি দেবলের শেষ বিধ্বস্ততার বিষয়টাকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়।'[৪০]

এই উদ্ধৃতাংশের 'সম্বন্ধ করা হয়' শব্দ তিনটেই ব্যক্ত করছে এই বর্ণনা দুর্বল। আর বাস্তবতা এটাই যে, ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত কোনো গ্রন্থেই দেবল বিধ্বস্ততার দায়ভার সুলতান জালালুদ্দীনের উপর আরোপ করা হয়নি। তবে এটুকু নিশ্চয় জানা যায় যে, সুলতান তখন এই এলাকা দখল করেছিলেন।

নতুন বিজয়ের ধারা

দেবল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুলতান জালালুদ্দীন দামরিলাও দখল করে নিলেন। সেই একই সময়ে সুলতানের এক জেনারেল নহরওয়ালা জয় করে গনিমতের মাল, মালবহন ও আরোহণের উট লাভ করেছিল।[৪১]

সুলতান ইলতুৎমিশের সাথে মনোমালিন্যের কারণ

তখন সুলতান জালালুদ্দীনের হিন্দুস্থান আগমনের দ্বিতীয় বছর পড়েছে। এর ভেতর ঘটে গেছে নতুন অনেক যুদ্ধাভিযান, যা একটিবারের জন্যও তাকে একটুখানি অবসর হয়ে বসতে দেয়নি। সুলতান দেখেছিলেন যে, বিশ্বব্যাপী এক প্রলয়ঙ্করী আগ্রাসনের ধ্বংসাত্মক কর্মযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও এই পড়শি হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রস্তুত নয়। জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে একটা সবক প্রদান করেছিল যে, পৃথিবীতে কেবল শক্তিরই কদর করা হয়। যুদ্ধে যেসব সৈনিক হেরে যায়, তাদের পানে তাকিয়ে দু-কথা কেউ জিজ্ঞেসও করে না।

এই চিন্তায় এক বছরেরও অধিক সময় ধরে সুলতানের একটা প্রচেষ্টাই অব্যাহত ছিল যে, আগে সঞ্চিত করতে হবে অধিকতর শক্তি, যাতে তাতারদের সাথে সামনের কোনো যুদ্ধে দেখিয়ে উঠতে পারেন—সেপাইদের নিয়ে যুদ্ধে নামা এই সেনাপতির শক্তি এখনো তোদের নাজেহাল করে ছাড়তে পারবে।

হ্যাঁ, দিল্লির সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের ন্যায়-ইনসাফ, পরহেজগারি, বীরত্ব ও সচ্চারিত্রিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন ও সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের মাঝে ছিল ঘৃণার এক বিশাল সমুদ্রের ব্যবধান। এর কারণ ছিল একটাই, সুলতান ইলতুৎমিশ তৎকালে জবরদস্ত সৈন্যদলের মালিক থাকা সত্ত্বেও কেবল নিজের কল্যাণচিন্তায় সুলতান জালালুদ্দীনকে যথাযথ সঙ্গ প্রদান করেননি। সুলতান জালালুদ্দীন পুরো উম্মাহর জন্য ভিখ চেয়ে ইলতুৎমিশের দরজায় এসে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু যখন ইলতুৎমিশের পক্ষ

---

[৪০] বানভুর, পৃষ্ঠা : ৩২

[৪১] জাহাঁকুশা, ২/১৪৮;

থেকে কোনো সাড়া পেলেন না, দিল্লি সাম্রাজ্যের প্রতি শক্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। দিন-দিন আরো বেড়েই চলল তার এই অসন্তোষের মাত্রা।

তারপর যখন পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বিপুল পরিমাণ এলাকা তিনি দখল করে নিলেন, তখন নির্ভীকচিত্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, এখন ইলতুৎমিশের শাসনাধীন এলাকা তিনি আয়ত্ত করতে শুরু করবেন। প্রকৃতপক্ষে সুলতানের এই সিদ্ধান্ত ছিল অকল্যাণকর। ক'দিন পরের চিত্রপটই প্রমাণ করে দিল, সুলতান যদি এমন কিছু না করতেন, তবে হিন্দুস্থানে যেসব অঞ্চল তিনি জয় করে নিয়েছিলেন, সেখানে উত্তমরূপে নিজের অবস্থান গড়ে নেবার যথাযথ সুযোগ পেতেন।

খানসারের যুদ্ধক্ষেত্র

সুলতান জালালুদ্দীন ও শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের মাঝে সংঘাতের শুরুটা ঘটেছিল খানসার রণক্ষেত্র থেকে। খানসার ছিল দিল্লির বাদশাহর শাসনাধীন সিন্ধুর একটি শহর। আজকাল এটাকে খিনসার বলে ডাকা হয়। এই জেলা 'থারপারকার' অঞ্চলে অমরকোটের পূর্বদিকে অবস্থিত। সুলতান জালালুদ্দীন তার সংক্ষিপ্ত সেনাদল নিয়ে শহর কবজা করার উদ্দেশ্যে খানসারের দিকে অগ্রসর হলেন। শহরের হাকিম সুলতানকে ভয় পেয়ে আনুগত্য স্বীকার করে নিল। ফলে কোনো রক্তপাতের দরকার পড়েনি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান জালালুদ্দীন জানতে পারলেন, দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ বিরাট বড় সৈন্যবহর নিয়ে সুলতানের মোকাবেলার জন্য যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ করেছেন। সুলতান জালালুদ্দীনও তখন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ফলে ইসলামি বিশ্বের সীমান্তের এই দুই নিরাপত্তারক্ষী তরবারি হাতে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়ে গেলেন।

সুলতান ইলতুৎমিশের সেনাবাহিনীতে ছিল ১ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার অশ্বারোহী ও তিনশ যোদ্ধা হাতি। বিপরীতে সুলতান জালালুদ্দীনের সৈন্যসংখ্যা ছিল অতি অল্প। সেই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকেই সারিবদ্ধ করে জাহাঁ পাহলোয়ান উজবুককে (যে ছিল অগ্রগামী দলের সেনাপতি) সামনে বাড়িয়ে দিলেন। ইলতুৎমিশের বাহিনীর অগ্রবর্তী দলও সম্মুখে এগিয়ে এল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দুপক্ষের অগ্রসেনারাই পথ হারিয়ে এদিক-সেদিক চলে গেল। ফলে নিয়মমাফিক সারিবদ্ধ যুদ্ধ আর সংঘটিত হল না।

তবে, শেষে দুইদলে অবশ্য ছোটখাট একটা সংঘর্ষ বেধেছিল। ঘটনা হল—যুদ্ধে সাধারণত যে-সমস্ত রীতি ফলো করা হয়, জাহাঁ পাহলোয়ান তা থেকে সরে এসে তার হাতের সৈন্যদলকে ইলতুৎমিশের পথ-হারানো সেনাদের ছাউনির ভেতর ঢুকিয়ে দিল। এতে ভেতরের এলোপাথাড়ি সংঘর্ষে মারা পড়ল দুই দলের কিছু লোক।[৪২]

---

[৪২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৬৮; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৭; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

সন্ধি স্থাপন ও মনোমালিন্য দূরীকরণ

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ টের পেয়ে গেলেন যে, অবস্থা বড় সঙ্গিন। তাই সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা চালালেন তিনি। তার সমীপে চিঠি লিখলেন—আপনার অজানা থাকার কথা নয় যে, দীনের শত্রুরা আমাদের একদম মাথার উপর এসে গেছে। আপনি সুলতানুল মুসলিমিন ও ইবনুস সুলতান। আমার জন্য বৈধ নয় আপনার বিরুদ্ধে কারুর সহযোগী হয়ে ওঠা। আপনার মতো ব্যক্তিত্বের মোকাবেলায় তলোয়ার ধারণ করা আমার জন্য উচিত নয়। তবে নিজের প্রতিরক্ষার জন্য বাধ্য হতে হলে ভিন্ন কথা। আমি মনে করি, এহেন অবস্থায় আমাদের সন্ধি করে ফেলা উচিত। যদি আপনি পছন্দ করেন, আমি আমার কন্যাকে আপনার কাছে বিয়ে দেব। যাতে করে বিদূরিত হয়ে যায় দু'পক্ষের অসন্তোষ। আমার-আপনার মধ্যখানে বহাল থাকে বিশ্বস্ততা।'

সুলতান জালালুদ্দীন ইলতুৎমিশের এই পরামর্শপ্রদানমূলক চিঠি কবুল করে নিলেন। ফলে উম্মাহ সেদিন পরস্পরের রক্তপাত ঘটাবার মতো ভয়াবহ এক যুদ্ধ হতে বেঁচে গেল।

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ দিল্লিতে ফিরে যাবার সময় জালালুদ্দীনের দুই সরদার এযদিক পাহলোয়ান ও সানজার জক তাইসিকেও সঙ্গে করে নিয়ে নিলেন, যাতে পরস্পরের সম্পর্ককে মজবুত করে তুলতে এই দুজনের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করা যায়।[৪৩]

খোরাসান ও ইরাকে তাতারদের নয়া লুটতরাজ

সুলতানের এই হিন্দুস্থানে অবস্থানকালে তাতাররা বেশি জোর ঢেলেছিল চীন ও ইউরোপের যুদ্ধাভিযানগুলোতে। ৬২১ হিজরিতে (১২২৪ খ্রিষ্টাব্দ) তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বাহিনী, যা স্রেফ ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল, ফের একবার খোরাসান, পারস্য ও ইরাকের সেই শহরগুলিতে রাজত্ব করতে বেরোল, যেগুলি পশ্চিমা তাতারদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল। অথবা প্রথম ধ্বংসকাণ্ডের পর যেখানে নতুন করে জনমানুষের বিচরণ দেখা যাচ্ছিল।

তাতারদের এই বাহিনী পারস্যে কুম, কাশান, হামাদান ও অন্যান্য শহরগুলোকে বাজেভাবে ধ্বংস করে দিল। তারপর তারা অগ্রসর হল রায় নগরীর দিকে। খাওয়ারিজমি বাহিনীর অনেক পথহারা সৈনিক সেখানে সমবেত হয়ে নতুনভাবে জনবসতি গড়ে তুলছিল। তাতাররা এসে এই বিধ্বস্ত অঞ্চলকে ফের একবার উজাড় করে দিল।

---

[৪৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৬৮; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৭; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

তাদের পরবর্তী আক্রমণটা নেমে এসেছিল তিবরিজ শহরের উপর। রায় শহরের পলাতক খাওয়ারিজমি সৈন্যদের মধ্য থেকে ৬ হাজার লোক প্রাণ বাঁচিয়ে এইখানে এসে পড়েছিল। তিবরিজের হাকিম ছিল উজবুক মুজাফফর বাহলোয়ান। প্রথম থেকেই তাতারদের ট্যাক্স প্রদান করে আসছিল সে। উজবুক এই খাওয়ারিজমিদের উপস্থিতিকে নিজের জন্য শক্ত শঙ্কার কারণ মনে করে বসল। তাতার-বাহিনী যখন তিবরিজের সীমানা-প্রাচীরের সামনে সেনাশিবির স্থাপন করে তাকে ধমকি পাঠাল, তখন সে আশ্রিত খাওয়ারিজমিদের অনেকের মস্তক নিজ হাতে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং বাকিদেরকে তাতারদের হাতে তুলে দিল জীবিত।

আল্লামা ইবনুল আসির এই ঘটনা বর্ণনা করে মুসলিমদের কাপুরুষতা ও দুর্বলতার জন্য কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছেন—এই তাতারদের ছিল মাত্র ৩ হাজার অশ্বারোহী। অথচ বিপরীতে পলাতক খাওয়ারিজমি সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার পদাতিক। এই ৬ হাজার-সহ উজবুকের বাহিনী ছিল অনেক বিশাল! তা সত্ত্বেও নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য না খাওয়ারিজমিরা কোনো হিম্মত করেছে, না উজবুকই করেছে কিছু![৪৪]

উপর্যুক্ত ঘটনাটি এই বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য যথেষ্ট যে, একজন দক্ষ কায়েদের অনুপস্থিতিতে কোনো বাহিনীই এমন শত্রুর সাথে কখনো টক্কর নিতে পারে না, যাদের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এরকম সংকটপূর্ণ মুহূর্তে সুলতান জালালুদ্দীনই ছিলেন কওমের নির্ভরতার সেই একমাত্র হাত, যিনি এই জেঁকে-বসা হতবিহ্বলতা থেকে তাদের উদ্ধার করতে পারতেন। তাতারদের এই সেনাদলের হত্যাযজ্ঞ ছিল আশু ঘটিতব্য তাদের নতুন কোনো আগ্রাসনের প্রারম্ভিকা। পারস্য ও ইরাকের মুসলিমরা অনুভব করে উঠছিল, এখন সুলতানকে হিন্দুস্থানের চেয়ে তাদেরই অধিক প্রয়োজন।

দিল্লির রাজদরবারের প্রশস্ততা

হিন্দুস্থানের জমিনে সুলতান জালালুদ্দীন এক নয়া পৃথিবী আবাদ করে তুলেছিলেন। তিনি তখন পড়শি শাসকদের সাথে একটা উত্তম সম্পর্ক বজায় রেখে স্বীয় মিশনের প্রতি নিবিষ্ট হতে চাচ্ছিলেন। দিল্লির বাদশাহ শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশও ছিলেন সুলতানের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পুরোপুরি সচেষ্ট। কিন্তু বড় আফসোস, ইলতুৎমিশের দরবারের আমির ও সেনাপতিরা—যারা ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের ঘোর বিরোধী—তার এই কর্মকাণ্ডের সাথে একমত ছিল না। ফলে সুলতান জালালুদ্দীনের জন্য প্রতিকূলই হয়ে রইল দিল্লির দরবার।

---

[৪৪] আল-কামিল, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৬০৬-৬০৭

সুলতান ইলতুৎমিশের দিল্লি পৌঁছার কয়েকদিন পর তার পরামর্শক, সরদার ও অধীনস্থ রাজারা কঠিনভাবে গোঁ ধরে ফেলল যে, হিন্দুস্থানের মাটি থেকে যেকোনো মূল্যে সুলতান জালালুদ্দীনকে বের করে দেওয়া হোক। কিবাছা ও অন্যান্য হিন্দু শাসকরাও এই অভিমত ব্যক্ত করল। তারা এ পরিকল্পনাও সাজাচ্ছিল—সুলতান জালালুদ্দীনকে তারা কিনঝার লেকের পারে ঘেরাও করে ফেলবে।[৪৫]

কিন্তু এটা ছিল তাদের হাওয়াই কল্পনা। রাজনৈতিক কল্যাণ-চিন্তায় শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশকে একটা সময় নাগাদ তাদের সকল কথাবার্তায় ঐকমত্য পোষণ করে যেতে হল। কিন্তু তিনি সুলতানের সাথে সম্পাদনকৃত সন্ধিনামা থেকে এত দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও সুলতানের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা থেকে যথাসম্ভব সংযত রইলেন।

ফেরা

হিন্দুস্থানে স্রেফ দু'বছরের চেষ্টা-মুজাহাদায় সুলতান জালালুদ্দীন ঝিলাম নদী থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, একজন সাধারণ শাসকের পক্ষে যা কয়েক বছরের মধ্যেও নির্মাণ করতে পারা সম্ভব নয়। এত বিপুল জনবসতি কবজা করে ফেলার পরও তিনি একটুখানি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না যে, এখানে এক নতুন পৃথিবী গড়ে সুস্থির একটা জীবন কাটাবেন। তার যদি শুধু সাম্রাজ্য-দখলের নেশাই থাকত, তা হলে একজন শাসকের ভেতর ক্ষমতার যে প্রবল নেশা থাকে, তা পূর্ণ করবার জন্য হিন্দুস্থান কোনো সংকীর্ণ রাজ্য ছিল না; ছিল যথেষ্ট বিস্তৃত। আয়তন ও জনগোষ্ঠীর বিবেচনায় সিরিয়া ও মিশরের সমপরিমাণ ছিল হিন্দুস্থান। এইখানে রাজত্ব কায়েম করতে-পারা যেকোনো শাসকের পক্ষেই অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের কারণ হতো তখন।

কিন্তু সুলতান দেখছিলেন—তিনি যদি সবকিছু ছেড়েছুড়ে নিছক এখানেই পড়ে থাকেন, শঙ্কার মুখে পড়ে যেতে পারে তার মূল টার্গেট। প্রথমত ব্যাপার ছিল এই : হিন্দুস্থান ছিল তখন তাতারদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত। এখানে ঘাঁটি গড়ে নিয়ে অন্যান্য সাম্রাজ্যে আক্রমণ করা থেকে তাতারদের বাধা প্রদান করা যেত না। কারণ, এই দেশের দুইদিকেই ছিল সমুদ্র। আরেকদিকে হিমালয় ও কারাকোরামের পার্বত্য অঞ্চল একে বহিরাগত আক্রমণকারীদের থেকে যথেষ্ট সুরক্ষিত করে দিয়েছিল। এজন্য সুলতানের বাহিনীর জন্য এটি উত্তম ছাউনি তো হতেই পারত; কিন্তু একে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে ফেলা কোনোভাবেই শঙ্কা থেকে খালি ছিল না।

তাতারদের সাথে যুদ্ধ বাধলে স্থানীয় শাসকদের বর্তমান অসহযোগিতা যদি স্পষ্ট শত্রুতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, তবে এর ফল হবে মারাত্মক। মুসলিমদের এই শস্য-শ্যামল নিরাপদ আশ্রয়স্থলকে যুদ্ধের আগুনে জ্বলতে দিতে চান না সুলতান।

---

[৪৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৬৮; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৮; সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৯০

সুলতানের সামনে মূল যে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ফুটে উঠেছিল, তা হল, অবশিষ্ট মুসলিমবিশ্বের, বিশেষত পবিত্র হারামাইন শরিফাইনের সুরক্ষার প্রশ্ন। তিনি ভাবলেন মুসলিমবিশ্বের সেই বিপুল গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলো যেকোনো সময় তাতার-আগ্রাসনের কবলে পড়তে পারে। এখন যেহেতু ইরাক, আরব, শাম, মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও আনাতোলিয়ার ইসলামি রাজ্যগুলো মুসলিমবিশ্বেরই খণ্ডবিখণ্ড ভূমি, এজন্য এই রাজ্যগুলোর সামনে তাতারদের থেকে প্রতিরক্ষা-প্রাচীর গড়ে তোলা এখন সময়ের বিশেষ দাবি। অস্থায়ীভাবে তাতার-আগ্রাসন থেমে যাওয়ায় মাঝখানে তিন-চার বছরের যে সুযোগটা গেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাতেও তখনও আরব-অনারব মুসলিম শাসকদের কোনো হুঁশ আসেনি।

এজন্য তাদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার মতো দূর-সুদূর পর্যন্ত কেউ-ই দৃষ্টিগোচর হয় না। সুলতান ওখানে পৌঁছে শিগগির এই ঘাটতি পূরণ করতে চাচ্ছিলেন। তা ছাড়া এ-সমস্ত এলাকা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সুলতানের সাম্রাজ্যের অংশ। এজন্য মানসিকভাবেও ওদিকেই ছিল সুলতানের মনের প্রবল টান।

শেষে এ বিষয়ে আমিরদের সাথে তিনি পরামর্শ করলেন। জাহাঁ পাহলোয়ান হিন্দুস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে অসম্মতি জানাল। বলল—'এখন হিন্দুস্থানেই জমে থাকা আমাদের জন্য উপকারী।' বলতে চাচ্ছিল যে, অন্যসব সাম্রাজ্যে সবসময় চেঙ্গিজ খানের বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। সে হিসেবে হিন্দুস্থান যথেষ্ট শঙ্কামুক্ত এলাকা। তা ছাড়া এখানকার শাসকও অনেকটা দুর্বল। এখানে তার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু কিছু আমির হিন্দুস্থান ছেড়ে যাবার জন্য গোঁ ধরে রইল। এই আমিররা গিয়াসুদ্দীনের প্রতিপক্ষ হয়ে ইরাক থেকে এখানে চলে এসেছিল। তারা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, হিন্দুস্থান থেকে যাত্রা আরম্ভ করতে সুলতানের একটুও বিলম্ব করা উচিত না। গিয়াসুদ্দীনের সামলাতে না-পারা ইরাকের রাজত্ব তার জন্য অপেক্ষমাণ।

যা হোক, সমস্ত বিষয়আশয় গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখলেন সুলতান। তারপর পরামর্শ করে হিন্দুস্থান থেকে ইরান ও ইরাকের দিকে রওনা দেবার জন্য মনস্থির করলেন তিনি। বিশ্বস্ত সেনাপতি উজবুক জাহাঁ পাহলোয়ানের হাতে বাহিনীর কিছু অংশ প্রদান করে তাকে এখানকার দখলীকৃত এলাকার গভর্নর বানালেন। হাসান মুযলিক ওরফে ওয়াফা মালিক নামের এক আমিরের কাঁধে দায়িত্ব সঁপলেন—তুমি গিয়ে গজনি ও ঘুরের ভগ্নস্তূপের ভেতর গড়ে-ওঠা নতুন জনবসতি পরিচালনার দায়িত্ব সামলাও।

তারপর, বাহিনীর অধিকাংশ সিপাহি নিয়ে সিন্ধু উপত্যকা থেকে যাত্রা করে গেলেন সুলতান।[৪৬]

---

[৪৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৬৯; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৮; ইবনে খালদুন, ৫/১২০;

এখানে মনে রাখা উচিত, কিছু ঐতিহাসিক হিন্দুস্থান থেকে সুলতানের ফিরে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'স্থানীয় শাসকবৃন্দ সুলতানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠায় ভয় পেয়ে গেছিলেন তিনি।' অথচ বাস্তবে এমন কিছু ঘটেনি।

একথাও আমাদের লক্ষ রাখতে হবে—হিন্দুস্থানের অভিযানগুলোতে সুলতান জালালুদ্দীন একবারও যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেননি। শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হবার পর একটিবারও এমন ঘটেনি যে, তার সঙ্গে স্থানীয় কোনো শাসক সংঘর্ষে নেমেছে। এমনই যখন অবস্থা, তখন একদমই আচানক এই সবুজ-শ্যামল বিস্তৃত বিজিত অঞ্চল থেকে বেরিয়ে সেই অরক্ষিত খোরাসান ও ইরানের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া উম্মাহর প্রতিরক্ষার পীড়ন ব্যতীত কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সে-সময়কার ইতিহাস যদি আমরা ঘেঁটে দেখি, এমন কিছু আমাদের নজরে আসে না যে, স্থানীয় শাসকদের তিনি ভয় পেয়েছিলেন। আর যুক্তিও এ কথা বলে যে, এত বড় এক যোদ্ধাকে কোনো যুদ্ধে পরাজিত না-করে কোনোভাবেই হিন্দুস্থান থেকে বার করা যেত না। কিন্তু আমরা দেখি, ইতিহাস এমন কোনো তথ্য উল্লেখ করেনি। অতএব এর স্পষ্ট অর্থ হল : সুলতান আপন মর্জিতে, স্রেফ স্বীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হিন্দুস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তবে এটা ঠিক যে, স্থানীয় শাসকরা হিন্দুস্থানে সুলতানের উপস্থিতি খুবই অপছন্দ করত। কিন্তু সুলতানকে এখান থেকে বের করে দেওয়ার সাহস তাদের ছিল না। এর দলিল হল—সুলতান হিন্দুস্থানে থাকবেন, না এখান থেকে চলে যাবেন, এ ব্যাপারে তিনি আমিরদের পরামর্শ তলব করেছিলেন। তখন জাহাঁ পাহলোয়ান তাকে এখানেই রেখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুটো কারণ বর্ণনা করেছিল। এক. চেঙ্গিজ খানের শঙ্কা থেকে এ দেশ মুক্ত। দুই. এখানকার শাসকরা দুর্বল।[৪৭] তা সত্ত্বেও ইরান থেকে আগত খাওয়ারিজমি আমিরদের থেকে শ্রবণকৃত অবস্থাপটের প্রতি লক্ষ করে হিন্দুস্থানের এই নিরাপদ কেন্দ্রভূমিকে আলবিদা জানাবার জন্য সংকল্প করে ফেললেন সুলতান। তিনি একটিমাত্র ফরজ বাস্তবায়নের জন্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছাড়বার মতো কঠিন কোরবানি প্রথম দেখিয়েছিলেন সেই খাওয়ারিজমের সিংহাসনে। এবার দেখালেন হিন্দুস্থানে। পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই মিলবে এমন দৃষ্টান্ত।

হ্যাঁ, সুলতানের প্রত্যাবর্তনের কালে স্থানীয় শাসকদের উৎপাত প্রকৃতপক্ষে এটুকু ছিল—তারা এই বলে ইলতুৎমিশকে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, ভারতবর্ষে সুলতানকে থাকতে দেওয়া মানে তাতারদের আক্রমণ ডেকে আনা। কিন্তু ইলতুৎমিশ তাদের কথা অনুযায়ী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। কারণ, তার ভালো করেই জানা ছিল কী হতে পারে এর পরিণতি।

---

[৪৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৬৯; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৮;

দিনা মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স

ওদিকে সুলতান জালালুদ্দীনও এসব গোপন ব্যাপার জেনে গিয়েছিলেন। হিন্দুস্থানি মুসলিমদের কদম দৃঢ় থাকবার জন্য দিল্লির ইসলামি শাসন সর্বদা শক্তিশালী থাকুক, এ দিকে সবসময় লক্ষ রাখতেন তিনি। ভাবলেন স্বেচ্ছায় হিন্দুস্থান ত্যাগ করে তিনি দিল্লির বাদশাহকে অনেক বড় দাঙ্গা থেকে নিরাপদ করে দিতে পারেন। কারণ, তিনি বেরিয়ে পড়লে দিল্লির মিত্র রাজধানীগুলোর তাকে নিয়ে যেসব অভিযোগ রয়েছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

তা ছাড়া, এখানেই জমে থাকলে সুলতান নিজেও এদের দিক থেকে নিশ্চয় অস্বস্তির শিকার হতে থাকতেন। কেবল হিন্দুস্থানের যুদ্ধাভিযান নিয়ে পড়ে থাকলে নিজের প্রধান উদ্দেশ্য থেকেও বহুদূরে ছিটকে পড়তেন তিনি।

সুলতান জালালুদ্দীন হিন্দুস্থানে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় মিশন বাস্তবায়নের জন্য কোনো-না-কোনোভাবে অনেক উপায়-উপকরণ যুগিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে তিনি হিন্দুস্থান ছেড়ে খোরাসানের উদ্দেশ্যে ছুটলেন। হিন্দুস্থানের সীমান্ত রক্ষার তাগিদে যেটুকু শক্তির প্রয়োজন পড়তে পারে, সে অনুপাতে এখানে রেখে গেলেন কিছু আমলা, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক।

সফরে আপতিত বিপদ

সুলতান জালালুদ্দীন মাকরান ও কিরমানের রাস্তা দিয়ে ইরানের দিকে যাচ্ছিলেন। সে মুহূর্তে তার কাছে ছিল ১০ হাজার সিপাহি। রাস্তায় গোধুম-রঙা মরুভূমিগুলোর ভেতর দিয়ে যাবার কালে কাফেলা-সমেত তাকে এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হল। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল তখন। সারা গায়ে এসে লাগছিল পাথরকুচি মিশ্রিত লু-হাওয়ার ঝাপটা। তদুপরি ছিল পানি ও খাদ্যের স্বল্পতা ও সংকট। এইসব বিষয়ের মুখোমুখি হয়ে সুলতানের সেপাইরা মন্দভাবে প্রভাবিত হল।

শিহাবুদ্দীন নাসাবি লেখেন, সুলতান জালালুদ্দীন তার সহযাত্রী কাফেলা নিয়ে হিন্দুস্থান থেকে কিরমান পর্যন্ত'র সফরে এমনসব মুসিবতের সম্মুখীন হলেন, যা ইতিপূর্বে অনুভূত সকল কষ্টক্লেশের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এবং তাদেরকে পৌঁছে দিয়েছিল মৃত্যুর ভয়ংকর ঘাট পর্যন্ত। যখন মরুসাইমুমের প্রবল ঝটকা এসে নাকেমুখে লেপটে যেতে থাকত, লোকেরা তখন শ্বাস নিতে নিতে অনুভব করত, তারা যেন জ্বরের প্রবল ঘোরের ভেতর ধোঁয়া-ধোঁয়া শ্বাস নিচ্ছে।[৪৮]

তখন মাকরানের কঙ্করময় ঘাস-পানিবিহীন বিশুষ্ক ময়দানগুলোতে যেন নৃত্য করছিল গা ঝলসে-দেওয়া-মৌসুম। এই প্রতিকূলতায় শেষ পর্যন্ত সুলতানের বাহিনীর অনেক সৈন্য অসুস্থ হয়ে পড়ল। চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা না-থাকায় দিন-দিন নাজুক থেকে নাজুকতর হতে চলল তাদের অবস্থা। এমনকি কখনো একসঙ্গে

---

[৪৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ১৭৪

উঠতে লাগল কয়েকটি করে জানাজা। আর কিছুদিনের মধ্যেই প্রাণ হারাল সিপাহিদের অনেক বড় একটা সংখ্যা।

মৌসুমের রুক্ষতা ও প্রতিকূলতায় বাহনজন্তু ও মালবাহী পশুগুলো কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। ধ্বংস হয়ে গেল অধিকাংশ ঘোড়া। যেসব সিপাহি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তারা ধীরগতির ষাঁড় ও গাধার বাহনে চড়তে বাধ্য হল। কারণ, ঘোড়ার প্রবল দুলুনির ভেতর পথ চলার শক্তি ও সক্ষমতা তাদের দেহে তখন ছিল না। অসহনীয় কষ্ট সয়ে-সয়ে সুলতান যখন কিরমানের উপান্তে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তার সঙ্গে শুধু ৪ হাজার লোক অবশিষ্ট ছিল।[৪৯]

[৪৯] ইবনে খালদুন, ৫/১২০; জাহাঁকুশা, ২/১৪৯;

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবনির্মিত প্রতিরক্ষাকেন্দ্র

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

আর তোমরা সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো, কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৫০]

বুরাক হাজিব

সফরকালে পথেই সুলতান জালালুদ্দীন সংবাদ পেয়ে গেছিলেন—তাতাররা মুসলিমবিশ্বে ফের একবার আগ্রাসনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এজন্য এই ঝড় রুখে দিতে যুদ্ধাস্ত্র ও বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করতে চাচ্ছিলেন তিনি। সুলতান জানতেন, এটা মোটেই কোনো সহজ কাজ নয়। এই বিরাট দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে উঠতে বিপুল উপকরণ ও লোকবল সংগ্রহ করা ছিল আবশ্যক। অথচ সুলতানের হাত তখন একদম প্রসারিত ছিল না। তার সহযাত্রী ছিল খুবই কম। অবস্থা হয়ে উঠেছিল ভীষণ প্রতিকূল।

তবু নিরাশ হবার পাত্র ছিলেন না সুলতান। মুসলিমবিশ্বের ধ্বংসস্তূপের ভেতর বিজয়-পতাকা উড্ডীন করবার অদম্য নেশা যেন চুম্বকটানের মতো হিঁচড়ে হিঁচড়ে তাকে পারস্য ও ইরাকের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সুলতান চাচ্ছিলেন—ওখানে পৌঁছে তার মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিপুল মুজাহাদা আরম্ভ করবেন। কিন্তু, কিরমানের কাছাকাছি পৌঁছতেই সেখানকার অভ্যন্তরীণ অরাজকতায় সেদিকেই নিবদ্ধ হয়ে গেল তার তাবৎ মনোযোগ। এই অরাজকতা ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল বুরাক হাজিব নামের এক হতভাগা।

সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের জীবৎকালে বুরাক হাজিব ছিল তার দরবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার। কারাখতাই গোত্রের অন্তর্গত ছিল সে। প্রথমদিকে ছিল তুর্কানেখাতা রাজ্যের দরবারি। পরবর্তীকালে এসে খাওয়ারিজম শাহের দরবারের সঙ্গে জুড়ে যায়। আলাউদ্দীন মুহাম্মদ তাকে সেনা-অফিসারের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। তখন তার জানা ছিল না যে তিনি এই ধূর্ত ধোঁকাবাজকে অনুগ্রহপুষ্ট বানিয়ে নিজের আস্তিনের তলে এক বিষাক্ত সর্প পুষে যাচ্ছেন, যা পরবর্তীতে হয়ে উঠবে তারই সন্তানদের জন্য স্পষ্ট ফেতনার কারণ।

---

[৫০] সুরা আলে ইমরান, ১০৩;

আলাউদ্দীনের প্রতিপত্তির কারণে বুরাক হাজিব তার জীবদ্দশায় ভেতরের বিষ উগড়ে দেবার মতো কোনো সুযোগ পেয়ে ওঠেনি। কিন্তু যখন তাতার-আগ্রাসনের ঝটকায় আচমকা ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল খাওয়ারিজম শাহি রাজসিংহাসন, মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বুরাক হাজিব।

শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন, যে তাতার-সয়লাব চলে যাবার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটি শহর ও বস্তি আয়ত্ত করে নিয়েছিল, অনভিজ্ঞতার দরুন সে বুরাক হাজিবকে নিজের নিষ্ঠাবান সহচর ভেবে বসল। বুরাককে কিরমানের হাকিম হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছিল সে। এর ক'দিন পরেই স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিল বুরাক হাজিব। আরো খানিক অগ্রে বেড়ে কিরমানের নিকটবর্তী জাওয়ারিশ শহর অবরোধ করে ফেলেছিল।[৫১] এই পুরো এলাকা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহজাদা গিয়াসুদ্দীনের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য এখানে বুরাক হাজিবের স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার হয়ে-ওঠা ছিল খাওয়ারিজমি খানদানের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ।

বুরাক হাজিবকে শায়েস্তা

বুরাক হাজিবের কুৎসিত কর্মকাণ্ড ও জুলুম-পীড়নের কথা জেনে সুলতান জালালুদ্দীন অতি শীঘ্রই তাকে শায়েস্তা করা জরুরি মনে করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কিরমানের উপকণ্ঠের শহর জাওয়ারিশের দিকে যাত্রা করলেন। সুলতানের আগমনের বার্তা পেয়ে অবরোধ উঠিয়ে নিল বুরাক হাজিব। জাওয়ারিশের হাকিম সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার হাতে দুর্গের চাবি তুলে দিল এবং আনুগত্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে উঠল। ওদিকে বুরাক হাজিবও অবস্থার নাজুকতা ও মেকি অপরাধ-বোধে তাড়িত হয়ে উপস্থিত হল এসে সুলতানের দরবারে। সর্বদা বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে যাবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল সেও।

বুরাক হাজিবকে শক্ত সাজা দেবার ইচ্ছা পোষণ করলেন সুলতান জালালুদ্দীন; কিন্তু এর পূর্বে আমিরদের সঙ্গে তিনি পরামর্শসভায় বসলেন। আওর খান অভিমত দিল, বুরাককে গ্রেফতার করে রাখা হোক আর কিরমান কবজা করে অন্যান্য এলাকা দখলের জন্য একে কেন্দ্র বানানো হোক। কিন্তু নয়া উজিরে আজম শারফুল মুলক খাজা জাহাঁ এই অভিমতের বিরোধিতা করে বলল—এই এলাকার নায়েব ও হাকিমদের ভেতর এই লোকই হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি, যে সুলতানের আনুগত্য প্রকাশ করেছে। অন্য হাকিমরা ওর ধোঁকাবাজি ও গাদ্দারি সম্পর্কে এখনো জানে না কিছু। তাই ওকে যদি এখন শাস্তি দেওয়া হয়, সে-সমস্ত হাকিমের মন কিন্তু বিষিয়ে উঠবে। ভাববে, বুরাককে সুলতান অন্যায়ভাবে শাস্তি

---

[৫১] জাহাঁকুশা, ২/২১১;

প্রদান করেছেন। এতে সুলতানের প্রতি তাদের যে মানসিকতা ছিল তা বিগড়ে যাবে। নিস্তেজ হয়ে যাবে সুলতানকে ঘিরে উত্থিত তাদের তাবৎ আশা-ভরসার উজ্জ্বল আলো। জনসাধারণের মনে জাগবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

সুলতান উজিরে আজমের সুপারিশ ও পরামর্শ কবুল করে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা বাদ দিলেন।[৫২]

কৌশল কৌশল খেলা

কিছুদিন পর সুলতান জালালুদ্দীন শিকারের উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী ঘন জঙ্গলের দিকে যাত্রা করেন। রওনা দেওয়ার আগে বুরাক হাজিবকেও তিনি এই আনন্দ-ভ্রমণে শরিক হতে দাওয়াত দিলেন। সুলতানের দাওয়াত পেয়ে বিনয়ে ভেঙে এল বুরাক হাজিবের কণ্ঠ। শিকারে যেতে পারবে না বলে ওজর দেখিয়ে সে বলল—মহামান্য সুলতান, ক'দিন ধরে আমার খুব পা ব্যথা। আপনাদের সাথে আমি যেতে পারছি না। ক্ষমা করবেন, সুলতান।

এইরকম মিথ্যা ওজর পেশ করে সুলতানের দাওয়াত গ্রহণ করল না বুরাক। জঙ্গলে পৌঁছার পর কয়েকজন নিষ্ঠাবান আমিরের কাছে সুলতান জানতে পারলেন—বুরাক হাজিব মিথ্যা বলেছে।

বুরাককে এই প্রতারণার শাস্তি ভোগাতে সুলতান নিজেও একটি চাল চেলে বসলেন। এক সংবাদবাহকের হাতে চিঠি প্রদান করে বুরাকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বার্তাবাহক গিয়ে বলল—ইরাক সফরসংক্রান্ত পরামর্শের জন্য সুলতান আপনাকে শিগগির তার ওখানে যেতে বলেছেন।

বুরাক হাজিবও ছিল মহা ধূর্ত। সেও বুঝে ফেলল—এই চিঠির পেছনে কাজ করছে আমাকে গ্রেফতার করার গোপন পরিকল্পনা। ফলে পুনরায় একই ওজর দেখিয়ে সুলতানের ডাকে যেতে পারছে না বলে ক্ষমা চাইল বুরাক। এবং সে সুলতানকে এই মুহূর্তেই ইরাক চলে যেতে পরামর্শ দিল। বলল—সুলতানের ইরাক যাবার ইচ্ছা যত দ্রুত পারা যায় বাস্তবায়ন করা উচিত বলে মনে করছি। এই কিরমান আপনার সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শহর হবার উপযুক্ত না। আপনার বাহিনী ও সেবায়েতদের ধারণ করবার শক্তিও এই এলাকার নেই। হ্যাঁ, এইসব দুর্গ সুরক্ষার জন্য এখানে আপনার একজন নায়েব, দুর্গপতি ও কোটাল থাকা যথেষ্ট। তো, আপনার নায়েব হিসেবে এ অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অধম প্রস্তুত আছি। আমার চেয়ে আপনার অধিক বিশ্বস্ত কেউ হতে পারে না। মরহুম সুলতান

---

[৫২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৭৫; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৮; জাহাঁকুশা, ২/২১১; ইবনে খালদুন, ৫/১২০;

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের খেদমত করতে-করতেই আমার চুল-দাড়ি সাদা হয়েছে। আর এ অঞ্চলও আমি তরবারির জোরে ফিরিয়ে এনেছি।[৫৩]

চিঠির বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট—সুলতান, আপনি এক্ষুনি ইরাক যাত্রা করুন। জাওয়ারিশে আমাকে খানিক নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে দিন। এই পত্র দিয়ে বার্তাবাহককে পাঠিয়ে দেওয়ার পর, শহরে বিদ্যমান সুলতানের সেপাইদের দ্রুত শহর ছাড়তে নির্দেশ দিল বুরাক। নিতান্ত বাধ্য হয়ে তারা যখন বাইরে বেরোল, খটাস করে সে প্রাচীরের ফটক বন্ধ করে দিল।

বুরাক হাজিবের এই ধোঁকাবাজি দেখে সুলতান জালালুদ্দীনের রক্ত ছলকে ওঠে; কিন্তু অবস্থা তেমন অনুকূল ছিল না। এই ইতর লোকটার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ কোনো যুদ্ধযাত্রাও করা যাচ্ছিল না। শেষে বাধ্য হয়ে সফরের লটবহর গোছগাছ করে পশ্চিম দিকে রওনা দিলেন সুলতান।[৫৪] পথিমধ্যে ইয়াযদ অঞ্চলের বৃদ্ধ হাকিম আলাউদ্দৌলা এসে সুলতানের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। সুলতান তাকে ইয়াযদের শাসনকার্যের পরোয়ানা লিখে দেন।

নতুন বন্ধু

কয়েকদিনের সফরের পর সুলতান জালালুদ্দীন শিরাজের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেন। শিরাজের হাকিম আতাবেগ সাআদ বিন জঙ্গি সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের যুগে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শাসন ও ক্ষমতা মেনে নিয়েছিল; কিন্তু পরে আবার বিদ্রোহ করে তার অধীনতা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ করেই তাতার-ফেতনা উদ্ভূত হওয়ায় আলাউদ্দীন শিরাজের দিকে দ্বিতীয়বার মনোনিবেশ করতে পারেননি। তাতার-তাণ্ডব চলে গেলে শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন সাআদ বিন জঙ্গিকে পরাজিত করে তার থেকে কয়েকটি এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল।[৫৫] সুলতান জালালুদ্দীন যখন শিরাজের উপকণ্ঠে পৌঁছলেন, সাআদ বিন জঙ্গি ও গিয়াসুদ্দীনের মাঝে তখনও সেই টানা-হেঁচড়া ও সংঘাত বিদ্যমান ছিল। গিয়াসুদ্দীনের পাল্লা ভারী হওয়ায়, বলা যায়, আতাবেগ সাআদ বিন জঙ্গি তার মুঠোর ভেতর ছিল।

সুলতান জালালুদ্দীন তার আগমনের কারণ সম্পর্কে অবগত করার জন্য আতাবেগ সাআদের দরবারে বার্তাবাহক পাঠিয়ে দিলেন। তখন, পবিত্র হারামাইন শরিফাইন-সহ মুসলিমবিশ্বের অবশিষ্ট অঞ্চল তাতারদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা ব্যতীত সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। প্রথমেই রুখে দিতে হবে দীর্ঘ প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্মাণ করে তাতার-আগ্রাসনের দৈত্যাকৃতির জোয়ার।

---

[৫৩] জাহাঁকুশা, ২/১৫৫, ২১৩-২১৪; রওজাতুস সফা, ৪/৮২৯;
[৫৪] জাহাঁকুশা, ২/১৫০, ২১৩-২১৪; রওজাতুস সফা, ৪/৮২৯;
[৫৫] ইবনে খালদুন, ৫/১২০; ইবনুল আসির, ৭/৬০৭-৬০৮;

আতাবেগ সাআদ বিন জঙ্গি সুলতান জালালুদ্দীনের আগমনকে এদিককার মুসলিমদের জন্য পরম সৌভাগ্য মনে করলেন। শিরাজের সীমানা-প্রাচীরের বাইরে এগিয়ে সুলতান জালালুদ্দীনকে জাঁকজমকপূর্ণ অভিবাদন জানালেন। শাহজাদা সালগুরশাহ বিন সাআদ ৫০০ অশ্বারোহী-সমেত সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানকে খোশ আমদেদ জানাল।

খাওয়ারিজমি খানদানের সাথে পূর্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত মুছে ফেলতে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ভেবে সাআদ বিন জঙ্গি সুলতান জালালুদ্দীনের সম্মানপ্রদর্শনে কোনো কমতি করেননি। সুলতানের সামনে তিনি দামি পোশাক, আশরাফি, খাদ্যরসদ, উট, হাবশি ও তুর্কি গোলাম এবং নানাজাতের মূল্যবান দ্রব্য পরিবেশন করলেন। সম্পর্ক আরো পোক্ত করে তুলতে স্বীয় কন্যা সালগুরি খাতুনকেও জালালুদ্দীনের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। এমনকি সুলতান জালালুদ্দীন ও সাআদ বিন জঙ্গির মাঝে দস্তখতকৃত একটি চুক্তিপত্র তৈরি করা হল। পত্রে খাওয়ারিজমি খানদানের বর্তমান প্রধানব্যক্তি হিসেবে সুলতান জালালুদ্দীন আতাবেগ সাআদ বিন জঙ্গির যে-সমস্ত এলাকা গিয়াসুদ্দীন কবজা করেছে, তা নাকচ করে দিলেন। সেখানে বহাল রাখলেন সাআদ বিন জঙ্গির পূর্বের রাজত্ব।[৫৬]

আতাবেগের কনিষ্ঠ পুত্র শাহজাদা সালগুরশাহ সুলতানের আদব-সম্মান ও খেদমতে কোনো ত্রুটি রাখেনি। সুলতানও সালগুরের এই মার্জিত আচরণে মোহিত হন। এজন্য প্রতিদানস্বরূপ শাহজাদা সালগুরশাহকে সস্নেহ সম্মান প্রদর্শন করে ফরজন্দ খান উপাধি প্রদান করেন।

সাআদ বিন জঙ্গির বড় ছেলে শাহজাদা মুজাফফর উদ্দীন আবু বকর সাআদ শিরাজ রাজ্যের অলি আহাদ ছিল। পিতার সাথে বিদ্রোহ করার অপরাধে কয়েক বছর জেলখানায় ছিল সে। সুলতান জালালুদ্দীন জানতে পারেন এই ঘটনা। তিনি আতাবেগ সাআদের নিকট সুপারিশ করে শাহজাদা মুজাফফর উদ্দীনকে মুক্ত করে দেন। সুলতান জালালুদ্দীনের এই অনুগ্রহ জীবনে কখনো ভোলেনি শাহজাদা। জেল থেকে মুক্তির কয়েকদিন পরেই সুলতান জালালুদ্দীনের সমীপে নিজের সমস্ত খেদমত পেশ করল সে। সুলতান জালালুদ্দীন যখন ইস্পাহানের দিকে রওনা হলেন, শাহজাদা আবু বকরও একজন সিপাহি হিসেবে তার বাহিনীর সঙ্গে শরিক হয়ে গেল।[৫৭] তাতার-বিরোধী জিহাদে সুলতান জালালুদ্দীনের পতাকাতলে থেকে শাহজাদা আবু বকর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রচনা করেছিল। তারপর পিতা সাআদ বিন জঙ্গি যখন মারা গেলেন, শিরাজের রাজত্ব সামলে নিল আবু বকর।

---

[৫৬] ইবনুল আসির, ৭/৬১১;

[৫৭] জাহাঁকুশা, ২/১৫১; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৫২;

দীর্ঘ সময় ধরে দৃষ্টান্তমূলক ন্যায়-ইনসাফের সাথে রাজ্য পরিচালনা করে যায় সে। কবি শেখ সাদি শিরাজি প্রণীত গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ কাব্যগ্রন্থে আবু বকর সাআদের ন্যায়পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ইস্পাহানে...

শিরাজের পর সুলতান জালালুদ্দীনের পরবর্তী মনজিল ছিল ইস্পাহান। ইস্পাহান তখন তাতারদের কর্তৃত্বমুক্ত অল্পকিছু সৌভাগ্যমণ্ডিত শহরের একটি। এ শহর তখন গিয়াসুদ্দীন পিরশাহের আওতাভুক্ত ছিল। কিন্তু শহরের আমির ও সাধারণ জনগণ আকৃষ্ট ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের প্রতি। এর বড় কারণ, সৈন্যদল ও অধীনস্থদের সাথে ভালো আচরণ করত না গিয়াসুদ্দীন। সে ভোগ-বিলাসের অতল সমুদ্রে ডুবে ছিল। রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত বেপরোয়া।[৫৮]

ইস্পাহানেও সুলতান জালালুদ্দীন অভিবাদনপ্রাপ্ত হলেন জনতার এক বিরাট হুল্লোড়ের ভেতর। ইস্পাহানের কাজি রোকনুদ্দীন মাসউদ ইবনে সাঈদ সুলতানের দরবারে এসে তার বিশ্বস্ত হয়ে রইবেন বলে আশ্বাস দিলেন। আতাবেগ আলাউদ্দৌলা, যিনি সম্পত্তি-সম্মান ও বীরত্বে গণ্য হতেন শহরের ছোট আমিরদের ভেতর, তিনিও বিপুল উপঢৌকন ও বিরল জিনিসপত্র নিয়ে সুলতানের খেদমতে এসে হাজির হলেন। আতাবেগ আলাউদ্দৌলার বয়স তখন ৮০ হয়ে গেছে। সুলতান জালালুদ্দীন তাকে পিতৃবৎ সম্মানপ্রদর্শন করলেন। নিজের সিংহাসনের পাশেই তাকে বসালেন। এবং তাকে পিতা বলে সম্বোধন করলেন তিনি।[৫৯]

গিয়াসুদ্দীনের কুধারণা

ইস্পাহানের পর সুলতান জালালুদ্দীন রায় শহরে গিয়ে ভাই গিয়াসুদ্দীনের সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলেন, যাতে তার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যকে তিনি নতুন করে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পারেন, ইসলামের শত্রুদের জুলুম-পীড়ন থেকে রক্ষা করতে পারেন মুসলিমদের; আর এভাবে গিয়াসুদ্দীন যেন তাতার-বিরোধী জিহাদে তার এক শক্ত বাহু হয়ে ওঠে।

কিন্তু কীসে নিহিত আছে দেশ ও জাতির কল্যাণ, তা অনুধাবনে অক্ষম ছিল গিয়াসুদ্দীন। সে তাতারদের বাদ দিয়ে সুলতান জালালুদ্দীনকেই নিজের শত্রু ও প্রতিপক্ষ ভাবতে লাগল। এ-কারণেই হিন্দুস্থান থেকে বড়ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনের সংবাদে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সে।

---

[৫৮] ইবনে খালদুন, ৫/১২০;

[৫৯] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৯; এমনকি পরবর্তীতে সুলতান খোরাসানের শাসনভারও তার হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। দেখুন তারিখে গুজিদাহ, ১/৫০২;

গিয়াসুদ্দীনের সাথে লড়াই

রায় নগরে বসে গিয়াসুদ্দীন পিরশাহ সংবাদ পেয়েছিল—হিন্দুস্থান থেকে সুলতান জালালুদ্দীন ইস্পাহানে এসে পৌঁছেছেন। তৎক্ষণাৎ সে ৩০ হাজার সিপাহি-বেষ্টিত একটি বাহিনী জমায়েত করে ইস্পাহানকে সুলতান জালালুদ্দীনের হাত থেকে বেদখল করার উদ্দেশে যাত্রা করল; অথচ সুলতান ভাইকে নিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন বলে এসেছিলেন। কিন্তু এই ভিন্ন চিত্রপট দেখে তিনি খুব ব্যথিত হয়ে ওঠেন। ভেতরে ধাই করে জ্বলে ওঠে ক্রোধের অনল। শেষে আপাত-রক্তপাত এড়িয়ে যেতে তিনি একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আঁটেন। ইদক আমির আখওয়ার নামের এক সহচরকে সন্ধিসংক্রান্ত একটি পত্র দিয়ে গিয়াসুদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দেন। পত্রে লিখেছিলেন—মরহুম পিতাজির ইনতেকালের পর যেসব কঠিন মুসিবত আমি বয়ে চলেছি, সেসব যদি কোনো পাহাড়ের উপর রেখে দেওয়া হয়, পাহাড়ও এই বোঝা ওঠাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে। আল্লাহর এই পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য একদম সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আমার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য থেকেও আমি ছিটকে পড়েছি। বাহুর জোরে জয় করে-নেওয়া এলাকাও আজ পেছনে ছেড়ে এসেছি। তোমার কাছে স্রেফ এই খেয়ালে এসেছি যে, ক'দিন এখানে একটুখানি আরাম করব। এখন মনে হচ্ছে মেহমানের অভিবাদনের জন্য তোমার কাছে কেবল ধারালো তরবারিই রাখা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঝরনার পারে এসেও পূর্বের সেই ওষ্ঠাগত পিপাসা নিয়েই আমি ফিরে যাচ্ছি![৬০]

চিঠির সাথে হাদিয়াস্বরূপ পারওয়ানের যুদ্ধে নিহত চেঙ্গিজপুত্র তুলি খানের মূল্যবান পোশাক, খরধার তরবারি ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়া পাঠালেন গিয়াসুদ্দীনের কাছে। এই বিরল জিনিসপত্র বহু বছরের অবিরাম দুর্যোগের ভেতরেও সুলতান জালালুদ্দীনের হাতে সংরক্ষিত হয়ে আসছিল। এগুলো ঐতিহাসিক নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও শুধু গিয়াসুদ্দীনের নির্ভরতা লাভের জন্য হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দেওয়ার সময় একটুও ভাবেননি তিনি।

অন্যদিকে গোপনে গিয়াসুদ্দীনের অফিসারদের ভেতর দূত পাঠিয়ে ছোট ছোট দলে তাদের বিভক্ত করতে লাগলেন। তাদের দূত-মারফত পূর্বের সেই পুরস্কার ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন, পিতার জীবৎকালে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যা তিনি তাদের প্রদান করতেন।

সুলতান জালালুদ্দীন পিতার সময়কাল থেকেই বাহিনীর প্রত্যেকটি শাখার সঙ্গে খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায়ে রাখতেন। এই সেনা-অফিসার ও সিপাহিদের প্রতি তার অনুগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। এ-কারণে সেনাবাহিনীর সবার কাছেই তিনি ছিলেন প্রিয় নেতা।

---

[৬০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৭৭; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৮.

সুলতানের গোপন চিঠি পাওয়ার পর গিয়াসুদ্দীনের কয়েকজন সেনা-অফিসার অগোচরে সুলতানের সঙ্গে এসে দেখা করল। তাদের ভেতর আবু বকর মালিকও ছিল। সুলতানের কাছে তারা বিনীত গলায় বলল, গিয়াসুদ্দীনের নিপীড়নমূলক আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি আমরা। আপনার আগমনের জন্য সেই কবে থেকে আমরা আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। এখন শুধু আপনার একটি ইশারার অপেক্ষায় আছি আমরা। আপনি নির্ভয়ে শিগগির লড়াইয়ে নামুন।

গিয়াসুদ্দীন যখন সুলতানের চিঠি পেল, যুদ্ধের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বাহিনীকে বিভক্ত করে ফেলল সে। এর মধ্যে কিছু আমির এসে সুলতানের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তাদের গোপন চিঠির দস্তখত দেখিয়ে পুরো কাহিনি তাকে শোনাল। চোখ খুলে গেল গিয়াসুদ্দীনের। রাগে সুলতানের দূত আমির আখওয়ারকে সে গ্রেফতার করে নিল। দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে সুলতানের সাথে দেখা করতে যাওয়া কিছু অফিসারকেও গ্রেফতার করল। অবশিষ্টরা পালিয়ে সুলতানের নিকট চলে যেতে সক্ষম হল।

আবার নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল গিয়াসুদ্দীন; কিন্তু এতজন সেনা-অফিসার তাকে ছেড়ে গেছে বলে ভেতরে-ভেতরে সাহস হারিয়ে ফেলেছিল সে। হঠাৎই আতঙ্কের একেকটা ঢেউ এসে যেন ভেঙে নিয়ে যাচ্ছিল তার সাহসের জমিন। বাদবাকি সিপাহিরাও শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

সুলতান জালালুদ্দীনের জন্য এটুকুই ছিল যথেষ্ট। তিনি নির্দ্বিধায় সিপাহিদের সামনে এগোবার নির্দেশ দিলেন। তার নেতৃত্বে ছিল টেনেটুনে মাত্র ক্লান্ত-বিধ্বস্ত ৩ হাজার সিপাহি। ওদিকে ৩০ হাজারের কম ছিল না গিয়াসুদ্দীনের সৈন্যসংখ্যা। কিন্তু এই ৩০ হাজার সৈন্যের যুদ্ধপ্রস্তুতির আগেই এসে উপস্থিত হল সুলতানের অশ্বারোহী বাহিনী। এটা দেখে গিয়াসুদ্দীনের বাহিনী যুদ্ধ না-করে অস্ত্র ছেড়ে দিল। অযোগ্য গিয়াসুদ্দীন সেনাশিবির থেকে পালিয়ে সালুকান দুর্গে গিয়ে লুকোল।

সুলতান জালালুদ্দীন যখন সৈন্যদের নিয়ে গিয়াসুদ্দীনের সেনাছাউনির ভেতর ঢুকলেন, অযোগ্য শাহজাদার সমস্ত আমির-অফিসার সুলতানকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজ নিজ সৈন্যদের নিয়ে সুলতানের সেনাদলে এসে ভিড়ে গেল। সুলতান ছাউনির ভেতর একপাশে দেখতে পেলেন, উৎকণ্ঠিত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে তার সৎমা, অর্থাৎ গিয়াসুদ্দীনের মা বিকালওয়াই বেগম। সন্ত্রস্ত গিয়াসুদ্দীন তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে মাকে এখানেই রেখে গেছে। আলাউদ্দীন মুহাম্মদের বেগমদের মধ্যে তাতারদের তাণ্ডবকাণ্ড থেকে উনিই শুধু বাঁচতে পেরেছিলেন। পুত্রের অযোগ্যতা টের পেয়ে রাজত্বের অধিকাংশ কার্যনির্বাহের ভার তিনি নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। শাশুড়ি তুর্কান খাতুনের পদচিহ্ন ধরেই চলছিলেন তিনি।[৬১]

---

[৬১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৮২; নিহায়াতুল আরাব. ৭/৩৬৯; ইবনে খালদুন, ১২০

সুলতান জালালুদ্দীন পুত্রসুলভ স্নেহাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধীরে-ধীরে সৎমায়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মায়াময় এক গোলাপি ছটায় ঝলমল করে উঠল তার চোখ-মুখ। খানিকক্ষণ নীরবতা পালনের পর সৎমায়ের কাছে ছোট ভাইটার স্থূলবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শিতার অভিযোগ করে খানিকটা অভিমানী গলায় বললেন—ও আমাকে ভয় পেয়ে এভাবে ভেগে গেছে কেন? এই দুনিয়ায় ও ছাড়া আমার কোন ভাইটি বাকি আছে? ও আমার কাছে আমার দৃষ্টির আলোর চেয়ে অধিক প্রিয়। সৈন্যদের বাহুর চেয়েও অধিক সম্মানিত।[৬২]

মাথার উপর ঝলকে ওঠে উন্নয়নের তারা

সুলতানের এসব কথাবার্তায় গিয়াসুদ্দীনের মা খুবই আনন্দ পেলেন। গিয়াসকে ডাকিয়ে এনে দুই ভাইয়ের মাঝে আপস করিয়ে দিলেন।[৬৩] গিয়াসুদ্দীনের মন যদিও নাখোশ, বিষণ্ন ও উদাস হয়ে উঠেছিল; কিন্তু সে দেখল—বড় ভাইয়ের উন্নতি ও প্রতিপত্তির তারকা এখন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। ফলে নিশ্চুপে সে ভাইয়ের খেদমতে দিন কাটাতে লাগল। সুলতান জালালুদ্দীনও তার প্রতি নিখাদ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃসুলভ সম্মানপ্রদর্শনে কোনো কমতি করছিলেন না। গিয়াসের সঙ্গ ছেড়ে-আসা সরদারদেরও খুব খাতির-যত্ন করছিলেন।

যে আমিরেরা তাতার হামলার দিনে, কিংবা তাদের চলে যাওয়ার পরে, রক্ষীবাহিনী হয়ে কাজ করে গেছে, তারা সুলতানের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হয়ে উঠল। নিজ নিজ এলাকার নেতৃত্বও তারাই পেল। যারা গাদ্দারি ও নিমকহারামি করে বেড়াত, তাদের ভোগ করতে হল নিজেদের ঘৃণিত কর্মের শাস্তি। এভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই, যেসব আত্মমগ্ন বিদ্রোহী আমির গিয়াসুদ্দীনের সময়ে আপাদমস্তক ফেতনাবাজ হয়ে উঠেছিল, সুলতানের ক্ষমতা ও মিষ্টি আচরণ দেখে অবনতি স্বীকার করতে বাধ্য হল নিজ থেকেই।[৬৪]

সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যাও তখন চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি পেল। সুলতানের পতাকাতলে জমায়েত হয়ে গেল ৪০-৩০ হাজার সিপাহি। কিরমান, ইস্পাহান, পারস্য, মাজেন্দ্রানসহ অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের লোকজন স্বীকার করে নিল সুলতানের কর্তৃত্ব। ফলে, এই ভূমিতে এক মজবুত ঘাঁটি স্থাপনের জন্য অবস্থা অনুকূল হয়ে ওঠে। খাওয়ারিজম, খোরাসান ও হিন্দুস্থানে জিহাদি মারকাজ প্রতিষ্ঠার তিনটি ক্লান্তিহীন সফল প্রচেষ্টার পর, এইবার প্রাণান্তকর চেষ্টার চতুর্থ

---

[৬২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৭৮; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৫৩; তারিখে কাবির লিজ-যাহাবি, ৬২/৬১৯

[৬৩] ইবনে খালদুন, ৫/১২০;

[৬৪] ইবনে খালদুন, ৫/১২০;

অধ্যায় রচনা করে ফের একবার একটি নতুন ঘাঁটি স্থাপন করতে সক্ষম হলেন সাহসী সুলতান জালালুদ্দীন। এই আনন্দঘন মুহূর্তে নুরুদ্দীন মুনশি নামে সুলতানের এক দরবারি ফারসি ভাষায় একটি কবিতা লিখে ফেলল। কবিতার অর্থ হল : 'হে জিন্দেগি, ফিরে আয় তবে ফের! সমুন্নত মহান বাদশাহ সুলতান জালালুদ্দীনের শান-শওকতে দুনিয়া দ্বিতীয়বার আনন্দময়ী হয়ে উঠেছে।'[৬৫]

খুজিস্তানের যুদ্ধাভিযান

কিছুকাল পর সুলতান জালালুদ্দীন খুজিস্তানের দিকে অগ্রযাত্রা করলেন। সেখানকার রাজধানী তস্তর অবরোধে লিপ্ত রইলেন তিনি। কিন্তু হাসিল হল না কামিয়াবি। এই এক অবরোধেই কেটে গেল পুরো শীতকাল। তারপর বাতাসের সেতারে যখন বেজে উঠল বসন্তের আগমনী সঙ্গীত, অবরোধ উঠিয়ে সুলতান জালালুদ্দীন শাহপুরখাস্ত চলে গেলেন। একমাস সেখানেই অবস্থান করলেন তিনি।[৬৬]

বৈশ্বিক চালচিত্র

আপনারা পড়েছেন, সিন্ধুপারের যুদ্ধের কিছুকাল পরে খোরাসানে চেঙ্গিজ খান তৃতীয়বারের মতো গণহত্যা চালিয়ে চীনের দিকে ফিরে গিয়েছিলেন। সেখানে হিয়া অঞ্চলের বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার কাজ ও পারিপার্শ্বিক কিছু অভিযান তাকে কয়েক বছর পর্যন্ত ইসলামি সাম্রাজ্যে আগ্রাসন চালাবার সুযোগ দেয়নি। এতে খোরাসান, ইরান ও ইরাকে অস্থায়ীভাবে তাতার-আগ্রাসন থেমে যাওয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এই শহরগুলোতে ফের একবার ফুটে উঠেছিল জীবনের সবুজ রং। পলাতক কিংবা আত্মগোপনকারী অনেক লোক বাপ-দাদার সেই শহরগুলিতে এসে অস্থিস্তূপের ভেতর আবার নতুনভাবে বসবাস শুরু করেছিল। কিন্তু এদের সংখ্যা ধ্বংস-পূর্ব জনসংখ্যার তুলনায় এক-শতাংশও ছিল না।

উদাহরণ হিসাবে হেরাতের কথাই বলি। তাতার-হামলার পূর্বে এর জনসংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। কিন্তু তাদের বরবাদির পর ১৫ বছর নাগাদ এই বিশাল শহরের জনসংখ্যা ৪০ জনের বেশি ছিল না।[৬৭]

সুলতান জালালুদ্দীনের বর্তমান দখলীকৃত এলাকাগুলোর অধিকাংশ ছিল হেরাতের মতো ধ্বংসপ্রাপ্ত বিলুপ্ত শহর। এই শহরগুলিতে নির্দিষ্ট কিছু লোক দ্বিতীয়বার এসে নীড় গড়েছিল। কিন্তু এইসব বিধ্বস্ত শহরের পশ্চিমদিকস্থ মুসলিমবিশ্বের অর্ধাংশ ছিল জনসংখ্যা ও উপায়-উপকরণে ভরপুর। আগ্রাসী

---

[৬৫] জাহাঁকুশা, ২/১৫৪; রওজাতুস সফা, ৪/৮২৯;

[৬৬] জাহাঁকুশা, ২/১৫৪; ইবনে খালদুন, ৫/১২১

[৬৭] রওজাতুস সফা, ৫/৪০;

তাতারদের লোভাতুর দৃষ্টি সেদিকেও পড়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল—মুসলিমদের সমস্ত পবিত্র ভূমি ও ধর্মীয় কেন্দ্র এই পশ্চিমাঞ্চলেই বিদ্যমান ছিল। তাতাররাও খুব ভালো করে জানত—যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের কেন্দ্রীয় শহরগুলো প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ এই জাতিটাকে নিঃশেষ করা অসম্ভব।

উম্মাহর ঐক্যভাবনা : সুলতানের চিন্তাদর্শন

তখন মুসলিমবিশ্বে সুলতান জালালুদ্দীনই ছিলেন সেই একক বাদশাহ, যিনি তাতারদের এই ভয়ংকর ফেতনার ধ্বংসকাণ্ড সম্পর্কে ছিলেন সর্বাধিক অবগত, এদের ধূর্ততা সম্পর্কে সর্বাধিক সতর্ক এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য তারই ছিল সর্বাধিক যোগ্যতা। কালের পদধ্বনি সম্পর্কে অত্যধিক উৎকর্ণ ছিলেন তিনি। তিনি জরুরি মনে করছিলেন—পবিত্র হারামাইন শরিফাইন ও অবশিষ্ট মুসলিমবিশ্বের সুরক্ষার জন্য গড়ে তুলতে হবে একটি ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তি। তাতারদের মোকাবেলায় উত্তমরূপে এই শক্তিপ্রয়োগের জন্য সুলতানের মস্তিষ্কে ছিল এক বিস্ময়কর পরিকল্পনা। তা হল—হিন্দুস্থান সীমান্ত থেকে আরম্ভ করে ব্ল্যাক লেকের তীর পর্যন্ত কাঁচির মতো বাঁকা চাঁদের আকৃতিতে দীর্ঘতর একটি প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়ে তোলা, যা একই সময়ে হিন্দুস্থান, পারস্য, বাগদাদ, শাম, হেজাজ, মিশর ও আনাতোলিয়ার মুসলিম জনপদগুলির জন্য হয়ে উঠবে পরিবেষ্টনকারী এক মজবুত দুর্গ।

এই মহা কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দেবার জন্য অসংখ্য উপাদান-উপকরণ, অঢেল অর্থকড়ি ও জনশক্তির প্রয়োজন। সম্বলহীন অবস্থায় এই পরিকল্পনার নকশা অঙ্কনকারী সুলতানের স্বীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অপরাপর মুসলিম শাসকের সহযোগিতা লাভ করতে পারা হয়ে উঠেছিল আবশ্যক। বাগদাদের খেলাফত তখন মুসলিমবিশ্বের কেন্দ্রীয় জনপদ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতান ভাবছিলেন—খলিফা নাসির যদি পূর্বের রাগ-ক্ষোভ ভুলে গিয়ে তাকে সাহায্য করবেন বলে সম্মত হয়ে ওঠেন, তা হলে অবস্থা সঙ্গিন দেখে আশপাশের অন্যসব মুসলিম শাসকও খলিফা নাসিরের সাথে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে দ্বিধাবোধ করবে না। কোনোভাবেই পিছিয়ে থাকতে পারবে না তারাও।

এই ভাবনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক পটভূমিকা হিসেবে খলিফা নাসিরের সাথে সরাসরি যোগসূত্র তৈরি করা জরুরি বলে মনে করলেন সুলতান জালালুদ্দীন। প্রকৃতিতে তখন নেমে এসেছে শীতকাল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল ছিল না বলে সুলতান জালালুদ্দীন উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় রইলেন।

খলিফার দরবারে সুলতানের দূতের রওনা : একটি ব্যর্থতার গল্প

শীতকালটা সুলতান জালালুদ্দীন তস্তরে কাটালেন। এখন পড়েছে বসন্তকাল। বসন্তে শাহপুরখাস্ত চলে এলেন তিনি। এখানে অবস্থান করলেন একটি মাস। তারপর, ৬২১ হিজরির সফর মাসে (মার্চ, ১২২৪) যখন বসন্তকাল যৌবনবতী হয়ে উঠেছে, তখন তিনি বাগদাদের দিকে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য, খলিফা নাসিরের সাথে কথাবার্তা বলে পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের একটা প্রচেষ্টা করে উঠবেন তিনি।[৬৮]

বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছে জিয়াউল মুলককে বার্তাবাহক বানিয়ে সুলতান জালালুদ্দীন খলিফার দরবারে পাঠালেন।[৬৯] খলিফার সামনে সুলতানের আগমনের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করল জিয়াউল মুলক।

সুলতান সৎ উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন—খলিফার মনে এই বিশ্বাস জন্মাবার যথাযথ চেষ্টা করল সে; কিন্তু বড় আফসোসের কথা হল, তাতারদের হাতে খাওয়ারিজমের কমপক্ষে ১ কোটি মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেছে দেখেও খলিফা নাসিরের অন্তরে বিধ্বস্ত খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের প্রতি সেই পুরোনো ঘৃণাবোধ তখনও পূর্ববৎ জমাট বেঁধে ছিল। মৃত আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের অবশিষ্ট হাড়গোড় পর্যন্ত পচে গিয়েছিল, তবু মুসলিমবিশ্বের এই ইমামের (খলিফা নাসির) মনে আলাউদ্দীনের সন্তান ও তার প্রজাকুলের প্রতি খানিক অনুগ্রহ জাগবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

খলিফার এই ক্রোধের একটি কারণ এই ছিল যে, সুলতানের এই আগমনের কিছুদিন আগেই তার অগ্রবর্তী দলের সেনাপতি ইলচি জাহাঁ পাহলোয়ান ইরানের খুজিস্তান অঞ্চলে হামলা চালিয়েছিল; কিন্তু এই এলাকাকে খেলাফতের আওতাভুক্ত ভাবতেন খলিফা। যদিও সুলতান জালালুদ্দীন খুজিস্তানের পরাজিত বাহিনীর সাথে উত্তম আচরণ করেছিলেন। এই লড়াইয়ে গ্রেফতারকৃত সবাইকে খানিক বাদেই মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু এই আক্রমণে বাগদাদ ও খাওয়ারিজমের সেই পুরোনো দ্বন্দ্ব আবার তাজা হয়ে উঠল। ফলে সুলতানের সাথে আপস ও তাকে সহযোগিতা করবার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করলেন না খলিফা নাসির। বরং শক্ত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ২০ হাজার সৈন্যসহ সেনাপতি কাশাতমুরকে বাগদাদের উপকণ্ঠে অবস্থানরত সুলতান জালালুদ্দীনের মোকাবেলায় পাঠিয়ে দিলেন। তার উপর ওদিকে ইরবিলের হাকিম মুজাফফর উদ্দীনের কাছে পত্রবাহী কবুতরের মাধ্যমে চিঠি পাঠালেন যে—১০ হাজার সৈন্য নিয়ে ওদিক থেকে এসে তুমি সুলতানের উপর

---

[৬৮] জাহাঁকুশা, ২/১৫৪;

[৬৯] ইবনে খালদুন, ৫/১২১;

আক্রমণ চালাও। আর এদিক থেকে আসছে আমার বাহিনী। সুলতানকে দুইদিক থেকে বেড়ের ভেতর ফেলে দাও তোমরা।

বাহিনী পাঠাবার আগে কাশাতমুরকে কাছে ডেকে খলিফা নাসির নির্দেশনা দিলেন—মুজাফফর আসার আগে তুমি যুদ্ধ শুরু করতে যেয়ো না।

বাগদাদ বাহিনীর আক্রমণ

সুলতান জালালুদ্দীন বাগদাদের বাইরে ছাউনি স্থাপন করে অস্থিরচিত্তে খলিফার জবাবি চিঠির অপেক্ষায় ছিলেন। এর মধ্যে আচমকা শুনতে পেলেন তার বিরুদ্ধে বাগদাদের বাহিনী অভিযানে নেমে এসেছে।

সুলতান খানিক পেরেশান বোধ করলেন। এখানে তিনি যুদ্ধের নিয়তে আসেননি। মানসিকভাবেও এখন তিনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নন। তার কাছে এখন আছে সহচর ও দেহরক্ষী হিসেবে ২ হাজার সিপাহি।

সুলতানের বার্তা

সংঘর্ষ থেকে বাঁচতে সুলতান আরেকবার দুপক্ষের ভুল বোঝাবুঝি দূর করবার চেষ্টা করলেন। দূত-মারফত অভিযানরত কাশাতমুরের কাছে পয়গাম পাঠালেন—আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করার নিয়তে আসিনি। খলিফা নাসিরের মেহমান হিসেবে এখানে হাজির হয়েছি। মেহমানের সাথে এমন যুদ্ধের আচরণ দেখানো অভদ্রতা। এইদিকে আমাদের আসবার উদ্দেশ্য কেবল একটাই—আমরা আমিরুল মুমিনিনের ছায়ায় খানিক আশ্রয় পেতে চাচ্ছি। মুসলিমদের শহরগুলোকে বরবাদ করে-দেওয়া শক্তিশালী তাতার-শত্রুরা ইতোমধ্যে চতুর্দিকে জয় লাভ করে উঠেছে। কোনো সৈন্যদলই তাদের মোকাবেলা করবার শক্তি ও সক্ষমতা রাখে না। খলিফাতুল মুসলিমিন যদি আমাকে সাহায্য করেন, আমার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলে এই তাতারদের মোকাবেলা ও তাদের মেরে তাড়ানোর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।[৭০]

যুদ্ধের শুরু

সুলতানের এই দরখাস্তের কোনো প্রতিক্রিয়া কাশাতমুরের উপর পড়েনি। খলিফার পক্ষ থেকে যুদ্ধের স্পষ্ট হুকুম মিলেছে তার। এজন্য তার পক্ষে সুলতানের কথায় কর্ণপাত করা ছিল অসম্ভব। সে খলিফার তাগিদের কারণে মুজাফফর উদ্দীন কোকোবরার আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু মুজাফফরের বাহিনী পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে কাশাতমুর ভেবে

---

[৭০] জাহাঁকুশা, ২/১৫৪; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৫৫;

বসল—সুলতান জালালুদ্দীনের সৈন্যদের পিষে ফেলতে আমার এই ২০ হাজার সিপাহিই যথেষ্ট। ফলে বাহিনীকে আক্রমণের হুকুম দিল সে। দিগন্তে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে সম্মুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কাশাতমুরের বাহিনী।

সুলতান জালালুদ্দীন বুঝে গেলেন—এখন মোকাবেলা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। শত্রুবাহিনীকে তার সৈন্যদলের তুলনায় ১০ গুণ বেশি দেখেও কণামাত্র ভয় পেলেন না তিনি। বরং দেড় হাজার খাওয়ারিজমি সেপাইকে তিনি খানিক দূরে একটা গোপন জায়গায় বসিয়ে দিলেন। বাকি ৫০০ জানবাজকে কাতারবদ্ধ করে নিজে প্রতিপক্ষ দলের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন।

দূর থেকে কাশাতমুর সুলতানের সৈন্যসংখ্যা ৫০০-এর মতো দেখে খুশিতে একপ্রকার তাড়াহুড়ো আরম্ভ করে দেয়। খুব অধৈর্য হয়ে ওঠে সে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সুলতানকে গ্রেফতার করে ফেলবে ভেবে খলিফার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবার স্বপ্নে বুঁদ হয়ে যায় সে নিজের ভেতর। কাশাতমুর ঝড়ের গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান খাওয়ারিজমিদের উপর এসে হামলে পড়ে।

যুদ্ধের পরিণতি

মুহূর্তের ভেতর সুলতান জালালুদ্দীন মৌমাছির মতো বাগদাদি বাহিনীকে হুল ফুটিয়ে দিয়ে পিছু হটে যাবার পরিকল্পনা এঁটে বসলেন। শত্রুবাহিনীর সেন্টারে ও ডানে-বামে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পেছনে হটে গেলেন। কাশাতমুর ধারণা করল—সুলতান জালালুদ্দীন প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। তাই বিপুল গতিতে সে সুলতানের পেছনে ধাওয়া করতে লাগল। সুলতান জালালুদ্দীন পিছু হটতে হটতে বিরোধী-শক্তিকে পাহাড়ের সেই ঘাঁটির ভেতর নিয়ে এলেন, যেখানে ঘাঁটি গেড়ে ছিল তার ১,৫০০ সিপাহি।

বাগদাদ-বাহিনী এখানে এসে পৌঁছতেই তাদের উপর শুরু হয়ে গেল তির ও পাথরের তুমুল বৃষ্টি। এই আকস্মিক আক্রমণে তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। কাশাতমুরের মনে হল—সুলতানের মূল বাহিনীর সংখ্যা তা হলে অনেক বেশি! ফলে পিছু ফিরে যেতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু বেচারার ভাগ্যে বেঁচে ফিরতে পারা আর জুটল না। এর ভেতর তলোয়ার উঁচিয়ে ঘাঁটিতে লুকিয়ে থাকা খাওয়ারিজমি সিপাহিরা বেরিয়ে এল। এদিকে সুলতান জালালুদ্দীনও পেছন ঘুরে আক্রমণ চালাতে লাগলেন। বাগদাদের বাহিনী এই আক্রমণকারীদের সংখ্যা ঠিক কত, তা না-দেখেই ভয়ে ছুটতে ছুটতে বাগদাদের দিকে পালিয়ে গেল। সৈন্যদের নিয়ে পেছন থেকে সুলতান জালালুদ্দীনও তাদের ধাওয়া করতে লাগলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁকাতে হাঁকাতে একদম বাগদাদ শহর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন।[৭১]

---

[৭১] জাহাঁকুশা, ২/১৫৫;

খলিফার হতভম্বতা

কাশাতমুরের মৃত্যু ও বাগদাদ-বাহিনীর পরাজয়ের কথা শুনে ভীষণ পেরেশান হয়ে পড়লেন খলিফা নাসির। বাগদাদ শহরের লৌহ-তোরণ বন্ধ করে তিনি কড়া পাহারা নিযুক্ত করলেন। স্থাপন করালেন অসংখ্য কামান। ১০ লক্ষ দিনারের বিপুল অর্থ-ব্যয়ে এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেখে মনে হচ্ছিল—বাগদাদের উপর যেন বিরাট কোনো সৈন্যদল এসে চড়াও হয়েছে।[৭২] অথচ সুলতানের নিকট তখন বড় কোনো বাহিনী ছিল না। বাগদাদের উপর চড়াও হবারও কোনো ইচ্ছা ছিল না তার। তিনি বাগদাদি বাহিনীকে শুধু তাদের ঘরে ফেরার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলেন।

বাকুবা ও দাকুকা দখল

এই মুহূর্তে ছাউনি থেকে শত মাইল দূরে রয়েছেন সুলতান জালালুদ্দীন। খোরাকি ও রসদপত্রের স্বল্পতা, বাহন ও মালবাহী পশুদের স্বল্পতা এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র না-থাকায় সিপাহিদের অবস্থা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেছে। এই অবস্থায় বাগদাদের বাহিনীর আবার এসে তাদের উপর আচানক হামলে-পড়া কিংবা বাগদাদের কোনো মিত্রশক্তি এসে তাদের উপর আক্রমণ করে-বসা একেবারে অসম্ভব কিছু ছিল না। এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সুলতানের জন্য তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তাই সংকট মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে তিনি বাগদাদ থেকে সাত ফারসাখ দূরের বাকুবা অঞ্চলটি দখল করে নিলেন। সেখান থেকে তিনি খাদ্যরসদ, ঘোড়া ও খচ্চর লাভ করলেন।

এরপরের ঘটনা। ইরবিল যাবার পথে একটা এলাকা পড়ে। নাম দাকুকা। সুলতান এই দাকুকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানকার লোকদের ভেতর একথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সুলতান জালালুদ্দীন ও তার সাথিরা খেলাফতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তারা খলিফার সাথে বিদ্রোহ করেছে।

ফলে সুলতান যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রাচীরের উপর থেকে সুলতানকে উদ্দেশ্য করে কুৎসিত গালাগাল ছুড়তে লাগল শহরবাসী। সুলতান শহর অবরোধ করে মুহূর্তের মধ্যে দখল করে ফেললেন। লোকদের গালিগালাজ শুনে সুলতানের সেপাইরা কঠিনভাবে ফুঁসে উঠেছিল। এজন্য শহরে প্রবেশের পর এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সুলতান তাদের থামাতে-না-থামাতেই অনেক লোক তাদের হাতে মারা পড়ল।[৭৩]

---

[৭২] শাজারাতুয যাহাব, ৫/৯৭;

[৭৩] ইবনুল আসির, ৭/৬১২; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৯; স্মর্তব্য যে, বাকুবা ও দাকুকা দখল করা হয়েছিল অস্থায়ীভাবে। পরে সুলতান এই শহরদুটো খালি করে দিয়েছিলেন।

ইরবিলের হাকিমের সাথে লড়াই এবং সন্ধিচুক্তি

এর মধ্যে খবর এল—ইরবিলের হাকিম মুজাফফর উদ্দীন কোকোবরা ১০ হাজার সিপাহি নিয়ে সুলতানের মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। সুলতান জালালুদ্দীন সঙ্গীসাথি বীরসেনাদের নিয়ে ইরবিলের পথে উঁচু এক পাহাড়ের পেছনে গিয়ে ওত পেতে রইলেন। মুজাফফর উদ্দীন কোকোবরার সৈন্যদল যখন এখান দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে খানিক সামনে এগিয়ে গেল, পেছন থেকে একযোগে তাদের উপর হামলা করে বসল সুলতানের সৈন্যরা। মুজাফফর উদ্দীনকে গ্রেফতার করা হল। তার সিপাহিরা জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গেল দিগ্বিদিক।

মুজাফফর উদ্দীন কোকোবরা ছিল একজন মার্জিত, অভিজ্ঞ ও সাহসী লোক। তৃতীয় ক্রুসেডযুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির একজন সেনাপতি হিসেবে বিপুল বীরত্ব দেখিয়েছিল সে। এখনকার এই যুদ্ধের সময় সে বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছিল। তাকে যখন সুলতান জালালুদ্দীনের দরবারে আনা হল, সুলতান তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। রাজোচিত সম্মানপ্রদর্শন করলেন। মুজাফফর উদ্দীন স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত বোধ করল। সুলতান তাকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিলেন। পাশাপাশি, মুজাফফর যেসব দস্যুদল থেকে হাজিদের নিরাপত্তার জন্য সফল প্রচেষ্টা করেছিল, তারও প্রশংসা করলেন। সুলতানের এই উদারতা ও মাহাত্ম্য দেখে দারুণ প্রভাবিত হল মুজাফফর উদ্দীন; এবং খুবই জোরাজুরি করে সুলতানকে নিজ শহরে নিয়ে গেল। সেখানে মেহমান হিসেবে কিছুকাল কাটালেন সুলতান। মুজাফফরের একনিষ্ঠ খেদমত ও আতিথেয়তায় খুব প্রীত হলেন তিনি।[৭৪]

নয়া সংকল্প

খলিফা নাসিরের ঔদ্ধত্য দেখেও সুলতান জালালুদ্দীন নিরাশ হলেন না। দেশ ও জাতির প্রতিরক্ষার জন্য তিনি নিজেই বাহুর জোর বৃদ্ধির পরিকল্পনা সাজালেন। স্বীয় মিশনের গণ্ডি প্রশস্ত করে উত্তর ইরাক থেকে শুরু করে আজারবাইজান পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একাধিক সাম্রাজ্যের উপর চড়াও হবার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন, যেখানকার শাসকশ্রেণি ছিল তাতারদের মিত্র ও করদাতা। তাতার-বিরোধী জিহাদে তাদের থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়ার আশা ছিল না। বরং সর্বদা এই আশঙ্কা বিরাজ করছিল যে, এই নব গঠিত জিহাদি শক্তির পিঠে খঞ্জর হয়ে এরা আঘাত হানতে পারে যেকোনো সময়।

---

[৭৪] মুজাফফর উদ্দীন কো-কোবরা তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির একজন গর্বিত সেনাপতি ছিল। বীরত্ব, দক্ষতা ও ভদ্রতায় ছিল আপাদমস্তক সুষমামণ্ডিত। তার দানশীলতার গুণও ছিল প্রসিদ্ধ। কিন্তু তার তবিয়ত কিছুটা বিদআতের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। ঈদে মিলাদুন নবী সা. উৎসব সর্বপ্রথম সে-ই সরকারি তত্ত্বাবধানে উদযাপন করিয়েছিল।

মারাগেহ দখল

আজারবাইজান যাবার সময় পথিমধ্যে মারাগেহ শহরের কিছু নেতৃস্থানীয় লোকের পক্ষ থেকে চিঠি পান সুলতান। এই চিঠিতে মারাগেহ দখলে নেবার আহ্বান জানানো হয়েছিল তাকে। মূল ঘটনা হল—মারাগেহ তখন তিবরিজের হাকিম উজবুক মুজাফফর উদ্দীনের অধীনে ছিল। কিন্তু সে ছিল মাত্রাতিরিক্ত প্রবৃত্তিপূজারি। একদিকে সে তাতারদের নুন খেত, অন্যদিকে পড়ে থাকত জর্জিয়ার খ্রিষ্টানদের পায়ের তলায়। মারাগেহ শহরের নেতৃস্থানীয় অনেক লোক সুলতানের পতাকাতলে চলে আসতে চাচ্ছিল। তাদেরই আহ্বানে ৬২২ হিজরির জুমাদাস সানিতে (জুলাই, ১২২৫) সুলতান জালালুদ্দীন মারাগেহ শহরে আক্রমণ করেছিলেন। কয়েকদিন অবরোধের পরেই জয় করে নিয়েছিলেন শহর। উপর্যুপরি বিপর্যয়ের ঝটকা সারা শহর ওলট-পালট করে দিয়েছিল। ফলে, সুলতানের আদেশে বিধ্বস্ত শহরের পুনর্গঠনের কাজ অত্যন্ত সুচারুভাবে পূর্ণতায় পৌঁছে।[৭৫]

মুসলিম শাসকদের সাথে যোগসূত্রতার শুরু

খলিফার সহযোগিতার ব্যাপারে আশাহত হয়ে সুলতান অত্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করতে লাগলেন যে, মুসলিমবিশ্বের অন্যান্য শাসকের সাথে সরাসরি সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে, যাতে এই পারস্পরিক ঐক্য ইসলামের শত্রুদের প্রতিরোধে বাদশাহ সিকান্দারের লৌহপ্রাচীর হয়ে ওঠে। পাশাপাশি তিনি আজারবাইজান, তারপর জর্জিয়ায় আক্রমণের পরিকল্পনা সাজাচ্ছিলেন।

একসময় প্রতিবেশী শাসকরা সুলতানের পিতার প্রতিটি নতুন অভিযানে ভয়ে একদম সিঁটিয়ে থাকত। তারা সুলতানের এবারকার এই বিজয়ধারাকেও পূর্বের সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এজন্য সুলতান চাচ্ছিলেন তাদের ভুল ধারণা দূর করে তার আসল উদ্দেশ্য ও ভাবনা সম্পর্কে অবগত করবেন। তাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছিলেন উম্মাহর জন্য তার হৃদয়ের বিষাদিত সব দরদ-ব্যথা।[৭৬]

আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সাথে ঐক্য

জুমাদাল উখরার শেষদিকের ঘটনা। সুলতান তখন মারাগেহ শহরে অবস্থান করছিলেন। তিনি তার সাম্রাজ্যের প্রধানবিচারপতি মুজিরুদ্দীন উমর ইবনে সাআদ খাওয়ারিজমিকে দূত বানিয়ে শুভকামনাজ্ঞাপক পত্র প্রদান করে আনাতোলিয়া, সিরিয়া ও মিশরের শাসকদের কাছে পাঠালেন। সুলতানের এই চিঠিতে লেখা

---

[৭৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৯৪; ইবনুল আসির, ৭/৬১৬;

[৭৬] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৫৮;

হয়েছিল উভয় দিকের সম্পর্ক পোক্ত করে তুলবার মতো কথাবার্তা। এবং তাতে শাসকদের এ-ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সুলতান জালালুদ্দীন আজারবাইজান দখল করে ফেলেছেন; এখন জিহাদের জন্য তিনি জর্জিয়া-অভিমুখে রওনা দেবেন।[৭৭]

আনাতোলিয়ায় তখন রাজত্ব করছিলেন রোমের মর্যাদাবান সেলজুক শাসক আলাউদ্দীন কায়কোবাদ। তার নামে লিখিত সুলতানের দীর্ঘ পত্রের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত।

সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের চিঠি

রোমের সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের নামে...

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অভিবাদন ও সালামের বরকতময় ধারা, হামদ ও প্রশংসার সূক্ষ্ম কোমলতা—যদ্দ্বারা অন্তর আকিদার স্বচ্ছতা ও ভেতরের পবিত্রতা লাভ করে এবং মহব্বত ও বন্ধুত্বের প্রাসাদ মজবুত হয়ে ওঠে—প্রতিমুহূর্তে সুলতানে মুয়াজ্জম, জামশেদে জামান, যুলকারনাইনে ওয়াক্ত, আলাউদ্দুন্‌য়া ওয়াদ-দীন, কুতবুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন, ফালাকুল মাআলি, জিল্লুল্লাহ ফিল আলামিন, ইফতিখারে আলে সেলজুক, মালিকুল মুলক ওয়াস সালাতিন, বুরহানু আমিরিল মুমিনিন সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের মজলিশজুড়ে সবসময় জড়িয়ে থাকুক।

আপনার সাথে সংঘবদ্ধ হবার সৌভাগ্য ও সাক্ষাতের মর্যাদা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা সর্বাবস্থায় বুকে পুষে রাখি আমি। এই আকাঙ্ক্ষা এতটা সংক্ষিপ্ত নয় যে, লেখনী তার দ্রুতগতি সত্ত্বেও তুলে আনতে পারে কাগজের পাতায়। 'পত্র সেই কথা থেকে অমুখাপেক্ষী নয়, যা কখনো শেষ হয় না।'

ইতিপূর্বে যদিও কালের আবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চিঠিপত্রের এই দরজা—যা বিচ্ছেদের কালে বন্ধুদের হৃদয়ে এনে দেয় শান্তিময় শীতল পরশ—বন্ধ ছিল; কিন্তু আজকের পর থেকে সম্পর্কহীনতার দেয়াল ভেঙে ফেলবার, মহব্বত ও সম্পর্কসূত্রের ফটক খুলে দেবার চেষ্টা করা উচিত আমাদের জন্য। উভয় দিক থেকে 'তুমি যদি কোনো শরিফ লোকের বন্ধুত্ব-লাভে সমর্থ হও, তবে তার সঙ্গ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকো। কারণ, জগতে শরিফ লোকের সংখ্যা খুব কম' এ কথার উপর যথাযথভাবে আমল করা উচিত। আল্লাহর শোকর ও অনুগ্রহ যে, জিহাদের সুন্নাতের প্রতি আমলের ব্যাপারে আমাদের ও আপনাদের সমান অংশীদারত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এমনিভাবে ধর্ম ও জাতি হিসেবেও আমরা সমপর্যায়ের। (কবির

---

[৭৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৯৪; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৯; সেলজুকনামা ১৫৩-১৫৮;

ভাষায়—) 'তোমার মহব্বত ও বন্ধুত্ব পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি সে, ধর্ম ও জাতি হিসেবে যে তোমার অনুকূল (একই ধর্মের, একই উম্মাহ)।'

পশ্চিমের শাসকদের ভেতর আপনার অনুপম ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সীমান্ত-রক্ষা ও কাফেরদের ঘাড় মটকে দেওয়ার কারণেই। এদিকে পূর্বাঞ্চলে আমি তলোয়ার হাতে কাফের-শক্তির ফেতনার আগুন নেভাচ্ছি। আমাদের পারস্পরিক ধর্মকর্ম সবকিছুই এমনভাবে মিলে গেছে; তবু যদি পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও বন্ধুনিষ্ঠ আচরণ কায়েমের প্রচেষ্টা আমরা না করি, উপকার লাভ করতে কিংবা ক্ষয়ক্ষতিমুক্ত থাকতে পরস্পরের সহযোদ্ধা হয়ে না উঠি, 'তবে কাকেই-বা আমরা বন্ধু বানাব আর কোন ভূমিতে চাদর লটকিয়ে—নিরাপদে নিশ্চিন্তে—চলতে পারব?'

জুমাদাল উখরার শেষদিকে মারাগেহ শহরে (এখন যা আমাদের বিজয়-কেতনের কেন্দ্রভূমি) বসে এই চিঠি লেখা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, জনাবের দোয়া ও সমর্থনের বরকতে আমাদের রাজ্য খুবই অনুকূল আছে। এজন্য আল্লাহর দরবারে অজস্র শুকরিয়া। ভাগ্য ও বাদশাহির কারণে উম্মাহর ভেতর আবার ঐক্যবদ্ধতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যের বড়রা, রাষ্ট্রের সরদাররা সবাই আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আমার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এলাকা পুনর্দখলে এসে গেছে এবং অব্যাহত আছে বিজয়ের ধারা। যে সময়টাতে এ রাজ্যে আমি অনুপস্থিত ছিলাম, তখন হিন্দুস্থানের শহরগুলোর এক বিপুল-বিস্তৃত সাম্রাজ্য আমাদের আমলাদের দখলে এসেছিল।

আমরা আমাদের সমস্ত ইচ্ছা ও সংকল্প দীনের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ও মুসলিমদের হৃদয়ে প্রশান্তি আনয়নের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। আরেকটা বিষয়, আমাদের এই সবুজ-শ্যামল অঞ্চলে—যেখানে প্রজারা বড় আনন্দপূর্ণ সময় যাপন করছে—আপনি নিশ্চয়ই পরম সুখে-আহ্লাদে জড়িয়ে থাকবেন। তদ্রূপ যে সৌভাগ্য আপনি অর্জন করেছেন, তাতেও নিজেদের আমরা অংশ বলে মনে করি।

এই মুহূর্তে সদরে মুয়াজ্জম, আলেমে মুজতাহিদ, কিওয়ামুল মুলক, মুজিরুল মিল্লাতি ওয়াদ-দীন, শারফুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন, আল্লামায়ে যামান, দানেশমন্দে দাওরান, ফখরে খাওয়ারিজম ওয়া খোরাসান, কাজিউল কোজাত, আবুল মুলক ওয়াস সালাতিন তাহের, যিনি পূর্বসূরি মনীষীদের সিলসিলার এক মূল্যবান মুক্তা, আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে ছুঁয়ে-যাওয়া এক শিহরণ, রাজ্যের নেতা ও জনগোষ্ঠীর বিশেষ প্রিয়ভাজন উপদেষ্টা। গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে তার প্রদত্ত পরামর্শে ঐকমত্য প্রদর্শন করে সবাই। তিনি এখন আপনার উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন। তার অদ্ভুত লালিত্যপূর্ণ কণ্ঠে চিঠি-পাঠ শুনবেন আপনি। আশা করছি এতে প্রশস্ত হবে আমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতির পথ। হৃদয়ের আয়না থেকে

মুছে যাবে অপরিচিতি ও দূরত্বের ধুলো। আমাদের বন্ধুত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে উঠবে। কারণ, আজকের পর উভয় দিক থেকে পত্রবাহকদের যাওয়া-আসা অব্যাহত থাকবে। উপযুক্ত হবে আপনিও কাজি সাহেবের থেকে গ্রহণ করার নিয়তে এই কথাগুলো শুনবেন। তিনি যা কিছু বয়ান করবেন,[৭৮] আপনি মনে করবেন সেগুলো আমাদেরই বলা; আমাদেরই পয়গাম। আশা আছে, তিনি তার উপস্থাপনায় আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের ধরন শুদ্ধ নিয়তে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলবেন। ওয়াস সালাম।

সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের জবাব

প্রধানবিচারপতি মুজিরুদ্দীন তাহের খাওয়ারিজমি যখন এই চিঠি নিয়ে সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের দরবারে পৌঁছেন, তাকে জানানো হয় বিপুল সংবর্ধনা। সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদ তাকে নিখাদ ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। খানিকক্ষণ মেহমানদারির পর সুলতান জালালুদ্দীনের উদ্দেশে তার জবাবি চিঠি প্রদান করে তাহেরকে বিদায় জানান।

সুলতান জালালুদ্দীনের নামে আলাউদ্দীন কায়কোবাদের চিঠি

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ তায়ালা যেহেতু সমুজ্জ্বল গৌরবমালা ও সমুন্নত গুণাবলি শাহরিয়ারে বনি আদম (বনি আদমের বাদশাহ), সিকান্দারে দুওম (দ্বিতীয় আলেকজান্ডার), সাহেবে কুরআন, আলাউল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন সুলতান জালালুদ্দীনের সত্তায় গচ্ছিত রেখেছেন, তার উপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, বিশুদ্ধ দলিলসহ তার ভেতর দান করেছেন মূল্যবান সূক্ষ্মদর্শিতা, এজন্য 'মহান আল্লাহ ইচ্ছে করলে এক ব্যক্তির মধ্যেই পুরো পৃথিবীর সমস্ত মহৎ গুণের সন্নিবেশ ঘটাতে পারেন। এটা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু না।' অতএব এই রীতি অনুসারে আল্লাহ তায়ালা এ-ও চেয়েছেন যে, পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সূচনা ও আগ্রহ, যোগসূত্র তৈরির দোলা আপনার দিলেই সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ জাগিয়ে তুলেছেন। এটি নিশ্চয় আপনার মাহাত্ম্যের পরিচয়। বন্ধুত্বের যত স্তর রয়েছে, তা এবং পারস্পরিক সহানুভূতিশীলতার সমস্ত গুণের সমাহার আপনার মধ্যেই ঘটিয়েছেন। 'জগতে শ্রেষ্ঠত্ব তো সে-ই লাভ করে ওঠে, যে তার যথাযথ যোগ্য।' এই রীতি অনুসারেই আপনি আমার সাথে চিঠি আদানপ্রদান আরম্ভ করেছেন। বন্ধুত্বের গোড়াপত্তন করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছেন আপনি। আপনার চিঠি আমার জন্য অত্যন্ত গর্ব ও মর্যাদার কারণ। এই চিঠি যখন আমার

---

[৭৮] অর্থাৎ, কাজিউল কোজাত মুজিরুদ্দীন

কাছে এসে পৌঁছল, আমার ভেতর যে আনন্দ ও আগ্রহ সুপ্ত ছিল, তা যেন খলবলিয়ে উঠল। মহব্বতের উষ্ণ স্রোতে আপ্লুত হল হৃদয়। কবির ভাষায়—'যখন মাহবুবের তাঁবু আমাদের তাঁবুর কাছে এসে পড়ে, তখন অল্প একটু দূরত্বও যেন হাজার দিনের দূরত্বের মতো ক্লান্তিকর ঠেকে।'

আল্লাহ পাক জানেন, যখন থেকে অভিশপ্ত কাফেরদের থেকে প্রতিশোধগ্রহণ ও উম্মাহর হৃদয়ে প্রশান্তি আনবার জন্য একের-পর-এক অঞ্চলে উড়ে চলেছে আপনার বিজয়-কেতন, তখন থেকেই আমাদের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে বেড়ে চলেছে আপনার সাক্ষাৎলাভের উদগ্র বাসনা। বেড়ে চলেছে চিঠি আদান-প্রদানের বিপুল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আপনার অজানা থাকবার কথা না, শীত-গ্রীষ্ম সবসময়ের সফর আমাকে চতুষ্পার্শ্বে তলোয়ার-বেষ্টিত ছায়ার ভেতর দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়, শত্রুদের সাথে করতে হয় জিহাদ (তখন সুলতান আলাউদ্দীন ইউরোপিয়ান আক্রমণকারীদের মোকাবেলা করছিলেন। এই ব্যাপারটাই তিনি চিঠিতে উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলো হচ্ছে আমাদের পারস্পরিক সাযুজ্যতার নিদর্শন। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য এই বিষয়গুলোর যৌক্তিকতাই যথেষ্ট)।

দ্বিতীয়ত কথা হল—মহান আল্লাহ যখন আপনাকে আমাদের মাঝে চিঠি আদান-প্রদানের রীতি চালু করবার মর্যাদা দান করেছেন; সুতরাং পারস্পরিক সাক্ষাতের ক্ষেত্রে আপনিই প্রথম যাত্রা করুন। এর বিপরীত দুঃসাহসিকতা দেখানো আমার জন্য উপযুক্ত মনে করছি না। এখন যেহেতু সম্পর্ক গভীর ও বিস্তৃত করতে আপনি অনুমতি প্রদান করেছেন; সুতরাং আমার বিশ্বাস, ধারাবাহিক চিঠি আদান-প্রদানে আপনার কোনো বিরক্তি আসবে না।

প্রধানবিচারপতি আল্লামা তাহের এসে উপস্থিত হয়েছেন। তার মারফত বরকতময় চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। চিঠি পড়ে দারুণ আনন্দ পেয়েছি আমি। আল্লামা তাহের এখানে কিছুদিন অবস্থান করে উন্নত চিন্তা-চেতনায় জয় করে নিয়েছেন আমাদের হৃদয়জগৎ। আধ্যাত্মিকভাবে আমাদের তিনি শক্তিশালী করে তুলেছেন।

জবাব পাঠানোর জন্য আমি সেনাপতি সালাহুদ্দীনকে চিঠি লেখার সৌভাগ্য অর্জনের আদেশ দিয়েছি। সে যা-কিছুই লেখে ও বর্ণনা করে, আশা করি আপনি তাতে ভরসা রাখবেন। এটাকে আমাদেরই বক্তব্য ভাববেন। মহব্বত ও বন্ধুত্বের যে ভিত্তি আপনি স্থাপন করেছেন, ক'দিন পরপর বন্ধুসুলভ পয়গাম ও সালাম আদান-প্রদানের মাধ্যমে তা পোক্ত করে তুলবেন।

ইজ্জত ও সম্মানের ব্যাপারে যা-কিছু ধারণা করা হয়, যদি তাতে প্রবৃদ্ধি ঘটানো যায়, তা হলে আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্যও তা বাড়িয়ে দেবেন, যাতে আমি আপনার খেদমতে সর্বদা পরিব্যাপ্ত থাকি এবং পরস্পরের বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক পোক্ত করে তুলি। ওয়াস সালাম।

লিখে দিয়েছেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার জন্য তুর্কানেখাতাকে তিনি একাধিক অঞ্চলের রাজত্ব, রাজকীয় পোশাক ও সেনাবাহিনী প্রদান করবেন।

আল-মালিকুল মুয়াজ্জম জানতেন—সাধারণ মুসলিমদের জন্য এরকম যুদ্ধযাত্রা অত্যন্ত মারাত্মক। স্বয়ং সুলতান ও তার জন্যও বদনাম ও ক্ষতির কারণ। এজন্য সুলতানকে বুঝিয়ে-সমঝিয়ে ঠান্ডা করবার চেষ্টা করলেন তিনি। জবাবি চিঠিতে লিখলেন—প্রতিটি অঙ্গনে আপানাকে আমি সঙ্গ দিয়ে যাব; কিন্তু খলিফা-বিরোধী কোনো কাজে কিছু করতে পারব না। কারণ, তিনি সর্বাবস্থাতেই মুসলমানদের ইমাম।[৮৪]

মুয়াজ্জমের এই উত্তর পেয়ে স্তিমিত হয়ে আসে সুলতানের জ্বলে-ওঠা জোশ। খলিফার বিরুদ্ধে তিনি দ্বিতীয়বার আর ক্রোধ প্রকাশ করেননি।

আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের উদ্দেশ্যমালা

সুলতান জালালুদ্দীনের সঙ্গে তিনি যদিও একতাবদ্ধ হয়েছিলেন এবং সুলতানের সম্মানে ও তোষণে কোনো কমতি করেননি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন নিজের রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য। স্বীয় ভাই আল-মালিকুল আশরাফ ও আল-মালিকুল কামিলের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সুলতানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিজের পা মজবুত করে নিয়েছিলেন।[৮৫]

যথাসম্ভব, মুয়াজ্জমের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এই কারণ সুলতানের চোখ এড়ায়নি। কিন্তু, সর্বাবস্থায় একজন মিত্রের প্রয়োজন রয়েছে ভেবে মুয়াজ্জমের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বন্ধুত্বকেও গনিমত মনে করেছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীতে এই বন্ধুত্বের সাগরে যথেষ্ট ভাটা পড়ে। সুলতানের ব্যাপারে মুয়াজ্জমের ধারণা কেমন ছিল, চলুন একটি ঘটনা থেকে তা বুঝে উঠি।

একদা খেলাফতের রাজধানী বাগদাদের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে নাম না-জানা এক লোক আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের দরবারে আগমন করে। মুয়াজ্জমের সঙ্গে আলাপের এক ফাঁকে লোকটা তাকে বলে ওঠে—আপনি এই খারেজি জালালুদ্দীন খাওয়ারিজমির থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। আমি মনে করছি এটাই কল্যাণকর। বিপরীতে আপনার ভাইদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। আপনাদের মাঝে আপস-রফা করতে আমি আপনার খেদমতে এসেছি।

মুয়াজ্জম বললেন—আগে এটা বলুন যে, আমি যখন সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলব, তারপর আমার কোনো ভাই যদি আমার উপর কখনো আক্রমণ করে বসে, তা হলে কি আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন?

---

[৮৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২২/২৬২;

[৮৫] তারিখুল ইসলাম যাহাবি, ৬২/৬১৯;

বাগদাদের দূত সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলাল—হ্যাঁ, অবশ্যই!

আল-মালিকুল মুয়াজ্জম বিশ্বাস করলেন না। তিনি ধীরশান্ত গলায় বলতে লাগলেন—এই দেখুন, আমাদের কাছে খলিফা নাসিরের চিঠি এখনো আছে। দিময়াতের যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের সাথে আমরা যখন তুমুল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সাহায্য চেয়ে খলিফার কাছে আমরা পত্র পাঠিয়েছিলাম। উত্তর এসেছিল—আমি আলজেরিরার হাকিমকে বলে দিয়েছি আপনাকে সহায়তা করতে। এটুকুই; কিন্তু কোনো সেনা-সাহায্য পাঠাননি তিনি।

তারপর মুয়াজ্জম গা টানা দিয়ে খানিক আড়মোড়া ভেঙে বললেন—বাগদাদবাসী, শোনো, আমাদের ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হল এরকম—এক লোক মসজিদে নামাজের জন্য বেরোলে কুকুরের ভয়ে হাতে একটি লাঠি নিয়ে যেত। একদিন তার এক বন্ধু তাকে বলল, আপনি বড় বুজুর্গ মানুষ। এই লাঠি আপনার জন্য একটা ভারী বোঝা। এটা রেখে দিন। সঙ্গে নেওয়ার দরকার নেই। আমি আপনাকে এমন এক জিনিসের কথা বলছি, যা সাথে থাকলে আপনার আর লাঠির প্রয়োজন পড়বে না।

বুড়ো জীবন-নদীর স্রোতে চলে গেছে বহুদূর। চেহারায় আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। দুর্বল মানুষ। মুখের চামড়া কুঞ্চিত। চুল-দাড়ি সাদা। এই কুঁচকানো চামড়ার ভেতর থেকে কৌতূহলে চকচক করে ওঠে বুড়োর বয়স্ক চোখ। অধীর কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন—কী সেটা, বলো আমাকে!

শুভাকাঙ্ক্ষী বক্তা বলতে থাকে—আপনি ঘর থেকে যখন বেরোবেন, সুরা ইয়াসিন পড়ে নেবেন। দেখবেন, কুকুর আপনার কাছেধারেও ঘেঁষবে না।

তারপর কেটে গেল আরো কিছুদিন। আবার একদিন বন্ধুটি বুড়োকে সেই লাঠি-সমেত দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করল—আমি তো আপনাকে এমন এক জিনিসের কথা বলে দিয়েছিলাম, যা ব্যবহার করলে আপনার লাঠির দরকার পড়বে না।

বুড়ো ঠোঁটের কোণে একটু কুঞ্চন জাগিয়ে বললেন—মিয়া, এই লাঠি তো নিয়েছি এমন কুকুর প্রতিহত করার জন্য, যে তোমার-আমার মতো কুরআন বোঝে না।

দূতকে এই গল্প শুনিয়ে মুয়াজ্জম বললেন—দেখুন, আমার সব ভাই আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে গেছে। এজন্য আমি খিলাত রণাঙ্গনে (যা আল-মালিকুল আশরাফের এলাকা) সুলতান জালালুদ্দীনকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। আমার উপর যদি ভাই আশরাফ এসে আক্রমণ করতে চায়, তাকে সুলতান জালালুদ্দীনই কঠিনভাবে রুখে দেবেন। কিন্তু যদি ভাই আল-মালিকুল কামিল এসে আক্রমণ করে, আমি নিজেই ওর ঘাড় মটকে দেব।[৮৬]

---

[৮৬] আননুজুমুজ-জাহিরা, ৬/২৬৪;

এক নতুন ফেতনা ও এর প্রতিকার

সুলতান জালালুদ্দীনের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে বিরামহীনভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলছিল খলিফা নাসিরের চক্রান্তধর্মী মেজাজ। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য আমির আইগান তাইসিকে হাতিয়ার বানিয়েছিলেন তিনি। ইতিপূর্বে আইগান তাইসিকে খাওয়ারিজমি দরবারের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য গণ্য করা হতো। সে ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের ভগ্নীপতি ও শাহজাদা গিয়াসুদ্দীনের মামা।

সুলতান জালালুদ্দীন যখন হিন্দুস্থানে ছিলেন, ইরাকে আইগান তাইসি ভাগ্নে গিয়াসুদ্দীনের পৃষ্ঠপোষক হয়ে তার রাজ্য গড়ার কাজে সহযোগিতা করছিল। কিন্তু অল্প ক'দিনের মধ্যেই মামা-ভাগ্নের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে ওঠে। আইগান তাইসি নিজেকে স্বাধীন শাসক দাবি করে বসে। গিয়াসুদ্দীন ও তার মাঝে যুদ্ধও সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে সামগ্রিকভাবে গিয়াসুদ্দীনের পাল্লাই ভারী ছিল।

সুলতান জালালুদ্দীন সম্প্রতি ইরান ও ইরাক জয় করেছেন। ওদিকে আজারবাইজানে নিজের বাহিনী গঠন করছে আইগান তাইসি। তার অধীনে জমায়েত হয়েছে ৫ হাজার যোদ্ধা।

তখন শীতকাল।

নাম না-জানা পাহাড়ি গাছগাছালির পাতারা হলুদ হয়ে সবার অলক্ষ্যে চিরতরে ঝরে যাচ্ছে। চরাচর অন্য মৌসুমের তুলনায় খানিকটা শান্ত। ঘাসবন শুকোবার উপক্রম। আমির আইগান তাইসি আর্রান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছে। খলিফা নাসির তার কাছে চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে হামাদান-সহ জালালুদ্দীনের বর্তমান দখলীকৃত সমস্ত অঞ্চলে আক্রমণ চালাবার জন্য তাকে উসকে দিলেন। আক্রমণ সফল হলে এই এলাকাগুলোর স্বাধীন শাসক বানাবেন তাকে—চিঠিতে এ মর্মেও ওয়াদা করলেন খলিফা নাসির।

খলিফার এই গোপন পৃষ্ঠপোষকতায় সাহসী হয়ে ওঠে আমির আইগান তাইসি। দ্রুততার সাথে স্বীয় বাহিনী নিয়ে হামাদান-অভিমুখে যাত্রা করে সে। সঙ্গে আছে আজারবাইজান থেকে লুট করে আনা মহিষের পাল ও গনিমতের ভান্ডার।

ওদিকে আইগানের এই যুদ্ধযাত্রার খবর পেয়ে গেলেন সুলতান জালালুদ্দীন। তিনিও বিজলির বেগে এগোতে লাগলেন। হামাদানের উপকণ্ঠে এসে পর্বতশ্রেণির ভেতর আইগান তাইসিকে ঘিরে ফেললেন তিনি। সুলতান সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এঁটেছিলেন; বিনা রক্তপাতে নির্মূল করতে চেষ্টা করবেন এই ফেতনা। শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টায় তিনি সফলও হয়েছিলেন।

কীভাবে সফল হয়েছিলেন, সে কথা বলছি। সুলতান তখন রাতের আঁধারে চুপিচুপি আইগান তাইসির তাঁবুর কাছে পৌঁছলেন। তাঁবুর চতুর্দিকে আজারবাইজান ও আর্রান সাগর থেকে লুণ্ঠনকৃত জিনিসপত্র স্তূপ করে রাখা। অন্ধকারে দেখতে

বড় অদ্ভুত লাগছে। অসংখ্য বাহনজন্তু ও মালবাহী পশু অন্ধকারের ভেতর একাকী আশপাশে হাঁটছে। দূরে কোথাও যাচ্ছে না। সুলতান তাঁবু ঘেরাও করে এইসব জিনিসপত্র কবজা করে ফেললেন।

আইগান তাইসি পুরো রাতের মিষ্টি একটা ঘুম ভেঙে জেগে উঠল ভোরবেলা। বড় করে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল সে। খানিক চোখ রগড়ে যখন সামনের দিকে তাকাল, সেনাছাউনির আশপাশের দৃশ্য দেখে পুরোপুরি হতবাক হয়ে গেল। হঠাৎ তার ঘুমমাখানো দৃষ্টি খানিক দূরেই সুলতান জালালুদ্দীনের টাঙানো রাজকীয় ছাতার উপর গিয়ে পড়ে। সুলতানকে চিনতে পেরে সে খুবই বিস্মিত হয়। এতক্ষণ ধরে তার ভেতর এই ধারণা কাজ করছিল যে, সুলতান এখান থেকে বহু মাইল দূরের দাকুকা শহর অবরোধে নিবিষ্ট রয়েছেন; সুলতান জানেন না যে, আমি তার বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু করেছি।

যা হোক, এখন ক্ষমাপ্রার্থনাই হয়ে ওঠে একমাত্র মুক্তির উপায়। আইগান তার বিবিকে (সুলতানের বোন) সুলতানের কাছে পাঠিয়ে প্রাণভিক্ষার আবেদন করে। সুলতান অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতিময় সম্ভাষণে বোনকে স্বাগত জানান। ভগ্নীপতিকে প্রদান করেন জীবনের নিরাপত্তা। আইগানের সৈনিকদের নিজের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আইগানের সেবা ও সুরক্ষার জন্য একটি দল সিপাহিকে তার কাছে রেখে যান তিনি।[৮৭]

তিবরিজ অভিযান

সুলতান জালালুদ্দীনের পরবর্তী টার্গেট ছিল আজারবাইজান। ওখানকার হাকিম উজবুক মুজাফফর উদ্দীন ছিল প্রবৃত্তিপূজারি, বদকার। তাতার-জাতির মিত্র ছিল সে। কয়েক বছর আগে তাতাররা যখন মার্ভ আক্রমণ করেছিল, ওখান থেকে পালিয়ে ৬ হাজার পরাজিত খাওয়ারিজমি সিপাহি এসে আজারবাইজানের রাজধানী তিবরিজে এসে উঠেছিল। তাতাররা যখন উজবুক মুজাফফরের কাছে এই খাওয়ারিজমি সেনাদের গ্রেফতারের দাবি জানাল, সে আগপিছ না-ভেবেই কতক খাওয়ারিজমির মস্তক কেটে তাতারদের কাছে পাঠিয়ে দিল। বাকি সেনাদের প্রেরণ করল গ্রেফতার করে।

উজবুকের এই কঠিন অপরাধে সুলতান জালালুদ্দীন অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন। তাকে তার ঘৃণিত কর্মের শাস্তি প্রদান করতে চাচ্ছিলেন। তা ছাড়া সুলতান এই সংবাদও পেয়েছিলেন যে, উজবুক ও খ্রিষ্টানরা একজোট হয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

---

[৮৭] ইবনুল আসির, ৭/৬১৫;

মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স
স্থাপিত: ২০২০ইং

সুলতানের খোদাপ্রদত্ত—ভাবগাম্ভীর্য, উন্নত সাহসিকতা, হিম্মত ও শক্তিমত্তা দেখে বেগম বিনতে তুগরুল খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। মনে-মনে সুলতানের সঙ্গে বিয়ের স্বপ্ন বুনতে থাকেন তিনি।[৯৪] তারপর তিবরিজের প্রধানবিচারপতি ইজ্জুদ্দীন কাজবিনির কাছে ফসখে নিকাহ (পূর্বের বিবাহবিচ্ছেদ) দাবি করে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেন।[৯৫] তারপর গোপনে সুলতান জালালুদ্দীনের নিকট পয়গাম পাঠান—স্বামীর পক্ষ থেকে আমার তালাক হয়ে গেছে। এতে ফয়সালা দিয়েছেন বাগদাদ ও শামের আলেমগণ। আপনার সাথে সন্ধিচুক্তি করে শহর সোপর্দ করে দিতে প্রস্তুত আছি আমি। তবে শর্ত হল—এর আগে আপনি আমাকে সামানপত্র-সহ আমার আপন জায়গিরে ফিরে যেতে দেবেন। শহর দখলের পর আমার সেই জায়গিরে গিয়ে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন।

সুলতান বিনতে তুগরুলের এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করে নিলেন। তবে তিনি শর্ত দিলেন, উজবুক যে বিনতে তুগরুলকে তালাক দিয়েছে, আগে তার প্রমাণ দেখাতে হবে। ফলে সেই মোতাবেক বিনতে তুগরুল তালাকের সাক্ষী পাঠিয়ে দিলেন। সাক্ষী এসে সামনা-সামনি হলফ করে বলল, বেগম বিনতে তুগরুলের উপর তালাক পতিত হয়েছে। উজবুকের সঙ্গে তার যে বিবাহ-বন্ধন ছিল, তা খতম হয়ে গেছে।

ফলে সুলতান বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করে নিদর্শনস্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন একটি মূল্যবান আংটি।[৯৬] বেগম বিনতে তুগরুল খুশিতে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে আমিরদের একত্র করে সুলতানের বিপুল শক্তিমত্তা ও প্রতিশোধ-স্পৃহার ভয় দেখালেন। তাদের রাজি করালেন যে, কিছু শর্ত অনুসারে সুলতানের সাথে আপনারা আপস করে ফেলুন।

রাজ্যের আমিরগণ হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন এই প্রস্তাব। শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে কাজি ইজ্জুদ্দীন কাজবিনিকে তারা সুলতানের দরবারে পাঠান।[৯৭]

এখানে লক্ষণীয় হল—সুলতান জালালুদ্দীন উজবুক মুজাফফরকে খুব ঘৃণা করতেন। তার প্রতি তিনি প্রচণ্ড রাগ পুষে রেখেছিলেন। কারণ, তাতার-

---

[৯৪] রওজাতুস সফা, ৪/৮৩০;

[৯৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ২০৭; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১৫৭; রওজাতুস সফা, ৪/৮৩০;

[৯৬] জাহাঁকুশা, ২/১৫৬;

[৯৭] জাহাঁকুশা, ২/১৫৬;

আগ্রাসনের শুরুর দিকে যখন পশ্চিমা তাতারদের সৈন্যদল সুবেদাই ও জুবি নৈয়ানের নেতৃত্বে তিবরিজের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সে-সময় পরাজিত খাওয়ারিজমি বাহিনীর কিছু সেপাই তিবরিজে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাতাররা যখন এখানে এসে পৌঁছল, উজবুক তখন তৎক্ষণাৎ তাতারদের ট্যাক্স প্রদান করতে রাজি হয়ে যায়। তার উপর তাদের খুশি করবার জন্য তিবরিজে আশ্রয়গ্রহণকারী খাওয়ারিজমি সৈন্যদের মস্তক কেটে তাতারদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

পরবর্তীকালে সুলতান এই জুলুম কখনোই ভুলতে পারেননি। খানিক আগের অবরোধের সময় বৈঠকে বারবার তিনি বলে উঠছিলেন—এরাই তিবরিজের সেই বাসিন্দা, সেদিন যারা আমাদের মুসলিম ভাইদের মস্তক কেটে তাতারদের কাছে হাদিয়া পাঠিয়েছিল।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সুলতানের ক্রোধের বিষয়টা জানতে পেরেছিল। এজন্য ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা সুলতানের সামনে এসে উপস্থিত হল। অস্ফুট স্বরে সুলতানের কাছে তারা কামনা করল জীবনের নিরাপত্তা। সুলতান তখন খাওয়ারিজমি সিপাহিদের সাথে তাদের পূর্বের সেই জুলুমের কথা তুললেন।

প্রতিনিধিদল ওজরখাহি করে ভয়ে ও বিনয়ে ভেঙে-পড়া কণ্ঠে বলল—হুজুর, এ ছিল উজবুকের নিজের কাণ্ড। এই অপরাধে আমাদের কোনো অংশীদারত্ব ছিল না। এই ঘৃণিত কর্ম থেকে উজবুককে থামাবার মতো আমাদের কোনো শক্তি ছিল না তখন।

সুলতান এদের ওজর কবুল করে নিলেন। প্রতিনিধিদলের আবেদন অনুযায়ী পুরো শহরবাসীর জান-মালের নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তদুপরি বেগম বিনতে তুগরুলকে অনুমতি দিলেন তার নিজের জায়গিরে যাবার।[৯৮]

বিজয়ীবেশে তিবরিজে প্রবেশ

৬২২ হিজরির ১৭ রজব জুমার দিন (২৫ জুলাই, ১২২৫) সকালে তিবরিজ শহরের ফটক খুলে দেওয়া হল।[৯৯] আমির-উমারা, শহরের নেতৃবৃন্দ ও রাজ-সদস্যদের প্রতিনিধিদল সুলতানের খেদমতে এসে সম্মানপূর্ণ অভিবাদন জানাতে লাগল। সুলতান সহাস্যবদনে যথাসম্ভব এক-এক করে তাদের সঙ্গে কুশল-বিনিময় করতে লাগলেন।

শহরে প্রবেশের পর তিনি আদেশ দিলেন—আজ আমার কাছে আসতে কাউকে বাধা দিয়ো না কেউ। ফলে আমজনতা এসে সুলতানের দরবারের

---

[৯৮] ইবনুল আসির, ৭/৬১৬;

[৯৯] ইবনুল আসির, ৭/৬১৬;

তৃতীয় অধ্যায়

জর্জিয়ার বিজয়সমূহ

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

এদের সাথে যুদ্ধ করো! আল্লাহ তায়ালা এদেরকে তোমাদের হাতে কঠিন শাস্তি দেবেন। এদের লাঞ্ছিত করবেন এবং এদের উপর তোমাদের দান করবেন বিজয়; বহু মুসলমানের অন্তরে দেবেন প্রশান্তির শীতল প্রলেপ।[১০৭]

এক নয়া চ্যালেঞ্জ

বোধ করে উঠি যে, সুলতান জালালুদ্দীনের অস্তিত্ব জিহাদের আগুন এবং 'কেবল আল্লাহর জন্যই বাঁচা-মরা'র খামিরা থেকে তৈরি করা হয়েছিল। জিহাদের চেতনাস্রোত তার শিরায়-উপশিরায় এমনভাবে ঢুকে গিয়েছিল যে, তার প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি পদক্ষেপে এই একই জজবা ঠিকরে ফুটত। তাতারদের সয়লাবের মুখে শক্ত এক দেয়াল গড়ে তোলার পরও হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি তিনি। খাপের ভেতর তখনো ছটফট করছিল তার তলোয়ার; যেন-বা ইসলামের শত্রুদের রক্ত-সমুদ্রে ডুবসাঁতার না দেওয়া পর্যন্ত এর স্বস্তি নেই।

যদিও তখন পর্যন্ত সুলতানের এতটুকু শক্তি গড়ে ওঠেনি যে, সমস্ত ইসলামি শহর তাতারদের থাবার ভেতর থেকে ছাড়িয়ে এই পশুদের গোবি মরুভূমি পর্যন্ত হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন, তবু সুলতানের একটি বড় সফলতা ছিল যে—তিনি লাভ করে উঠেছিলেন প্রতিপক্ষের আক্রমণ রোধ করবার মতো একটা সক্ষমতা। ফলে তাতাররা তাকে ভয় পেয়ে পরিত্যাগ করেছিল নিজেদের অগ্রাভিযানের ইচ্ছা।

এই মিশন থেকে সাময়িকের জন্য কোনোভাবে অবসর হতেই সুলতানের চোখে পড়ল—আত্মিক প্রশান্তির উপাদান এখন উত্তর-পশ্চিমের এলাকায়। জর্জিয়ার শয়তান খ্রিষ্টানদের ফেতনা বিগত এক শতাব্দীর অধিক সময় ধরে ওই এলাকার সীমান্ত শহরগুলোতে মুসলিমদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সুলতানের জন্য এটা ছিল এক শক্ত চ্যালেঞ্জ। তাতারদের শক্তি নিশ্চিহ্ন করবার আগেই এই শক্তিশালী শত্রুর সাথে পাঙ্গা নেওয়ার ব্যাপারটা বাহ্যত যদিও অনুপকারী বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু সুলতান এদের নির্যাতনের

---

[১০৭] সুরা তাওবা, আয়াত ১৪

ফিরিস্তি শুনে-শুনে অনেকদিন যাবৎ উপযুক্ত একটা মওকা খুঁজছিলেন। এবার জর্জিয়ানদের কবল থেকে মুসলিমদের রেহাই দিতে একটুও বিলম্ব করা যায় না। সুলতানের সহ্যের বাঁধ একটু-একটু করে ভেঙে চলেছে।

মূলত জর্জিয়ানদের নির্যাতনের ধরন ও মাত্রা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, এদের ঘাড় মটকে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলেন না সুলতান। তাতাররা মুসলিম উম্মাহর ভেতর গণহত্যা চালাবার পর মুসলমানরা এতটাই ভগ্নচিত্ত, পরাজিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল; মনে হচ্ছিল—এই সুযোগে জর্জিয়ানরা অবশিষ্ট মুসলিমবিশ্ব গ্রাস করে নেবে। তারা নিকটবর্তী এলাকাগুলো দখল করার পর সর্বপ্রথম খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ-জয়ের সংকল্প করেছিল।[১০৮] কিন্তু তাদের মাঝপথে ছিল বাধা সৃষ্টিকারী এক ভারী জগদ্দল—সুলতান জালালুদ্দীন। এই জগদ্দল না হটিয়ে তারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারছিল না।

জর্জিয়ান কারা?

জর্জিয়া আজারবাইজানের উত্তর-সীমান্তসংলগ্ন এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য। কাফকাজ অঞ্চলের সুউচ্চ পর্বতমালার ভেতর অবস্থিত এই রাজ্যে ছিল আর্মেনীয় খ্রিষ্টানদের একটি শাখার শাসন। এদেরকে বলা হতো জর্জিয়ান। এখানকার রাজধানী ছিল তিফলিস। তিফলিস এক সবুজ-শ্যামল ঝকঝকে শহর। সেখানে ছিল নয়নজুড়ানো সব চারণভূমি। পার্শ্ববর্তী পর্বতশ্রেণি থেকে গুনগুন করে বয়ে চলে স্বচ্ছ স্নিগ্ধ জলের অসংখ্য ঝরনা। এজন্য সর্বকালেই এ রাজ্য ছিল সুপ্রসিদ্ধ।[১০৯]

জর্জিয়ানরা ছিল উগ্রবাদী খ্রিষ্টান; পাশাপাশি দুর্ধর্ষ যোদ্ধাজাতি। কোনো বহিঃশত্রুই জর্জিয়ানদের উপর আক্রমণ করে তাদের দাবিয়ে দিতে পারেনি কখনো। মুসলিম-বিজেতারা বারবার সৈন্যদল প্রেরণ করেও এই জাতিকে অনুগত করতে পারেননি।

৫১৫ হিজরিতে জর্জিয়ানরা আক্রমণ চালিয়ে সুলতান তুগরুল সেলজুকির থেকে তিফলিস ছিনিয়ে নিয়ে তাদের শক্তি মজবুত করে তোলে। নির্বিঘ্নে ইসলামি অঞ্চলগুলোতে তারা রাজত্ব চালাতে থাকে। আজারবাইজান, দরবন্দ শিরওয়ান, খিলাত ও আরজানুররোমের মুসলিম শাসকরা তাদের করদাতা হিসাবে গণ্য হতে থাকে। এ-সমস্ত এলাকায় নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালানো ছিল জর্জিয়ানদের নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই জালেমদের ভয়ে এখানকার শাসক ও জনসাধারণ সেঁধিয়ে থাকত নিজেদের ভেতর। কিছু কিছু মুসলিম শাসক জর্জিয়ান শাসকের প্রদত্ত শাহি পোশাক পরে প্রকাশ করত নিজেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ গোলামি। এমনকি, মুসলিম

---

[১০৮] জাহাঁকুশা, ২/১৫৮;

[১০৯] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৫৮

পারে কিনা[১১৪] (একথা বলে জর্জিয়ানদের উদ্দেশ্য ছিল, তোমার পিতাকে পরাজিত করেছে যে শক্তি, আমরা যখন তাকেই ভয় পাইনি, তা হলে তুমি কোন ছাড়)!

সুলতানের প্রজ্ঞাদীপ্ত পরিকল্পনা

সুলতানের জর্জিয়া আক্রমণের বিস্তারিত কাহিনি পড়বার আগে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, সাধারণ অবস্থায় সুলতান জালালুদ্দীনের অভ্যাস ও পরিকল্পনা থাকত দুশমনের উপর আচমকা হামলা করে বসা। একজন চতুর ও বিচক্ষণ সেনাপতির বৈশিষ্ট্য মূলত এটাই। কিন্তু এবার স্পষ্টভাবে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিলেন সুলতান। আশপাশের সবখানে তার আক্রমণের খবর ছড়িয়ে দেবার পর এই অভিযানে নামলেন তিনি। বাহ্যত এতে কোনো কল্যাণ দেখতে পাচ্ছিল না কেউ। কারণ, এতে দুশমনের বিপুল প্রস্তুতি নেবার সুযোগ মিলে গিয়েছিল।

সুলতানের এরকম প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে অভিযানে নামবার একটি কারণ একটু আগেই আমরা বলে এসেছি। প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা যেন তার এই সৈন্য প্রেরণের ব্যাপারটাকে নিজেদের বিরুদ্ধে ভেবে না বসে। এ ছাড়া আরেকটি কল্যাণ ছিল লক্ষণীয়। তা হল—জর্জিয়ানরা নিজেদের শক্তিমত্তা নিয়ে ভীষণ অহংকারী ও উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। সুলতান তাদের শক্তির এই দম্ভ ভেঙে দেবার জন্য প্রকাশ্যেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। পরে যাতে তারা বলতে না পারে যে, আমরা নিজেদের অজ্ঞাতে আক্রমণের মুখে পড়ে পরাজিত হয়েছি। নয়তো তোমরা কখনোই পেরে উঠতে না!

সুলতান যদি যুদ্ধের ঘোষণা না দিয়েও আক্রমণ চালাতেন, তবু জর্জিয়ানদের যুদ্ধপ্রস্তুতি কম হতো না। কারণ, তারা আগে থেকেই আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল।

আরেকটি পয়েন্টে আমাদের লক্ষ রাখা উচিত—সুলতান এবারকার বদলে-যাওয়া দৃশ্যপটে অধিকাংশ যুদ্ধে হালকা-পাতলা কিন্তু দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে অভিযান সম্পন্ন করছিলেন। এর কারণ ছিল দুটো। প্রথমত, তাতারদের আক্রমণে মুসলিমবিশ্বের অস্তিত্বে যেই প্রকট আঘাত লেগেছিল, তা মুসলিমদের জনশক্তি অনেক কমিয়ে দিয়েছিল। এহেন অবস্থায় বড় কোনো বাহিনী বিন্যস্ত করে-ওঠা সুলতানের পক্ষে ছিল অসম্ভব।

---

[১১৪] ইবনুল আসির, ৭/৬১৭; জর্জিয়ানদের এই জবাব বাচালতা ছাড়া কিছু ছিল না। কারণ, তাতারদের সাথে যুদ্ধ বাধলে জর্জিয়ানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। যুদ্ধে তাতারদের পাল্লাই ছিল ভারী।

কারবির ডানে-বামে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ কিছু পাহাড়। সেই পাহাড়ের ঢালুতে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে জর্জিয়ানরা। তাদের জন্য এক দুর্জয় দুর্গের কাজ দিচ্ছে পাহাড়ের ঢালু। চূড়ার কাছে দাঁড়ানো এই শত্রুদের নিচে নামবার অপেক্ষা করছে সুলতানের সৈন্যরা। কিন্তু জর্জিয়ানরা প্রাকৃতিক এই ঘাঁটি থেকে হটে যেতে প্রস্তুত না। তাদের ধারণা, মুসলিমরা এই ভয়ংকর চড়াই ডিঙোবার সাহস করে উঠবে না। তারা নেবে না সেই ঝুঁকি। আর ঝুঁকি যদি নেয়ও, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।

সারাদিন কেটে গেল। সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে। ধীরে-ধীরে অন্ধকার নামছে। একসময় চারপাশ তলিয়ে গেল এই অন্ধকারের কালো জলে। সুলতান সৈন্যদলের সেন্টারের পেছনে ক্ষুদ্র তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাচ্ছেন। দু-দিকের সেপাইরাই পাহারায় থেকে রাত কাটিয়ে দিল। পরদিন জর্জিয়ানদের সেই একই স্থানে জমে থাকতে দেখে সুলতান জালালুদ্দীন সেনাপতিদের বললেন—দুশমনের উদ্দেশ্য কেবল আমাদের সময় নষ্ট করা। এখন আমাদের পরিকল্পনা হল—আমরা কয়েকদিক থেকে পাহাড়ে চড়ে উঠব। যদি দুশমন আমাদের উপর হামলা করে বসে, সঙ্গে সঙ্গে পিছপা হয়ে নিচে নেমে আসতে থাকব। নিচ থেকে তাদের দিকে একসঙ্গে নিক্ষেপ করতে থাকব ঝাঁকে ঝাঁকে তির।

সুলতান পরিকল্পনার খুঁটিনাটি সেনাপতিদের বোঝানোর পর নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে তাদের পাহাড়ে উঠবার ইশারা করলেন। প্রথমে অভিযানে নামল বাম বাহুর সিপাহিরা। তাদের বিভিন্ন দল আমির আওর খান, শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন ও আমির আইগান তাইসির নেতৃত্বে সামনে বাড়তে লাগল। কিন্তু ডান বাহু সুলতানের ঘোষণা পাওয়ার পরও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল। তাদের পদযুগলে যেন রাজ্যের পিছুটান। কিছুতেই সামনে এগোতে চাচ্ছিল না। শেষমেশ তারা এই টানাটানি করতে করতে উপত্যকাতেই থেমে রইল। উপরে উঠতে-থাকা জানবাজরা হঠাৎ নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে—উপত্যকায় আটকে আছে দক্ষিণ বাহু। ফলে তারা ভাবে—হয়তো কোনো কল্যাণের জন্যই ওখানে থেমে আছে ওরা। তাই উদ্দীপ্ত মনে পাহাড় বেয়ে তারা ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে। কিছুক্ষণ পরপর অনতিক্রম্য ঢালু, উঁচু-উঁচু শক্ত পাথর, কখনো-বা চিকন পাহাড়ি পথ। তারা নারায়ে তাকবিরের ধ্বনি উচ্চকিত করতে করতে, রণসঙ্গীত পড়তে পড়তে হিড়হিড় করে নিজেদের টেনে নিয়ে যেতে থাকে উচ্চতায়।

জর্জিয়ানদের সরদার শালুহ এই সময়টার অপেক্ষাতেই ছিল। এই ভয়ংকর চড়াইগুলোতে সুলতানের সিপাহিদের মুহূর্তখানিকের ভেতর নিচে নামতে বাধ্য করতে পারত সে। সে এলোপাথাড়ি আক্রমণের সংকল্প করল। দ্বিতীয় সরদার ইওয়ানি তাতে বাধা দিতে গিয়ে বলল—আমাদেরও মুসলিমদের মতো সেন্টার. ডান ও বাম বাহু—এভাবে বাহিনীকে বিভক্ত করে আক্রমণে নামা উচিত।

শালুহ দাম্ভিক স্বরে জবাব দিল—এই তুচ্ছ দুশমনের সাথে লড়াইয়ের জন্য এসবের প্রয়োজন নেই। এদের নিশ্চিহ্ন করবার জন্য আমি একলাই যথেষ্ট। এ কথা বলেই সে তার অধীনস্থ ৭ হাজার সিপাহি নিয়ে সুলতানের বাহিনীর বাম বাহুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই বাহু পৌঁছে গিয়েছিল চূড়ার কাছাকাছি। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী বিস্ময়কর বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করল। কোনোভাবেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেদের পা ফসকে যেতে দিল না। ফলে পাহাড়ের ওই সুউচ্চ চূড়াতেই জমে উঠল এক ভীতিকর যুদ্ধ।

এর ভেতর সুলতানের কমান্ডে সেন্টারের বাহিনীও উপরে চড়তে শুরু করেছে। তা দেখে অবশিষ্ট জর্জিয়ান সিপাহিরা বন্যার স্রোতধারার মতো ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে ইসলামি বাহিনীর একদম সামনা-সামনি এসে গেল, যাতে পথেই এদের থামিয়ে দিয়ে আক্রমণের আঘাতে একদম নিচে নিয়ে ফেলা যায়।

তারা সুলতানকে এক অনভিজ্ঞ ও বেকুব ভেবে নিজেদের চালাকি ও শক্তি নিয়ে নর্তন-কুর্দন শুরু করে দিয়েছিল। তলোয়ার খাপমুক্ত করে তারা প্রবলবেগে নিচে অবতরণ করতে লাগল।[১২০]

সুলতানের চাল

দুশমন হুড়মুড় করে কাছাকাছি আসছে দেখে ঊর্ধ্বগামী সৈন্যদের ইশারায় থামতে বললেন সুলতান। জর্জিয়ানরা তখন দেখল, ইসলামি বাহিনী ভীষণ ভয়াবহ একটি জায়গায় আটকে গেছে। তাই তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে তারা নিচে নামতে লাগল। কিন্তু দুপক্ষের তরবারি যুদ্ধমত্ত হয়ে ওঠার আগেই সুলতান আদেশ দিলেন—শোনো, এবার নিচে নামো সবাই।

সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদলের সেনাপতিরা নিজ নিজ সৈন্যদের নিয়ে হুড়োহুড়ি করে একজন অন্যজনের মাথায় পাড়া দিতে দিতে অবতরণ করতে লাগল। সুলতানের বাহিনীকে এমন হয়রান হয়ে ভাগতে দেখে জর্জিয়ানদের দাম্ভিকতায় দ্বিগুণ প্রবৃদ্ধি ঘটল। দাঁতে দাঁত পিষে, হইহুল্লোড় করতে করতে তারাও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মুসলিমদের পেছনে ছুট লাগাল। জর্জিয়ানদের পুরো বাহিনী নিচে খোলা ময়দানে নেমে-আসা পর্যন্ত পিছু হটতে থাকল মুসলিমবাহিনী।[১২১]

সুলতান যখন বুঝলেন—পুরো জর্জিয়ান বাহিনী তাদের প্রতিরোধ-ক্ষেত্র ছেড়ে এবার বাইরে এসে গেছে, তখন তিনি বাহিনী সুবিন্যস্ত করে পেছন ঘুরে

---

[১২০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৯৮, ১৯৯; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭০; তারিখুল ইসলাম যাহাবি, ৬৩/৬২৮; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৫৮;

[১২১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৯৯; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৫৮; ইবনে খালদুন, ৫/১২৫;

আক্রমণ চালালেন। উপর থেকে জর্জিয়ানরা যেন বাতাসের ঘোড়ায় চেপে নেমে আসছিল। এইবার এই অকস্মাৎ অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। কিন্তু মোকাবেলা ব্যতীত তখন কোনো উপায়ও ছিল না। তাই শুরু হল পালটাপালটি আক্রমণ।

ক্রুশের ধারক জর্জিয়ান বীর আর আল্লাহর বান্দা মুসলিম বাহাদুররা একে অন্যকে ঠেকিয়ে রাখতে যুদ্ধে মেতে উঠল। আহতদের গা মরিচের মতো জ্বলতে লাগল। সেই ব্যথায় তাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে কেয়ামতময় হয়ে উঠল রণাঙ্গন। শক্ত ঢালের গায়ে বাড়ি খেয়ে ভেঙে-ভেঙে নিচে পড়তে লাগল অসংখ্য তির ও বর্শার ফলা। গরম খুনের স্রোতধারায় জমিন লাল হয়ে গেল।

সুলতান এই সময় একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে পাহাড় ও উপত্যকায় ছড়িয়ে-পড়া বাহিনীকে পরিচালনা করছেন। ত্রিত্ববাদীদের মোকাবেলায় তাওহিদের পতাকাবাহী সৈনিকেরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লড়ে যাচ্ছে। পরিশেষে আল্লাহর সাহায্য তার আঁচল পেতে দিয়ে ইসলামি বাহিনীকে কোলে তুলে নিল।

জর্জিয়ানদের দ্বিতীয় সরদার ইওয়ানি চূড়ায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। সে ওখান থেকে সিপাহিদের ডেকে বলল—শালুহ পরাজিত হয়ে গেছে। এখন আমার অধীনেই আসো!

এই বলেই সে এই যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বাঁচতে এক সংকীর্ণ ঘাঁটির দিকে দৌড় লাগাল। সিপাহিদের একটা বড় দলও ছুটল তার পেছন-পেছন। ময়দানে অসংখ্য লাশ ছেড়ে পাহাড়ি গিরিপথের দিকে ভাগল সবাই। বেহুঁশের মতো ছুটতে গিয়ে তাদের অনেকে উলটে গভীর খাদে পড়ে ধ্বংস হল। মুসলমান সিপাহিরাও পলায়নপর দুশমনকে ধাওয়া করে পর্বতশ্রেণির ভেতর ঢুকে পড়ল। কিছু জর্জিয়ান কারবি ঘাঁটির সংকীর্ণ ও প্যাঁচানো রাস্তায় অবস্থিত গুহায় ও গভীর উপত্যকায় গিয়ে লুকোল।[১২২] সুলতানের বাহিনী ধরে-ধরে এদের হত্যা করে ফেলল।

আবু শামার বর্ণনা মোতাবেক, এদের নিহতের সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার।[১২৩] বলা হয়—দুশমনের অধিকাংশ লোকই সেদিন মারা গিয়েছিল। সুলতান বন্দি ও বহু নিহতের কর্তিত মস্তক তাজুদ্দীন কালিজের নেতৃত্বে তিবরিজে পাঠিয়ে দিলেন। বিজয়ের পর সুলতানের তাঁবু যুদ্ধক্ষেত্রের সাথেই স্থাপন করে দেওয়া হল। কারণ, উপত্যকা ভরে ছিল দুশমনের লাশে, ফলে তার সাথে যে-ই সাক্ষাৎ করতে আসছিল, ময়দানের লাশ মাড়িয়েই আসতে হচ্ছিল।

---

[১২২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৯৯; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭০; তারিখুল ইসলাম যাহাবি, ৬৩/৬২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৫৯;

[১২৩] আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া, ৭/১২৪; আবু শামার সূত্রে বর্ণিত। ইবনুল আসির এই সংখ্যা ২০ হাজার বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রহরীকে দিয়ে বলালেন—আমি খুব ভালো করে জানি, যুদ্ধের সময় তোমরা সংকীর্ণমনস্কতার পরিচয় দিয়েছ। তোমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে জর্জিয়ানরা যদি তোমাদের উপর হামলা করে, তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। এবার যখন মহান আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেছেন, আমি তোমাদের সেই ত্রুটি ক্ষমা করছি। কিন্তু শর্ত হল—আমি চলে গেলে তোমরা এখানে অবস্থান করে খুব ঝটপট উপর্যুপরি আক্রমণ করে জর্জিয়ানদের ঠিকানা উজাড় করে দিবে।

আমিরগণ প্রতিশ্রুতি দিল। সুলতান হৃষ্টচিত্তে ফেরার পথে পা বাড়ালেন।[১২৯]

তিবরিজে প্রত্যাবর্তন

সুলতান ছোট-ছোট কয়েকটি বাহিনী নিয়ে অতি দ্রুত তিবরিজ পৌঁছে গেলেন। এবং উজিরে আজমের কথা অনুসারে বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করে ফেললেন। সেই বিদ্রোহীদের ভেতর তিবরিজের হাকিম নিজামুদ্দীন তাগরাই ও তার চাচা শামসুদ্দীন তাগরাইও ছিল। সুলতান তিবরিজের হাকিমকে হত্যা করলেন, অন্যান্য অপরাধীকে নিক্ষেপ করলেন কয়েদখানায়।[১৩০]

আন-নাসাবির বক্তব্য অনুযায়ী এই ঘটনায় উজিরে আজম মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে নিরপরাধ লোকদের শাস্তি দিয়েছিল। এই বাস্তবতার মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিল অনেকদিন পরে।[১৩১]

মাহে রমজানের কর্মব্যস্ততা

সুলতান রমজান মাস তিবরিজে কাটালেন। পুরো মাসজুড়ে আলেম, ফকিহ ও ওয়ায়েজদের বয়ানের মাহফিল চালু ছিল জায়গায় জায়গায়। সুলতান নিজস্ব লোকজন নিয়ে খুব গুরুত্বের সাথে সেসবে যেতেন। এ-সমস্ত মাহফিলে যে আলেমগণ প্রকাশ্যে হকের বাণী বুলন্দ করতেন, অসৎকাজ থেকে বাধা দিতেন, তাদের সাহস আরো বাড়িয়ে তুলতেন সুলতান। কিছু খতিব সুলতানকে খুশি করবার জন্য নিজেদের খুতবায় তার প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করে তাকে আসমান-জমিনের শ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত করতে চেয়েছিল। তাদের এই অদ্ভুত কাণ্ড সুলতান একদম পছন্দ করেননি।[১৩২]

---

[১২৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ২০২; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭০;

[১৩০] ইবনুল আসির, ৭/৬১৮; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭১

[১৩১] এ ব্যাপারে বিস্তারিত পঞ্চদশ অধ্যায়ে সুলতানের সিরাত ও কীর্তিমালার আলোচনায় দেখুন। আরও দেখুন সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১১৭-১১৮; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭১;

[১৩২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ২০৬; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭১;

বেগম বিনতে তুগরুলের সঙ্গে বিবাহ

সুলতান জালালুদ্দীন বেগম বিনতে তুগরুলের সঙ্গে বিয়ের ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু লাগাতার জিহাদি মিশন নিয়ে কাজ করতে করতে সেই ওয়াদা বাস্তবায়নে খানিকটা বিলম্ব হয়ে গেল। তিবরিজে সুলতান একটু সুযোগ পেলেন। এবার তিনি সেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা পোষণ করলেন। বেগম বিনতে তুগরুল স্বীয় জায়গির খুবি শহরে অবস্থান করছিলেন। সেখানেই সম্পন্ন হল আকদে নিকাহ।[১৩৩]

গনজা বিজয়

সুলতান তিবরিজে অবস্থানকালেই নির্ভরযোগ্য আমির আওর খান আলি নিশাপুরিকে একটি সৈন্যদল দিয়ে গনজা শহরে পাঠিয়ে দিলেন। গনজা ছিল আজারবাইজানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। আজারবাইজানের সাবেক পলাতক হাকিম উজবুক মুজাফফর বাহলোয়ানও সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আওর খান যখন গনজায় হামলা করল, শহর থেকে পালিয়ে একটি দুর্গে গিয়ে লুকোল সে। সেখানেই সে সংবাদ পেল তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী সুলতানকে বিয়ে করে ফেলেছে। সে অস্থির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—বিনতে তুগরুল কি খুশিমনেই বিয়ে করেছে, নাকি এতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে?

সংবাদদাতা স্থির গলায় বলল, তিনি নিজ খুশিতেই এমনটি করেছেন। সাক্ষীদের মাধ্যমে তালাকের প্রমাণ দিয়েছেন।

শুনে উজবুকের মন এতটাই বিষাদময় হল যে, সেই অবস্থাতেই বিছানায় পড়ে গেল সে। উত্তপ্ত জ্বরের ধাক্কায় কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল তার। কিছুদিন পর সেই অবস্থার ভেতরেই তার মৃত্যু ঘটল।[১৩৪]

ওদিকে আওর খান নিশাপুরি গনজা ছাড়াও আজারবাইজান উপকণ্ঠের বিলকান, বারজা, সাকবির ও শিজও জয় করে নিল। এভাবে এক বিস্তৃত ভূমি এসে গেল সুলতানের সাম্রাজ্যের আওতায়।[১৩৫]

খলিফা নাসিরের ইনতেকাল

সুলতান জালালুদ্দীন জর্জিয়া থেকে তিবরিজে এসেছেন বেশিদিন কাটেনি, এর ভেতর একদিন বাগদাদে খলিফা নাসিরের ইনতেকাল হয়ে গেল। এটা ৬২২ হিজরির রমজান মাসের (৫ অক্টোবর ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ) শেষরাতের ঘটনা।

---

[১৩৩] ইবনুল আসির, ৭/৬১৯; ইবনে খালদুন, ৫/১২৪;

[১৩৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ২০৭; জাহাঁকুশা, ২/১৫৭;

[১৩৫] ইবনে খালদুন, ৫/১২৪-১২৫; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭১'

শিক্ষার বিষয় হল—প্রতিদ্বন্দ্বী আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের পৃথিবী-ত্যাগের স্রেফ ৫ বছর পর খলিফা নাসিরও নিজ কুকর্মের ভান্ডার নিয়ে রাব্বুল আলামিনের 'হিসাবরক্ষণ-কক্ষে' গিয়ে পৌঁছলেন। সেই সাম্রাজ্য, সেই রাজ্য ও শক্তি, যার নেশায় এই দুই শাসক একে অন্যকে তুলনামূলক নীচু দেখতে ছটফট করতেন সদা, আজ দুজনের কারুর মাঝেই এসবকিছু নেই। দুই গজ জমিন শুধু তাদের ভাগ্যে জুটেছে।

যে সাম্রাজ্য খলিফা ছেড়ে গিয়েছিলেন, অল্পকালের মধ্যেই তা কাফেরদের আয়ত্তে চলে গিয়েছিল।

নতুন খলিফা

খলিফা নাসিরের অলি আহাদ আবু নাসর মুহাম্মদ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মকাণ্ড ও অভ্যাস-আচরণে ছিলেন পিতার পুরোপুরি বিপরীত। তিনি জাহির বি-আমরিল্লাহ উপাধি নিয়ে খেলাফতের মসনদে উপবেশন করেন। তিনি ন্যায়-ইনসাফের সাথে রাজত্ব করেন। আমজনতাকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে দেন। অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলির পাশাপাশি বহিঃরাজনীতিতেও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তিনি। এবং তাতে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হন। বিশেষত, মুসলিমবিশ্বের সীমান্ত এলাকাগুলোতে তলোয়ার ধারণকারী বীর-মুজাহিদ সুলতান জালালুদ্দীনকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। নিজ থেকেই সুলতানের সাথে উত্তম আচরণ ও মজবুত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।

খলিফা জাহিরের বন্ধুত্বের চিঠি

সুলতান জালালুদ্দীন তিবরিজে অবস্থান করছিলেন। খলিফার পক্ষ থেকে প্রসিদ্ধ সুফি নাজমুদ্দীন রাজি (মিরসাদুল ইবাদ গ্রন্থের লেখক) ও রোকনুদ্দীন আত্তাফ দূত হিসেবে তার কাছে এলেন। সুলতানকে তারা বললেন, খলিফা নাসির আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেছেন। এবং জাহির বি-আমরিল্লাহ সামলে নিয়েছেন খেলাফতের মসনদ। তার পক্ষ থেকে আমরা সুলতানের খেদমতে পরস্পরের কল্যাণকামিতা ও সুধারণার আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আরজ করছি—খলিফাতুল মুসলিমিনের মনের চাওয়া হল দুই রাজ্যের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভ্রাতৃসুলভ হোক।

জিহাদি মিশন বাস্তবায়নের জন্য সুলতান জালালুদ্দীনের ভীষণ প্রয়োজন ছিল অন্যসব মুসলিম শাসকের সহযোগিতার। কয়েকটি রাজ্যের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদিত হলেও খলিফাতুল মুসলিমিনের অসহযোগিতায় প্রকটভাবে পীড়িত বোধ করছিলেন। মূলত খাওয়ারিজমি মহলের প্রতি দরবারে খেলাফতের তিরস্কার ও বিরূপতা বহু মুসলিম শাসককে সুলতানের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা থেকে

আটকে রেখেছিল। কিন্তু এখন বদলে গেল চিত্রপট। স্বয়ং খলিফাতুল মুসলিমিনের পক্ষ থেকে প্রকৃত বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে দেওয়া হয়েছে। কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের ত্বরিতপ্রবাহে আকুপাকু করে উঠছে সুলতানের মন। সাতরাজ্যের বাদশাহি পেয়েও তিনি ততটা প্রফুল্লহৃদয় হয়ে উঠতেন না, যতটা হয়েছিলেন নতুন খলিফার পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের চিঠি পেয়ে।

সুলতান কাজি মুজিরুদ্দীনকে রাজকীয় পোশাক প্রদান করে দরবারে খেলাফতের সাথে উত্তম সম্পর্কের নবায়নের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।[১৩৭]

জর্জিয়ার পথে দ্বিতীয় যাত্রা

সুলতানের জর্জিয়ার মিশন তখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কিছু অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মেটাতে অস্থায়ীভাবে তিনি তিবরিজে অবস্থান করছিলেন। এখান থেকে অবসর হতেই নতুন প্রস্তুতি ও তাজা উদ্যম নিয়ে ৬২২ হিজরির জিলহজ মাসে (ডিসেম্বর, ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ) পুনরায় জর্জিয়ার আকাশচুম্বী পাহাড়গুলোর দিকে যাত্রা করলেন।[১৩৮]

তার দীর্ঘ সময়ের অনুপস্থিতির সুযোগে জর্জিয়ানরা কিপচাক ও লকজ গোত্রগুলোকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে শক্ত ধ্বংসযজ্ঞ বাধাতে আঞ্জাম দিয়ে উঠেছিল যুদ্ধের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা। এবার এই সম্মিলিত বাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।[১৩৯]

জর্জিয়ার সম্রাজ্ঞীর সাথে আলোচনা

৬২৩ হিজরির মহররম মাসে (জানুয়ারি, ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দ) জর্জিয়া সীমান্তে প্রবেশ করেন সুলতান।[১৪০] সীমান্তবর্তী শহর দাবিন হয়ে সম্মুখে রওনা হন।[১৪১] তখন ছিল হাড়-কাঁপানো শীতকাল। প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। সাদা-সাদা বরফের চাদরে পাহাড়, উপত্যকা ও ময়দান পুরোপুরি ঢেকে আছে। মৌসুম ভীতিকরভাবে বিরূপ হয়ে উঠেছে।

ইরস-নদীর তীরে পৌঁছতেই সুলতান ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন; চলাফেরা করাও মুশকিল হয়ে গেল তার পক্ষে। তাই তিনি শীতকালটা এখানেই কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।[১৪২] তারপর সুলতান মালিক তাশতদার নামের এক হুঁশিয়ার

---

[১৩৭] সিরাতে জালালুদ্দীন, ২৮০; খাওয়ারিজম শাহি ১৮৫;

[১৩৮] ইবনুল আসির ৭/৬২৮

[১৩৯] ইবনুল আসির ৭/৬২৮;

[১৪০] ইবনুল আসির, ৭/৬১৯; ইবনে খালদুন, ৫/১২৪

[১৪১] জাহাঁকুশা, ২/১২০

[১৪২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১২৪; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭১;

সহচরকে পত্রবাহক হিসেবে জর্জিয়ানদের সম্রাজ্ঞীর সাথে আলোচনার জন্য পাঠালেন, যাতে তাকে এই যুদ্ধের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখিয়ে রক্তপাত থেকে বিরত রাখা যায় এবং হাতিয়ার ফেলতে সম্মত করা যায়।[১৪৩]

চক্রান্তের জাল

শালুহ, ইওয়ানি ও অন্যান্য জর্জিয়ান আমির, যারা বিগত যুদ্ধে বরণ করেছিল সুলতানের দাসত্ব, তারা তখন সুলতানের চোখে মর্যাদাপূর্ণ একটা আসন পেতে খুব চেষ্টা করতে লাগল। তারা সকাল-সন্ধ্যায় সুলতানের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণ গাইতে লাগল। দিনরাত প্রকাশ করতে লাগল তার গোলামি। নিজেদের কওমের ব্যাপারে শক্ত ভাষা ব্যবহার করে তাদের প্রতি প্রকাশ করছিল অসন্তোষ। সুলতানও এদের উপর ভরসা করে ফেললেন। এবং তার দানশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে মুরান্দ, ইরমিয়া, সালমাস ও আশনুর জায়গির এদের নামে লিখে দিলেন। সুলতানের আশা ছিল—এতে করে তিনি জর্জিয়া বিজয়ে এদের মনোদৈহিক সহযোগিতা লাভ করে উঠতে পারবেন।

আসন্ন যুদ্ধের পরিকল্পনা কেমন হবে এবং তাতে কেমন হয়ে উঠবে জর্জিয়ার পরিস্থিতি, সেই সম্পর্কে এরা সুলতানকে সতর্কবাণী শোনাত। কিন্তু এ ছিল এদের বাহ্যিক কর্ম। ভেতর থেকে তখনও এরা সুলতানের পাক্কা দুশমন ও নিজ কওমের একেকজন বিশ্বস্ত সিপাহি হিসেবেই রয়ে গিয়েছিল। সুলতানের শক্তি পুরোপুরিভাবে নিঃশেষ করে দিতে এরা সুযোগের সন্ধান করছিল।[১৪৪]

শেষমেশ এরা এক ঘৃণ্য পরিকল্পনা বিন্যস্ত করল। তারপর একদিন, মওকা পেয়ে সম্রাজ্ঞীকে গোপনে চিঠি পাঠিয়ে নিজেদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে তুলল। জানাল—আমরা মুসলিম বাহিনীকে পথ দেখিয়ে-দেখিয়ে মারিকাব ঘাঁটির রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব। ওখানে আমাদের যোদ্ধাদেরকে গোপন ঘাঁটিতে মোতায়েন করুন। ওখানে ইসলামি বাহিনীকে তাদের অজ্ঞাতাবস্থায় আমরা নিশ্চিহ্ন করে দেব। মেটাব প্রতিশোধের পিপাসা।

সুলতান জালালুদ্দীন এই চক্রান্ত সম্পর্কে একটুও অবগত ছিলেন না। কারণ, শালুহ তো বাহ্যিকভাবে ইসলামই কবুল করে নিয়েছিল। এজন্য সুলতান তার উপর ও তার মাধ্যমে অন্য জর্জিয়ান আমিরদের উপর নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন। এই মুনাফিকবাহিনী তাদের ঘৃণ্য চক্রান্তে মুসলিমবাহিনীকে শক্ত বিপদের মধ্যে ফেলেই দিয়েছিল প্রায়। কিন্তু যাকে আল্লাহ রাখে, তাকে ফেলতে পারে কে বিপাকে?

---

[১৪৩] জাহাঁকুশা, ২/১৬০

[১৪৪] জাহাঁকুশা, ২/১৬০

বিস্ময়কর একটি ঘটনা ঘটে গেল। সেই ঘটনাই সুলতান জালালুদ্দীনকে দুশমনের এই সংকল্প সম্পর্কে অবহিত করল।

চক্রান্তের বিস্তার

সুলতান জালালুদ্দীনের বার্তাবাহক সুলতান মালিক তাশতদার তিফলিসে জর্জিয়ান-সম্রাজ্ঞীর সাথে আলোচনা করছে। সুলতান মালিক তাশতদার ছিল বড় চালাক ও সমঝদার লোক। সে জর্জিয়ানদের এক দরবারি যাজকের সাথে অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলল, যাতে করে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপের ফাঁকে তার মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের তথ্য।

জর্জিয়ার কার-নদী[১৪৫] ছিল অপার-মায়াবী দৃশ্যাবলির দরুন এক মনোরম পর্যটনকেন্দ্র। মালিক তাশতদার একদিন এই নদীর পার ধরে হাঁটছিল। হঠাৎ দেখে পাশ দিয়ে সেই যাজক আসছে। অত্যধিক মদ্যপানের দরুন টালমাটাল অবস্থা তার। নেশার ঘোরে দেমাগ চড়ে আছে।

মালিক তাশতদার কাছে এগিয়ে গেল। হালপুরসি হল। আলাপের ভেতর দুজনই নিজ নিজ বাহিনীর শক্তিমত্তা ও শান-শওকত নিয়ে তুঙ্গস্পর্শী বক্তব্যে মেতে উঠল। খ্রিষ্টান যাজক নেশার ঝোঁকে প্রথম থেকেই নিজের মধ্যে ছিল না। সে অচৈতন্যে চিৎকার করে বলতে লাগল—তোমরা আমাদের ভাবো কী, শুনি? আমরা সবকিছু বন্দোবস্ত করে রেখেছি। মারিকাব ঘাঁটিতে আমাদের অসংখ্য যোদ্ধা ওত পেতে বসে আছে। শালুহ ও ইওয়ানি সুলতান জালালুদ্দীনকে এদিক থেকেই নিয়ে আসবে। তখন দেখো, আমরা কীভাবে প্রতিশোধ নিই! হুম্ম!

শুনেই মালিক তাশতদারের গা বেয়ে শঙ্কার এক প্রবল স্রোত বয়ে গেল। বুকের ভেতরটা আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল তার। মুহূর্তে তার চোখের সামনে এসে গেল দুশমনের ঘৃণ্য চক্রান্ত। সে ভাবল—যাজক যেহেতু মদমত্ত, এজন্য এখন সে জানে না কার সামনে এইসব কথা বলছে। কিন্তু যখনই তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে বলে ওর হুঁশ আসবে, আমাকে হত্যা না করে ছাড়বে না।

বিদ্যুচ্চমকের মতো এই খেয়াল তার মগজের ভেতর ঝিলিক দিয়ে ওঠে। পরমুহূর্তেই ব্যস্ত ভঙ্গিতে তরবারি কোষমুক্ত করে জর্জিয়ান যাজককে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয় সে। কার-নদীর পারে এই কাণ্ড দেখবার মতো কেউ ছিল না। চারপাশে জড়ানো ছিল নীরবতার চাদর। কিন্তু এই কাণ্ড গোপন থাকবার নয়। তখন তার জন্য এই এলাকায় অবস্থান করা ছিল মৃত্যুকে দাওয়াত দেওয়ার

---

[১৪৫] কার একটি বড় নদী। এটি কাফকাজের বাবুল আবওয়াব পাহাড় থেকে প্রবাহিত হয়। তিফলিস শহরের মাঝখান দিয়ে গিয়ে শহরটিকে দুভাগ করে দিয়েছে। তারপর আজারবাইজান ও আররানের মাঝখানে পার্থক্য সৃষ্টি করে কাসপিয়ান সাগরে গিয়ে পড়েছে।

নামান্তর। মালিক তাশতদারের ভেতরে এই শঙ্কাও কাজ করছিল যে, সুলতান যদি এই মুনাফিকদের কথামতো ইতোমধ্যে যাত্রা শুরু করে দেন!

তাই ক্ষণকাল বিলম্ব না করে সে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে ওঠে। পা দিয়ে শক্ত গুঁতো লাগাতেই ঝড়ের বেগে সারি সারি পাহাড় ও বনজঙ্গল পেরিয়ে সুবহে সাদিকের সময়, যখন মুসলিমদের সেনাছাউনিতে ফজরের আজান গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে, হাঁপাতে হাঁপাতে সুলতানের দরবারে গিয়ে হাজির হয় সে, এবং খুলে বলে পুরো কাহিনি।

মুনাফিকদের পরিণাম

সুলতান এসব শুনতেই শালুহ, ইওয়ানি ও প্রহরার ভেতর থাকা অন্য ৪০ জর্জিয়ানকে হাজির করতে বলেন। তিনি মালিক তাশতদারের সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করতে চাচ্ছিলেন।

মুনাফিকের দল হাজির হল। সুলতান বড় মিহি কণ্ঠে জর্জিয়ানদের উপর আক্রমণের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন—হামলা করতে যাবার জন্য গরস নাকি মারিকাব ঘাঁটি, কোন দিকের রাস্তা বেশি উপযুক্ত হবে?

মুনাফিকদের একদম জানা ছিল না—সুলতানের চোখের সামনে সমস্ত রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেছে। সুলতানের সম্বোধনের ভঙ্গিতেও তেমন কোনো স্বর ছিল না যে, এরা সতর্ক হয়ে উঠবে। এজন্য শালুহ গৃহীত প্ল্যান-মোতাবেক গড়বড় করে বলতে আরম্ভ করল—আলামপনা, গরসের পথে জর্জিয়ান সিপাহিদের একটি শক্তিশালী দুর্গ রয়েছে। আমাদের এই যুদ্ধযাত্রায় ওরা প্রথমেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু মারিকাবের রাস্তা একদম শঙ্কামুক্ত। আবার এই রাস্তা তিফলিসের খুব সন্নিকটে। আমার অভিমত হল—এই পথেই বাহিনী প্রেরণ করা হোক, মহামান্য আলামপনা।

অন্য জর্জিয়ান আমিররাও জোরেশোরে এই অভিমতের সমর্থন জানাল—জি আলামপনা, তাই হোক, তাই হোক।

সুলতান এদের সবার নেফাকি ধরে ফেললেন। তিনি ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। খাপ থেকে টান দিয়ে তলোয়ার বের করে এমন এক শক্ত কোপ বসালেন যে, শালুহের হাতির মতো দেহ পুরো দু-টুকরো হয়ে গেল। অন্য জর্জিয়ান আমিরদেরও হত্যা করা হল সুলতানের আদেশে।

সুলতান তার একনিষ্ঠ সেনাপতিদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। যার যার অভিমত পেশ করল সবাই। সুলতান বললেন—আমার রায় হল দুশমনের উপর এ মুহূর্তেই আক্রমণ করতে হবে। ওরা শালুহ ও তার সাথিদের এই পরিণতি

সিন্ধুতীরের ঐতিহাসিক যুদ্ধের পর এখন পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, জর্জিয়ানদের সাথে সংঘটিত এই যুদ্ধটাই ছিল সুলতানের জন্য সবচেয়ে কঠিন। এখান থেকে সুলতানের কোনোমতে বেঁচে ফিরবার সম্ভাবনা ছিল খুব কম। কিন্তু আল্লাহর অফুরন্ত সাহায্যের প্রতি ভরসা রেখে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পর সফল হলেন সুলতান।

সৌভাগ্যক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনার খবর সুলতানের বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এজন্য দ্রুতবেগে তারাও সুলতানের সাহায্যে ছুটে এল। একটি সাহায্যকারী সেনাদল যখন সুলতানের কাছে এসে পৌঁছল, তৎক্ষণাৎ সুলতান তাদের সারিবদ্ধ করে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে ঊর্ধ্বাকাশ কাঁপিয়ে তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জর্জিয়ার খ্রিষ্টানদের উপর। এবং দুশমনের দুটো দলের উপরেই জোরদার আক্রমণ চালিয়ে রুখে দিলেন তাদের অগ্রগামিতা।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জর্জিয়ানদের পা হড়কাতেই মুসলিমবাহিনীকে ধাওয়া করতে হুকুম দিলেন সুলতান। জানবাজ সেপাইরা পলায়নরত শত্রুদের পেছনে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিয়ে তির, বর্শা ও তলোয়ারের সাহায্যে তাদের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করল। কার নদী পর্যন্ত অব্যাহত রাখল ধাওয়া। কিছু সাধারণশ্রেণির জর্জিয়ান সৈন্য মুসলিমদের তরবারির ভয়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া নিয়েই ঝাঁপ মারল নদীর ভেতর। কিন্তু ওপারে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিল মাত্র দুয়েকজন, বাকিরা নদীর পাহাড়-উঁচু ঢেউয়ের ভেতর তলিয়ে গিয়েছিল।[১৪৯]

সুলতানের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা

কয়েকটি রণাঙ্গনে পরাজিত হয়ে জর্জিয়ানরা সুলতান জালালুদ্দীনকে বিরাট ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এজন্য সুযোগ তৈরি হয়ে গেছে ভেবে সুলতানের এক পরামর্শদাতা তাকে বলল—আলামপনা, এই মওকা বিরাট গনিমত। এক্ষুনি শত্রুদের রাজধানী তিফলিস অবরোধ করা উচিত আমাদের।

সুলতান জালালুদ্দীন প্রত্যাখ্যানের গলায় বললেন—তিফলিসের মজবুত প্রাচীরের সামনে আমাদের সৈন্য নিয়োগের দরকার নেই। বাইরে যে জর্জিয়ানরা আছে, তাদের নিশ্চিহ্ন করে উঠতে পারলেই নির্বিঘ্নে আমরা তিফলিস দখল করে ফেলতে পারব।[১৫০]

সুলতানের বাহিনী দুই-তিন দিন ধরে জর্জিয়ানদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে লাগল। সুলতানের যখন পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মাল যে, এখন জর্জিয়ান ও তাদের সাথে যারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাদের সেই সেনাশক্তিটুকুই বাকি আছে, যারা

---

[১৪৯] জাহাঁকুশা, ২/১৬৪

[১৫০] ইবনুল আসির, ৭/৬২৮

আশ্রয় নিয়েছে তিফলিস দুর্গের প্রাচীরের ভেতর। ফলে, সামানপত্র নিরাপদ এক জায়গায় রেখে স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন সুলতান।

তিফলিস বিজয়

তিফলিস থেকে খানিকটা দূরে বাহিনীকে থামতে নির্দেশ দিলেন সুলতান। তার সঙ্গে রাখলেন শুধু ৩ হাজারের কাছাকাছি সৈন্য। অবশিষ্টদের কয়েক ভাগে বিভক্ত করে জায়গায়-জায়গায় ঘাঁটি স্থাপন করে বসিয়ে দিলেন। এই ব্যবস্থাপনার পর সম্মুখে অগ্রসর হলেন তিনি। একেবারে তিফলিসের প্রাচীরের কাছাকাছি এসে থামলেন। নগরপ্রাচীরের বেশিরভাগ অংশ উঁচু পর্বতশ্রেণির উপর নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানে জর্জিয়ান, কিপচাক, আর্মেনি ও লাকজি সৈন্যরা পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই শক্ত-সুউচ্চ প্রাচীর দীর্ঘসময়ের জন্য আক্রমণকারীদের রুখে দেবার জন্য ছিল যথেষ্ট। সুলতান জালালুদ্দীন যদি অবরোধ করে ফেলতেন, তবু কয়েক মাস নাগাদ অবলীলায় প্রতিরোধ করে যেতে পারত শহরবাসী। কিন্তু প্রাচীরের সামনে সুলতানকে একটি সংক্ষিপ্ত সেনাদলের সাথে অবস্থান করতে দেখে ধোঁকায় পড়ে গেল অবরুদ্ধ দুশমন। আমাদের লোকসংখ্যা তো অনেক বেশি—এমন ভাবনায় উল্লসিত হয়ে অবিলম্বে তারা বাইরে এসে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল। ফলে আগপিছ কিছু না ভেবে এই অসংখ্য জর্জিয়ান ও তাদের জোটবদ্ধ বাহিনীর বহর শহরের ফটক দিয়ে স্রোতের মতো বেরোতে লাগল।

আক্রমণকারীদের সয়লাব ধেয়ে আসছে দেখে কিছুক্ষণ থেমে পরক্ষণেই পিছু হটতে থাকলেন সুলতান। জর্জিয়ানরা ধারণা করল—মোকাবেলা না-করে সুলতান জালালুদ্দীন পালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিশোধের বিক্ষোভে জ্বলে-ওঠা জর্জিয়ানরা হুড়োহুড়ি করে সুলতানের পেছন-পেছন ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে সুলতান চুম্বকের মতো টেনে টেনে সেই জায়গাটায় তাদের নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন, যেখানে ওত পেতে বসে আছে তার বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য।

কাফেরবাহিনী যখন পুরোপুরিভাবে মুসলিমদের মুঠোর ভেতর চলে এল, মুসলিম সেপাইরা গোপন ঘাঁটি থেকে বের হয়ে আক্রমণ চালাল তাদের উপর। এই আকস্মিক আক্রমণে জর্জিয়ানরা এতটাই ঘাবড়ে গেল যে, হিতাহিত হুঁশ ছিল না তাদের কারুর। সামনের দিক থেকে সুলতান জালালুদ্দীনও ঘোড়ার লাগাম টেনে পেছন ঘুরে দাঁড়ালেন। জর্জিয়ানরা দেখল এখন তারা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ থেকে বাঁচতে তারা উলটো ঘুরে সেই নগরপ্রাচীরের দিকেই ফিরে যেতে লাগল। মুসলিম-সেনারাও পেছন থেকে তাদের ধাওয়া করে অগ্রসর হতে লাগল। তাদের কমান্ড করছিল শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন। জর্জিয়ানরা যখন প্রাচীরের ফটক

কল্যাণের কথা ভেবে জর্জিয়ানদের নিরাপত্তার পরোয়ানা দিয়ে দিলেন সুলতান, এবং সমস্ত সামানপত্রসহ দুর্গ দখল করে নিলেন।[১৫৫]

তিফলিসের উপকণ্ঠে জর্জিয়ানদের বহু গ্রাম ও দুর্গ বিদ্যমান ছিল। ওখানকার জর্জিয়ানদের একটা বড় সংখ্যা সুলতানের বাহিনীর আগমনের ভয়ে পাড়ি জমিয়েছিল অন্যান্য এলাকায়। সুলতানের সৈন্যরা একের পর এক এইসব নয়নাভিরাম এলাকা দখল করে নিল। কোথাও অস্ত্রধারী বিদ্রোহী কাউকে পেলে সোজা জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে লাগল।[১৫৬]

তিফলিস-জয়ের মধ্য দিয়েই সুলতানের সেই বিশাল প্রতিরক্ষা-প্রাচীর সম্পন্নতা পেল, যার জন্য সুদীর্ঘ সময় ধরে এত প্রচেষ্টা করে আসছিলেন তিনি। সিন্ধুতীর থেকে নিয়ে কাফকাজ পর্যন্ত ধনুক-বাঁকা চাঁদের মতো হাজার মাইল দীর্ঘ এই প্রতিরক্ষাকেন্দ্র ভৌগোলিক বিবেচনায় তাতার-আগ্রাসনের সম্ভাব্য সমস্ত পথ ঘিরে রেখেছিল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, তাতারদের এখন যেকোনো ইসলামি সাম্রাজ্যে হামলা করার পূর্বে এই প্রতিরোধ-কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাদের অগ্রযাত্রার সম্ভাব্য সকল পথ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে সুলতান এই হাজার মাইল দীর্ঘ ভূখণ্ডের প্রতি ইঞ্চির সুরক্ষার ভার নিজের কাঁধে নিয়ে নিলেন। এই উদ্দেশ্যে মুজাহিদদের দ্রুতগতিসম্পন্ন বাহিনী শত্রুদের আক্রমণ ঠেকাতে সুদীর্ঘ ভূখণ্ডজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আমার যদি হতো কভু ফিদিয়া নেবার শখ

তিফলিস থেকে তিবরিজ যাওয়ার পথে সারমারি নামক স্থানে সুলতান জালালুদ্দীনের একটি সেনাছাউনি ছিল। তাজুদ্দীন হেলালের প্রহরায় সুলতান যেসব বিশেষ বন্দিকে তিবরিজের উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তারা পথিমধ্যে এখানে এসে থেমে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যে উজির শারফুল মুলক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল এই কয়েদিদের থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দেবার। জর্জিয়ানরা তাদের তিনজন বড় বড় সরদারের মুক্তির বদলায় নগদ ২০ হাজার আশরাফি, অলংকার ও মহিষের পাল নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হল।

আলাপ-আলোচনা চলছে। খানিক বাদেই তিন সরদারকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগেই সুলতান জালালুদ্দীন ইরস-নদীর ব্রিজ পেরিয়ে এখানে এসে পৌঁছলেন। এই ক্যাম্পেই অবস্থান করছিলেন মুনশি শিহাবুদ্দীন নাসাবি। সুলতান যখন জর্জিয়ানদের মুক্তির কথা শুনলেন, নাসাবিকে ডেকে বললেন—আমার যদি আগ্রহ থাকত দুশমনকে বিক্রি করে দেওয়ার, তা হলে এখন পর্যন্ত এ

---

[১৫৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২৪; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭১;

[১৫৬] জাহাঁকুশা, ২/১৬৪

পরিমাণ ধনদৌলত আমি জমা করে ফেলতাম, কালের অবিরাম আবর্তনও তা গুনে শেষ করে উঠতে পারত না।

একথা বলে সুলতান হুকুম দিলেন—না, জর্জিয়ান সরদারদের কখনো আজাদ করা যাবে না।

তার এই হুকুমের ফলে সরদারদের মুক্ত করে ফিদিয়া গ্রহণের যে পরিকল্পনা এঁটেছিল উজির, তা পরিহার করতে হল। এ-কারণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে উজিরের মন। প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় জেদ ধরে সে সরকারি কোষাগার থেকে অনর্থক খাতে নির্দ্বিধায় প্রচুর অর্থ খরচ করতে থাকে।

আল্লামা ইবনুল আসিরের প্রশংসা-বচন

অধিকাংশ ঐতিহাসিক জর্জিয়ায় সংঘটিত সুলতান জালালুদ্দীনের এইসব জিহাদি অভিযানের কথা পুরোপুরিভাবে ধামাচাপা দিয়ে গেছেন, নতুবা ভাসা-ভাসাভাবে এরকম বর্ণনা দিয়েছেন, যেন-বা এগুলো রোজকার কোনো মামুলি সংঘর্ষের মতো ব্যাপার। অথচ জর্জিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ, নাজুক ও ভয়ানক ছিল যে, সুলতানের জীবনকাহিনিতে যদি এই এক এলাকার যুদ্ধাভিযান ব্যতীত কিছু না থাকত, তবু তার বীরত্ব, হিম্মত ও যুদ্ধকৌশলের প্রমাণ দেবার জন্য কোনো কীর্তি পেশ করার দরকার পড়ত না। তার এই এক অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাই উম্মতে মুসলিমা কেয়ামত পর্যন্ত শেষ করে উঠতে পারত না। এই এক যুদ্ধই ইতিহাসের পাতায় তার নাম রোশনাই করে তুলবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ যুদ্ধের পূর্বে জর্জিয়ায় খ্রিষ্টানদের কর্তৃত্ব কোনোভাবেই খতম করা যাচ্ছিল না। সেখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠী বিলুপ্ত হতে চলছিল দিন-দিন। সুলতান জালালুদ্দীন জর্জিয়ান খ্রিষ্টানদের এমনভাবে থেঁতলে দিলেন যে, সেখানে নতুন শক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে লাগল মুসলমান। আজও পর্যন্ত এইসব এলাকাতে তাদের একটা বড় জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে।

এক্ষেত্রে সুলতান জালালুদ্দীনের যথাযোগ্য কৃতিত্ব যদি বুঝতে চান, তা হলে পড়ুন আল্লামা ইবনুল আসিরের একটি লেখা। তিনি ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীনের সমকালের। তিনি বলেন—পূর্বের বছরগুলোর ঘটনাপ্রবাহে আমরা বর্ণনা করেছি, জর্জিয়ানরা তাদের সীমান্তসংলগ্ন ইসলামি সাম্রাজ্যগুলো, যেমন : খিলাত, আজারবাইজান, আর্রান, আরজানুররোম, দরবন্দ শিরওয়ান ইত্যাদি অঞ্চলে নির্বিচারে মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করত। একের পর এক কবজা করে ফেলত তাদের এলাকা। সেইসব এলাকার মুসলিমরা জর্জিয়ান খ্রিষ্টানদের হাতে শিকার হতো লাঞ্ছনার ও হেনস্থার। জর্জিয়ানরা তাদের উপর আক্রমণাত্মক হয়ে গণহত্যা চালাত।

স্থাপিত: ২০২০ইং

আমরা ও সমস্ত মুসলমান যখনই এইসব কথা শুনতে পেতাম, আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম—মহান আল্লাহ যেন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এমন এক অগ্রপথিক পাঠান, যিনি এসে তাদেরকে হেফাজত করবেন, তাদের সাহায্য করবেন ও সবার পক্ষ থেকে গ্রহণ করবেন প্রতিশোধ।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এইসব নিপীড়িতের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাদের উপর বর্ষণ করলেন করুণার অপার্থিব বারিধারা। তাদের দান করলেন একজন সুলতান জালালুদ্দীন, যিনি জর্জিয়ানদের পরিণতি এমনভাবে বরবাদ করে দিয়েছিলেন, যা আপনারা পড়েছেন। এই কাফেরদের থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের বদলা নিয়েই ছেড়েছিলেন তিনি।[১৫৭]

বাগদাদের দূতের জিহাদি জজবা

সুলতানের এইসব কীর্তি ইসলামি সাম্রাজ্যে জিহাদের এক নতুন জোশ ও জজবা জাগিয়ে তুলেছিল। এক দীর্ঘ সময়ের পর আমির ও নেতৃবৃন্দ জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে ফের সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয় বলে ভাবতে আরম্ভ করেছিল। নিম্নযুক্ত ঘটনা থেকে এই মহাবিপ্লবের একটা ধারণা নিতে পারি আমরা। জর্জিয়া অভিযানের একদিন যোগ্য একজন আলেম বাগদাদের দূত হয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে এলেন। সুলতান তখন ছাউনি স্থাপন করেছিলেন গনজা এলাকায়।

সাক্ষাৎ শেষে দূতের যখন ফেরার পালা, সুলতান এখানকার প্রসিদ্ধ আলেম হাফেজ তাকি উদ্দীনকে তার সঙ্গে রওনা করিয়ে দিলেন, যেন তার সম্মানার্থে তিনি বাগদাদ পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে আসেন। দূত তখন সবে কয়েক মনজিল সফর করেছেন, তখনই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল সুলতানের বিরুদ্ধে তাতারদের নতুন আক্রমণের গুজব। ওদিকে সুলতান চলে গিয়েছিলেন ইস্পাহান। এজন্য ব্যাপকভাবে রটে গেল সুলতান জালালুদ্দীন জিহাদের জন্য সীমান্ত এলাকার দিকে যাচ্ছেন।

একথা শুনতে পেয়ে বাগদাদ যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন দূত। দ্রুত রওনা হয়ে গেলেন সুলতানের সন্ধানে। সুলতান মায়াঁজ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। এর মধ্যেই বাগদাদের দূত এসে তার খেদমতে হাজির। দূত ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে আরজ করে উঠলেন—আমরা জানতে পেরেছি তাতাররা আপনার বিরুদ্ধে আবার বাহিনী প্রেরণ করছে আর আপনি বেরিয়েছেন তাদের সাথে জিহাদ করতে। এই অবস্থায় আপনার পতাকাতলে এসে সমস্ত মুসলমানের জিহাদ করা ফরজ। আমিও একজন মুসলমান। তাই এই ফরজ বিধান আমি ছাড়তে পারি না।

---

[১৫৭] ইবনুল আসির, ৭/৬১৭

দূতের এই জিহাদি জজবা দেখে সুলতান জালালুদ্দীনের খুশির অন্ত রইল না। প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বললেন—প্রকৃত খেলাফতি দূতের শান এমনই হওয়া উচিত, যা আপনার মাঝে দেখতে পেয়েছি।

সুলতান তার কাতেব নাসাবিকে হুকুম দিলেন—চলুন, দূতকে আমাদের পুরো বাহিনী পরিদর্শন করানো হোক।

আদেশমাত্র দূতের সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে যেতে লাগল একেকটি সেনাদল।

প্রদর্শনের পর সুলতান জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, আমিরুল মুমিনিনের সৈন্য বেশি, নাকি আমাদের মতোই?

দূত বললেন—আমিরুল মুমিনিনের সৈন্যসংখ্যা এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। অবশ্য যুদ্ধে আপনার সৈন্যরা অধিক দক্ষ ও পারদর্শী।

কিছুদিন পর বাগদাদে ফিরে গেলেন দূত। কারণ, তাতারদের আগমনের এই খবর ছিল একটা গুজব। মূলত সুলতানের কিছু সৈন্য, যারা ছিল বালকা খান নামের এক আমিরের নেতৃত্বে, স্থানীয় কেন্দ্রের ডাকে হিন্দুস্থানের দখলীকৃত এলাকাগুলো থেকে ফিরে আসছিল। দূর থেকে লোকজন তাদেরকে মনে করেছিল তাতার-বাহিনী।[১৫৮]

---

[১৫৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২৭-১২৮; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৬৫

চতুর্থ অধ্যায়

সম্মিলিত প্রতিরোধ-শক্তির বিধ্বস্ততা

সে-সময়কার এইসব পটভূমি দেখে বুঝে উঠি—অসম্ভব কিছু নয় যে, সুলতানের ক্রমবর্ধমান শক্তি চুরমার করার জন্য পাঁয়তারা করে এই ক্ষমতাধর খলিফাতুল মুসলিমিনকে (খলিফা জাহের বিল্লাহ) সুলতানের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া হয়েছিল। যথাসম্ভব এটাও সেই পাঁয়তারারই ফল যে, খলিফাতুল মুসলিমিন সুলতানকে সহযোগিতা করা থেকেই শুধু দূরে সরে যাননি; বরং তিনি সুলতানের মিত্র আল-মালিকুল মুয়াজ্জমকেও সুলতানের থেকে পৃথক হয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আল-মালিকুল আশরাফের সাথে দ্বন্দ্ব

সুলতান জালালুদ্দীন ও আল-মালিকুল আশরাফের মাঝে ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। কিন্তু যেহেতু একটা সময় ধরে মুয়াজ্জম ও আশরাফের সম্পর্ক ছিল ভীষণ খারাপ, সেজন্য সুলতানকে মুয়াজ্জমের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে দেখে তাকেও আশরাফ নিজের প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে আল-মালিকুল আশরাফ ও সুলতান জালালুদ্দীনের সম্পর্ক দিন-দিন আরো খারাপ হতে থাকল।

সুলতানের থেকে আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের বিচ্ছিন্নতা

আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার কারণে সুলতান জালালুদ্দীন আল-মালিকুল আশরাফের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছিলেন। কিন্তু এখন, মুয়াজ্জম এই দুজনের মাঝে যুদ্ধের আগুন উসকে দিয়ে সুলতানের মিত্রতা ছেড়ে আশরাফের দলে গিয়ে ভিড়লেন। ইতিপূর্বে খলিফাতুল মুসলিমিনও মুয়াজ্জমকে সুলতানের থেকে পৃথক হয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। এবং মুয়াজ্জমকে হুকুম করেছিলেন সুলতানকে বিদ্রোহী ঘোষণা করে স্থায়ীভাবে তার থেকে পৃথক থাকবার। শাওয়াল মাসে মুয়াজ্জমের কাছে স্বয়ং আল-আশরাফ এসে সুলতানের সঙ্গ ত্যাগের জন্য তাকে রাজি করালেন। দুই ভাইয়ের মাঝে সম্পাদিত হল পারস্পরিক ঐক্যের চুক্তি। পরবর্তীতে এই চুক্তিতে তাদের তৃতীয় ভাই মিশরের বাদশাহ আল-মালিকুল কামিলও এসে শামিল হয়েছিলেন।

এই ভাইয়েরা সুলতান জালালুদ্দীনের ক্ষমতাকে তাদের খান্দানি পদমর্যাদার এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শাসন-ক্ষমতার জন্য হুমকি মনে করে সুলতানের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে উঠলেন।

উচিত ছিল—সুলতান জালালুদ্দীন এই অর্থবিহীন টানা-হেঁচড়া থেকে শুরুর দিকেই নিজের আঁচল বাঁচিয়ে রাখবেন; কিন্তু এখন, আল-মালিকুল মুয়াজ্জম আলাদা হয়ে প্রতিপক্ষের সাথে ঘেঁষে যাবার পর তার বিরুদ্ধে গঠিত এই সম্মিলিত শক্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে থাকতে পারলেন না তিনি।

এই প্রেক্ষাপটে ভেতরে তিনি শক্ত একটা ঝটকা খেলেন। যার প্রতি সুলতানের আশা ছিল যে, সে তার যুদ্ধের বাহু হয়ে উঠবে, সে-ই এখন তার জানের শত্রু প্রমাণিত হয়েছে। যাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য তিনি তার সমস্ত রাত্রির নিদ্রা বিসর্জন দিয়েছেন, তারাই এখন তাকে নিশ্চিহ্ন করতে উঠেপড়ে লেগেছে। সুলতান বুঝে গেলেন—এখন আইয়ুবি শাসকদের চক্রান্তের ফাঁদে পা দেওয়া, তাদের কোনো প্রতিশ্রুতির প্রতি নির্ভরশীল করতে চাওয়া অথবা নিজের মিশন বাস্তবায়নের জন্য তাদের সাহায্যের উপরেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা আত্মহননের সমার্থক।

পাশাপাশি তিনি তাদেরকে এই ধৃষ্টতা ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের শাস্তিও ভোগ করাতে চাচ্ছিলেন। এজন্য ব্যাপারটাকে আপস-রফার মাধ্যমে সমাধানের সম্ভাব্য সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতি চিন্তা না করে তিনি আইয়ুবি শাসকদেরকে শক্ত জবাব দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠলেন। একা হওয়া সত্ত্বেও তাদের সম্মিলিত শক্তির মোকাবেলায় হয়ে উঠলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সুলতান জালালুদ্দীন ও আইয়ুবি খানদানের এই পারস্পরিক যুদ্ধে দু-দিকের সেনা-অফিসারদের দায়িত্ববোধহীন কর্মকাণ্ড, চাটুকারদের ভুলভাল মন্তব্য, উজিরদের ষড়যন্ত্র ও সুলতানদের পারস্পরিক অনির্ভরতার একটা বড় ভূমিকা ছিল। এই বিষয়গুলোর কারণে উভয়দল তাদের কল্যাণের দিকে না তাকিয়ে এমন এক ফাঁদে পা রাখলেন, যা থেকে বেরোনো উভয় দিকের জন্যই অসম্ভব হয়ে ওঠে। এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় বরবাদ হয়ে যায় দুইদলের কল্যাণের পুঁজি।

আমরা যদি এই পটভূমিকে সুলতানের প্রশংসার চোখে দেখি, মনে হয়—আইয়ুবি খানদানের বিরুদ্ধে তলোয়ার ওঠাতে সুলতান একান্ত বাধ্য হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যদি পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে দেখি, এই বাস্তবতা অস্বীকার করার জো থাকে না যে, এক্ষেত্রে না গ্রহণযোগ্য ছিল আইয়ুবি শাসকদের কর্মপদ্ধতি, না প্রশংসনীয় ছিল সুলতানের গৃহীত পলিসি।

যদি সুলতান জালালুদ্দীন ও আইয়ুবি খানদানের মুকুটধারীরা একনিষ্ঠ মনোবাঞ্ছা নিয়ে একসঙ্গে বসে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত রফাদফা করে নিতেন, আগত অনেক মুসিবত থেকে বেঁচে থাকতে পারত উম্মতে মুসলিমা।

কয়েকটি ঘটনা ও যুদ্ধাভিযানের কথা

সেই দিনগুলিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। স্বয়ং সুলতান জালালুদ্দীনকেও কিছু নতুন অভিযানে যেতে হয়। এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে উল্লেখ করছি।

আকস্মিক অভিযান

তিফলিস বিজয়ের দিনগুলোতে কিরমানের হাকিম বুরাক হাজিব মওকা পেয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে এবং চেঙ্গিজ খানকে বলে পাঠায়—জালালুদ্দীন এক বিস্তৃত ভূখণ্ড দখল করে শক্তি জমিয়ে নিয়েছে। এইসব বিজয়ের পর তার রোখ হবে আপনার দিকে। তাকে যদি আগেভাগেই ভেঙে না দেন, আপনার রাজ্যও দখল করে নেবে সে।

ইরাকের গভর্নর শারফুদ্দীন বুরাক হাজিবের এই কর্মকাণ্ডের সংবাদ পাঠিয়ে দিল সুলতানের কাছে। সংবাদ মিলতেই ৬২৩ হিজরির জুমাদাস সানিতে বাছাইকৃত অশ্বারোহীদের একটি বাহিনী নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মতো কিরমানের দিকে ছুটলেন সুলতান। এবং বিস্তৃত সব জঙ্গল, সুউচ্চ পাহাড় ও বিশুষ্ক সব মরুভূমি অতিক্রম করে স্রেফ ১৭ দিনের ভেতর তিফলিস থেকে কিরমানে গিয়ে পৌঁছলেন। অধিকাংশ সিপাহি সুলতানের দ্রুতগতির সাথে তাল মিলিয়ে ছুটতে পারছিল না। পেছনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। এজন্য কিরমান পৌঁছা পর্যন্ত তার সঙ্গে কেবল বাকি ছিল ৩ হাজার অশ্বারোহী। অবশিষ্টরা পেছনে পড়ে ছিল তখনও।

সুলতানের এই আচানক আগমনে ঘাবড়ে ওঠে বুরাক। কান্না-কান্না ভাব নিয়ে জোড়হাত করে ক্ষমা চায়। সুলতান কিছু কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বুরাকের ক্ষমার এই আবেদন কবুল করে নেন।

খলিফা জাহেরের মৃত্যু

বিগত কিছুদিন ধরে খলিফাতুল মুসলিমিনের বদলে-যাওয়া-মুখোশ দেখে বিরামহীনভাবে একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছিল সুলতানের করোটির ভেতর। এর আশু সমাধান ছিল জরুরি।

যেহেতু জাহের বিল্লাহ ছিলেন একজন ন্যায়বান, সদাচারী ও নরম মেজাজের খলিফা, এজন্য সম্ভব ছিল—দূতিয়ালির প্রচেষ্টায় খলিফার হৃদয় পরিচ্ছন্ন করে

বাহাদুরির এক আজিব ঘটনা

সুলতান এই অভিযান থেকে অবসর হয়ে মাওকানের ভেতর দিয়ে একশ সিপাহির একটি বাহিনী নিয়ে সম্রাজ্ঞী বিনতে তুগরুলের সাথে মুলাকাতের জন্য খুবি শহরে রওনা দিলেন, যাতে কিছুদিন সেখানে আরাম-বিশ্রাম করতে পারেন। এর ভেতর খবর পেলেন—সানকারজা নামের এক আমির অন্যান্য আতাবেগ আমিরকে সাথে নিয়ে কয়েকগুণ বেশি সৈন্যের বাহিনীসহ তার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আছে পথিমধ্যে।

এই অবস্থায় বাহ্যত সামনে অগ্রসর হওয়া ছিল নিজেকে বিপদে ফেলার নামান্তর। কিন্তু সুলতানের জন্য এটা ছিল এক মামুলি ব্যাপার। তিনি নির্ভয়ে-নির্বিঘ্নে সফর জারি রাখলেন। যেইমাত্র চোখে ফুটে উঠল শত্রুবাহিনীর অবয়ব, এই একশ সিপাহি নিয়েই তাদের উপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আতাবেগ বাহিনীর মনে এতটাই ভয় চেপে গেল যে, হুড়োহুড়ি করে তারা ভেগে গেল। কিন্তু সুলতান ধাওয়া ঠিকই জারি রাখলেন। শেষমেশ তারা সবাই হাতিয়ার ফেলতে প্রস্তুত হল এবং সুলতানের একান্ত দাসানুদাস হয়ে গেল।

মালিক খামুশের তোহফা

সুলতান খুবি শহরে খানিক বিশ্রাম নেওয়ার পর তিবরিজ পরিভ্রমণ করে গনজায় এসে তাঁবু খাটালেন। এখানে তিবরিজের সাবেক হাকিম উজবুক বাহলোয়ানের পুত্র কাজাল আরসালান ওরফে মালিক খামুশ সুলতানের খেদমতে এসে হাজির হল। সে ছিল জন্মগত বোবা। সুলতানকে সে এক দুর্লভ উপঢৌকন প্রদান করল—একটি কোমরবন্ধনী। তাতে কয়েকটি অমূল্য হিরে জড়ানো ছিল। সেই হিরেগুলোর একেকটির পরিমাপ হাতের তালু বরাবর।

এই দুষ্প্রাপ্য জিনিস ইরানি শাসকদের মাঝে বংশপরম্পরায় চলে আসছিল। এতে খোদিত ছিল শাহ কায়কাউসসহ কয়েকজন প্রাচীন ইরানি বাদশাহর নাম। উজবুক বাহলোয়ানের মৃত্যুর পর এর উত্তরাধিকারী হয়েছিল মালিক খামুশ। আর এখন তা সুলতানের জন্য সে অর্পণ করে দিল। সুলতান এই বিরল তোহফা পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। কায়কাউসের নাম মুছে তাতে নিজের নাম খোদাই করে নিলেন এবং এটি ঈদের দিন পরবেন বলে ঠিক করলেন।

বিধ্বস্ত তিফলিস

সুলতান তুর্কমানি মহলে হামলা করার আগে তিফলিস ও তার উপকণ্ঠে তাঁবু খাটিয়ে-থাকা অধিকাংশ খাওয়ারিজমিকে অসহনীয় ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে ভারসাম্যপূর্ণ সবুজ-শ্যামল এলাকাগুলোর দিকে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। বাহ্যত কোনো আশঙ্কা ছিল না যে, এই কঠিন মৌসুমে তাদের উপর আক্রমণের

জন্য যাত্রা করবে আশপাশের জর্জিয়ান সেনারা। কিন্তু খাওয়ারিজমি বাহিনী এখান থেকে সরে যেতেই বিস্ময়করভাবে কুরুস, আনি ও অন্যকিছু সংরক্ষিত দুর্গের জর্জিয়ান সৈন্যরা মৌসুমের প্রাবল্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ৬২৪ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে (ফেব্রুয়ারি, ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) সরাসরি তিফলিসে আক্রমণ করে বসল। খাওয়ারিজমি বাহিনীর একটি ছোট্ট অংশ ওখানে থেকে গিয়েছিল। তারা সংঘর্ষে অক্ষমতা প্রকাশ করে বেরিয়ে পড়ল শহর ছেড়ে। জর্জিয়ানদের বিশ্বাস ছিল—শহরের কর্তৃত্ব তারা স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে পারবে না। তারা জানত—সুলতান জালালুদ্দীন এই খবর শোনামাত্র বাহিনী নিয়ে এসে প্রচণ্ড বিক্রমে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তার মোকাবেলায় তখন টিকতে পারবে না তারা। তাই শহর বিজয় করতেই সবদিকে তারা আগুন লাগিয়ে দিল, এবং গণহত্যা চালিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ফেরার পথে।

গনজায় সুলতানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছতেই তৎক্ষণাৎ তিনি তিফলিসের উদ্দেশে রওনা দিলেন। কিন্তু তার পৌঁছবার আগেই জর্জিয়ানরা শহরের শক্ত ক্ষতি করে চলে গেল

জর্জিয়ানদের সাথে আরো কয়েকটি যুদ্ধ

সেই দিনগুলিতেই কুক খান নামের এক খাওয়ারিজমি সেনাপতি কারুর সঙ্গে পরামর্শ না-করেই বিক্ষিপ্ত সিপাহিদের জমায়েত করে জর্জিয়ানদের এলাকা লাওরিতে কর্তৃত্ব করতে লাগল। একরাতে সে বাহিনীর একাংশকে বাতাখ হ্রদের পূর্ব পারে এবং অপরাংশকে পশ্চিম পারে মোতায়েন করল।

জর্জিয়ানরা সুযোগ দেখে পশ্চিম পারে ছাউনি স্থাপনকারীদের উপর অতর্কিতে নৈশহামলা চালাল। অনেক খাওয়ারিজমিকে শহিদ কিংবা আহত করল। অনেককে করল গ্রেফতার।

জখমি হওয়া সিপাহিদের ভেতর আজবাতাইন নামের এক তুর্কিও ছিল। সঙ্গীদের পরাজয় ও পিছে হটবার পর সে দেখল—জর্জিয়ানরা একেকজন জখমিকে ধরে ধরে হত্যা করে দিচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সে একটি বড় পাথরের দিকে চলে গেল। তাতে ঠেস দিয়ে বসল সে। নিজের তূণীর সামনে রাখল। তারপর কামানে তির চড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। কয়েক জর্জিয়ান সেনা তার দিকে অগ্রসর হতেই সে তির চালাতে শুরু করে দিল। এভাবে পরপর তিন জর্জিয়ানকে মেরে ফেলল। জর্জিয়ানরা এতই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল যে, তারপর তাদের কেউ আর তার কাছে যাবার হিম্মত করে ওঠেনি।

ময়দান যখন খালি হয়ে গেল, আজবাতাইন পদব্রজে রওনা হয়ে গেল আজারবাইজানের দিকে। কিন্তু তার সঠিক রাস্তা জানা ছিল না। এজন্য সে জর্জিয়ানদের সেনাপতি ইওয়ানির পুত্রের দুর্গের কাছে গিয়ে উঠল। এখানে এক

জর্জিয়ানকে বকরি চরাতে দেখল। আচমকা পেছন থেকে এই জর্জিয়ানকে হত্যা করে বকরির পাল হাঁকিয়ে এক উপত্যকায় নিয়ে গেল। একটি বকরি জবাই করে গোশত ভুনা করল। খেয়ে খানিকটা আগুন নেভাল পেটের। বাকিটুকু একটি পাত্রে রেখে আবার সফর শুরু করে দিল।

ওদিকে সুলতান জালালুদ্দীন আজারবাইজান থেকে ফেরার পথে মাওকানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ তিনি জর্জিয়ানদের এই নৈশ আক্রমণের সংবাদ পেলেন। সঙ্গে এই খবরও এল—জর্জিয়ানদের সম্রাজ্ঞী ও সিপাহসালার ৪০ হাজারের অধিক সৈন্য নিয়ে যাত্রা শুরু করছে।

তৎক্ষণাৎ তিনি বাতাখ হ্রদের তীরে গিয়ে পৌঁছলেন। আর এখানেই দুই বাহিনীর অগ্রদলের সাথে জোরদার যুদ্ধ বাধল। সেই যুদ্ধে জর্জিয়ানরা পরাজিত হয়ে পেছনে হটে গেল। বন্দি হল তাদের অনেক লোক। প্রত্যেককে তখনই হত্যা করে ফেললেন সুলতান। খাওয়ারিজমি সিপাহিরা জর্জিয়ানদের ধাওয়া করতে-করতে সেনাপতির তাঁবুর কাছে গিয়ে পৌঁছল। এবং মুহূর্তের ভেতর লুটে নিল পুরো তাঁবু।

জর্জিয়ানরা লাওরি শহরে গিয়ে আবদ্ধ হল দুর্গের ভেতর। সুলতান জালালুদ্দীন শক্তভাবে শহরটি অবরোধ করে আবেদন জানালেন—রাতের আক্রমণে যেসব খাওয়ারিজমি সিপাহিকে গ্রেফতার করেছ, এক্ষুনি তাদের মুক্ত করে দাও!

জর্জিয়ানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সব কয়েদিকে মুক্ত করে দিল। সুলতান দেখলেন—এই কয়েদিদের ভেতর আজবাতাইন নেই। জর্জিয়ান দূতকে যখন জিজ্ঞেস করা হল সে কোথায়। সে সাফ-সাফ অস্বীকার করে দিল—আমাদের এখানে এই নামে কোনো কয়েদি নেই।

সুলতান আবার দ্বিতীয়বার তাকে ফিরিয়ে দিতে বললেন। স্পষ্ট গলায় বললেন—এই আক্রমণের পর অকুস্থল থেকে খাওয়ারিজমি সিপাহিরা সব লাশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই নিহতদের ভেতর আজবাতাইনের লাশ পাওয়া যায়নি।

এলাকাটা যেহেতু এমন ঘেরাও দেওয়া ছিল যে, জর্জিয়ানদের আটকানো পথ ভেদ করে নিরাপদে জীবিত বেরিয়ে যাওয়া মুশকিল, তাই সুলতানের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল—আজবাতাইন এখনো এদের হাতেই বন্দি আছে।

শেষমেশ জর্জিয়ানরা দৃঢ় শপথ করে বলল—তাদের কাছে আর কোনো খাওয়ারিজমি কয়েদি নেই। একথাও বলল—যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এক খাওয়ারিজমি সিপাহি আমাদের দিকে তির চালাচ্ছিল। তাকে গ্রেফতার করা যায়নি।

কিছুদিনের ভেতর প্রকাশিত হয়ে গেল জর্জিয়ানদের কথার সত্যতা। কারণ, আজবাতাইন সহি-সালামতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সীমান্ত শহর নাখজোয়ানে

পঞ্চম অধ্যায়

বাতেনিদের (ইসমাইলিয়া) সাথে জিহাদ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ

হে নবি, কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করো। তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করো তুমি।[১৬১]

'সুলতান জালালুদ্দীন বাতেনিদের বিপুল ক্ষতিসাধন করলেন। তাদের থেকে (মুসলিম উম্মাহর) প্রতিশোধ নিলেন। মূলত বাতেনিদের অরাজকতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাতারদের আবির্ভাবের পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসলামি সাম্রাজ্যগুলোতে খুবই বেড়ে গিয়েছিল বাতেনিদের লোভ-লালসা। কিন্তু এদের জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের পথ বন্ধ করে দিলেন সুলতান। এদের শেকড় উৎপাটিত করে একদম ছুড়ে ফেলে দিলেন।'[১৬২]

বাতেনিদের নতুন হাঙ্গামা

আপনারা পড়ে এসেছেন—বাতেনি ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা হাসান ইবনে সাব্বাহর স্থলাভিষিক্তরা এক শতকের অধিক সময় ধরে পুরো মুসলিমবিশ্বে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। বড় বড় অনেক নামজাদা সুলতান, উজির, শায়েখ ও আলেম এই বাতেনিদের রক্তাক্ত খঞ্জরে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

মাঝখানে এদের রুহানি ইমাম জালালুদ্দীন হাসানের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণার পর এদের খঞ্জর-যুদ্ধ কয়েক বছর অস্থায়ীভাবে থেমে ছিল।[১৬৩] কিন্তু ৬১৮ হিজরিতে তার মৃত্যুর পর ফেদাইরা নতুন সাহস ও শক্তি নিয়ে আবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তখন তাদের ইমাম ছিল আলাউদ্দীন খোরশাহ। তাতারদের হাতে মুসলিমবিশ্বে যে বিধ্বস্ততা নেমে এসেছিল, তা বাড়িয়ে তুলেছিল এই লোকের সাহস। তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাতাররাও মুসলিমবিশ্বে আলামুতের অরাজকতা ও ঘৃণিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত ছিল। এজন্য আশপাশের সমস্ত এলাকায় কর্তৃত্ব করা সত্ত্বেও বাতেনি ফেরকার বিরুদ্ধে তারা কিছু করেনি। বাতেনিদের শহরগুলো আগের মতোই আবাদ এবং বস্তিগুলোও আগের মতোই নিরাপদ ছিল।[১৬৪]

---

[১৬১] সুরা তাহরিম, আয়াত ৯

[১৬২] তারিকুল কামিল ৭/৬৪০

[১৬৩] আল্লাহই ভালো জানেন তার এই ইসলামগ্রহণ খাঁটি মন থেকে প্রকাশ পেয়েছিল নাকি ধোঁকা ছিল। ইতিহাসপ্রণেতা হাফেজ যাহাবি রহ. দ্বিতীয় আশংকাটি গ্রহণ করেছেন।

[১৬৪] তারিখুল ইসলাম যাহাবি, তবকা ৬২; ৬১৭ হিজরির ঘটনাবলি

ইসলামের এক শত্রুর মুখে এরকম ধমকি শুনে ক্রোধে জ্বলে ওঠে আওর খানের আপাদমস্তক। আস্তিনের ভেতর থেকে কয়েকটি চিকচিকে খঞ্জর বের করে রাগে বাতেনি দূতের সামনে সজোরে ছুড়ে মারেন। ভয়ে লাফ দিয়ে ওঠে বাতেনি দূত। একহাত পেছনে ছিটকে যায় সে।

আওর খান হুংকার ছেড়ে বলেন—আমাদের খঞ্জর তোদের খঞ্জর থেকে অধিক ধারালো। আমাদের কাছে এমন তলোয়ারও আছে, যা তোদের কাছে নেই।[১৬৫]

আওর খান নিশাপুরির শাহাদাত

বাতেনি দূত ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল। আলামুতের দরবারে পৌঁছে ঝাঁঝালো কণ্ঠে আওর খানের উদ্ধত আচরণের কথা ব্যক্ত করল। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে তিন ফেদাইকে নিযুক্ত করা হল আওর খানকে হত্যা করার জন্য। সুযোগমতো একদিন তারা আওর খানকে শহিদ করে দিল। মাথার উপর আওর খানের টকটকে রক্তমিশ্রিত খঞ্জরগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে তারা বলল—'আমরা হলাম মাওলা আলাউদ্দীনের ফেদাই!' এই বলেই বুকে চাপড় মেরে মেরে দম্ভ দেখাতে লাগল।

এই কথার আওয়াজ বুলন্দ করে অপ্রতিহত ভঙ্গিতে তারা ঢুকে পড়ল প্রাসাদের ভেতর। এবার নিশ্চিহ্ন করতে চাচ্ছিল উজিরে আজমকে। সৌভাগ্যক্রমে প্রাসাদে সেদিন ছিলেন না উজিরে আজম। ফেদাইরা তখন তাঁবু নির্মাতা এক ব্যক্তিকে সেখানে পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল।

তখনও মাতালের মতো খুঁজছিল উজিরে আজমকে। হঠাৎ এই হাঙ্গামা শুনে জনতার বিরাট একটি দলের কান খাড়া হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ তারা ঘরবাড়ি ও দোকানপাট থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে এবং উজিরের প্রাসাদে বিচরণরত তিন ফেদাইকে পাকড়াও করে ফেলে। ফেদাইদের পাশবিক কর্মকাণ্ডে সবার ভেতর যেহেতু দানা বেঁধে উঠেছিল ক্রোধ, তাই গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে তিন ফেদাইকে পাথর মেরে মেরে হত্যা করে ফেলে উত্তেজিত জনতা।

আমির আওর খান ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীনের এক গর্বিত জেনারেল। ফেদাইদের হাতে তার এই আকস্মিক শাহাদাতে বিষাদময় হয়ে ওঠে সুলতানের মন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত নেন—এই বদ ফেরকাটাকে কঠিন শাস্তি না-দেওয়া পর্যন্ত থামবেন না।[১৬৬]

---

[১৬৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ২২৮

[১৬৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ২২৯

এদের মধ্যে এক ফেদাই ছিল হিন্দুস্থানি। সে এক পা অগ্রসর হয়ে বলল—আমি তো আপনাকে ওইদিন ওই সময়েই হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করিনি। কারণ, আমাদের কেন্দ্র থেকে আপনাকে হত্যার হুকুম তখনও পাইনি।[১৬৭]

শুনে ঘর্মসিক্ত হয়ে ওঠে উজিরে আজমের শরীর। তিনি অপারগতার গলায় বলে ওঠেন—দেখুন, আমার জান নেবেন না। আমি জানি না, কেন আপনার সরদার আলাউদ্দীন আমার উপর নারাজ। আমি যে-রকম সুলতান জালালুদ্দীনের গোলাম, তদ্রুপ আপনার ইমামেরও এক নগণ্য খাদেম।[১৬৮]

কঠিন সাজা

বাতেনিদের দূত উজিরে আজমকে খুব করে ভয়-ডর দেখিয়ে চলে গেল। এদিকে সুলতানের গুপ্তচররা এই গোপন বৈঠকের কাহিনি সুলতানের কাছে পাচার করে তাকে সতর্ক করে তুলল। ফেদাইদের দম্ভ, দুঃসাহস ও উজিরে আজমের কাপুরুষতায় সুলতান জালালুদ্দীন খুবই রাগান্বিত হলেন। এক চিঠিতে উজিরকে অভিশাপ ও তিরস্কার করার পর হুকুম দিলেন—অবিলম্বে এই পাঁচ ফেদাইকে গ্রেফতার করে জিন্দা জ্বালিয়ে দাও।

উজিরের পক্ষে সুলতানের হুকুম এড়িয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিপরিষদের সামনে বিশালাকার একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হল। তারপর পাঁচ ফেদাইকে ধরে ছুড়ে ফেলা হল সেই আগুনের ভেতর। এই ফেদাইগুলো অগ্নিশিখায় জ্বলতে জ্বলতেও হেঁকে উঠতে লাগল—হাম হ্যাঁয় মাওলা আলাউদ্দীন কা ফেদাই, হাম হ্যাঁয় মাওলা আলাউদ্দীন কা ফেদাই!

শেষে এভাবেই জ্বলেপুড়ে তারা ছাইভস্ম হল। বাহিনীর সেই সেনা-অফিসারকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল, যে কোনোপ্রকার যাচাই-বাছাই না করেই সৈন্যদলে এই দুশমনদের ভর্তি করে নিয়েছিল।[১৬৯]

জিহাদের ঘোষণা

পাঁচ ফেদাইকে কঠিন সাজা দেবার সাথে সাথেই সুলতান জালালুদ্দীন বাতেনি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। এই জিহাদের পুরো ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা সাজানোর পর শক্তিশালী একটি বাহিনী নিয়ে ঘন কালো মেঘপুঞ্জের মতো চারপাশ অন্ধকার করে বাতেনি সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

---

[১৬৭] অর্থাৎ, আওর খানের হত্যার দিন

[১৬৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ২৪৮

[১৬৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ২৩১; ইবনে খালদুন, ৫/১২৭; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৬৬-১৬৮; হাসান ইবনে সাব্বাহ, ৬৬-৬৭;

স্মর্তব্য, কাউকে আগুনে জ্বালিয়ে মারা শরিয়তের শাস্তিপ্রদানের নীতি অনুযায়ী জায়েজ নেই। এজন্য সুলতানের এই কাজ অনুসরণযোগ্য নয়।

বাতেনিদের অধিকাংশ দুর্গ অত্যন্ত সমুন্নত পাহাড়-পর্বত, অনতিক্রম্য উপত্যকা ও পরিখার ভেতর স্থাপন করা হয়েছিল। এজন্য বিগত এক শতাব্দী থেকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মুসলিম-বিজেতারা বারবার উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়েও এদের শক্তি নিঃশেষ করতে পারেননি; ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য এসে এই কঠিন মিশন সুলতান জালালুদ্দীনের জন্য একেবারে সহজ করে দিল। সুলতান বিস্ময়করভাবে কয়েক মাসের লক্ষ্য মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে অর্জন করে উঠলেন। সুলতানের আগমনের খবর শোনামাত্র পুরো বাতেনি সাম্রাজ্যে যেন ভূকম্পন জেগে উঠল। তাদের আত্মায় ভয়ের এমন শীতল প্রবাহ বয়ে গেল যে, কোথাও তারা খুব একটা জমিয়ে মোকাবেলাও করতে পারল না।

সুলতানের সিপাহিরা খোরাসানের কুহেকুরদ থেকে নিয়ে বাতেনিদের প্রাণকেন্দ্র আলামুত পর্যন্ত যত দুর্জয় ঘাঁটি ছিল, সব একদম গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। এই কাফের ও মুরতাদদের জান্তব কর্মীদের ধীরে-ধীরে সব জায়গায় নির্বিচারে হত্যা করা হল। বাচ্চাকাচ্চা ও নারীদের বন্দি করা হল। এবং জব্দ করে নেওয়া হল বাতেনিদের সমস্ত সম্পত্তি।[১৭০]

সুলতানের ভাগ্যে যদি আরো কয়েকটা দিন মিলত, তা হলে এই এক মিশনেই আলামুত জয় করে ভূপৃষ্ঠ থেকে বাতেনিদের নামনিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ দক্ষিণ-পূর্ব থেকে তাতারদের উৎপাতের খবর এসে আচানক তাকে এখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করল। তিনি বাতেনি সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। দম আটকে ছিল শুধু নাকের ডগায়। তাদের এমনভাবে অস্তিত্ব-সংকটে ফেলে দিয়েছিলেন যে, ৬৫৬ হিজরিতে হালাকু খানের এক হামলাতেই আলামুতের পুরো বাতেনি সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

খঞ্জর ও তলোয়ার

সুলতান জালালুদ্দীনের এই যুদ্ধ-জয় বাতেনি ইমামের ভেতরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। সুলতানের ফিরে যাবার পর পরবর্তী সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তার সাথে সে সম্পর্ক ভালো করবার চেষ্টা জুড়ে দিল। সুলতান জালালুদ্দীন তখন রায় শহরে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ করেই তার কাছে বাতেনি দূত এসে উপস্থিত হল। এই দূতের সাথে নতুন ফেদাইও ছিল। দূত তার মনিবের পক্ষ থেকে সুলতানের কাছে পয়গাম পৌঁছাল যে—এই ফেদাইরা আপনার ইশারায় জান পর্যন্ত কোরবান করে দিতে পারে। আপনি এদের মাধ্যমে যে দুশমনকেই চান, হত্যা করাতে পারবেন।

---

[১৭০] ইবনুল আসির, ৭/৬৪০; ইবনে খালদুন, ৫/১২৭

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

আর তোমরা এই কাফেরদের সাথে সেসময় পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না দূরীভূত হয় ফেতনা এবং দীন হয়ে যায় কেবল আল্লাহরই।[১৭৩]

মুসলিমবিশ্বে তাতারদের দ্বিতীয় দফা আগ্রাসন

এ পর্যন্ত যা-কিছু পড়ে এসেছেন, তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের অপরিসীম মেহনত-মুজাহাদার উদ্দেশ্য ছিল কেবল তাতার-জাতির সর্বগ্রাসী সয়লাব থেকে মুসলিমবিশ্বকে রক্ষা করা। এ-ও পড়ে এসেছেন যে, তাতারদের সাথে সুলতানের শেষযুদ্ধ ৬১৮ হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। তারপর এখন পর্যন্ত (৬২৪ হিজরি) তাদের সাথে সুলতানের যদিও সরাসরি কোনো যুদ্ধ বাধেনি; কিন্তু এই ছয় বছরের ভেতর সুলতানের বিপুল দৌড়ঝাঁপের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটাই—যেভাবেই হোক তাতারদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে হবে পুরো মুসলিমবিশ্বকে।

৬ বছরের মধ্যে প্রথম ২ বছর (৬১৯-৬২০) সুলতান জালালুদ্দীন হিন্দুস্থানের ধুলোবালি দিয়ে মুসলিমদের জন্য গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন এক নতুন প্রতিরক্ষা-দুর্গ। তাতাররা তখন খাওয়ারিজম ও তৎসংলগ্ন মুসলিমবিশ্বে রাজত্ব করার পর, নিজেদের অগ্রনায়ক চেঙ্গিজ খানের পথনির্দেশনায় চীন, রাশিয়া ও ইউরোপের নতুন নতুন অঞ্চলের পথে পা বাড়িয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীনকে এক বাস্তুহারা পরাজিত প্রতিপক্ষ ভেবে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এদিকটায় তারা মনোনিবেশ করেনি। কিন্তু হিন্দুস্থান থেকে সুলতান ফিরে এসে ২ বছর (৬২১-৬২২) ধরে দিনরাত ক্লান্তিহীন পরিশ্রম শেষে যখন নতুন রাজ্য গড়ে তুললেন, তখনই তাতারদের চোখ খুলে গেল। তবে, ততক্ষণে আশপাশের মুসলিম শাসকদের ঐক্যবদ্ধ করে এক মজবুত প্রতিরক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন সুলতান। মুসলিম শাসকদের এই ঐক্যবদ্ধতা যতক্ষণ স্থায়ী ছিল, তাতাররা মুসলিমবিশ্বের সীমান্তে এসে আঘাত হানতে পারেনি।

৬২৩ হিজরির মাঝামাঝিতে এসে মুসলিম শাসকদের এই ঐক্যবদ্ধতার দেয়ালে চিড় ধরে গেল এবং বছর পেরোতে-না-পেরোতে মুছে গেল ঐক্যের প্রায়

---

[১৭৩] আনফাল, আয়াত : ৩৯

শেষচিহ্নটুকুও। গোবি মরুভূমিতে তখন জীবনের সর্বশেষ প্রহরগুলো গুনছিলেন বুড়ো চেঙ্গিজ খান। তিনি চাচ্ছিলেন—জীবনপ্রদীপ নিভে যাবার আগে এই বিপজ্জনক প্রতিপক্ষকে ভূপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে যাবেন। তখনো বুরাক হাজিব ও তার মতো কুচক্রী আমিররা তাতার-জাতির বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন হিসেবে মুসলিমবিশ্বে কাজ করে যাচ্ছিল। বুরাক হাজিব চেঙ্গিজ খানকে সুলতান জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের জন্য আহ্বান করেছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর পারস্পরিক ঐক্য টুটে গিয়েছিল বলে সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযানে নামার এটাই ছিল যথোপযুক্ত সময়।

চেঙ্গিজ খানের মনে তখনো খেলা করছিল অবশিষ্ট পুরো মুসলিমবিশ্বকে দখল করবার বাসনা। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন—সুলতান জালালুদ্দীনকে রাস্তা থেকে হটাতে না পারলে তার এই আশা কখনোই পূরণ হবে না। তাই ৬২৪ হিজরিতে (১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতানকে নিশ্চিহ্ন করবার পূর্ণ প্রস্তুতি আরম্ভ করল তাতাররা। সে বছরের দ্বিতীয়ার্ধে, সুলতান জালালুদ্দীন যখন বাতেনি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন, তাতারদের নতুন সয়লাব তখন কয়েকদিক থেকে অগ্রসর হয়ে সুলতানের সীমান্ত এলাকাগুলোর দিকে বাড়ছিল।

তাতার-বাহিনীর অগ্রযাত্রা

সুলতান জালালুদ্দীন তাতার-বাহিনীর অগ্রাভিযানের সংবাদ যথাসময়ে পেয়ে গেলেন। বাতেনিদের অবশিষ্ট সেনাশক্তি ও তাদের প্রাণকেন্দ্র আলামুতকে সেই অবস্থায় ছেড়ে ফিরে এলেন তিনি। এর মধ্যেই জানতে পারলেন তাতাররা একই সময়ে কয়েকটি অঞ্চলে আক্রমণ করবার ইচ্ছা করেছে। তাদের একটি ভারী সেনাদল রায় শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

সুলতান বুঝে গেলেন—তাতাররা এখন তাকে পাকড়াও করার সাথে সাথে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে চাচ্ছে অবশিষ্ট মুসলমবিশ্ব। তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—তাতাররা যদি রায় দখলের পর নিজেদের ঘাঁটি মজবুত করে নিয়ে সরাসরি ইরাক, সিরিয়া অথবা আরবের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেলে, অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠবে! এই শঙ্কায় তিনি অন্য সমস্ত দিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে দ্রুততার সাথে রায় শহরের দিকেই ছুটলেন।

তিবরিজের বিদ্রোহ

সবে হামাদান পৌঁছেছেন সুলতান। এর ভেতর খবর পেলেন—তিবরিজের সাবেক শাসক উজবুক মুজাফফর উদ্দীন বাহলোয়ানের এক ক্রীতদাস ফেতনাবাজদের একটি বিরাট দল নিয়ে বিদ্রোহ করে বসেছে। সে উজবুক পাহলোয়ানের প্রতিবন্ধী ছেলে মালিক খামুশকে তার পিতার স্থলাভিষিক্ত বানাতে চাচ্ছে।

সময়টা ঠিক এরকম—যখন সুলতান জালালুদ্দীনের জন্য একান্ত জরুরি ছিল বহিঃশত্রুর মোকাবেলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। কিন্তু অভ্যন্তরীণ এই ষড়যন্ত্র তার জন্য কঠিন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে ওঠে। সুলতান অবস্থার সঙ্গিনতা অনুভব করে উজিরে আজমের হাতে কিছু ফৌজ প্রদান করে তাকে এই রাষ্ট্রদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে পাঠিয়ে দেন। আর বাহিনীর বেশিরভাগ অংশ নিজ কমান্ডে নিয়ে রায় নগরের দিকে তিনি অব্যাহত রাখেন সফর।

উজিরে আজম ফিরে গিয়ে বিদ্রোহের আগুন খুব দ্রুতই শীতল করে দিতে পারেন। বিদ্রোহী-নেতাদের ধরে হত্যা করে ফেলেন।

এদিকের এই হাঙ্গামা থেকে মুক্ত হতে পেরে তাতারদের মুখোমুখি হবার জন্য একাগ্রচিত্তে অভিযানে নিবিষ্ট হন সুলতান জালালুদ্দীন।[১৭৪] বুকের উপর থেকে যেন নেমে যায় দুশ্চিন্তার একটা ভারী পাথর। এবার তিনি দুর্দম তেজে রায় শহরের দিকে ছুটে চলেনে। ওদিকে তাতাররাও রায় নগরীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছিল। ফলে, সেদিন দুই বাহিনীর প্রত্যেকেরই প্রধান চেষ্টা ও কামনা হয়ে ওঠে—কার আগে কে পৌঁছতে পারে গিয়ে রায় শহরের প্রাচীরের মুখে!

রায় নগরীর প্রথম যুদ্ধ

তাতাররা সবে রায় থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত দামেগান এসেছে। সুলতানের বাহিনী অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রায় নগর রক্ষার উদ্দেশ্যে ঠিক সময়ে এসে শহরে পৌঁছল। তারপর... খোলা প্রান্তরে প্রায় ছয় বছরের দীর্ঘ বিরতির পর ফের একবার মুখোমুখি হয়ে উঠল দুইপক্ষ। সবার চেহারা থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ছিল ঘৃণা, শত্রুতা ও ক্রোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এই ক্রোধের ভেতরেই সম্মিলিত কণ্ঠের এক হুল্লোড় তুলে ছুটে গিয়ে লড়াই বাধিয়ে দিল দুইদল। একে অন্যের উপর বজ্রের মতো শক্ত ঝটকায় ফেটে পড়তে লাগল। দুদিক থেকেই ঝাঁকে-ঝাঁকে এমন তির-বৃষ্টি শুরু হল যে, মনে হতে লাগল—ঘনকালো মেঘবাদলে ছেয়ে গেছে সারা আকাশ। সাঁই সাঁই শব্দে ছুটে যাওয়া সেসব তিরের আঘাতে নিমেষে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল দুদিকের অসংখ্য সিপাহি।

তারপর এল তরবারি ও বর্শার পালা। অশ্বারোহীরা ঘোড়ার উরুর কাছে পদাঘাত করে উদ্ধত ভঙ্গিতে তরবারি ও বর্শা উঁচিয়ে একে অন্যের দিকে ছুটে গেল। পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে যেতে লাগল খরধার বর্শা। খুব কাছে থেকে শুরু হল সম্মুখযুদ্ধ। আঘাতে-আঘাতে চিকচিকে সাদা হয়ে-ওঠা তরবারিগুলো ক্রমাগতভাবে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তন করে বালুতে ফেলতে লাগল।

---

[১৭৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩২, খাওয়ারিজম শাহি ১৭৯

সবদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল মৃত্যুর ভীতিকর আওয়াজ। হক-বাতিলের এই কঠিন যুদ্ধ দিনভর জারি রইল। ইসলামি বাহিনীর সেনাপতিরা একে অন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের বীরত্বের প্রকাশ ঘটাচ্ছিল। শেষকালে এসে মুসলিম বাহিনীর উপর নাজিল হল আল্লাহর সাহায্য।

কুফরের ধ্বজাধারী তাতাররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন এত সহজে তাদের ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। তিনি পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়ে পুরো পরিকল্পনা ও সতর্কতার সাথে পলায়নরত শত্রুদের ধাওয়া করলেন। কয়েকদিন পর্যন্ত তাড়িয়ে তাড়িয়ে এদিকে-ওদিকে ঘেরাও করে ফেলা, হত্যা ও গ্রেফতার করার ধারা অব্যাহত রাখলেন।

এভাবে মুসলিমরা সেদিন পরাস্ত তাতার-বাহিনীর একটা বড় অংশকে হত্যা ও তাদের ভারী একটা দলকে বন্দি করে নিল।

এই বিপুল বিজয়ের পর তৎক্ষণাৎ সংবাদ এল—তাতারদের অন্য একটি বড় বাহিনী রায় নগরীর দিকে যাত্রা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান রায় নগরীর উপান্তে সেনাশিবির স্থাপন করে শত্রুদের এই নতুন দলের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। কিন্তু বছরের শেষ পর্যন্ত এই দ্বিতীয় বাহিনী সুলতানের মোকাবেলার জন্য এখানে এসে আর পৌঁছায়নি।[১৭৫]

সেসময় বাহ্যত মনে হয়েছিল—প্রথম বাহিনীর পরাজয়ের ফলে দুশমন হয়তো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অগ্রযাত্রা পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে খুলে গেল বাস্তবতার পর্দা—সেই দিনগুলোর কোনো এক সময় গোবি মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া মানবকুলের শ্রেষ্ঠ হন্তারক চেঙ্গিজ খান মৃত্যুর কাছে হেরে গিয়েছিলেন জীবনের বাজি।

আবাদভূমির প্রায় অর্ধেকাংশ নিয়ে গড়ে-ওঠা বিশাল সাম্রাজ্য থেকে এই বিশ্ববিজেতা চিরতরে বিমুখ হয়ে এবার প্রোথিত হয়ে গেলেন শুধু দু-গজ জমিনে, কয়েক টুকরি মাটির নিচে।

বড় বড় শহর, দুর্গ, মহল্লা ও লাখো জনশক্তি নিয়ে গড়ে-ওঠা পৃথিবীর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বাহিনী, পুত্র, পৌত্র, অনুচর, সেবায়েত ও সম্পদের বিপুল ভান্ডার—এই সবকিছু, যা তিনি দুনিয়াতে হাসিল করেছিলেন, পেছনে ফেলে রেখে স্বীয় খালিক ও মালিকের সামনে যাবতীয় কুকর্মের ফিরিস্তি পেশ করতে চলে গেলেন। পৃথিবী থেকে তিনি মহাপ্রলয় পর্যন্ত সহস্র অভিশাপ ও তিরস্কার পেতে থাকবেন। আর আখেরাতে জাহান্নামের আগুনের চিরকালীন সাজা প্রাপ্তির যোগ্য তো হয়ে গেছেন বহু আগেই।

---

[১৭৫] ইবনুল আসির, পৃষ্ঠা ২৪০

শিক্ষার বিষয় হল—তিনি পৃথিবীর সর্বাধিক ভূখণ্ডে রাজত্ব করা সত্ত্বেও নিজের জন্য এমন একটি কবরও বানিয়ে যেতে পারেননি, যা তাকে করে রাখবে স্মরণীয়। তার মৃত্যু সফরকালেই এক অনাবাদ মাঠে ঘটেছিল। সেখানেই দাফন করে দেওয়া হয়েছিল তাকে।

কয়েক বছরের ভেতর ভূমির পরিবর্তন-পরিবর্ধনে এই জায়গাটা এমনভাবে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে, হাজার প্রচেষ্টার পরও খোদ উত্তরসূরিরাও তার কবরের সন্ধান পায়নি। চেঙ্গিজ খানের মৃত্যু ১৮ আগস্ট, ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে (৪ রমজান, ৬২৪ হিজরি) ঘটেছিল।

তার মৃত্যুর পর কারাকোরামে সিংহাসনে আরোহণ করে তার পুত্র উকতাই খান।[১৭৬]

চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুতে উত্তরসূরি ও স্থলাভিষিক্তদের উপর ছেয়ে যায় দুশ্চিন্তার ঘনঘোর মেঘ। শোকে আপাদমস্তক মুহ্যমান হয়ে যায় তারা। তারপর কিছুকাল বাইরের কোনো যুদ্ধে ভ্রুক্ষেপ করবার সামর্থ্য তাদের হয়নি।

---

[১৭৬] তারিখু মুখতাসারিদ্দুওয়াল ২৪৪-২৪৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/২৪৩, আল-ই'লাম বি-ওফায়াতিল আ'লাম ২/২৫৭

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

কায়কোবাদের সাহায্য

সেই দিনগুলোতেই এশিয়া মাইনরের শাসক আলাউদ্দীন কায়কোবাদের দূত ইমাদুদ্দীন সুলতান জালালুদ্দীনের রাজধানী তিবরিজে এসে উপনীত হয়। সুলতান যেহেতু তাতারদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ইরান চলে গিয়েছিলেন, তাই ইমাদুদ্দীন খুবি শহরে সুলতানের উজির শারফুল মুলকের সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছে প্রদান করে আলাউদ্দীন কায়কোবাদের নিম্নোক্ত চিঠি :

'নিঃসন্দেহে সুলতান জালালুদ্দীন মুসলিমবিশ্বের পূর্ব সীমান্তের অঞ্চলগুলোতে তাতারদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। এদিকে আমরা পশ্চিম সীমান্তে কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করছি। চলতি বছরে তাদের কিছু দুর্গ আমরা জয় করে নিয়েছি। এই নাজুক সময়ে আপনার বিরুদ্ধে আশপাশের কিছু শত্রু পুষে রেখেছে অলীক বাসনা। তারা কুটিল চক্রান্ত লালন করছে। কিন্তু আমরা আপনার পাশে আছি। আপনি ডাক দেওয়ামাত্র আমরা হাজির হবো। আমাদের সবসময় পাশে পাবেন। আমাদের ও আপনাদের রাজ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই।

কেউ যদি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য উঠে দাঁড়ায়, কিংবা আপনার মোকাবেলায় কোষমুক্ত করে তরবারি, তা হলে আমরা আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা করব। শত্রুদের সেই তরবারি মুহূর্তের মধ্যে কোষবদ্ধ করতে বাধ্য করব। বরং বাধ্য করব নাক দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে। আমরা তাদের খেল খতম করে দেব।'

উজিরে আজম দূতকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেন। চিঠির জবাব দেওয়ার আগে আমিরদের একত্র করে পরামর্শ চান। তাতার-বাহিনীর শঙ্কা থাকার দরুন সেনাবাহিনী গঠনের জন্য সুলতানের যেহেতু বিরাট পুঁজির দরকার, তাই আমিরগণ অভিমত দিল—সুলতান কায়কোবাদ পাশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। তার এই বক্তব্যের জবাবে শুধু আর্থিক সহায়তার কথাই ইঙ্গিতে বলে দেওয়া হোক। যুদ্ধের জন্য সৈন্যদলে ইরান ও ইরাক থেকেও লোক ভর্তি করিয়ে নিতে পারব। এ নিয়ে বেশি সমস্যা হবে না। এখন আর্থিক সহযোগিতাটাই বেশি দরকার।

কায়কোবাদকে উজির শারফুল মুলকের পক্ষ থেকে খাওয়ারিজমিদের বর্তমান প্রয়োজনের মল ক্ষেত্রটি জানিয়ে দেওয়া হল। চিঠি পাঠানো হল : 'আপনি নিশ্চয় জানেন তাতারদের উপর্যুপরি আগ্রাসনে খাওয়ারিজমের সেইসব ধনভান্ডার লুট

হয়ে গেছে, যা বহু শতাব্দী ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছিল। সুলতান জালালুদ্দীন তার পিতার মৃত্যুর পর এমন এক সংকটপূর্ণ সময়ে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করেছেন যে, তার কাছে নিজের তরবারি ছাড়া কিছুই নেই। এ অবস্থায় আপনি যদি তার জন্য ভারী অর্থের যোগান দিতে পারেন, তা হলে এই অনুগ্রহ সুলতান কখনো ভুলবেন না। সবসময় চর্চিত হতে থাকবে আপনার এই কাজের সুখ্যাতি।'

কায়কোবাদ এই পত্রের জবাবে বিপুল অর্থ ও উপঢৌকন পাঠিয়ে তাতার-বিরোধী জিহাদে অঙ্কিত করে ফেললেন নিজের নামখানা।[১৭৭] তাতারদের সাথে ঘটে-যাওয়া এইসব যুদ্ধের দিনগুলোতে কায়কোবাদ ছাড়া কোনো শাসকই সুলতানের জন্য মৌখিক একটু সমবেদনাও প্রকাশ করেনি। বরং, বাতেনিরা তো পুরোদমে সুলতানের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে অপতৎপরতা চালিয়ে গেছে। অব্যাহত থেকেছে সিরিয়ার শাসকদের ঘৃণিত কর্মকাণ্ডও।

একটি অশুভ ধারণা

সুলতান জালালুদ্দীনের পিতা খলিফা নাসিরের খেল খতম করে দেবার জন্য ৬১৪ হিজরি সনে দক্ষ তদবিরকারী আল্লামা সাক্কাকিকে দিয়ে একটি পুতুল তৈরি করিয়ে কাজি মুজিরুদ্দীনের মাধ্যমে তা বাগদাদের মাটিতে দাফন করিয়েছিলেন। খাওয়ারিজমি মহলের কিছু সদস্যের ধারণা ছিল, আল্লামা সাক্কাকির এই কাণ্ডের উলটো প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল বলেই সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের ক্ষমতার সূর্যে গ্রহণ লেগে গিয়েছিল। ফলে, এই লোকগুলো সুলতান জালালুদ্দীনকে জোর দিতে লাগল যে, এই জাদুটির বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচতে খোঁজ লাগিয়ে পুতুলটি উদ্ধার করে নষ্ট করে ফেলা হোক। বলা যায় না ফের এই পুতুলের আছরে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়তে পারে খাওয়ারিজমি শক্তির পতাকা!

এইসব আজগুবি সংশয়ে সুলতানের খানিকমাত্র বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু এই আমিরদের গোঁ-ধরা মনোভাবের মুখে এদের সংশয় দূর করবার জন্য কাজি মুজিরুদ্দীনকে ফের তিনি বাগদাদে পাঠালেন। মুজিরুদ্দীন বাগদাদে পৌঁছে অস্থির হয়ে সেই জায়গাটা খুঁজতে লাগলেন, শাহের আমলে যেখানে তিনি পুতুলটা দাফন করেছিলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানের পরও শেষ পর্যন্ত কোনো খোঁজ মেলেনি। মুজিরুদ্দীনের নিষ্ফল প্রত্যাবর্তনে সংশয়বাদীরা আরো বেশি দোদুল্যমানতায় পড়ে যায়। ব্যাপারটাকে তারা সুলতান জালালুদ্দীনের পতনের প্রেক্ষাপট মনে করতে থাকে।[১৭৮]

---

[১৭৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৬১-২৬২, খাওয়ারিজম শাহি ১৮১

[১৭৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৫৩-২৫৪

আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের মৃত্যু

এর মধ্যেই সুলতানের সাবেক মিত্র আল-মালিকুল মুয়াজ্জম ঈসা ইবনে আল-মালিকুল আদিল মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা ৬২৪ হিজরির জিলকদ মাসের। মুয়াজ্জমের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তার পুত্র মালিক আন-নাসের দাউদ।[১৭৯]

রায় নগরীর দ্বিতীয় যুদ্ধ

৬২৫ হিজরি সনে (১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) তাতারদের নতুন খাকানে আজম উকতাই খান পিতা চেঙ্গিজ খানের মিশন পূরণ করবার জন্য পূর্বের তুলনায় অধিক প্রস্তুতি শুরু করল। এবং সে এক বিশাল সৈন্যবহর পাঠাল সুলতানের মোকাবেলায়। সুলতান জালালুদ্দীন তখন তিবরিজে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ তার গোয়েন্দারা এসে জানাল—তাতার-বাহিনী জাইহুন-নদী পেরিয়ে গেছে। এখন তাদের অভিমুখ ইরাকের দিকে।[১৮০]

তাতারদের এই বাহিনীর নেতৃত্ব বাজি নৈয়ান, বাকু নৈয়ান ও আসর তাগানের মতো দক্ষ সরদারদের হাতে ছিল।[১৮১] তারা সৈন্যদল নিয়ে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু খোরাসানকে যখন আগে থেকেই বিধ্বস্ত দেখতে পেল, রওনা দিল রায় নগরীর দিকে।[১৮২] এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইস্পাহানের দিকে যাত্রা শুরু করে তাতারদের শক্তপোক্ত আরেকটি বাহিনী।[১৮৩]

সুলতানের পরিবার তখন ইস্পাহানেই ছিল।[১৮৪] কিন্তু রায় নগরীর যুদ্ধটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভেবে এদিকেই সুলতান রওনা দিয়েছিলেন। রায়ের কাছাকাছি পৌঁছতেই তাতার নরপশুদের সাথে ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে গেল সুলতানের। এবার তাতারদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। অথচ সুলতান জালালুদ্দীন প্রাসঙ্গিক কিছু কারণে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগই পাননি। তবু, সে মুহূর্তে যে পরিমাণ শক্তি তিনি জমিয়েছিলেন, তা-ই নিয়ে জীবন বাজি লাগিয়ে এদের সাথে শুরু করে দিলেন যুদ্ধ। কিন্তু সর্বশক্তি খাটিয়েও রুখতে পারলেন না তাতারদের অগ্রসরমান সয়লাব। শেষকালে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুলতানকে পিছে হটতে হল। সুলতানের এই

---

[১৭৯] ইবনুল আসির ৭/৬৪১, আল-ই'লাম বি-ওফায়াতিল আ'লাম ২/২৫৭

[১৮০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩২, খাওয়ারিজম শাহি ১৬৮

[১৮১] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[১৮২] ইবনুল আসির ৭/৬৪৪

[১৮৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩২, খাওয়ারিজম শাহি ১৬৮, তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[১৮৪] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

পিছিয়ে আসার ব্যাপারটা পরাজয় বরণ করে নেওয়ার পদ্ধতিতে ছিল না। বরং এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছে সরে এসে তিনি সঞ্চিত করে ওঠেন নিজের সমস্ত শক্তি। তারপর আরেকটি রণক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়ে বিপুল তেজে আক্রমণ চালান। কিন্তু এবারেও দুশমনকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। শেষমেশ বাহিনীকে আরো একবার পিছু হটতে নির্দেশ দিলেন। পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছু দুশমন। তাদের ওলট-পালট করে দিয়ে ইস্পাহানের দিকে ছুটে গেলেন।[১৮৫] ইস্পাহানে তখন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তাতারদের অভিযানরত দ্বিতীয় দলটি।

ইস্পাহানে সুলতান

ইস্পাহান ছিল সেই সৌভাগ্যপূর্ণ একটি শহর, তখন পর্যন্ত তাতাররা যেটিকে একবারও কবজা করতে সক্ষম হয়নি। এর একটি বড় কারণ, আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে প্রথমদিকে তাতাররা সাধারণত যেসব পথে ঘোড়া ছুটিয়েছিল, ইস্পাহান সেদিকে ছিল না। ভিন্নদিকে পড়েছিল। দ্বিতীয় কারণ, এই শহরের প্রাচীরগুলো ছিল খুব উঁচু ও মজবুত। তা ছাড়া এখানকার বাসিন্দারা নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতায় চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ ছিল। ঈদসহ অন্যান্য উৎসবে সিপাহিসুলভ পোশাক পরে সামরিক কায়দায় মার্শাল আর্টের প্রদর্শনী ছিল এদের একটি পছন্দনীয় কাজ।

তারিখে কাবিরে উল্লিখিত ঐতিহাসিক আবদুল লতিফ বাগদাদির একটি বর্ণনা আমাদের জানায়—তাতাররা তাদের অভিযানের শুরুর দিকে একবার এখানে এসে আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু তখন তাদের কঠিন এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। শহরবাসী নিশ্চিন্তে তাদের জন্য খুলে দিয়েছিল দরজা। তাতাররা ভেতরে ঢুকতেই চারদিক থেকে তাদের ঘিরে এমনভাবে হত্যা করতে শুরু করেছিল যে, একজনও এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারেনি। তারপর সুলতানের সাথে যুদ্ধ ও অন্যান্য মিশনের কারণে দ্বিতীয়বার তারা ইস্পাহানের দিকে আসতে পারেনি।

যা হোক, এবারকার আক্রমণে তাতাররা ইস্পাহানবাসীর রক্তে নিজেদের তরবারিগুলোর পিপাসা মেটাতে অস্থির হয়ে উঠল।

ইস্পাহানে পৌঁছে সুলতান জানতে পারলেন—তাতারদের দ্বিতীয় দলটি ইস্পাহান থেকে স্রেফ একদিনের দূরত্বে ছাউনি স্থাপন করেছে।[১৮৬] যেকোনো সময় এসে হামলা করতে পারে। এদিকে শহরবাসীর প্রতিরোধ-প্রস্তুতি ছিল নামেমাত্র।

---

[১৮৫] ইবনুল আসির ৭/৬৪৪

[১৮৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৩, তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

শুধু ইস্পাহানের মজবুত প্রাচীরের নিরাপদ আশ্রয়ের কারণে তাতারদের হাত থেকে এখনো তারা বেঁচে ছিল। কিন্তু অবস্থা এবার পুরোপুরি ভিন্নদিকে মোড় নিল। সাধারণ ও বিশিষ্ট শ্রেণির সবাই মৃত্যুকে চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখছিল। তাতারদের ভয়ে আশপাশের সব হাকিম, সুবাদার নিজ নিজ শহর ও দুর্গ ছেড়ে আশ্রয়ের আশায় ইস্পাহানের দিকে ছুটে আসছিল।[১৮৭] সেনাপতির মনোজগতেও বয়ে যাচ্ছিল ভয়ের অস্বাভাবিক শীতল বাতাস। পরপর দুই ময়দান থেকে সুলতানকে পিছু হটতে হয়েছে বলে এদের জ্বলে-ওঠা সাহসিকতা এবার স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল।

এই অবস্থায় অনেক বড় একটা বোঝা নেমে এল সুলতানের মাথার উপর। তিনি ভাবলেন—আমিও যদি সেই একই রকম অনুভূতির প্রকাশ ঘটাই, যা অন্যদের মাঝে দেখা যাচ্ছে, তা হলে তাতারদের সাথে সংঘর্ষের সম্ভাব্য যেটুকু আলো এখনো ফুটে আছে, তা-ও যাবে উধাও হয়ে। ফলে তিনি হতাশা ও দুশ্চিন্তার সমস্ত কারণ ধামাচাপা দিয়ে ভেঙে-পড়া এই সিপাহিদের মধ্যে অফুরন্ত সাহস যোগালেন। তাদের মহান আল্লাহর বিপুল সাহায্যের আশ্বাস দিলেন।

শিহাবুদ্দীন নাসাবি লেখেন—'সেই সংকটপূর্ণ ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতে কী অফুরন্ত ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের আত্মিক শক্তি, এ থেকে খানিকটা ধারণা করে ওঠা যায় যে, আমির-সরদাররা যখন তাতারদের ইস্পাহানের কাছাকাছি চলে আসার সংবাদ শুনল, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা সুলতানের দোরগোড়ায় এসে পড়ল। কিছুক্ষণ বসবার পর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি মেলে তাদের। তারা যখন দরবারে প্রবেশ করে, সুলতান জালালুদ্দীন তখন আবাসস্থলের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তাদের দেখামাত্র তিনি আগ বাড়িয়ে এমনকিছু বিষয় নিয়ে কথা আরম্ভ করে দিলেন, তাতারদের আগ্রাসনের সাথে যার কোনো যোগসূত্র ছিল না। যেন-বা ইস্পাহান-অভিমুখে তাতারদের এই যুদ্ধযাত্রা কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ই নয়। সুলতানের অঙ্গভঙ্গিমায় এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যে, এদের এই আক্রমণ তো নতুন কোনো বিষয় নয়!

অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপসালাপের পর বসবার জন্য সুলতান তাদের ইশারা করলেন। তারপর, তাতারদের আক্রমণ ঠেকাতে কেমন সূক্ষ্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, সেই বিষয়ে পরামর্শ শুরু করলেন।[১৮৮]

---

[১৮৭] জাহাঁকুশা ২/১৬৮

[১৮৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৩, খাওয়ারিজম শাহি ১৬৮, তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি, জাহাঁকুশা ২/১৬৮

পরামর্শের পর সাম্রাজ্যের সভাসদ ও আমিরদের একত্র করে এক সাহস-জাগানিয়া বক্তব্য দিলেন সুলতান। বললেন—হ্যাঁ, আসলেই আমাদের অনেক বড় এক মিশন এবং কঠিন এক বিপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কিন্তু, এক্ষেত্রে আমরা যদি হেলে পড়ি, অবলম্বন করি ভীরুতা ও কাপুরুষতা, আমাদের বাঁচার কোনো পথ থাকবে না। আমাদের জন্য উত্তম হচ্ছে দুশমনের সাথে প্রচণ্ড শক্তিমত্তায় সংঘর্ষ করা, সেক্ষেত্রে যত কঠিন বিপদই আসুক, বিপুল অবিচলতায় রণাঙ্গনে দৃঢ়পদ থাকা। যদি মহান আল্লাহর পরম অনুগ্রহ আমাদের সঙ্গে থাকে, দুশমনের রক্তলিপ্সা থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারি। আর যদি পরাজিতও হই, কোনো চিন্তা নেই, শাহাদাতের মর্যাদা থেকে তো বঞ্চিত থাকছি না।

সুলতানের এই বক্তব্য ভয়-আতংকে সিপাহিদের রগরেশায় জমে-যাওয়া রক্তপিণ্ডে জাগিয়ে তোলে তাজা উত্তপ্ততা। বিচূর্ণ হৃদয়গুলিতে এনে দেয় ফুসফুস-ভর্তি নতুন উদ্যম ও সাহস। লড়তে প্রস্তুত হয়ে ওঠে সকল সেনা-অফিসার ও সিপাহি।[১৮৯]

জিহাদের প্রস্তুতি

মোকাবেলার জন্য সিপাহিদের প্রস্তুত হয়ে উঠতে দেখে সুলতান জালালুদ্দীন খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এবার তার পুরো অভিনিবেশ বাধা পড়ল শুধু যুদ্ধের সুতোয়। বাহিনীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল যুদ্ধের রসদপত্র। সুলতান সাধ্যের ভেতর অনেকটা পূরণ করলেন এসবের স্বল্পতা। যে পরিমাণ উপকরণ অর্জিত হল, সেটুকুতেই যুদ্ধের জন্য উদ্দীপ্ত করে তুললেন বাহিনীকে।[১৯০] তারপর অগ্রবর্তী দল হিসেবে ৪ হাজার সৈন্যকে দামেগান ও রায় নগরীর দিকে পাঠিয়ে ওদিক থেকে অগ্রসরমান দ্বিতীয় তাতার দলটির যাবতীয় তথ্য আহরণের জন্য নির্দেশ দিলেন। এই অগ্রবর্তী বাহিনী তাতারদের সমস্ত তৎপরতার খবর সুলতানের কাছে পাঠাতে লাগল প্রতিদিন।

ঘটেছিল এই—তাতাররা দামেগান ও রায় থেকে ইস্পাহানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আর সুলতানের যে দলটি তাদের উদ্দেশে সামনে এগিয়েছিল, তারা তাতারদের অবস্থা বুঝে ক্রমাগত পেছন দিকে হটে আসছিল। কিছুদিনের ভেতর এই অগ্রগামী দলটি উলটোপথে আসতে আসতে একেবারে ইস্পাহানে এসে ঠেকল। সুলতানকে বিস্তারিতভাবে অন্যসব সংবাদের সাথে এটাও জানাল যে, শত্রুবাহিনী খুব কাছাকাছি এসে গেছে।[১৯১]

---

[১৮৯] ২/১৬৮

[১৯০] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[১৯১] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি, নিহায়াতুল আরাব ৭/১২৮

মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স ২০২০ইং

সুলতান জালালুদ্দীন বাহিনীর সাহস বৃদ্ধি করতে লাগলেন। চেষ্টা করতে লাগলেন দুশমনের ব্যাপারে তাদের নির্ভীক করে তুলবার। অত্যধিক দৃঢ় করে তোলার জন্য সেনা-অফিসার ও সিপাহিদের থেকে শপথ নিলেন—সবাই এ মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাব না। সমস্বরে সবাই শপথবাক্য পাঠ করল। তারপর সবার সামনে সুলতান নিজেও এই বিষয়ে শপথ করলেন।[১৯২]

জিহাদের সাধারণ ঘোষণা

যেহেতু জনশক্তির স্বল্পতা ছিল প্রকট, এজন্য সুলতান ইস্পাহানের কাজি সাহেবকে জিহাদের সাধারণ ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[১৯৩] এই ঘোষণার পর শহর ও আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সিপাহি ও স্বেচ্ছাসেবকরা দলবদ্ধভাবে সেনাবাহিনীতে এসে যোগ দিতে লাগল। শিরাজের শাহজাদা আবু বকর বিন সাআদ,[১৯৪] যে তার পিতা সাআদ বিন জঙ্গির পরে সিংহাসনে আরোহণ করেছিল, নিজের বাহাদুর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতানের দরবারে এসে পৌঁছল।[১৯৫]

অত্যধিক জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য সুলতান জালালুদ্দীন ইস্পাহানের হাকিম ও কাজি সাহেবকে একটি পদাতিক বাহিনী গঠনের ও সামরিক ট্রেনিং প্রদানের আদেশ দিলেন।[১৯৬] তখনো সুলতান বাহিনীর গঠন ও ব্যবস্থাপনায় লিপ্ত। এর ভেতর একদিন আক্রমণকারী তাতাররা ইস্পাহানের পূর্ব-প্রাচীরের সামনে এসে আবির্ভূত হল। তাজিন নৈয়ান, বাংকু নৈয়ান, বাকুনু নৈয়ান, ইসন তগান নৈয়ান, ইয়াতমাস নৈয়ান ও বাশাউর নৈয়ানের মতো যুদ্ধবাজ মোঙ্গল সরদাররা এই বাহিনীর কমান্ড দিচ্ছিল। এদের সেনাশিবির ছিল আসসিন নামক এক গ্রামের সঙ্গে লাগোয়া।

একদিকে সুলতান ও তার জানবাজ সিপাহিরা মোকাবেলার জন্য পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু কিছু দরবারি, জ্যোতিষী ও রাজ্যের আমিরবর্গ জেদ ধরে বসল যে, তিনদিন পর্যন্ত খোলা প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা হোক! নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুলতান তাদের কথা মানলেন।[১৯৭]

---

[১৯২] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[১৯৩] ইবনে খালদুন ৫/১২৮

[১৯৪] গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ কাব্যগ্রন্থে শেখ সাদি রহ. এর মামদুহ, প্রশংসনীয় ব্যক্তি

[১৯৫] ইবনুল আসির ৭/৬৪৪

[১৯৬] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[১৯৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৩, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭২

অতর্কিত আক্রমণকারীদের কাণ্ডকীর্তি

তাতাররা যখন দেখল—সুলতান প্রাচীরের বাইরে আসতে প্রস্তুত না, তখন এটাকে তারা সুলতানের দুর্বলতা ভেবে অবরোধের জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিল।[১৯৮] অবরোধের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল খাদ্য-রসদের এক বিশাল ভান্ডার জমানো। এজন্য ২ হাজার তাতারের একটি দল লুলু এলাকার পর্বতশ্রেণির কাছে অবস্থিত উপান্তবর্তী গ্রাম ও বস্তিগুলো লুট করার জন্য চলে গেল।

সংবাদ সরবরাহকারীরা এই তথ্য যখন সুলতানের কাছে পাঠাল, তৎক্ষণাৎ ৩ হাজার অশ্বারোহীকে এই লুটেরাদের উপর অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাঠিয়ে দিলেন তিনি। এই অশ্বারোহীরা গিয়ে তাতার-বাহিনীকে পাহাড়ি ঘাঁটিগুলোর মাঝে ঘেরাও করে ফেলল। সবদিক থেকে আটকে ফেলার পর তাদের অধিকাংশকে হত্যা করে ফেলল। এবং প্রায় ৪০০ যোদ্ধাকে বন্দি করে সুলতানের সামনে উপস্থিত করল। সুলতান কিছু বন্দিকে তার বাসস্থানের প্রাঙ্গণে ডেকে নিজ হাতে জাহান্নামে পাঠালেন। বাকিদের সড়কপথে জনতার সামনে হত্যা করা হল। মাটিতে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল তাদের লাশ। সেসব লাশ জনসম্মুখে লটকিয়ে দেওয়া হল খুঁটিতে, যাতে শহরের সাধারণ ও বিশিষ্টজনদের মন থেকে দূর হয়ে যায় তাতার-ত্রাস; সবাই দুর্বার সাহসী হয়ে ওঠে।[১৯৯]

যুদ্ধের ময়দানে..

তিনদিন পেরোবার পর বাহিনী-সমেত সুলতান জালালুদ্দীন ইস্পাহানের প্রাচীর-বেষ্টন থেকে বেরিয়ে এলেন। শহরের বাইরে প্রশস্ত এক ময়দানে সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধ করলেন। তিনি নিজে দাঁড়ালেন বাহিনীর ঠিক মধ্যখানে। ভাই গিয়াসুদ্দীনকে মোতায়েন করলেন ডান বাহুতে।[২০০] ময়দানের অন্যদিকে সারিবদ্ধ হল তাতারদের শক্ত বাহিনী। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ ২২ রমজান ৬২৫ হিজরিতে (২৪ আগস্ট, ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দ) সংঘটিত হয়েছিল।[২০১]

গিয়াসুদ্দীনের গাদ্দারি

দ্রিগদ্রিগ করে ঢেঁড়া বেজে উঠেছে। দুদিকের সৈন্যরাই বর্শা ও তলোয়ার উঁচিয়ে একে অন্যের দিকে ছুট লাগাল। সুলতান ডান ও বাম বাহুর সেনা-অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যখন শত্রুবাহিনীর সেন্টারে গিয়ে আক্রমণ করবেন,

---

[১৯৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৪, খাওয়ারিজম শাহি ১৬৯

[১৯৯] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[২০০] জাহাঁকুশা ২/১৬৮

[২০১] এটি ইবনুল আসির রহ. এর বক্তব্য। অন্য ঐতিহাসিকদের নিকট এটি ৬২৪ হিজরির ঘটনা। কিন্তু কারাঈনের মাধ্যমে ইবনুল আসিরের মতটিকেই প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়।

তখন তারাও যেন সাথে-সাথে শত্রুপক্ষের ডান ও বাম বাহুর উপর সমস্ত শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[২০২] কিন্তু এই নাজুক পরিস্থিতিতে সুলতানের ভাই গিয়াসুদ্দীন গাদ্দারি ও কাপুরুষত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে বসে। নিজ সহচর, কিছু অফিসার ও নেতৃত্বাধীন বাহিনী নিয়ে ডান বাহুর যুদ্ধসারি থেকে আলাদা হয়ে যায় সে। এলচি জাহাঁ পাহলোয়ানও—যে ছিল সুলতানের বাহিনীর অফিসার—গিয়াসুদ্দীনের অনুসরণ করে।[২০৩]

সুলতান জালালুদ্দীন গিয়াসুদ্দীনকে ময়দান ছাড়তে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিন্তু খোদাপ্রদত্ত ধৈর্য ও একীভূত মনোভাবের কারণে এই কঠিন প্রেক্ষাপটেও খানিক-মাত্র বিমূঢ়তা দেখালেন না তিনি।[২০৪] সুলতানের এই হিম্মত দেখে তার অফিসার ও বাহিনীর হিম্মতও স্থির হয়ে রইল। তারা ধারণা করল গিয়াসুদ্দীন হয়তো কল্যাণের জন্যই সুলতানের হুকুমে আলাদা হয়ে গেছে।[২০৫] অন্যদিকে তাতার-বাহিনীর উপরও এই অবস্থাদৃশ্যের উলটো প্রতিক্রিয়া পড়ে। তারা যখন দেখে—খাওয়ারিজমি বাহিনীর ডান বাহু থেকে কয়েকটি দল পৃথক হয়ে অন্য কোনো দিকে চলে যাচ্ছে, মনে শঙ্কা নিয়ে বুঝে ওঠে যে, সুলতান হয়তো যুদ্ধের চাল চালতে পেছন থেকে আক্রমণের জন্য এদের পাঠাচ্ছেন।[২০৬]

সুলতানের সেনা-অফিসার ও তাতার সরদারদের কেউই আসল কাহিনি সম্পর্কে অবগত হতে পারেনি—এটি নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর গায়েবি সাহায্যের কারিশমা ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই যদি মুসলিমদের অন্তর পরাভূত হয়ে যেত এবং তাতারদের ভেতর গর্জে উঠত সিংহহৃদয়, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মুসলিমদের পরাজয় ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না।

রণাঙ্গনের নকশা

এর মধ্যেই যুদ্ধমত্ত হয়ে উঠল দুইদল। লড়াই প্রচণ্ড হয়ে-ওঠায় মুসলিম বাহিনীর ডান ও বাম বাহুর মাঝখানের দূরত্ব অনেক বেড়ে গেল। আক্রমণ চালাতে চালাতে দুই বাহু চলে গেল দুইদিকে। একারণে দু-বাহুর জন্যই মুশকিল হয়ে গেল সেন্টারের সঙ্গে গিয়ে সংযুক্ত হওয়া।

---

[২০২] জাহাঁকুশা ২/১৬৯

[২০৩] ইবনুল আসির ৭/৬৪৪, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭২

[২০৪] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪

[২০৫] খাওয়ারিজম শাহি ১৬৯

[২০৬] ইবনুল আসির ৭/৬৪৪

এদিকে সেন্টারের ইস্পাহানি পদাতিক বাহিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সামনে অগ্রসর হতে দেখে তাতাররা তাদের বিক্ষিপ্ত করে দেবার জন্য একটু দূরে দূরে দু-চারজন করে অশ্বারোহী লাগিয়ে দিল। সুলতান জালালুদ্দীন যখন এগোতে এগোতে সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তাতারদের এই চাল বুঝে ইস্পাহানি পদাতিক বাহিনীকে পিছে হটতে আদেশ দিলেন।[২০৭] এবং এর সঙ্গে-সঙ্গেই ডান ও বাম বাহুকে ইশারা করলেন একযোগে এসে দুশমনের উপর ফেটে পড়তে।[২০৮]

গিয়াসুদ্দীনের দল পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুতে তখনো জমাটবদ্ধ ছিল বিপুল শক্তি। সুলতানের ইশারা পেতেই তারা শত্রুপক্ষের বাম বাহুর উপর এসে এক জোরদার আক্রমণ চালাল। আক্রমণ করতে-করতে তাদের অনেকদূরে কাশানের উপকণ্ঠ পর্যন্ত নিয়ে গেল। অন্যদিকে তাতারদের ডান বাহু মুসলিমদের বাম বাহুতে আক্রমণ করে-করে তাদের একেবারে ময়দানের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত হটিয়ে দিল।[২০৯]

এখানে কিছু আজব দৃশ্যই যেন প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই করে যাচ্ছিল দুই সৈন্যবাহিনীরই ছোট ছোট দলগুলো। ডান বাহুর অফিসারদের বাম বাহু সম্পর্কে কোনো খবর ছিল না আর বাম বাহুর সেনাপতিদের ছিল না ডান বাহুর কোনো খোঁজ। সেন্টারের বাহিনীকে নিয়ে সুলতান জালালুদ্দীন দুই বাহু থেকেই আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।[২১০]

শত্রুপক্ষের পরাজয়

এই এলোপাথাড়ি যুদ্ধও প্রচণ্ড বিক্রমে চলমান ছিল। শেষকালে সুলতানের পরাভূত বাম বাহু নিজেদের পা মজবুত করে উঠতে সক্ষম হল। তাতারদের ডান বাহুতে আক্রমণ চালিয়ে তারা ফিরে এল স্ব-স্থানে।

দিনের শেষভাগে বাহিনী সুবিন্যস্ত করে শত্রুদলের উপর লাগাতার কয়েকটি ধ্বংসাত্মক হামলা করেন সুলতান। এর মধ্যেই মুসলিমদের বাম বাহু দুশমনের ডান বাহুতে প্রচণ্ড আঘাত করে তাদের একদম পিষে ফেলল। শেষমেশ ভেঙে গেল তাতারদের সাহসের প্রাচীর এবং ময়দান ছেড়ে তারা পালিয়ে গেল।[২১১]

সুলতান নিজের বাহিনী নিয়ে দুশমনকে ধাওয়া করে কয়েক মাইল পর্যন্ত গেলেন। বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে তাতার-বাহিনীর কাছাকাছি পৌঁছে তরবারির কোপে বহু তাতারকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিলেন মৃত্যুকূপে।

---

[২০৭] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[২০৮] জাহাঁকুশা ২/১৬৯, খাওয়ারিজম শাহি ১৬৯

[২০৯] জাহাঁকুশা ২/১৬৯

[২১০] জাহাঁকুশা ২/১৬৯

[২১১] শাযারাত ৫/১১৩, আল-ইবার ৩/১৯২, তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

সন্ধ্যাবেলা খুব ক্লান্তি ধরে গেলে ঘোড়ার পিঠ থেকে তিনি নেমে গেলেন।[২১২] সেখান থেকে পাশের একটি উঁচু টিলায় গিয়ে উঠলেন। সূর্য তখন পাটে বসতে চলেছে। সূর্যের ধূসর হলুদ আলোয় সুলতান রুকুর ভঙ্গিতে হাঁটুতে ভর দিয়ে তাতারদের পাগলের মতো পালিয়ে যেতে-থাকা এবং মুসলিম বাহিনীর হাতে তাদের ধ্বংস হতে-থাকা দেখতে লাগলেন।

দিগন্তে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে হুলস্থুল করে ছুটে পালাচ্ছে তাতার বাহিনী। পালাতে গিয়ে গায়ের ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে অনেকেই আচমকা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচ্ছে। পেছন থেকে অগ্রসরমান মুসলিম অশ্বারোহীরা ভূপাতিতদের একদম থেঁতলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সুলতানের সিপাহিরা ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেই বেশ খানিকটা দূর থেকেই কল্লা নামিয়ে ফেলছে শত্রুদের।[২১৩] দৃশ্যটা বড় প্রশান্তি এনে দেয় পেছনে টিলায় দণ্ডায়মান সুলতানের চোখে।

সুলতান জালালুদ্দীন কতক্ষণ ধরে এই দৃশ্য দেখে পুলকিত হয়ে উঠতে থাকেন। কিন্তু অন্ধকারে চারপাশ ঢেকে যাচ্ছে দেখে সিপাহিদের তিনি থামতে নির্দেশ দেন।[২১৪] এই অন্ধকারে শত্রুকে ধাওয়া করে সামনে অগ্রসর হওয়া বড় অসতর্কতা।

কিছুক্ষণ পরই ইলান তুগু নামে মুসলিম বাহিনীর এক উন্নত সেনা-অফিসার সুলতানের কাছে এল। আবেগ-কম্পিত স্বরে আরজ করতে লাগল—হুজুরওয়ালা, বহুপূর্বে আমরা আশা করেছিলাম, যদি আমাদের বিজয় অর্জিত হয়, তা আমরা জীবনভর উপভোগ করব। উৎসবের আয়োজন করব। প্রাণ খুলে দুশমনকে শিকার করব। আলিজাহ, আজ আমাদের সেই স্বর্ণালি সুযোগ এসেছে। কিন্তু আপনি পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করে বসেছেন। তাতাররা তো রাতের অন্ধকারে দু-দিনের দূরত্ব অতিক্রম করে চলে যাবে। তা হলে তাদের আমরা এখন থেকেই ধাওয়া করছি না কেন? কেন আমরা থেমে আছি?[২১৫]

আরো কিছু আমির এই বক্তব্যের প্রতি জোরেশোরে সমর্থন জানাল।[২১৬] সুলতান জালালুদ্দীন বাহাদুর সেনা-অফিসারদের অত্যন্ত কদর করতেন। তাদের প্রত্যেকটি পরামর্শ, জজবা ও অনুভূতির প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ করতেন। এই অফিসারের জজবাতি আবদার ও আমিরদের লাগামহীন সমর্থন করে-যাওয়া

---

[২১২] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[২১৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৫, খাওয়ারিজম শাহি ১৬৯

[২১৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৫, খাওয়ারিজম শাহি ১৭০

[২১৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৫, তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[২১৬] খাওয়ারিজম শাহি ১৭০

দেখে নরম হয়ে গেলেন তিনি। ধাওয়ার অনুমতি প্রদান করে নিজেও তাদের সঙ্গে ঘোড়া হাঁকালেন।

কিছুক্ষণ পর এই ধাওয়ায় বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই শরিক হয়ে গেল। ওদিকে যে সুলতানের বাহিনীর ডান বাহুর কয়েকটি দল পূর্বে তাতারদের বাম বাহুকে আক্রমণ করে-করে কাশান পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে তারা তখনো ফেরেনি।

বদলে গেছে দৃশ্যপট

পরাজিত তাতার-বাহিনীর পলায়নরত কয়েক হাজার সৈন্য সামনে এগিয়ে একটি জায়গায় পৌঁছে সমবেত হয়ে গেল। যেহেতু কিছুক্ষণের জন্য সুলতানের বাহিনী এদের ধাওয়া করা ছেড়ে দিয়েছিল, সেজন্য এদের সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠার একটা সুযোগ মিলে গিয়েছিল।

এর মধ্যেই এরা দেখল—সুদূর দিগন্তে ধুলোবালির মেঘপুঞ্জের ভেতর থেকে ছুটে আসছে খাওয়ারিজমি বাহিনী। ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। চারপাশে একটা মলিন-বিমর্ষ আবছায়া ঝুলে আছে। এরা ভাবল—এই আধো অন্ধকারে অগ্রসরমান মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়া তেমন মুশকিল কিছু না।

তাতাররা তাদের দক্ষ তিরন্দাজদের একটি টিলার পেছনে গোপনে বসিয়ে রাখল। অবশিষ্ট সৈন্যরাও একযোগে হামলে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। যেইমাত্র খাওয়ারিজমি বাহিনী প্রায় মুঠোর ভেতর এসে গেল, তক্ষুনি শুরু হল তাতারদের তিরবৃষ্টি। সাথে-সাথে সমস্ত তাতার-সেনা টিলার আড়াল থেকে বের হয়ে সয়লাবের মতো এসে ইসলামি বাহিনীর উপর একদম ফেটে পড়ল।[২১৭]

তাতারদের এই আকস্মিক ও প্রচণ্ড আক্রমণের প্রথম শিকার হল খাওয়ারিজমি বাহিনীর বাম বাহু।[২১৮] এই বাহুর অফিসাররা নিজেদের যুদ্ধসারি সামলে রাখবার পুরোপুরি চেষ্টা করল; কিন্তু টিকে থাকতে পারল না শেষ নাগাদ। পিছু হটতে হল। তাদের ধাওয়া করতে লাগল তাতারদের ডান বাহু।

নাসাবি বর্ণনা করেছেন—সেদিন খাওয়ারিজমি বাহিনীর আমির আওর খানের কথা খুব বেশি মনে পড়ছিল। তাকে বাতেনিরা হত্যা করে ফেলেছিল। খাওয়ারিজমি বাহিনীর বাম বাহুর কমান্ডার অধিকাংশ সময় আওর খানই থাকতেন। তার বিদ্যমানতায় সবসময় এসে পদচুম্বন করত বিজয়।

এ যুদ্ধে বাম বাহুর পিছু হটে আসার কারণে পুরো বাহিনী অবিন্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এলোমেলোভাবে এক বাহিনী ঢুকে গিয়েছিল আরেক সৈন্যদলের

---

[২১৭] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি, খাওয়ারিজম শাহি ১৭০

[২১৮] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

ভেতর।[২১৯] স্থানে-স্থানে পৃথক পৃথকভাবে বীরত্ব দেখাচ্ছিল সবাই। অন্ধকার ধীরে-ধীরে গাঢ় হয়ে উঠছিল। দোস্ত-দুশমন পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাতারদের কয়েকটি দল পেছন থেকে হামলা করে মুসলিম বাহিনীকে পুরোপুরিভাবে ঘিরে ফেলতে চাচ্ছিল।[২২০] সেন্টারের বাহিনী প্রবল আক্রমণের তোড়ে হটে যাচ্ছিল পেছনে।[২২১] স্বয়ং সুলতানও ভীষণ ফ্যাসাদে পড়ে দুশমনের প্রায় করতলে চলে গেছিলেন। তার দিকে বিরামহীনভাবে ছুটে আসছিল তির, বর্শা ও তলোয়ার। মনে হচ্ছিল, আজ বুঝি তার মৃত্যু নিশ্চিত। জীবনের মেয়াদ যদি প্রথম থেকেই নির্ধারিত না থাকত, তা হলে সুলতানের সেদিন কয়েক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারাও মুশকিল ছিল।[২২২]

ঘেরাও দিয়েছে ভেঙে

মুসলিমরা মনে করল—এই পরিস্থিতিতে তাতারদের সাথে মোকাবেলা করা অনর্থক। ফলে তারা আক্রমণকারীদের ঘেরাও ভেদ করে এদিক-ওদিক চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। এদিকে সুলতান জালালুদ্দীন ৪০০ সৈন্যসহ দুশমনের অবরোধের ভেতর ফেঁসে গেলেন। সৈন্যদের মধ্যে সুলতানের বাহাদুর আমির-উমারা এবং বাহিনীর বড় বড় কিছু সরদারও ছিল।[২২৩] সুলতান লড়াই থেকে ভেগে যাবেন না বলে কসম খেয়েছিলেন। এজন্য তিনি, তার রক্ষীদল ও বিশেষ সহচরবৃন্দ শেষ পর্যন্ত বীরদর্পে মোকাবেলা করে যেতে থাকলেন।

লড়াই চলাকালে একবার সুযোগ পেলেন একটুখানি স্বস্তির; তৎক্ষণাৎ পেছন ঘুরে আশপাশের পরিস্থিতি নিরিখ করে তিনি দেখলেন—তার নিজের পতাকাধারীও পিঠ দেখিয়ে পালাচ্ছে। সহ্য হল না সুলতানের। রাগে তাক করে বর্শা ছুড়ে মারলেন। পতাকাধারী সেখানেই ভূপাতিত হল।

তাতাররা এবার চতুর্দিক থেকে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়ে সুলতানকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছিল। চারপাশ থেকে ধীরে-ধীরে গুটিয়ে আনছিল তাদের বৃত্ত। সুলতানের কাছের সাথিরা জীবন বাজি রেখে সংঘর্ষ করছিল। বিপুল বিক্রমে কেটে ফেলছিল অগ্রসরমান একেকটি তাতার-সেনাকে।

সুলতানের মামাতো ভাই আখশ মালিক সুলতানের দিকে ঝাঁকে-ঝাঁকে নিক্ষিপ্ত তির ফেরাচ্ছিল। তির ফেরাতে ফেরাতে তার সর্বাঙ্গ চালুনির মতো হয়ে

---

[২১৯] জাহাঁকুশা ২/১৬৯, তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[২২০] জাহাঁকুশা ২/১৬৯

[২২১] জাহাঁকুশা ২/১৬৯

[২২২] জাহাঁকুশা ২/১৬৯

[২২৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৬

গেল। একটু পরেই শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করল সে। আমির ও বিশিষ্টজনদের অধিকাংশই ইতোমধ্যে চুমুক দিয়ে ফেলেছে শাহাদাতের পেয়ালায়। সুলতানের সাথে ছিল কেবল ১৪ জন সাহসী দাস।[২২৪]

তাতাররা ফের একবার স্বপ্ন দেখছিল সুলতানকে জীবিত পাকড়াও করে বর্তমান খানে আজমের সামনে তাকে পেশ করে নিজেদের মনোবাসনা পূরণ করবার। সুলতানও এদের সেই কুমতলব টের পেয়ে গেলেন। বুঝে গেলেন—এখন সংঘর্ষ চালিয়ে যাওয়া অনর্থক। বাহ্যত মুক্তির কোনো পথও ছিল না তখন। কিন্তু শেষচেষ্টা হিসেবে আল্লাহকে স্মরণ করে নিজের সমস্ত শক্তি জমিয়ে তিনি আবার একদিকে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। আক্রমণের চোটে সেদিকের শত্রুদের দৃঢ় পা নড়বড়ে হয়ে যায়। বিজলির মতো ঝলকানি দিয়ে উঠতে থাকে সুলতানের তলোয়ার। সংঘর্ষকারী তাতারদের ধরাশায়ী করতে করতে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যে নিজের কয়েকজন জানবাজ সিপাহিকে নিয়ে দ্রুতবেগে শত্রুদের ঘেরাও ভেদ করে বেরিয়ে পড়েন তিনি।

তাতার অশ্বারোহীরা পুরো তেজ নিয়ে তার পেছনে ছুট লাগায়। কিন্তু নিমেষে সুলতান অদৃশ্য হয়ে যান অন্ধকারের ভেতর। বাইনাল নৈয়ান নামে তাতারদের এক সরদার সুলতানের এই 'বীরত্বের সাথে বাঁচার পথ তৈরি করে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্য' দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। এই বিমূঢ়তার ভেতর থেকেই অবচেতনে সে বলে ওঠে, 'তুই সবখানে নিখুঁতভাবে বেঁচে যাস। নিঃসন্দেহে এ যুগের বীরপুরুষ কেবল তুই-ই। তুই-ই প্রতিপক্ষের সাথে যথোপযুক্ত টক্কর নেবার মতো যোদ্ধা।'

তারপর কয়েকদিন পর্যন্ত সুলতানের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিছু লোকের ধারণা ছিল—এই যুদ্ধে তিনি শহিদ হয়ে গেছেন। কেউ কেউ মনে করেছিল সুলতানকে দুশমন বন্দি করে ফেলেছে।[২২৫]

যুদ্ধের বিস্ময়কর পরিণতি

রাত্রি-আঁধারে বেধে-ওঠা এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষমুহূর্তের চিত্রপট ছিল অত্যন্ত বিস্ময়জাগানিয়া। উভয়দলের প্রত্যেক সৈন্য নিজ নিজ প্রতিপক্ষের উপর এলোপাথাড়ি আক্রমণ করে পরিষ্কার করে নিতে চাচ্ছিল নিজের বেঁচে-যাওয়ার রাস্তা। যেমনভাবে সুলতানের সৈন্যদের প্রচেষ্টা ছিল দুশমনের অবরোধ ভেঙে

---

[২২৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭২, তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[২২৫] জাহাঁকুশা ২/১৬৯, রওজাতুস সফা ৪/৮৩০

এদিক-ওদিক বেরিয়ে যাবার, ঠিক তেমনই অন্ধকারে যুদ্ধক্ষেত্রের সঠিক পরিস্থিতি বুঝে উঠতে না-পেরে তাতাররাও নিদারুণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

এই হাঙ্গামা ও হুলস্থুলের ভেতর থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে নিয়ে ময়দান থেকে সরে যেতে চাচ্ছিল তারা। স্থানে-স্থানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষ করছিল মুসলিমদের সাথে। মুসলিমরা যখন কোনো এক দিকে জোরদার আক্রমণ করে তাতারদের কবল থেকে বেরিয়ে পড়ত, তখন তাতারদের দলগুলো ভয়ে-বিস্ময়ে আরো বেশি এলোমেলো হয়ে যেত।

রাতের কালো চাদরে আকাশের উচ্চতায় মিটমিট করে জ্বলা নক্ষত্ররাজি এই ঐতিহাসিক যুদ্ধের শেষদিকে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখছিল—মুসলিম ও তাতার, দু'দলই, রাতের অন্ধকারকে আড়াল বানিয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

হাফেজ যাহাবি এই যুদ্ধে দুপক্ষের কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিণতি নিয়ে লিখেছেন—এটা ছিল এমন এক পালটাপালটি যুদ্ধ, পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে এর কোনো নজির আছে বলে শুনিনি। কারণ, এই এক যুদ্ধ, যেটাতে দু-পক্ষই ময়দান থেকে পরাজিত হয়ে ভেগেছিল।[২২৬]

ইসলামি বাহিনীর অজানা অবস্থা

রাতের অন্ধকারে এই রক্তক্ষরণকারী যুদ্ধের শেষদিকে মুসলিমদের অবস্থা হয়েছিল এই—তাদের সৈন্যদলের একটা বড় অংশ শহিদ হয়ে গেছিল; আহতদের সংখ্যা এতে ধরা হয়নি। বাম বাহু ও সেন্টারের সৈন্যরা জীবিত ফিরে যাওয়ার জন্য পারস্য, কিরমান ও তিবরিজের মতো দূরদূরান্তের এলাকাগুলোর দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছিল।[২২৭] অবশ্য, ইতিপূর্বে ডান বাহুর যেসব সিপাহি তাতারদের বাম বাহুকে পিছু হটিয়ে কাশান পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, তারা এই যুদ্ধে উপস্থিত না-থাকায় ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকতে পেরেছিল। তারা বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে যাবার পর দুইদিন পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রেখে নিজেদের ছাউনি পর্যন্ত ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু যখন তারা সুলতান উধাও হয়ে গেছেন বলে সংবাদ পায়, ভয় পেয়ে তখন আর যুদ্ধ করার হিম্মত করে ওঠেনি।[২২৮] সুলতানের উধাও হয়ে যাওয়া ছাড়াও সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক কারণ ছিল অন্যটা। যেসব দক্ষ নিষ্ঠাবান বাহাদুর সেনা-অফিসারের প্রতি সুলতানের সবচেয়ে বেশি ভরসা ছিল, তারা এই রাতের রক্তপাতের শিকার হয়ে শহিদ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আলপ খান, আরতাক

---

[২২৬] আল-ইবার ৩/১৯২, শাযারাতুয যাহাব ৫/১১৩

[২২৭] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি

[২২৮] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি, ইবনে খালদুন ৫/১২৮

খান, কুজ খান, মাঙ্কি বেগ তাইন ও বুলক খানের নাম ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। শিহাবুদ্দীন নাসাবি বলেন—সুলতানের সহযোদ্ধা আমির ও বিশিষ্টজনদের মধ্য থেকে মাত্র তিনজন (কুচতেগিন পাহলোয়ান, উদক আমির আখওয়ার এবং বিশেষ অফিসার খান বারদি) জীবিত ফিরতে পেরেছিল।[২২৯]

আবু বকর ইবনে সাআদের প্রত্যাবর্তন

ইসলামি বাহিনীর বড় নেতাদের মধ্য থেকে শিরাজের শাসক আবু বকর ইবনে সাআদই শুধু সম্পূর্ণ নিরাপদে সুস্থভাবে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। প্রথমবার তাতারদের পা যখন টলে গিয়েছিল, তখনই তাদের পশ্চাদ্ধাবনে ছুটেছিলেন তিনি। অবশিষ্ট যত দল ছিল, সব থেকে তার দল ছিল বেশি এগিয়ে। সন্ধ্যার সময় সুলতান জালালুদ্দীন যখন তাতারদের ধাওয়া করতে নিষেধ করলেন, তখন আবু বকর ইবনে সাআদ অবশিষ্ট সৈন্য থেকে দূরে চলে-যাওয়ায় ওদিকেই কোথাও রয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি সুলতান ও অবশিষ্ট বাহিনীর কোনো দেখা না পেয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক ভেবে অন্যদিকের পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন শুরু করলেন। প্রত্যাবর্তনের সময়ও সুলতানের সাথে তার পুনর্মিলন হয়নি। এজন্য সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার ধাওয়ায় যোগ দেননি তিনি। ফলে, অন্যরা যে মহাবিপদের মুখে পড়েছিল, তা থেকে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন।[২৩০]

আতাবেগ আলাউদ্দৌলার কোরবানি

আতাবেগ আলাউদ্দৌলা পারস্যের প্রাচীন শাহি খানদানের অন্তর্গত ছিলেন। ৬০ বছর ধরে ইয়ায অঞ্চলে রাজত্ব করে গেছেন তিনি। বয়স বেশি হওয়ায় তাকে ডাকা হতো আবা খান। হিন্দুস্থান থেকে সুলতান জালালুদ্দীনের প্রত্যাবর্তনের পর এই আতাবেগ সুলতানের অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছিলেন। সুলতান খোরাসানের অবশিষ্ট এলাকার শাসনভার সোপর্দ করেছিলেন তার কাঁধে। তার বয়স বেশি হওয়ায় সুলতান তাকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন। এই যুদ্ধে এ বৃদ্ধ আমিরও শামিল ছিলেন।

লড়াইয়ের শেষদিকে বাতেনি ফেরকার এক লোক তাকে গ্রেফতার করে ফেলে। বৃদ্ধ আতাবেগ বাতেনিকে নিজের কাছে থাকা সব স্বর্ণ ও হিরে-জহরত দিয়ে অনেক কষ্টে তার থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তারপর নিজ এলাকায় চলে

---

[২২৯] ইবনুল আসির ৭/৬৪৪

[২৩০] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭২

গিয়েছিলেন তিনি। তখন রাত হয়ে গিয়েছিল অনেক। অন্ধকারে এই বৃদ্ধ যুদ্ধ থেকে ফিরে যেতে যেতে পথিমধ্যে হঠাৎ একটি কুয়ার ভেতর পড়ে যান। সেখানেই মৃত্যু ঘটে তার। সেসময় তার বয়স ছিল ৮৪ বছরের কাছাকাছি।[২৩১]

ইস্পাহান অবরোধ

ইস্পাহানের এই যুদ্ধের শেষভাগে মুসলিম ও তাতার, দুপক্ষই ময়দান ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু তাতারদের মোকাবেলা করতে গিয়ে মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশি। বিশেষত সুলতানের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং বড়-বড় কমান্ডারদের শাহাদাত ঘটার কারণে দ্বিতীয়বার জোটবদ্ধ হবার মতো সক্ষমতা তাদের থাকেনি।

বিপরীতে তাতাররা ময়দান থেকে পিছু হটার পর সুবিন্যস্ত হয়ে আরেকবার সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এবার ইস্পাহান পর্যন্ত পৌঁছতে তাদের সামনে আর কোনো প্রতিবন্ধকতাই ছিল না। তারা পূর্ণ বিজয় অর্জনের জন্য শহর দখল করা ও গণহত্যা চালানো জরুরি মনে করছিল। ফলে কিছুদিনের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের মতো সামনে এগিয়ে তারা ঘেরাও করে নিল ইস্পাহান শহর।[২৩২]

বাতেনিদের উচ্ছ্বাস

গিয়াসুদ্দীন গাদ্দারি ক.রে চলে যাবার পর আশ্রয়ের জন্য বাতেনি ইমাম আলাউদ্দীন খোরশাহের কাছে গিয়েছিল। এদিকে পেছনে সুলতান জালালুদ্দীন গুম কিংবা শহিদ হয়ে গেছেন বলে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সবদিকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাতেনিদের রাজ্যে বেজে উঠল আনন্দের বাজনা। সিরিয়ায় বাতেনিদের প্রতিনিধি শায়েখ মুজাফফর বিন হুসাইন বাতেনিদের ইমামের নামে তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখল—'বেচারা জালালুদ্দীন ইস্পাহানের উপকণ্ঠে মারা পড়েছে। তার বাহিনী টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তার ভাই হুজুরের আশ্রয়ে থাকবার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। ওদিকে তিবরিজে কাজাল আরসালান ওরফে মালিক খামুশের রক্ষীদলও আপনার দাসানুদাস হতে চাচ্ছে। মোটকথা, এখন পুরো ইরান ইমাম আলাউদ্দীনের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।'

পরবর্তীতে এই চিঠি কীভাবে যেন খাওয়ারিজমিদের হাতে এসে গেল। তখন তারা বুঝল যে, বাতেনিরা তাদের মুসিবতে আনন্দ পেয়েছে।[২৩৩]

---

[২৩১] তারিখে গাযিদাহ ১/৫০২, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭২

[২৩২] ইবনুল আসির ৭/৬৪৫

[২৩৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৭৮

সুলতানের বর্তমান অবস্থা

সুলতান জালালুদ্দীন তাতারদের কবল থেকে বেঁচে বেরিয়ে যাবার পর এই ভেবে দ্বিতীয়বার ইস্পাহানের দিকে যাত্রা করেননি যে, তাতাররাও তার পিছু-পিছু ইস্পাহানের দিকে রওনা করে বসতে পারে![২৩৪] তাই তিনি দুশমনের চোখ ফাঁকি দিয়ে লওরিস্তানের পর্বতসারিতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে এক গুপ্ত ঘাঁটিতে আশ্রয় নিলেন।

তার পরাজিত বাহিনীর পলাতক সিপাহিদের কেউ-কেউ দূরদূরান্ত থেকে এদিকেই আসতে থাকে। এবং সৌভাগ্যক্রমে সুলতানের সাথে আচানক সাক্ষাৎ ঘটে-যাওয়ায় আনন্দে আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে।[২৩৫]

ইস্পাহানবাসীকে সুলতানের চিঠি

ইস্পাহানের বাসিন্দারা তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতায় চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ ছিল।[২৩৬] কিন্তু তাতারদের এবারকার অবরোধে তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা বড় অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং সুলতান জালালুদ্দীনও—যিনি এই ভয়ংকর তুফানে ছিলেন মুসলিমদের ডুবন্ত তরীর সর্বশেষ নাবিক—হয়ে গেছেন লাপাত্তা। শহরের ছোট-বড় সবার চেহারায় ছিল কেমন এক নিস্তেজ-নিরুদ্যম ছায়া। নেতাশ্রেণির লোকগুলো ভেবে পাচ্ছিল না মুক্তির কী উপায় এখন।

বিদ্রোহী মেজাজের কিছু স্থানীয় আমির এই পুরো ব্যাপারটার দায়ভার সুলতান জালালুদ্দীন ও খাওয়ারিজমি সিপাহিদের উপর চাপাতে চাচ্ছিল। তাদের মতে, ইস্পাহানবাসী যে সুলতান জালালুদ্দীনের আনুগত্য প্রকাশ করেছিল এবং খাওয়ারিজমিদের ইস্পাহানে থাকার সুযোগ দিয়েছিল, এটা ছিল তাদের এক বড় বোকামি। এই বোকামির ফলেই তাতাররা ইস্পাহানে এসে আক্রমণ করেছিল। তারা বলল, এবার এই আপদ থেকে মুক্তির একটাই উপায়—খাওয়ারিজমি সৈন্যদের ইস্পাহান থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করা।

প্রধানবিচারপতি রোকনুদ্দীন সায়েদ-সহ শহরের অন্য নেতৃবৃন্দ খুব কষ্টে বুঝিয়েসুঝিয়ে এদের ঠান্ডা করলেন। গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা থেকে বাঁচতে শেষমেশ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—সাতদিন পর্যন্ত যদি সুলতান জালালুদ্দীনের প্রত্যাবর্তন না ঘটে, ইস্পাহানবাসী নিজেদের ইচ্ছেমতো যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

---

[২৩৪] ইবনুল আসির ৭/৬৪৫

[২৩৫] জাহাঁকুশা ২/১৬৯

[২৩৬] ইবনুল আসির ৭/৬৪৫

নেতৃবৃন্দ ও কাজি সাহেব এ কথার উপর একমত হলেন যে, যদি ঈদুল ফিতরের নামাজ পর্যন্ত সুলতানের কোনো খোঁজ পাওয়া না যায়, তা হলে তার ভগ্নীপতি আমির আইগান তাইসিকে—যিনি অসুস্থতার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি—সুলতানের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে খাওয়ারিজমিদের বাদশাহ মনোনীত করা হবে। কারণ, খাওয়ারিজমিদের মধ্যে তিনিই এখন সবচেয়ে দক্ষ রাজনীতিক। বংশলতিকার বিবেচনায় অন্যদের তুলনায় অনেক অভিজাত।[২৩৭]

যা হোক, শহরে এই সিদ্ধান্ত ও প্রতিশ্রুতি চলছিল, এর ভেতর গোপনে শহরের আমিরদের কাছে সুলতান জালালুদ্দীনের বার্তাবাহক এসে পৌঁছল। সে সুলতানের সালাম পৌঁছিয়ে বলল—মহান সুলতান আল্লাহর অনুগ্রহে ভালো আছেন। তিনি বলছেন—'আমি নির্দিষ্ট এক জায়গায় অবস্থান না করে ঘুরেফিরে বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে সমবেত করতে চাচ্ছি। তারপর আমি ও আপনারা সবাই একজোট হয়ে অবরোধকারী তাতারদের উপর হামলা করব। তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করব আমরা।'[২৩৮]

ইস্পাহানের আমির ও নেতৃবৃন্দ এই সংবাদে অত্যন্ত খুশি হল। সুলতানের নির্দেশ গ্রহণ করে তাকে ভরপুর সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিল। যেহেতু এই চিঠি গোপনে এসেছিল, এজন্য আমজনতা জানতে পারল না সুলতান বেঁচে আছেন নাকি শহিদ হয়ে গেছেন। সুলতানকে নিয়ে শহরজুড়ে বিভিন্ন গল্পকাহিনি ছড়িয়ে পড়ল।

ঈদগাহে সুলতান জালালুদ্দীনের আগমন

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে লোকজন কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দূরে ধূলিঝড় উঠতে দেখা গেল। টিপটিপ করে লাফাতে আরম্ভ করল জনতার হৃৎপিণ্ড। কে আসে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে? আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সবার উৎসুক দৃষ্টি সেই একদিকেই নিবদ্ধ হয়ে রইল। পুরো মাঠজুড়ে নেমে এল ঝিম-ধরা এক নীরবতা। কয়েক মুহূর্তের জন্য সবকিছু যেন স্থবির হয়ে গেল। সবার চেহারায় খোদিত হয়ে থাকল একই প্রশ্নবোধক চিহ্ন—কে আসে এই ধূলিঝড় উড়িয়ে?

শেষমেশ উড়ন্ত ধুলোবালি শূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগল। অশ্বারোহী বাহিনী এসে গেল সন্নিকটে। খানিক পরেই দেখা গেল—মুজাহিদ গ্রুপ ও মহান নেতা সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ এক অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে শহরে প্রবেশ

---

[২৩৭] তারিখে গাযিদাহ ২/৫০২, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৭

[২৩৮] ইবনুল আসির ৭/৬৪৫

করছেন।[২৩৯] সুলতানকে আচমকা নিজেদের সামনে পেয়ে মুজাহিদ ও আমজনতা বিপুল আনন্দে নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে গেল। খুশিতে তাকে সংবর্ধনা জানাতে ঈদগাহ ছেড়ে একসঙ্গে সবাই ছুট লাগাল। সুলতানের আগমনে ঈদুল ফিতরের খানিক আগের অবলুপ্ত ফুরফুরে আমেজ পুনরায় ফিরে এল। সারা শহরে জেগে উঠল প্রাণের সাড়া। সুলতান সবার সাথে মিলে ঈদের সালাত আদায় করলেন।[২৪০]

শেষযুদ্ধ, স্পষ্ট বিজয়

মোকাবেলার উদ্দেশ্যে আগাগোড়া এক নতুন পরিকল্পনা সাজিয়ে, একদিন সুলতান তার বাহিনী ও ইস্পাহানি স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে তাতার-বাহিনীর মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। ফের একবার হক ও বাতিলের মাঝে বেধে উঠল যুদ্ধ। খাওয়ারিজমি, তুর্কি ও পারসিক সিপাহিদের পাশাপাশি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরাও অত্যন্ত দুঃসাহসিকতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও বীরত্বের সাথে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।

এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে তাতাররা পরাজিত হল। তারা খুব বাজেভাবে হেরে গিয়ে রায়ের দিকে পালিয়ে গেল। সুলতান জালালুদ্দীন পূর্বের ক্ষয় ও ত্রুটির পুরোপুরি বদলা নিতে চাচ্ছিলেন। এজন্য ইসলামের শত্রুদের পিছু ছাড়লেন না তিনি। কয়েকদিন পর্যন্ত হাঁকাতে হাঁকাতে কিছু তাতার-সেনাকে ঘিরে ধরে হত্যা করে ফেললেন। প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ পিছু হটার পর সাধারণ তাতার-সৈন্যরা রায় নগরী থেকে সামনে এগিয়ে গেল।[২৪১] কিন্তু তাতাররা জাইহুন-নদীর পারে চলে-যাওয়া পর্যন্ত সুলতানের নির্দেশে মুসলিম বাহিনী ধাওয়া অব্যাহত রাখল।[২৪২]

সুলতান বিগত যুদ্ধগুলোতে যে পরাজয় বরণ করেছিলেন, এই মহান বিজয়ে তা অনেকাংশে পরিশোধিত হয়ে গিয়েছিল। তাতাররাও সুলতানের প্রতি এতোটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল যে, তারা ৩ বছর পর্যন্ত এদিকে জাইহুন-নদী পেরোবার হিম্মত করে ওঠেনি। এই মহা সফলতার পর সুলতান ইস্পাহানে ফিরে এসে সেসব অফিসার ও সৈন্যকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করলেন, যারা এ সময়ের সব যুদ্ধেই সাহসিকতা ও বাহাদুরির নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল।

বিপরীত দিকে, বিগত যুদ্ধগুলোর পরাজয়ে যেসব সেনাপতি ও আমিরের কাপুরুষতা ও আহাম্মকির ভূমিকা ছিল, সুলতান তাদের জনতার মজমায় অপদস্থ করলেন। সবার জন্যই যাতে শিক্ষণীয় হয়ে থাকে, এজন্য তাদের বোরকা পরিয়ে শহরের বাজার ও অলিগলিতে ঘুরিয়ে আনলেন। (জাহাঁকুশা ২/১৭০)

---

[২৩৯] জাহাঁকুশা ২/১৭০

[২৪০] জাহাঁকুশা ২/১৭০

[২৪১] ইবনুল আসির ৭/৬৪৫

[২৪২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৮, খাওয়ারিজম শাহি ১৭১

চেঙ্গিজ খানের স্থলাভিষিক্তের অবমুক্তি

এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাতাররা এতোই অনুতপ্ত হয়েছিল যে, চেঙ্গিজ খানের স্থলাভিষিক্ত উকতাই খান সুলতানকে চিঠি লিখে ইস্পাহানে হামলাকারী বাহিনীর সাথে তার কোনো যোগাযোগ কিংবা সম্পর্ক ছিল না বলে জানাল।

ইবনুল আসির তো এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, চেঙ্গিজ খানের স্থলাভিষিক্ত উকতাই খান সুলতানকে বলে পাঠিয়েছিল—এই আক্রমণকারীদের আমি ধিক্কার জানিয়েছি।[২৪৩] কিন্তু এ কথা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না যে, তাতারদের এতো বড় সেনাদল তাদের খাকানের অনুমতি ছাড়া কোনো রাজ্যে এসে হামলা করার দুঃসাহস দেখাবে! তা ছাড়া বিপরীতে যখন ছিলেন তাতারদের জাতীয় ও পরম্পরাগত প্রতিপক্ষ, তা হলে এটা কীভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, হামলাকারী বাহিনী তাদের সরকারের অনুমোদন ও রীতিসিদ্ধ পরিকল্পনা ছাড়া প্রতিপক্ষের দিকে অগ্রসর হবে!

আক্রমণকারীরা খাকানের পক্ষ থেকে আসেনি—এটা যদি মেনেও নেওয়া হয়, তবু এমন অনেক প্রশ্ন ওঠে, যেগুলোর জবাব কোনোভাবেই পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, এই আক্রমণকারী দলটি কারা ছিল? কোথা থেকে এসেছিল? কোথায় ফিরে গিয়েছিল? এদের ছাউনি কোথায় ছিল? রাজ্য ছিল কোনটা? এদের বাদশাহ কে ছিল? যদি খাকান এদের ধিক্কার দিয়ে থাকে, তা হলে তো খাকানের শত্রু জালালুদ্দীনের সাথে এদের এক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল... তারা উলটো যুদ্ধ কেন শুরু করেছিল? এই প্রশ্নও ওঠে যে, যুদ্ধের এই মৌসুম একবছরের কিছু অধিক সময় ধরে চলেছিল, তার ভেতর একটিবারও কেন এই হামলাকারীদের থেকে খাকান নিজের অবমুক্তির কথা প্রকাশ করেনি? এই খেয়াল পরাজিত হওয়ার পরই কেন এল?

সবকিছু এড়িয়ে জেনে ওঠা যায় যে, তাতার-খাকানের এই বাহানা নিজের অনুতপ্ত মনের যাতনা দূর করার ব্যর্থ চেষ্টা ব্যতীত কিছু ছিল না।

তাতারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত এসব যুদ্ধের ফল

৬২৪ ও ৬২৫ হিজরিতে তাতারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত এসব যুদ্ধ থেকে আমরা সুলতান জালালুদ্দীনের ঈমানি শক্তি, দৃঢ় সংকল্প, স্বয়ম্ভরতা ও দুর্বার হিম্মতের উচ্চতা কেমন ছিল, খুব ভালোভাবেই আন্দাজ করে নিতে পারি। এই দুটি বছরের অধিকাংশ সময়ে সুলতান কোনো-না-কোনো রণাঙ্গনে তাতারদের সাথে লড়াইয়ে নেমেছেন। অথবা লড়াইয়ের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনায় কাটিয়েছেন। এই সুদীর্ঘ যুদ্ধ-

---

[২৪৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৩৮, তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৪ হিজরি, ইবনুল আসির ৭/৬৪৫

ধারাবাহিকতার শুরু এমন এক সময়ে হয়েছিল, যখন অন্যান্য মুসলিম শাসকের সাথে সুলতানের ভেঙে গিয়েছিল ঐক্য, তার অধিকাংশ মিত্র হয়ে গিয়েছিল প্রতিপক্ষ। সুলতান এই যুদ্ধগুলোতে একা-একা লড়ে গেছেন। বাইরের শাসকদের মধ্য থেকে শুধু সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদ তাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এই জিহাদের একটি অংশ হয়ে উঠেছিলেন।

এই প্রশস্ত পৃথিবীর বুকে নিঃসঙ্গ হয়ে-যাওয়া সত্ত্বেও শক্ত জগদ্দলের মতো অনড় থেকে তাতারদের বিরুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীন মোকাবেলা করে গেছেন। দু-তিনটে ময়দানে তার পরাজয়ও ঘটেছে। একই সময়ে তাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে স্বজনদের গাদ্দারি ও অভ্যন্তরীণ কূটচক্রান্তের। তবু তার হিম্মত, মনোবল ও সংকল্পে কোনো চিড় ধরেনি। তিনি এক ময়দানে পরাজিত হয়ে অন্য রণক্ষেত্রে তার বদলা নিতে শুরু করেছিলেন। এমনকি শেষে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ইসলামের শত্রুদের ছুটে পালাতে হয়েছিল।

মুসলিমদের জুটেছিল ফাতহুম মুবিন—সুস্পষ্ট বিজয়। সেই বিজয়ের ফলে পুরো মুসলিমবিশ্বই উপকৃত হয়েছিল। সুলতানের হিম্মত ও কোরবানির বদৌলতে তাতাররা তাদের এই দ্বিতীয় আগ্রাসনে—যার শুরু চেঙ্গিজ খানের যুগে এবং শেষ তার পুত্র উকতাই খানের সময়ে—মুসলিমবিশ্বের এক ইঞ্চি ভূমিও দখল করতে পারেনি। বরং আগত কয়েক বছরের জন্য এদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল মুসলিম উম্মাহ।



সপ্তম অধ্যায়

সম্মিলিত বাহিনীর সাথে জিহাদ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

বিষয়টা এরকম যে, লোকজন তাদের বলেছে—এই লোকগুলি তোমাদের জন্য বাহিনী সমবেত করেছে। তোমরা এদের ভয় করো। তখন এ কথা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিল। তারা উলটো বলল—আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।[২৪৪]

অন্যান রাজ্যের সাথে জর্জিয়ানদের ঐক্য

সুলতান জালালুদ্দীন তাতারদের উচিতশিক্ষা দিয়ে সবেমাত্র ফারেগ হয়েছেন, এর মধ্যে হঠাৎ করে আরেকবার তাকে জর্জিয়ার যুদ্ধের প্রতি মনোনিবেশ করতে হল। জর্জিয়ানদের শক্তি যদিও গুঁড়িয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সুলতান দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত তাতারদের মোকাবেলায় পরিব্যাপ্ত থাকায় জর্জিয়ানরা আশপাশের বিভিন্ন শাসককে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রণক্ষেত্র গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল।

ঘটনা সেই সময়ের, যখন সুলতানের বিজয়ের ক্রমধারায় ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলছিল আশপাশের সব শাসক। সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধুনদের উপকূলবর্তী এলাকাগুলো থেকে শুরু করে কাফকাজের পর্বতশ্রেণি পর্যন্ত সুবিস্তৃত এমন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে উঠেছিলেন, যা লোক-স্বল্পতা ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশা সত্ত্বেও আয়তনের বিবেচনায় হয়ে উঠেছিল সেকালের সর্ববৃহৎ ইসলামি সাম্রাজ্য। তাতারদের বিরুদ্ধে সুলতানের এবারকার সফলতাগুলো অত্যধিক বাড়িয়ে দিয়েছিল তার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, শক্তি ও প্রতিপত্তি।

উচিত ছিল—সুলতান জালালুদ্দীন যে তাতার আগ্রাসনের সামনে লৌহপ্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেজন্য প্রতিবেশী শাসকশ্রেণির তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা; কিন্তু, না, রাজ্যের মসনদলোভী এই শাসকরা বরং সুলতান জালালুদ্দীনের নতুন প্রতিটি সফলতায় নিজেদের কুরসি টলমল করে উঠতে দেখছিল। সুলতানের অগ্রগতি ও উন্নতির প্রতিটি পদক্ষেপ যেন বড়

---

[২৪৪] আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩

ব্যথা-জাগানিয়া হয়ে পড়তে লাগল তাদের বুকের জমিনে। এবং সেই পদাঘাতে তারা নিজেদের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবার শঙ্কা অনুভব করে উঠল। ফলে, জর্জিয়ানরা এই শাসকদেরকে নিজেদের সাথে যূথবদ্ধ করে সুলতানের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত শক্তি গড়ে তুলতে বিলম্ব করেনি।

তাতারদের ঝঞ্ঝাট থেকে খানিক সুযোগ মেলার পরপরই সুলতান জর্জিয়ার সীমান্তে এক নতুন সয়লাব ফেঁপে উঠতে দেখছিলেন, যা গড়ে উঠেছিল এক ডজন শাসকের আক্রমণাত্মক শক্তি নিয়ে। সুলতানের বিরুদ্ধে আগ্রাসী হয়ে-ওঠা এই বাহিনীতে ছিল নিম্নোক্ত রাজ্য ও গোত্রের অংশগ্রহণ : ১. জর্জিয়ান, ২. কিপচাক, ৩. আর্মেন, ৪. আলান, ৫. লাকজ, ৬. সারির, ৭. সুনিয়ান, ৮. আবখাজ, ৯. জানিয়াত, ১০. রোম ও ১১. সিরিয়া।[২৪৫]

সুলতানের যুদ্ধবিষয়ক পরামর্শসভা

দুশমনের বিপুল তোড়জোড়ের সংবাদ লাগাতার পাচ্ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীন। তিনি মানদুরে শিবির স্থাপন করে যুদ্ধবিষয়ক পরামর্শসভা ডাকলেন। সাম্রাজ্যের আমির ও সেনাপতিদের অভিমত শোনার পরে উজিরে আজমকে খেয়াল প্রকাশের সুযোগ দিলেন। বললেন—আপনি বলুন, এখন কী করা যায়?

উজিরে আজম খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় ভদ্রতাব্যঞ্জক কণ্ঠে আরজ করলেন—আলামপনা, দুশমনের সংখ্যা অনেক বেশি। আমাদের লোকবল তার দশভাগের একভাগও নয়। এজন্য এখনোই লড়াইয়ে না-নেমে আমাদের গরমকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার। ততদিন পর্যন্ত আমাদের গেরিলা বাহিনী গোপনে গোপনে ভেঙে দিতে থাকবে দুশমনের সেনাশক্তি। লুট করতে থাকবে তাদের রসদ। দুশমনের খোরাকি গরমকাল পর্যন্ত থাকবে না। ফলে তাদের সেপাই ও ঘোড়াগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে। এর ভেতর দূরদূরান্তের সীমান্তে আমাদের বিভিন্ন সেনাদল যে প্রহরারত আছে, তারাও আমাদের সাহায্যে এসে পৌঁছে যাবে। আর, তখন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আক্রমণ চালিয়ে দুশমনকে একেবারে পিষে ফেলব।

কাপুরুষ উজিরে আজমের এই বক্তব্য চলাকালেই প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে আরম্ভ করেছিলেন সুলতান। উজির কথা বন্ধ করতেই তিনি কলমদানি থেকে দোয়াত উঠিয়ে সজোরে ছুড়ে মারলেন উজিরে আজমের মাথায়। গর্জে উঠে বললেন—কী, তোমরা আমাকে এ সমস্ত ভেড়া-বকরির ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছ!![২৪৬]

রাগে ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে সুলতানের। বলে ওঠেন—ভেড়া-বকরির পালের আধিক্য দেখে সিংহের আবার কীসের ভয়!!

---

[২৪৫] জাহাঁকুশা ২/১৭০

[২৪৬] জাহাঁকুশা ২/১৭১, রওজাতুস সফা ৪/৮৩১

সুলতানের চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে। আচমকাই ভয়ে কেঁপে উঠল পুরো মজলিশ। পাশাপাশি সবার বুকে দোলা দিয়ে গেল পরম সাহসিকতার এক দুর্বিনীত হাওয়া। সেই ঝাপটায় ভেতরে-ভেতরে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল মজলিশের সমস্ত জনতা।

জিহাদে শরিক হওয়ার জন্য সাধারণ ঘোষণা

সুলতান সিদ্ধান্ত শুনিয়ে সাধারণ যুদ্ধের ঘোষণা করে দিলেন। চতুর্দিক থেকে সর্বশ্রেণির মুসলিমজনতা সুলতানের জিহাদের আহ্বানে লাব্বাইক বলে ছুটে আসতে লাগল। ঘোড়ার পাল, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্রের ভান্ডার যতদূর সম্ভব জমা করা হল। কদিন পরেই সেনাবাহিনীকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দিলেন সুলতান।

অন্যদিক থেকে সম্মিলিত বিরোধীশক্তিও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছিল। সুলতান জনপদ থেকে বেরিয়ে চওড়া-প্রশস্ত এক ময়দানে সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। শত্রুবাহিনী যখন কাছাকাছি এসে পৌঁছল, সুলতান পাশের একটি টিলায় চড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুশমনের বাহিনী পরখ করতে লাগলেন। তার চোখের সামনে তখন স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনা ছড়িয়ে-দেওয়া এক অন্যরকম দৃশ্য। বিরোধীপক্ষের সয়লাব। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত পদাতিক ও অশ্বারোহীদের যুদ্ধসারি। এই বাহিনীর কোনো শেষ দেখা যাচ্ছিল না। সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত কেবল ঝাপসা কালো মানচিত্র যেন।

জর্জিয়ার খ্রিষ্টানরা ছাড়াও উত্তর ও পশ্চিমের সমস্ত যোদ্ধা গোত্রও নিজ নিজ পতাকা উঁচিয়ে পা মজবুত করে ময়দানে এসে দাঁড়াচ্ছিল। রোম ও সিরিয়ার মুসলিম সৈন্যদেরও এই সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধসারিতে দেখা যাচ্ছিল। এ বিষয়ে সুলতান যদিও প্রথম থেকেই বিস্তারিত জানতেন; কিন্তু চোখের সামনে শত্রুসেনাদের এই ধেয়ে-আসা উথালপাথাল ঢেউ দেখে তার ও তার সৈন্যদলের মনে হতে লাগল—আজ আমাদের মোকাবেলায় পুরো বিশ্ব বেরিয়ে পড়েছে।[২৪৭]

সুলতান বুঝে নিলেন—হাতে এখন যে পরিমাণ সেনাশক্তি আছে, স্রেফ তাই দিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে শত্রুদের সয়লাব রুখে-দেওয়া অনেক কঠিন। এর জন্য চালতে হবে এমন কোনো চাল, যার মাধ্যমে শত্রুবাহিনীর মাঝে ছড়িয়ে পড়বে বিক্ষিপ্ততা, ভেঙে পড়বে তাদের ঐক্য, কেউ ভরসা রাখবে না কারুর উপর, আর লড়াই শুরুর আগেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে তারা হেরে যাবে যুদ্ধে।

সুলতান এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কিছুক্ষণ গভীর পরিকল্পনা-বিন্যাসে মগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর মুহূর্তের মধ্যেই তার ধারালো ধীশক্তি দিয়ে সাজিয়ে ফেললেন একটি শক্ত পরিকল্পনা।

---

[২৪৭] জাহাঁকুশা ২/১৭১-১৭২, রওজাতুস সফা ৪/৮৩১

সুলতান জালালুদ্দীনের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা

সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর ডান বাহুর সেনাদলে কিপচাকি যোদ্ধাদের ২০ হাজার অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের যুদ্ধসারিতে জায়গায় জায়গায় উড়ছিল কিপচাকি পতাকা।

কিপচাক গোত্রগুলোর সাথে খাওয়ারিজমি সুলতানদের ছিল পুরোনো আত্মীয়তা। সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের দাদি তুর্কান খাতুন এই গোত্রেরই এক শাখার অন্তর্গত ছিলেন। সুলতান এদেরকে নিজের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হতে দেখে ভাবলেন—কোনোভাবে যদি সম্মিলিত বাহিনী থেকে এই কিপচাকদের আলাদা করে ফেলা যায়, আমার শত্রুর সংখ্যাই শুধু কমে যাবে না; সম্মিলিত বাহিনীর অবশিষ্ট সেনাসদস্যদের পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যেও ফাটল ধরে যাবে।

একটুক্ষণ ভেবে একটি উপায় বের করে ফেললেন তিনি। একখণ্ড রুটির উপর অল্প একটু লবণ রেখে তা এক দূতের কাছে দিয়ে বললেন—গোপনে কিপচাক বাহিনীর সেনাপ্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করো। এই রুটি ও লবণ তার কাছে পৌঁছে দিয়ে আমার পক্ষ থেকে বলে দিয়ো—তোমরা ভুলে গেছ, মুহতারাম পিতাজির ক্ষমতাকালে তোমাদের জন্য কয়েকবার আমি সুপারিশ করে তার পাকড়াও থেকে তোমাদের বাঁচিয়েছিলাম। বন্দিদশার কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের। তোমরা কি নিজেদের সেই নিমকহালালির প্রমাণ পেশ করার জন্য এবং আমার অনুগ্রহের বদলা দেবার জন্য তরবারি ধারণ করে এখন নেমে এসেছ আমার মোকাবেলায়?

সুলতানের কৌশলের তির গিয়ে ঠিক নিশানাতেই লাগল। পত্রবাহক যখন কিপচাকি সেনাপ্রধানকে রুটি ও লবণ দিয়ে এই পয়গাম শোনাল, তখন শরমে সে পানি হয়ে গেল। এই চিঠির প্রত্যেকটি শব্দ তার আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধে একটা শক্ত চোট লাগাল। নিজের সিপাহিদের সে হুকুম দিল তাৎক্ষণিকভাবে ময়দান ছেড়ে যাবার।

সুলতানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটিও এই কৌশলের মধ্যদিয়েই পূরণ হয়ে গেল। ঐক্যবদ্ধ অন্যান্য সেনাপ্রধান কিপচাকি সৈন্যদলের এই পৃথক হয়ে যাবার আসল কারণ সম্পর্কে জানতে না পেরে, পড়ে গেল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের গভীর কূপের ভেতর। লড়াই শুরুর আগেই তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল পারস্পরিক অনির্ভরতা ও বিরূপ মনোভাব।[২৪৮]

---

[২৪৮] জাহাঁকুশা ২/১৭২

আরো একটি কৌশল

সুলতান জালালুদ্দীন শত্রুদলের ভেতরগত এই অবস্থা পরখ করতে পেরেছিলেন। সুযোগটাকে গনিমত ভেবে সাধারণ আক্রমণে নামার আগে আরো একটি মনস্তাত্ত্বিক আঘাত হানতে চাইলেন তাদের ভেতর। সম্মিলিত বাহিনীতে আসল ভূমিকা পালন করছিল জর্জিয়ানরা। সবকটি সেনাদলের সাধারণ নেতৃত্বও ছিল ইওয়ানি নামের এক জর্জিয়ান সরদারের হাতে। সুলতান দূত-মারফত তার কাছে পত্র পাঠালেন—'আপনি অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছেন। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ঘোড়ার অবস্থাও নাজেহাল। এজন্য, এরকম করলে ভালো হয় না যে, উভয়পক্ষের বাছাইকৃত লড়াকু জোয়ানদের মাঠে নামিয়ে দেওয়া হবে, যুদ্ধে একাকী তারা নিজেদের বীরত্ব দেখিয়ে যাবে, আর আমরা জোয়ানদের তুমুল লড়াইয়ের সেসব দৃশ্য দেখে পুলক বোধ করে উঠতে থাকব!' এই প্রস্তাব ইওয়ানিরও পছন্দ হয়ে গেল। জবাবে সে হ্যাঁ বলে দিল।[২৪৯]

আছে কি কোনো মল্লযোদ্ধা

সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল উভয়পক্ষ। সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে জর্জিয়ানদেরকে তাদের শক্তিমত্তা, দেহের উচ্চতা এবং সাহসিকতার কারণে সবচেয়ে উন্নত গণ্য করা হতো। এজন্য তাদের যুদ্ধসারির ভেতর থেকে নামজাদা এক পাহলোয়ান ঘোড়া দৌড়িয়ে মাঠের মাঝ-বরাবর চলে এল। এই পাহলোয়ানের ছিল মস্ত এক দেহ, ভীষণ গাট্টাগোট্টা, চওড়া বুক, পরনে ভারী লোহার পোশাক, হাতে ওজনদার অস্ত্র।

এ সবকিছুতে তাকে লোহার আস্ত একটা পাহাড়ের মতো লাগছিল। সে ময়দানে এসেই হাতির মতো সুতীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে মল্লযুদ্ধের জন্য প্রতিপক্ষকে আহ্বান করতে লাগল। মুসলিমদের সারি থেকে সাধারণ গড়নের এক অশ্বারোহী বের হয়ে তিরের গতিতে সেই জর্জিয়ানের দিকে ছুটল। দর্শকদের তখন মনে হচ্ছিল—একটা কমবয়েসি বাচ্চা গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক দৈত্যের সামনে![২৫০]

জর্জিয়ান পাহলোয়ান নিমেষে তার খেল খতম করে দেবার জন্য, একটুও অপেক্ষা না করে, টান দিয়ে পিঠের ঝুলন্ত খাপ থেকে তলোয়ারটা বের করে হালকা-পাতলা এই মুজাহিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন সেই সাধারণ অশ্বারোহী মুজাহিদ সাঁই করে বিজলির বেগে নিজের দেহটাকে পেছনে টেনে নিয়ে গেল। জর্জিয়ান সেনার চিকচিকে তলোয়ার শনশন করে মুজাহিদের পাশ দিয়ে

---

[২৪৯] জাহাঁকুশা ২/১৭২, রওজাতুস সফা ৪/৮৩১,

[২৫০] জাহাঁকুশা ২/১৭৩

বাতাস কেটে চলে গেল। জর্জিয়ান তবু থামল না। তরবারি দিয়ে পরপর আরো কয়েকটি আক্রমণ করল। কিন্তু প্রতিবার তার তরবারি শুধু বাতাসেই বৃত্ত বানাতে লাগল। কোনোভাবেই সে নাগাল পাচ্ছিল না মহাবীর মুজাহিদের।

অকস্মাৎ সেই মুজাহিদ হাতের মধ্যে তার ধারালো বর্শাটি সামলে নিয়ে বিপুল তেজে ঘোড়া-সমেত ঘুরে দাঁড়াল। উঁচুকণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনির সাথে একটি ভয়ানক চিৎকারও শোনা গেল। লোকেরা অবাক চোখে দেখল—জর্জিয়ান পাহলোয়ান ঘোড়া থেকে ছিটকে জমিনে পড়ে গেছে। জবাই করা পশুর মতো তড়পাচ্ছে। মুজাহিদের ধারালো বর্শা তার পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলেছে।

সম্মিলিত বাহিনীর দর্শক সৈন্যরা জ্বলন্ত অস্থিরতায় দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরতে লাগল নিচের ঠোঁট। ওদিকে মুসলিমরা খুশিতে নারায়ে তাকবির ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুলছিল সমস্ত ঊর্ধ্বাকাশ। শোনা যাচ্ছিল শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতার কান বিদীর্ণ করে-দেওয়া অজস্র কণ্ঠের আওয়াজ।[২৫১]

জর্জিয়ান পাহলোয়ান মরে ঠান্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো সেই মুজাহিদ ময়দান ছাড়ছে না। সে নতুন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তখনই দুশমনের কাতার ভেদ করে বের হয়ে এল আরেক অস্ত্রসজ্জিত যুবক। সে ছিল নিহত জর্জিয়ান পাহলোয়ানেরই পুত্র। দৈহিক গঠনে বাপের তুলনায় একেও কম মনে হচ্ছিল না। তার চোখে জমাট বেঁধে ছিল রক্ত। ক্রোধের প্রচণ্ডতায় চেহারা আগুনের অঙ্গার হয়ে উঠছিল প্রতিনিয়ত। সে প্রবল ভূকম্পনের মতো ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফেটে পড়ল প্রতিপক্ষ মুজাহিদের উপর। কয়েক মুহূর্ত নাগাদ ঝনঝন করতে থাকল অশ্বারোহী দুই যোদ্ধার তরবারির ভীতিকর ঝংকার। ওদিকে, দুদিকের দণ্ডায়মান সৈন্যবাহিনী নিঃশ্বাস আটকে জীবন-মৃত্যুর এই খেলা দেখছিল। অকস্মাৎ, আবার শোনা গেল কলজে-চেড়া সুতীক্ষ্ণ চিৎকার। জর্জিয়ানরা নিরাশার গভীর সমুদ্রের ভেতর থেকে চোখ বড় বড় করে দেখল—তাদের এই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাও রক্তে-মাটিতে মাখামাখি হয়ে কাটা পাখির মতো লাফাচ্ছে।

একদিক থেকে বেজে উঠছিল আনন্দের অট্টহাসি, অন্যদিকে বেধে গিয়েছিল প্রতিশোধের উদ্দীপনায় হাঁকডাকপূর্ণ হাঙ্গামা। এই তুমুল উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যদিয়ে ময়দানে ঢুকল জর্জিয়ানদের তৃতীয় যোদ্ধা। এই যোদ্ধাও ছিল প্রথম নিহত জর্জিয়ান পাহলোয়ানেরই পুত্র। মুসলিম মুজাহিদ ওর কেচ্ছা খতম করে দিতেও খুব বেশি বিলম্ব করল না। একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তেজোদ্দীপ্ত মোকাবেলার পর মেরে তাকে ভূপাতিত করে দিল।

---

[২৫১] জাহাঁকুশা ২/১৭৩

জর্জিয়ান ও সম্মিলিত সেনাদের স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা খাদে নেমে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে। তাদের সেনাপ্রধান ভাবছিল, সুলতান জালালুদ্দীনের বাহিনীর অতি নগণ্য এক সিপাহিরই যখন এতো শক্তি, তা হলে আমরা সবাই মিলেও তার সাথে টক্কর দিই, নিশ্চিত পেরে উঠব না।

ময়দানে মুজাহিদ সেই আগের মতোই অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পরপর তিন শক্তিশালী শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার পরও তার শরীরে অবসাদের খানিকমাত্র ছাপ ফোটেনি। এখনো সে 'আছে কি কোনো মল্লযোদ্ধা' বলে বলে ঘোড়ার পিঠে বসে যুদ্ধের জন্য মাঠের মাঝখানে প্রতিপক্ষের তীব্র লালসা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ সম্মিলিত বাহিনীর আরো এক পাহলোয়ান ক্রোধে হুড়মুড় করে ঘোড়া ছুটিয়ে বের হয়ে এল। এই লোকের গঠনপ্রকৃতি দেখেও মনে হচ্ছিল—এ লোক পূর্বের মোকাবেলায় মারা-যাওয়া পাহলোয়ানদেরই ভাই হবে।

মুজাহিদ পুরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে এর সাথেও মেতে উঠল তলোয়ার-বর্শার খেলায়। এবং খানিক পরে একেও পান করতে বাধ্য করল মৃত্যুর তেতো পানি। কিছুক্ষণের জন্য ময়দানজুড়ে ছেয়ে গেল গভীর নিস্তব্ধতা। দুশমনই না শুধু, বন্ধুরাও নিঃশ্বাস আটকে এই তরবারি-চালনাকারী মুজাহিদকে দেখছিল, যার লৌহকঠিন বাহু পরপর ৪ জন দৈত্যাকৃতির লোককে খতম করে ফেলেছিল।

এই মুজাহিদের দৃষ্টি তখন পঞ্চম শিকারের সন্ধানে ময়দানের চারপাশে ঘুরছিল। বহুক্ষণ সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যরা নিঃঝুম নিঃস্তব্ধতায় থ মেরে রইল। সামনে আসবার সাহস হচ্ছিল না তাদের কারুর। শেষে তাদের এক নামজাদা শক্তিশালী সরদার মোকাবেলার জন্য ময়দানে নেমে এল।

জর্জিয়ানরা খানিক আগেই তাদের চারজন শ্রেষ্ঠ বাহাদুরকে হারিয়েছে। কিন্তু এই লোক ছিল জর্জিয়ানদের তূণীরের সবচেয়ে কড়া ও বিষাক্ত তির। এই ভয়াবহ লড়াকু সরদার যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এল, তার পাহাড়সম দেহ ও হাতির মতো ঘোড়াটি দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল ঐক্যবদ্ধ জনতা। তাদের শুকিয়ে যাওয়া কণ্ঠতালুতে ফিরে এল জল। আশাপ্রদ চেহারা নিয়ে ঢোক গিলতে লাগল তারা। আর বিরাট তরবারি উঁচিয়ে যখন প্রতিপক্ষ মুজাহিদের উপর সে হামলে পড়ল, সবার তখন মনে হতে লাগল, আসল যুদ্ধ তা হলে এখন শুরু হয়েছে!

একইসঙ্গে সম্মিলিত বাহিনী ও সুলতানের বাহিনী নড়েচড়ে উঠল। তলোয়ারের ঝনঝনানিতে কেঁপে উঠছিল পুরো ময়দান। জর্জিয়ার এই দানব ক্রমাগত ধ্বংসাত্মক আক্রমণ করছিল। আর মুজাহিদ প্রতিরোধের ভঙ্গিতে পিছু হটে-হটে দানবের সেই আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখছিল। মুজাহিদের বাহুতে যথেষ্ট শক্তি ছিল তখনো। কিন্তু পেরেশানির কথা হল—এই নাজুক পরিস্থিতিতে তার ঘোড়াটি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জর্জিয়ান সেনারাও মুজাহিদের এই দুর্বলতা ধরে

ফেলেছিল। এজন্য সে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, যাতে শিগগির মুজাহিদের কেচ্ছা খতম করে দিতে পারে।

জর্জিয়ান সেনাবাহিনীর পাল্লা ভারী হয়ে উঠতে দেখে ধকধক করতে লাগল মুসলিমদের হৃৎপিণ্ড। বিশেষ করে সেই অফিসার ও আমিরদের চেহারা অধিক পাঁশুটে হয়ে গিয়েছিল, যাদের জানা ছিল, এই সাধারণ মুজাহিদের বেশে মল্লযুদ্ধে যিনি নেমেছেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ!

লড়াই পুরো প্রচণ্ডতার সাথে জারি রইল। সাধারণ মুজাহিদের বেশ ধারণকারী সুলতান জালালুদ্দীন তার ঘোড়ার দুর্বলতার কারণে ইতোমধ্যে কয়েকটি আঘাত খেয়ে গেলেন। তিনি বুঝে ফেললেন—এবার লড়াই অধিক দীর্ঘ হতে দেওয়া আত্মাহুতির নামান্তর। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। দুশমন যখন নিজের ঘোড়াকে দ্বিগুণ উত্তেজিত করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুলতানের দিকে তরবারি চালাল, সুলতান ঠিক সেই মুহূর্তে হাতে বর্শাটি আঁকড়ে ধরে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নেমে গেলেন।

জর্জিয়ান সরদারের তরবারির আঘাতটা নিষ্ফলভাবে শূন্যে বাতাস কেটে গেল। আর সাথে সাথেই বিজলির মতো এসে সুলতান জালালুদ্দীন বর্শার এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন যে, দৈত্যাকৃতির সেই জর্জিয়ান সরদারের পেট চিড়ে বাইরে ঝুলে গেল তার বিশাল নাড়িভুঁড়ি।[২৫২]

আল্লাহর সাহায্য অবতরণ

মুসলিম বাহিনীর ভেতর থেকে অবিরাম শোকর, তাকবির, তাহলিলের ধ্বনি উচ্চকিত হয়ে পৃথিবীর আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে লাগল। বিপরীতে দুশমনের সারি যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হতাশা, বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও বিমূঢ়তা এসে তাদের হৃদয়জগৎ আচ্ছন্ন করে ফেলল। তাদের চারপাশে যেন জেগে রইল এক অদ্ভুত প্রহেলিকা।

সুলতান এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে ব্যাপক আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। জর্জিয়ানদের সাহসিকতা কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল। একটুক্ষণ পরই তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ময়দান ছেড়ে ভাগতে লাগল। এদের পিছপা হতে দেখে সম্মিলিত বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরাও লড়াই করতে পারল না। দ্রুতই তারা জর্জিয়ানদের মতো পালাতে বাধ্য হল। বিপুল গনিমত অর্জন করল সুলতানের বাহিনী।

---

[২৫২] জাহাঁকুশা ২/১৭৩, রওজাতুস সফা ৪/১৮৩১

আতা মালিক জুয়াইনি লেখেন—এ পরিমাণ গনিমত অর্জিত হল যে, ভেড়া-বকরির পালের দিকে কারুর ভ্রুক্ষেপই ছিল না। এতো ব্যাপক ধনদৌলত জুটে গেল যে, বড়-বড় মহিষের পালও সম্পদের গণনায় ধরা হয়নি।[২৫৩]

এভাবেই এই যুদ্ধ—যেখানে বিজয় মনে হচ্ছিল অসম্ভব—মহান আল্লাহর সাহায্যে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই মুসলিমদের বিরাট সফলতা ও বাতিলের স্পষ্ট পরাজয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হল।

---

[২৫৩] জাহাঁকুশা ২/১৭৪

অষ্টম অধ্যায়

আপন লোকের শত্রুতা

আল-মালিকুল আদিলের সাথে যুদ্ধ

এই দিনগুলিতেই আল-মালিকুল আশরাফ ও সুলতান জালালুদ্দীনের মধ্যকার সম্পর্কের তিক্ততা বহুগুণ বেড়ে গেল। দীর্ঘ সময় ধরে এই দুই বাদশাহর পারস্পরিক সম্পর্ক অপ্রীতিকরভাবে চলে আসছিল। কালের পরিক্রমার সাথে সাথে পরস্পরের এই দ্বান্দ্বিক মনোভাব আরো বেড়ে চলল।

এই দ্বন্দ্বের শুরুটা হয়েছিল ৬২২ হিজরি সনে। তারপর আল-মালিকুল আশরাফ যখন তার ভাই আল-মালিকুল মুয়াজ্জম ও আল-মালিকুল কামিলকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তি গড়ে তুললেন, তখন দু-দলের মাঝে যথারীতি শুরু হয়ে গেল তলোয়ার-বর্শার যুদ্ধ। সীমান্ত এলাকাগুলোতে দুই দলীয় সংঘাত হয়ে উঠল আগত-দিনের নৈমিত্তিক কাজ। সুলতান জালালুদ্দীন ও আল-মালিকুল আশরাফের যুদ্ধ ইতিহাসের স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ আমাদের এ গ্রন্থের আলোচ্যবিষয়ের অন্তর্গত নয় (কেউ যদি চান, এই বইয়ের উৎসগ্রন্থগুলোতে ফিরে যেতে পারেন, এই যুদ্ধের কার্যকারণ ও ফল নিয়ে গবেষণা করতে পারেন)।

কায়কোবাদের প্রস্তাব

এ যুদ্ধের প্রথম হোতা তো ছিলেন আল-মালিকুল মুয়াজ্জম। তিনি ভাই আল-মালিকুল আশরাফের বিরুদ্ধে সুলতানকে ফুঁসলাবার জন্য তার সঙ্গে একজোট হয়ে গেছিলেন। কিন্তু তারপর সেলজুক শাসক আলাউদ্দীন কায়কোবাদও এই আগুনে ইন্ধন যোগাতে কোনো কসুর করেননি। সুলতান জালালুদ্দীন যখন তাতারদের ইস্পাহানে পরাজিত করে উত্তর ইরাকে ফিরে গিয়েছিলেন, তখনকার কোনো এক দিন চিঠি নিয়ে কায়কোবাদের দূত এসে সুলতানের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। সেই চিঠিতে সেলজুক সুলতান কায়কোবাদ এ-বছর কাফেরদের (খ্রিষ্টানদের) একাধিক দুর্গ জয় করে নিয়েছেন বলে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এবং সুলতান যে তাতারদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন, সেজন্য তাকে জানানো হয়েছিল মোবারকবাদ। পাশাপাশি আল-মালিকুল আশরাফের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য সুলতানকে উসকে দিতে বলা হয়েছিল—'এখন আমাদের শুধু একটা কাজই বাকি রয়ে গেছে। তা হল—এই বিদ্রোহী ও নাফরমান দলটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।'

সুলতানকে আল-মালিকুল আশরাফের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে নামিয়ে আনতে আশরাফ-বিরোধী এই মিশনকে জিহাদে আকবার[২৫৪] বলেও ব্যক্ত করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে সেই হাদিসের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছিল, যে হাদিসে এরকম একটা কথা আছে—'আমরা বড় জিহাদ থেকে ছোট জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।'[২৫৫]

খিলাতে সুলতান জালালুদ্দীনের সিদ্ধান্ত-নিরূপক যুদ্ধ

সুলতান জালালুদ্দীন আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের প্ররোচনায় ৬২৩ হিজরির জিলকদ মাসে (নভেম্বর, ১২২৬) আল-মালিকুল আশরাফের রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর খিলাতে চড়াও হন। কিন্তু এখানকার প্রতিকূল পরিবেশের জন্য অবরোধ উঠিয়ে তখন নিষ্ফলভাবে ফিরে যান তিনি।

কায়কোবাদের চিঠি পাওয়ার কিছুদিন পর ৬২৬ হিজরির শাওয়াল মাসে (আগস্ট, ১২২৯) আবারো খিলাত শহর অবরোধ করেন সুলতান। এই অভিযানে সুলতানের ব্যয় হয় পুরো আট মাস। এই লম্বা সময়ের ভেতর গুরুত্বপূর্ণ যেসব ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. তাতারদের সুলতানের সাথে সন্ধি করতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ঘটনা :

সুলতান জালালুদ্দীনের ক্রমাগত বিজয়ের আলোচনা তখন দূর-সুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সুলতানের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে স্বয়ং তাতাররাও ভীত হয়ে উঠছিল। তাতার শাহজাদা ভাবছিল—যখন অভ্যন্তরীণ সমরাভিযানগুলো থেকে সুলতানের খানিক সুযোগ মিলবে, তখুনি তিনি আমাদের থেকে প্রতিশোধগ্রহণের জন্য আমুদরিয়া পেরিয়ে আসতেও কুণ্ঠিত হবেন না। আর একারণেই তাতাররা সুলতানের সাথে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল। তারা এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য সুলতানের বোনকে মাধ্যম বানিয়েছিল।

প্রিয় পাঠক, আপনারা পড়ে এসেছেন—কয়েক বছর আগে সুলতানের সৎবোন খান সুলতান চেঙ্গিজ খানের হাতে বন্দি হয়েছিল। বন্দি নারীদের যখন তাতার সরদারদের মাঝে ভাগবণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল, শাহজাদি খান সুলতানকে তখন নিজের জন্য রেখে দিয়েছিল জোচি খান। জোচি খান ক্রমান্বয়ে ইসলামি ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে পড়ছিল। এজন্য শাহজাদিকে সে এই বলে মুক্ত করে দিয়েছিল যে, তুমি বাচ্চাদের কুরআন মাজিদ পড়াবে। ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করবে। এমনকি খান সুলতানকে তার আত্মীয়দের সাথে চিঠি আদান-

---

[২৫৪] বড় জিহাদ

[২৫৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৮০

প্রদানের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। তাই কদিন পরপর সুলতান জালালুদ্দীনের নামে তার চিঠি আসত। সেসব চিঠিতে নিজের অবস্থা ছাড়াও, সাধারণত বৃদ্ধ দাদি তুর্কান খাতুনের কথাও লিখত খান সুলতান। কয়েক বছর পরে মারা গিয়েছিল জোচি খান। কিন্তু শাহজাদি খান সুলতানকে তাতারদের খাকান উকতাই খান নিজের দেশে ফিরতে দেয়নি।

সে শাহজাদিকে বলে সুলতান জালালুদ্দীনের নামে একটি চিঠি লেখাল। সেই চিঠি সুলতানের হাতে এসে পৌঁছেছিল খিলাত অবরোধের দিনগুলোতে। এই চিঠি নিয়ে যে দূতটি এসেছিল, আলামত হিসেবে তার কাছে ছিল আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের সেই আংটি, পিতার শেষ-স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে যেটি সংরক্ষণ করে রেখেছিল শাহজাদি খান সুলতান।

বোন তার দুর্ধর্ষ সাহসী ভাইকে লিখল—'প্রাণাধিক প্রিয় ভাই আমার, খাকান তোমার মরতবা ও শান-শওকত সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছে। সে তোমার সাথে সন্ধি ও আত্মীয়সুলভ সম্পর্ক গড়তে চাচ্ছে। তার প্রস্তাব হল—জাইহুন-নদীকে মুসলমান ও তাতারদের মধ্যবর্তী সীমান্ত নির্ধারণ করা হোক। এদিকের এলাকা হয়ে যাবে খাকানের আর ওপারের সমস্তকিছু তোমার বলে মেনে নেওয়া হবে। তার এই প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও তুমি যদি মনে করো, তোমার এখন অনেক শক্তি হয়ে গেছে, যেই শক্তিবলে খাকানের সাথে জিহাদ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে, তা হলে যা সমুচিত মনে হয়, তা-ই করো। কিন্তু পরস্পরের নিরাপত্তা ও সন্ধিচুক্তির এই সুযোগটি গনিমত ভেবো! কারণ, এবার স্বয়ং তাতাররাই তোমার সাথে সন্ধি করতে চাচ্ছে।'[২৫৬]

সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনের উদ্দেশ্য যদি হতো নিছক রাজত্ব, রাজমুকুট ও সিংহাসন এবং ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকার মতো কিছু, তা হলে তার জন্য দুশমনের সাথে আপস করে বাকি জীবন স্বস্তিতে কাটাবার এবং বর্ণিল শাহি মহল্লাগুলোর মনকাড়া দৃশ্যে বুঁদ হয়ে থাকবার এটিই ছিল সর্বোত্তম সুযোগ। কিন্তু তিনি সেসব লোকের মধ্যে ছিলেন, যাদের মনজিল হয় অনন্ত নক্ষত্রবীথি পেরিয়ে আরো বহুদূর। বিলাসময় রাজমুকুট পড়ে থাকত সুলতানের টুকরির ভেতর, যেন নিদারুণ অবহেলায় একাকী অশ্রুবিসর্জন দিত। সুলতানের কখনোই মনঃপুত হয়নি যে, লাখো মুসলমানের হন্তারকদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে তিনি হাত থেকে ফেলে দেবেন শাহি তলোয়ার। যদিও তখন তাতারদের থেকে পুরোপুরি বদলা নেবার মতো শক্তি জমে ওঠেনি তার; কিন্তু বড় অস্থিরতায় সেই সময়টার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন; কখন তিনি গোবি মরুভূমির বালিয়াড়ির ভেতর

---

[২৫৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩০০-৩০১, ইবনে খালদুন ৫/১৩৫-১৩৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৩

উড্ডীন করবেন ইসলামের বিজয়-পতাকা! দাদি, বোন ও তাদের মতো হাজারো অবলা নারীকে কখন ছাড়িয়ে আনবেন তাতারদের কবল থেকে! একারণেই উকতাইয়ের এই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন।

তাতারদের দিক থেকে সুলতানের সাথে সন্ধি স্থাপনের এটাই ছিল প্রথম ও শেষচেষ্টা। তারপর তারা সন্ধি থেকে হতাশ হয়ে চুপচাপ এই অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগল যে, কখন সুলতানের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং কখন তারা তার বিরুদ্ধে নতুন করে চূড়ান্ত কোনো অভিযানে নামবে!

২. একমাত্র পুত্র ও দত্তকের মৃত্যু :

সিন্ধুনদের তীরে চেঙ্গিজ খানের ক্রোধানলের শিকার হয়েছিল সুলতানের সন্তানরা। পরবর্তীকালে সুলতান যে'কটি বিয়ে করেছিলেন, তা থেকে শুধু একজন স্ত্রীর গর্ভেই একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। নাম রাখা হয়েছিল কিমকারশাহ। কিমকারশাহ বড় হাসিমুখো ছিল। ঠোঁটের কোণে সর্বদা ঝুলে থাকত ফালিচাঁদের মায়াবী হাসি। মেধাবী ছিল সে। সুলতান তাকে খুব ভালোবাসতেন।

বলা যায়—এই বাচ্চা ছিল তার হাজারো আশার কেন্দ্রবিন্দু। তার স্বপ্নের রাজপুত্র। এই পুত্রের মধ্যদিয়ে নিজের অপূর্ণ অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটা গোপন বাসনা ছিল সুলতানের মনে। কিন্তু শতকিছু করেও কেউ তাকদিরে ইলাহিকে টলাতে পারে না। খিলাত অবরোধকালে এই ছোট্ট শাহজাদা স্রেফ ৩ বছর বয়সে আচানক পৃথিবী থেকে গত হয়ে যায়। কিছু লোকের ধারণা ছিল—ধাইমা তাকে বিষ খাইয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।[২৫৭] তারপর সুলতানের শুধু রয়ে গিয়েছিল পালিত একটি সন্তান। কিন্তু কিছুদিন পর সেও খিলাত অবরোধের মধ্যেই অসুস্থতায় পড়ে মারা যায়।

এই ছেলের নাম ছিল দৌশ খান। সুলতানের মামাতো ভাই আখশ মালিকের পুত্র ছিল সে। আখশ মালিক সুলতানের দেহরক্ষীবাহিনীর প্রধানও ছিল। সিন্ধুর যুদ্ধে সুলতানকে সে দুশমনের কবলে পড়ে-যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিল। পরে ইস্পাহানের যুদ্ধে তির-তলোয়ার থেকে সুলতানকে রক্ষা করতে করতে শহিদ হয়ে গিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন তখন আখশ মালিকের এতিম পুত্রকে নিজের সন্তান বানিয়ে নিয়েছিলেন। এই বাচ্চাটিকে তিনি নিজের সমস্ত সন্তানের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এই দুই সন্তানের মৃত্যু সুলতানের হৃদয়ে বড়সড় এক ক্ষতের সৃষ্টি করে গেছিল।[২৫৮]

---

[২৫৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩০৩, খাওয়ারিজম শাহি ১৮৯

[২৫৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩০৬

৩. দরবারে খেলাফতের অনুমোদন :

সুলতান জালালুদ্দীন বর্তমান খলিফা মুসতানসির বিল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো করার জন্য দূত-মারফত কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। এর ভালো একটা ফলও তিনি পেয়েছিলেন। খলিফা তাতারদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা পেরেশান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে লক্ষ করছিলেন। এজন্যই তিনি নিজের বাহিনীতে ব্যাপকহারে সৈন্য ভর্তি করে নিয়েছিলেন। এমনকি তাতারদের বিরুদ্ধে সুলতানের দুর্ধর্ষ পদক্ষেপও প্রশংসার চোখে দেখছিলেন তিনি।

সুলতান তখন নিবিষ্ট ছিলেন খিলাত অবরোধে। অকস্মাৎ, খলিফা মুসতানসিরের পক্ষ থেকে সাদুদ্দীন হাজিবের নেতৃত্বে সুলতানের দরবারে একটি প্রতিনিধিদল এসে উপস্থিত হল। তাদের এই আগমনের কারণ ছিল দুটো :

১. সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ বাগদাদে সৈন্য প্রেরণের সময় খাওয়ারিজম রাজ্যে জুমার খুতবা থেকে আব্বাসি খলিফার নাম মওকুফ করে দিয়েছিলেন। এবং এখন পর্যন্ত খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য এর উপরই আমল চলে আসছে। সুলতান জালালুদ্দীন আব্বাসি খেলাফতের সাথে দূত আসা-যাওয়ার সম্পর্ক স্থাপন করে নিলেও পিতার এই অনুচিত আদেশ তখনো বাতিল করেননি। এই প্রতিনিধিদল খলিফা মুসতানসিরের পক্ষ থেকে দরখাস্ত নিয়ে এল যে, সুলতান জালালুদ্দীন যেন দুদিকের সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে দৃঢ় করে তুলতে নিজের রাজ্যে ফের খলিফার নাম-সংবলিত খুতবা চালু করেন!

২. মুসেলের হাকিম বদরুদ্দীন, ইরবিলের হাকিম মুজাফফর উদ্দীন, বুয়াহর সরদার শিহাবুদ্দীন সুলাইমান শাহ এবং হ্যাজোরাস্পের হাকিম ইমাদুদ্দীন পাহলোয়ান ছিল খলিফার অনুগত। দরবারে খেলাফতের কামনা ছিল সুলতান যেন তার মিশন আঞ্জাম দিতে গিয়ে এদের উপর চড়াও না হন! সুলতান জালালুদ্দীন বাগদাদের সাথে নিজের সম্পর্ক ভালো করে নেবার গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি তৎক্ষণাৎ দুটো দাবিই কবুল করে নিলেন। এবং আরো দৃঢ়তার জন্য নিজের সেনা-অফিসার বদরুদ্দীন তুলক ইবনে ইনাজ খানকে পাঠিয়ে দিলেন খলিফার দরবারে। যাবার সময় সুলতান তাকে তাগিদ দিলেন যে, 'বাগদাদের উজিরে আজম মুয়াইয়িদুদ্দীন কামির সাক্ষাতে তার হাতে চুমো দেবে না। কোনোপ্রকার নমনীয়তা দেখাবারও দরকার নেই।' একথা বলার কারণ—খলিফা নাসিরের সময়কাল থেকে এখন পর্যন্ত উজিরে আজম হয়ে-আসা এই শিয়া লোকটা সবসময় খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে ও বিদ্রোহে লিপ্ত থাকত।

যা হোক, বাগদাদে সুলতানের দূতকে যথেষ্ট সমাদর ও আপ্যায়ন করা হল। ফিরে এসে সে বলেছিল—'আমি বাগদাদে কিছুদিন কাটিয়েছিলাম। আমি যে মহলে ছিলাম, তার সামনের দজলা নদীর পারে এক সন্ধ্যায় একটি নৌকা এসে লাগল।

খলিফার প্রহরী সাদুদ্দীন প্রবেশ করল মহলের ভেতর। বলল—চলুন, খলিফার দরবারে হাজিরি দেবার জন্য তৈরি হয়ে নিন। আমি নৌকায় সওয়ার হলে প্রহরী সাদুদ্দীনও সাথে বসে গেল। তা দেখে মাঝি তাকে আমার অপরিচিত ভাষায় কিছু বলল। তা শুনে সাদুদ্দীন লাফ দিয়ে এই নৌকা থেকে নেমে পাশের আরেক নৌকায় গিয়ে উঠল। এই নৌকায় আমাকে ফেলে গেল একা। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে পাশের নৌকা থেকে গলা উঁচিয়ে সে বলল—আমার জানা ছিল না, এটা বিশেষ কোনো নৌকা। দরবারে খেলাফত এই স্পেশাল নৌকা আপনার সম্মানে শুধু আপনার জন্যই পাঠিয়েছে।'

মোটকথা, সুলতানের দূত এতোটা সম্মানের সাথে বাগদাদের খেলাফত-মহলে পৌঁছেছিল যে, খলিফা মুসতানসির বিল্লাহর সাথে তার মোলাকাত ঘটল বিশেষভাবে, একা-একা। খলিফা খুব সম্মানের সাথে সুলতানের প্রসঙ্গ তুললেন। জিজ্ঞেস করলেন—'কাইফাল জানাবুল আলি আশ-শাহানশাহি (মহান বাদশাহ কেমন আছেন)?

খানিকক্ষণ কুশল বিনিময়ের পর দূতের দরখাস্ত শুনলেন খলিফা। বললেন—'দরবারে খেলাফতের দৃষ্টিতে সুলতান জালালুদ্দীনের যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান রয়েছে, তা মুসলিমবিশ্বের অন্যকোনো শাসক এখনো অর্জন করে উঠতে পারেননি। আমরা সুলতান জালালুদ্দীনকে সকল সুলতানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চাচ্ছি।' একথা বলে খলিফা সুলতানের জন্য নাওয়াযিশনামা (সম্মাননাপত্র) দিলেন। তা দেখে দূতের চোখ উঠল কপালে। এটি ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের নামে কল্যাণকামিতার পয়গাম।

খলিফা মুসতানসির বার্তাবাহকের বড় যত্ন-আত্তি করেন। ফেরার সময় নিজের দুজন দরবারি, সাদুদ্দীন হাজিব ও ফালাকুদ্দীনকে সুলতান ও তার আমিরদের জন্য মূল্যবান শাহি পোশাক ও উপঢৌকন দিয়ে দূতের সাথে রওনা করিয়ে দিলেন। দুটো শাহি পোশাক ছিল সুলতানের জন্য, বাকিগুলো তার দরবারিদের জন্য।

খলিফার পক্ষ থেকে শাহি পোশাক পেয়ে দারুণ আনন্দিত হলেন সুলতান। চারপাশে বিরোধিতার যে গাঢ় অন্ধকার তার চোখের সামনে জমাট বেঁধে ছিল, তা থেকে বাঁচতে খলিফার ছায়াকে নিজের জন্য বিরাট নেয়ামত মনে করলেন তিনি। আনন্দপ্রকাশের জন্য সুলতান এক জমকালো মেহফিলের আয়োজন করেন। সেখানে উপস্থিত লোকদের সামনে খলিফার প্রদানকৃত দুটো শাহি পোশাকই তিনি পরে দেখান। তার মধ্যে একটি শাহি পোশাকে ছিল পাগড়ি, জুব্বা ও হিরাখচিত একটি হিন্দুস্থানি তলোয়ার। দ্বিতীয় শাহি পোশাকে ছিল কানা' (একপ্রকারের গেঞ্জি), আস্তিনদার জুব্বা, স্বর্ণের হাতলযুক্ত তরবারি, ইয়াকুত পাথরের একচল্লিশটি নাগিনাখচিত স্বর্ণের ঢাল ও সামানপত্র-বোঝাই দুটো ঘোড়া।

বাগদাদের দূত সুলতানের সাথে আলাপের সময় খিলাতবাসীদের জন্য সুপারিশ করে বলল—হুজুর, ওদের প্রতি অনুগ্রহ করে অবরোধ উঠিয়ে নিলে উত্তম হয়।

জবাবে সুলতান বলেন—আমিরুল মুমিনিন তার পয়গামে লিখেছেন, তিনি আমার বিজয় ও প্রতিপত্তি কামনা করছেন। আমাকে সমস্ত শাসকের উপর শ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে দেখতে চাচ্ছেন। এবার খিলাতের বিজয় যখন খুব কাছাকাছি এসে গেছে, তুমি এমন পরামর্শ কেন দিচ্ছ, যা খলিফার এই চিঠির বক্তব্যের বিপরীত?

দূত ওজর দেখিয়ে বলল—শুধু আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণ-চিন্তায় এবং এ খেয়ালে এমন পরামর্শ দিচ্ছি যে, খিলাতের অবরোধ যদি দীর্ঘ হতেই থাকে! আর আপনাকে শহর জয় না করেই ফিরে যেতে হয় তা হলে তো আপনার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে আমার মন খুবই শঙ্কিত, হুজুর। শেষে যদি বাধ্য হয়ে শহর জয় না-করেই আপনাকে ফিরে যেতে হয়! এজন্য এখনই সুন্দর একটা পন্থায় আপনি ফিরে যেতে পারেন। বলবেন—খলিফাতুল মুসলিমিন সুপারিশ করেছেন বিধায় অবরোধ উঠিয়ে নিচ্ছি।

সুলতান দূতের এই অনুনয়বিজড়িত বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন বটে; কিন্তু তার পরামর্শ মেনে কাজ করেননি, শেষ পর্যন্ত খিলাত শহর জয় করেই ছেড়েছেন।[২৫৯]

৪. রোকনুদ্দীন আরজানুররোমির আগমন :

তারপর অকস্মাৎ একদিন সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনের আঙিনায় প্রবেশ করল এক নতুন লোক। সে ছিল রোকনুদ্দীন আরজানুররোমি। আলাউদ্দীন কায়কোবাদের চাচাতো ভাই ও আরজানুররোম নামের এক ছোট্ট রাজ্যের শাসক। আরজানুররোম ছিল খিলাত ও রোম সাম্রাজ্যের মাঝখানে। কয়েক বছর আগে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সাথে রোকনুদ্দীনের শত্রুতা ছিল। কয়েকবার সে খাওয়ারিজমি সিপাহিদের সেনাসাহায্য ও রসদপত্র বিনাশ করেছিল। একবার সুলতানের এক দূতকেও হত্যা করেছিল। কিন্তু এবার সে সুলতানের কাছে পূর্বেকার অপরাধের ক্ষমাগ্রহণের জন্য দূত পাঠাল।

তবে আসল কারণ হল—ওদিকে সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সাথে রোকনুদ্দীনের সম্পর্ক মন্দ হয়ে গিয়েছিল। কায়কোবাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য অন্য কোনো শক্তিশালী শাসকের আশ্রয়ের দরকার ছিল রোকনের। সে যখন দেখল সুলতান জালালুদ্দীনের রাজ্যের গণ্ডি খিলাত পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে গেছে, তখন নিজের মতলব হাসিলের জন্য চেষ্টা চালাতে লাগল সুলতানের সাথে সম্পর্ক

---

[২৫৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৭৮-১৮০, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৩-৩৭৪; ইবনে খালদুন ৫/১৩৬

গড়বার। রোকনের প্রেরিত ওজরখাহি-সংবলিত চিঠি মঞ্জুর করে নিলেন সুলতান। ফলে, রোকন নিজে এসে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হল। সাথে সুলতানের পরিপূর্ণ সহযোগিতার উদ্দেশ্যে রসদপত্র ছাড়াও হাতিয়ার ও দুর্গ জয়ের অস্ত্রপাতি নিয়ে এল। এর মধ্যে কারাবগারা নামে অনেক বড় একটি কামানও ছিল।

৫. সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সাথে দ্বন্দ্ব :

এর মধ্যেই সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের পথে শক্ত বাধা হয়ে দাঁড়াবার জন্য আল-মালিকুল আশরাফের সাথে যূথবদ্ধ হয়ে উঠল আরো এক শক্তিমান শত্রু। সেই শত্রু ছিল আনাতোলিয়ার সেলজুকি রোমি সাম্রাজ্যের শাসক সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদ।

৬২৭ হিজরি পর্যন্ত সুলতান জালালুদ্দীন ও কায়কোবাদের মধ্যে কোনোধরনের বিরোধ কিংবা সংঘাত ছিল না। বরং ইতিপূর্বে দুই রাজ্যে প্রতিনিধিদলের যাওয়া-আসাও ছিল। এবং, ৬২৪-৬২৫ হিজরিতে তাতার-বিরোধী জিহাদে সুলতান জালালুদ্দীনকে কায়কোবাদ আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেছিলেন। তারপর আল-মালিকুল আশরাফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সুলতান জালালুদ্দীনকে ফুঁসলিয়েছিলেন কায়কোবাদ। কিন্তু ৬২৭ হিজরির মাঝামাঝিতে এসে সেই সম্পর্ক একদম ভেঙে পড়ে। কায়কোবাদ অন্য শাসকদের সাথে জোট বেঁধে সুলতানের বিরুদ্ধে চড়াও হতে থাকে; এর পেছনে কিছু কারণ ছিল। নিচে সেগুলো উল্লেখ করছি :

১. কায়কোবাদ তখন নিরাশায় পড়ে গিয়েছিলেন যে, তাতারদের বিরুদ্ধে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, কোনো কাজ হবে না। দুনিয়ার অন্যান্য শাসকের মতো তিনিও তাতারদের ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য তাতারদের বিপুল পরিমাণ ধনদৌলত প্রদান করে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়বেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সংকল্প বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা মনে করছিলেন সুলতান জালালুদ্দীনকে। তার মনে এই চিন্তা দানা বাঁধছিল যে, সুলতানের এই তাতার-বিরোধী জিহাদই মূলত মুসলিমবিশ্ব আর তাতারদের মাঝে সন্ধি-স্থাপনের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এজন্য সুলতানকে তিনি জিহাদ থেকে বিরত রাখবার চেষ্টা করতে চাইলেন। কারণ, যতক্ষণ সুলতান জালালুদ্দীন জিহাদ চালু রাখবেন, ততক্ষণ অন্যান্য ইসলামি রাজ্যও মুজাহিদদের সহযোগিতা করতে চাইবে। ফলে তাতাররা এদের সবাইকেই নিজেদের শত্রু বলে ভাবতে থাকবে।

   কায়কোবাদের মগজের ভেতর এই চিন্তা এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, তখন তিনি সুলতানের হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে তাকে জিহাদ থেকে আটকে রাখার মধ্যেও কোনো অসুবিধা দেখছিলেন না।

২. খিলাত অবরোধের দিনগুলিতে সুলতানের বাহিনী সেলজুক সাম্রাজ্যের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। কায়কোবাদের মনে তখন শঙ্কা জেগে উঠল যে, এবার সুলতানের বাহিনী দেখছি আমার রাজ্যেও হামলা করে বসতে দ্বিধাবোধ করবে না!

৩. সেলজুক রোমি সাম্রাজ্য ও খিলাতের মাঝখানে ছোট্ট এক রাজ্য ছিল আরজানুররোম। এখানকার শাসক ছিল রোকনুদ্দীন। আলাউদ্দীন কায়কোবাদের কঠিন শত্রু ছিল সে। খিলাত অবরোধের সময় সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে একজোট হয়ে গেছিল রোকনুদ্দীন। কায়কোবাদ এই ঐক্যবদ্ধতাকে নিজের বিরুদ্ধে ভেবে মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

৪. খিলাত অবরোধের দিনগুলিতে সুলতানের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল কায়কোবাদ। সেই প্রতিনিধিদল মৌলিকভাবে কয়েকটি দাবি নিয়ে এসেছিল :

ক. সুলতানকে খিলাত-অবরোধ পরিত্যাগ করতে হবে।

খ. তাতারদের সাথে সন্ধি করে ফেলতে হবে।

গ. রোকনুদ্দীন আরজানুররোমিকে গ্রেফতার করে কায়কোবাদের হাতে সোপর্দ করতে হবে।

ঘ. সুলতানের মেয়েকে কায়কোবাদের ছেলের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে।

উল্লিখিত দাবিগুলো মেনে নিলে সুলতানকে বিপুল অর্থ প্রদান করা হবে বলেও নিশ্চয়তা দিয়েছিল আলাউদ্দীন কায়কোবাদ। কিন্তু সুলতান এসব দাবির একটিও মানতে পারেননি। ফলে দু-দিকের সম্পর্ক আরো বিরূপ হয়ে ওঠে। কায়কোবাদের এই প্রতিনিধিদল প্রেরণের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করছি : খিলাত অবরোধকালে আলাউদ্দীন কায়কোবাদের দূত আমির শামসুদ্দীন আলতুন ও কামালুদ্দীন কামিয়ার সুলতানের দরবারে এসে উপস্থিত হল। দরবারে সুলতান নিজের আমির ও সেনাপতিদের সমবেত করলেন। আমির শামসুদ্দীন সুলতানের হস্ত চুম্বন করে তার নিকট পেশ করল কায়কোবাদের চিঠি।[২৬০] সেই চিঠির চুম্বকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল—আবখাজের বিরোধীদের শায়েস্তা করার পর সুলতানের (সুলতান জালালুদ্দীন) তরবারি যখন কোষবদ্ধ হবে এবং

---

[২৬০] সেলজুকনামা ১৬২, ইবনে বিবি প্রণীত, উর্দু অনুবাদক : মুহাম্মদ জাকারিয়া মায়িল

তিফলিস বিজয়ের পর খানিক সুযোগ মিলবে, তখন মানসিক স্ফূর্তির জন্য তিনি রোমের তৃণভূমিতে কাটিয়ে আসবেন কিছুদিন।[২৬১]

২. জানা গেছে—আপনি কিছু মতলববাজ মানুষরূপী শয়তানকে কুব্বাতুল ইসলাম খিলাত শহরের অবরোধ-কার্যে আটকে রেখেছেন। এটা সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হচ্ছে না।

৩. আমি স্পষ্ট করে বলছি যে, তাতার-বাহিনীর সাথে সন্ধি করে ফেলুন। হ্যাঁ, এটাই উত্তম। আর যদি সম্ভব হয়, যতদূর সুযোগ মেলে আপনার, সন্ধির প্রস্তাবটা আপনার দিক থেকেই করবেন।

৪. আমার মনে হচ্ছে—তাতারদের দরবারে দূত প্রেরণ করে 'সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে সন্ধি' হিসেবে শহিদ সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের তাড়াহুড়োর মধ্যে গৃহীত পূর্বের সেই সিদ্ধান্তের জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চাই।
আশা করছি, কথায় নমনীয়তা দেখালে এবং স্বর্ণ-রুপার উপঢৌকন পাঠালে তাতারদের এই বিশ্বব্যাপী ফেতনার আগুন নিভে যাবে।

৫. আমার সাধ্যে যতটুকু কুলোয়, স্বর্ণ-রৌপ্য-হিরে-জহরত প্রদানে এবং আপনার অন্যান্য খেদমতেও কোনো কমতি রাখব না।

৬. আত্মমগ্ন চাটুকারদের কথায় যদি আমার এই নসিহতের প্রতি আপনি ভ্রুক্ষেপ না করেন, ইসলামি সম্ভ্রমবোধ ও বৈশ্বিক নীতিমালা হিসেবে হলেও কার্যক্ষেত্রে এই নসিহত মানা আপনার জন্য জরুরি হবে।

সুলতান জালালুদ্দীন গম্ভীর মুখে বসে চিঠির মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করছিলেন। আলাউদ্দীন কায়কোবাদের চিঠির সারবত্তা বেরোল—সুলতানকে তার দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ অর্থাৎ তাতার এবং আল-মালিকুল আশরাফের সাথে সন্ধি করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কায়কোবাদের পক্ষ থেকে তাকে পরিপূর্ণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। যদি তিনি এমনটি না করেন, তার উপর আগ্রাসন পরিচালনাকারীদের কাতারে কায়কোবাদও শামিল হয়ে যাবেন।

সুলতান জালালুদ্দীনের পক্ষে এই চিঠির কথাগুলো হাতকড়া পরিহিত একজন দাসের মতো চোখ বুজে মেনে নেওয়াটা ছিল অসম্ভব। আল-মালিকুল আশরাফের সাথে তার চলে আসছিল পুরোনো সংঘাত। এর কয়েকটি কারণও ছিল। তা ছাড়া এ ছিল দু-পক্ষের পারস্পরিক ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এতে তৃতীয় কোনো শক্তির এই অধিকার ছিল না যে, শুধু এক পক্ষকেই গলা চেপে ধরে

---

[২৬১] রোম দ্বারা সেলজুক সাম্রাজ্যের এলাকা 'এশিয়া মাইনর' উদ্দেশ্য। সে যুগে ইউরোপের 'রোম' ছাড়াও এশিয়ার এই অঞ্চলকেও রোম ডাকা হতো। কারণ—বহু শতাব্দীকাল এই এলাকা ইউরোপের রোম সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে ছিল। আজকাল এই এলাকাকেই তুরস্ক বলা হয়ে থাকে।

সন্ধিচুক্তিতে বাধ্য করে তুলবে; আর অন্যপক্ষের ভুলত্রুটির দিকে তাকাবেই না। বাকি আছে তাতারদের সাথে সন্ধি স্থাপনের পরামর্শ। তো, সুলতানের পক্ষে সেটা বাস্তবায়ন-অযোগ্যই ছিল না শুধু, বরং ছিল একেবারে ভ্রুক্ষেপ না-করার মতো একটা বিষয়।

যখন এই শত্রুগোষ্ঠী নিজেদের কয়েকজন সদস্যের প্রতিশোধের জন্য পুরো মুসলিমবিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চল উজাড় করে দিয়েছে, তখন সুলতানের এই অধিকার কীভাবে থাকে যে, এদের সহস্র জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও মজলুমদের মুখপাত্র হয়ে সেই কাফের বাহিনীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবেন? কায়কোবাদ কি মনে করেছিল মুসলিমদের রক্ত এত সস্তা? সুলতান জালালুদ্দীন জানতেন—স্বর্ণ-রৌপ্য ও নমনীয়তা দেখিয়ে এ সমস্ত হায়নার অভ্যাস পরিবর্তন করা যাবে না। তার কাছে এর একমাত্র ওষুধ ছিল জিহাদ বিস-সাইফ—ধারালো তরবারি হাতে সারিবদ্ধ যুদ্ধ। তিনি তো সেসময় পর্যন্ত তাতারদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে-থাকার সংকল্প করেছিলেন, ভূপৃষ্ঠে যতক্ষণ না বিজয়ী হয়ে ওঠে আল্লাহর দীন।

সুলতানের কাছে প্রেরিত কায়কোবাদের চিঠিতে ইতিবাচক জবাব দেওয়ার মতো কোনো পয়েন্টই ছিল না। তবে তিনি কায়কোবাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ করে শত্রুর তালিকা আর বাড়াতে চাচ্ছিলেন না। এজন্য কায়কোবাদের বার্তাবাহকদের তিনি বললেন—'সুলতানের মনে যদি কোনো প্রকারের ধুলো পড়ে গিয়ে থাকে, তিনি যদি আমাদের প্রতি মন ভার করে থাকেন, আমরা ওজরখাহি ও ক্ষমা চাওয়ার উদ্যোগ দেখালেই সেটা দূর হয়ে যাবে, আশা করি। তোমরা যারা এসেছ, নিরাপদে ফিরে যাও। আমাদের পক্ষ থেকে তাকে নিখাদ সালাম পৌঁছে দিয়ো। পরবর্তীতে আমাদের বার্তাবাহক অঙ্গীকারনাম ও চিঠির বিস্তারিত জবাব নিয়ে পৌঁছে যাবে।'[২৬২]

প্রতিনিধিদল আরেকটা দাবি তুলল—রোকনুদ্দীন আরজানুররোমিকে (সে তখন সুলতানের ওখানেই ছিল) গ্রেফতার করে সুলতান কায়কোবাদের কাছে অর্পণ করা হোক, যাতে কায়কোবাদ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন এবং রোকনের এলাকায় কর্তৃত্ব চালাতে পারে রোমি বাহিনী।

এই দাবি শুনে অগ্নিতপ্ত হয়ে ওঠেন সুলতান। বলেন—যদিও তোমাদের কাঙ্ক্ষিত এই লোক আমাদের সাথেও অনেক বাড়াবাড়ি করেছে; কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের এখানে আরবদের মতোই সে মেহমান হিসেবে এসেছে। আমাদের ঘরে ওঠা লোকের সাথে ওরকম কোনো আচরণ আমরা করতে পারি না। এমন কারুর

---

[২৬২] সেলজুকনামা

কাছে তাকে সোপর্দ করে দিতে পারি না, যে তার রক্তের পিপাসায় কাতর হয়ে আছে।[২৬৩]

তারপর প্রতিনিধিদল দুই রাজ্যের সম্পর্ক সুন্দর ও মজবুত করে তুলতে কায়কোবাদের পুত্রের জন্য সুলতানের সেই কন্যার বাগদান তলব করল, যার জন্ম হয়েছিল সুলতানের সম্রাজ্ঞী সালগুরি খাতুন বিনতে আতাবেগ সাআদের গর্ভে।[২৬৪] উত্থাপিত এই দাবি শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাবনায় পড়ে যান সুলতান। তার এই ভাবনা নিশ্চয় মুসলিমবিশ্ব দেশ ও জাতির কল্যাণের বাইরের কিছু ছিল না। আশা করা যাচ্ছিল—সুলতান এক শক্তিধর মিত্রের সহযোগিতা লাভের জন্য তার সাথে সাধারণ যে সম্পর্কসূত্র রয়েছে, তাকে আত্মীয়তার সম্পর্কে উন্নীত করবার সুযোগ বোধহয় হাতছাড়া করবেন না। কিন্তু শারফুল মুলকের গাদ্দারি ও বদজবানি সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সুলতান কিছু বলবার আগেই উজিরে আজম শারফুল মুলক প্রতিনিধিদলের এই দরখাস্ত অত্যন্ত ঘৃণিত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ বলে এই সম্মানিত দূতদেরকে খুব ডাঁটপাট দেখাতে শুরু করল। এবং যাচ্ছেতাই বকাবাজি করল।

উজিরে আজমের এই আচমকা রেগে ওঠার কারণ—তার জন্য যে তোহফা এই দূতেরা এনেছিল, সেগুলো ছিল খুবই মামুলি জিনিস, যা তার পছন্দ হয়নি। এজন্য আলাদা সাক্ষাতেও উজির এই দূতদের ব্যাপারে মন্দ বলতে এবং তাদের প্রতি ভুল ধারণা পোষণ করতে কোনো ত্রুটি রাখেনি।

শিহাবুদ্দীন নাসাবি লেখেন—একদিন এই দূতেরা উজিরে আজমের তাঁবুতে এসেছিল। আমি দেখেছি, উজিরে আজম তাদের কঠিন গলায় বলছেন—সুলতান যদি অনুমতি দেন, আমার ব্যক্তিগত সেনাদল নিয়েই তোমাদের মুলুকে ঢুকে সব দখল করে ফেলতে পারি আমি।

এরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আরো কিছু কথাবার্তা বললেন তিনি। দূতদের চলে যাবার পর উজিরে আজমকে আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনার এমন তিক্ত কথার উদ্দেশ্য কী? তাদের বাদশাহ তো বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছেন, তার বার্তাবাহকদের দুদিকের সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ করতে পাঠিয়েছেন।

উজির বললেন, এই দূতেরা আমাকে যে হাদিয়া দিয়েছে, তা মাত্র ২ হাজার দিনারের।[২৬৫]

এ থেকে আন্দাজ করে ওঠা মুশকিল না যে, খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কল্যাণের বিষয়গুলোকে স্রেফ তামাশা বানিয়ে নিয়েছিল।

---

[২৬৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩২০

[২৬৪] সেলজুকনামা ১৫৬

[২৬৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩২০

ডুবে ছিল ব্যক্তিগত উপকারসিদ্ধির নেশায়। এর পর খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বরবাদির সামনে কী আর বাধা থাকতে পারে?

রোমি দূতেরা এখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর ভগ্নহৃদয়ে ফিরে গেল। কায়কোবাদও ব্যাপারটাকে নিজের জন্য অপমানকর মনে করলেন। ফলে, সুলতান জালালুদ্দীনের শত্রুদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। আল-মালিকুল আশরাফের কাছে দূত পাঠিয়ে সম্পর্ক নবায়িত করবার চেষ্টায় খানিকমাত্র বিলম্ব করলেন না।[২৬৬]

এর ভেতর খিলাত শহর অবরোধের প্রায় আটমাস কেটে গেল। অবরুদ্ধদের ক্ষুধার পীড়নে এবং অবরোধকারীদের শীত-গরমের আতিশয্যে বেহাল দশা হয়ে পড়ল। অবস্থা হল এই—একবার ২০ হাজার লোক প্রাচীরের দরজা খুলে একদম বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। ক্ষুধায় এদের শরীরের অবস্থা হয়ে পড়েছিল নাকাল, বিধ্বস্ত। সুলতানের উজির তৎক্ষণাৎ কয়েকটি ষাঁড় ও গাভী জবাই করে এদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিল। তা সত্ত্বেও বহু লোকের অবস্থা এতই নাজুক হয়ে পড়েছিল যে, তাদের বাঁচানো যায়নি।

এই অবস্থা দেখে ইসমাইল ইওয়ানি নামে খিলাতের এক আমির গোপনে সুলতানের কাছে চিঠি পাঠাল যে, আমাকে যদি আজারবাইজানে কোনো জায়গির দিতে পারেন, বিনিময়ে আমি শহর জয় করে দেবার ওয়াদা করছি। সুলতান জায়গির দেবেন বলে ওয়াদা করে নিলেন। ইসমাইল ইওয়ানির বলা এই পন্থায় তুলনামূলক কম রক্তপাতে শহর বিজিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ইওয়ানি রাতারাতি কিছু খাওয়ারিজমি সৈন্যকে নগর-প্রাচীরের উপর চড়িয়ে দিল। এই সৈন্যরা প্রাচীরে স্থাপন করে দিল নিজেদের পতাকা।

পরদিন শুরু হল প্রচণ্ড যুদ্ধ। এর ভেতর কামানগুলো নগর-প্রাচীরের একদিকে বিশাল ছিদ্র করে ফেলল। সেই ছিদ্রের কাছে শহরের সৈন্যদল ভরপুর সংঘর্ষ করে যেতে লাগল। খানিক বাদেই হয়তো খাওয়ারিজমিদের তারা পেছনে হটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে আচমকা তাদের দৃষ্টি চলে গেল মাথার উপরে, প্রাচীরের চূড়ায়। সেখানে প্রবল হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে খাওয়ারিজমি পতাকা। এটা দেখে তারা মনে করল শহর হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফলে সবাই হাতিয়ার ফেলে দিল। এভাবে ২৮ জুমাদাল উলা ৬২৭ হিজরি সনে (১৪ এপ্রিল, ১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) বিজিত হল খিলাত।[২৬৭]

বিজয়ের পর সুলতানের উত্তেজিত সৈন্যরা লুটপাটের অনুমতি চাইল। শহরবাসীর বিপদ লক্ষ করে তা থেকে সুলতান তাদের নিষেধ করতে চেষ্টা

---

[২৬৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩১৭-৩১৯, খাওয়ারিজম শাহি ১৯৩

[২৬৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩২০-৩২১, ইবনুল আসির ৭/৬৫৩

করলেন। কিন্তু স্বয়ং আমির ও সেনাপতিরা বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন আরম্ভ করে দিল। বলল—অবরোধ দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমাদের সৈন্যরাও তো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে! শেষ হয়ে গেছে ঘোড়া ও মহিষ। গনিমত সংগ্রহের অনুমতি যদি না মেলে, তা হলে সিপাহিরা দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্যদিকে দুশমন আমাদের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে আছে। এ অবস্থায় সৈন্যরা তাদের মোকাবেলা করার বদলে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে বাহিনী এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে শৃঙ্খলা।

সুলতানের কানে এই কথাগুলো ফুঁকে দিয়ে তারা লুটপাটের অনুমতি আদায় করে নিল। হুড়োহুড়ি করে শহরে ঢুকতে গিয়ে বড়সড় এক তুফানের জন্ম দিল। গুপ্তধনের সন্ধানে কত জায়গা যে খোদাই করল এবং কত নিরপরাধ লোক যে তাদের কোপানলে পড়ল, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

শহর জয়ের পর বিজিতদের সাথে সিপাহিদের এই আচরণও সুলতান জালালুদ্দীনের পতনের একটা কারণ হয়ে উঠেছিল।[২৬৮]

বিগড়ে যাওয়া অবস্থা

খিলাত জয়ের পর ৬২৭ হিজরির মাঝামাঝিতে পরিস্থিতি বাহ্যত সুলতান জালালুদ্দীনের মুঠোর ভেতরেই ছিল। তাতার ও জর্জিয়ানরা পেয়ে গিয়েছিল নিজেদের শিক্ষা। আলামুতের সীমান্তের ভেতর পুরোপুরি গুটিয়ে গিয়েছিল বাতেনি ফেরকা। খলিফার বন্ধুত্বও লাভ করে উঠেছিলেন সুলতান। কিন্তু এসব ছিল শুধু বাহ্যিক চিত্র। আড়ালে খুব দ্রুতই বিগড়ে যাচ্ছিল অবস্থা। খলিফার বন্ধুত্বের চিঠি একটা রুসুম ছাড়া কিছুই ছিল না। দরবারে খেলাফতের পক্ষ থেকে দেওয়া রাজকীয় পোশাক ছিল স্রেফ মন ভুলিয়ে রাখার একটা মাধ্যম।

বাগদাদ তখনো পূর্ববৎ মুসলিমবিশ্বের সংকটের বিষয়াদি থেকে একদম সম্পর্কহীন। এসবের চিন্তাই তাদের ভেতর ছিল না। খলিফার দরবার থেকে এখনো ছিল না সুলতানের সেনাসাহায্য পাবার কোনো সম্ভাবনা।

তা ছাড়া সুলতানের জন্য এখন বাইরের শত্রুদের চেয়েও অধিক হয়ে উঠেছিল এই গাদ্দার ও প্রতিবেশীদের শঙ্কা। সুলতানের ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করে দিতে এরা বিরতিহীনভাবে কূটচক্রান্তে লিপ্ত ছিল। সুলতানের বিশ্বস্ত উজির, সরদার ও আমিরদের মধ্য থেকে গোপনে কয়েকজন ভিড়ে গিয়েছিল দুশমনের দলে। বাহিনীর ভেতর দেখা যাচ্ছিল না আগের মতো বিশ্বস্ততা ও জীবন বাজি রাখবার উদ্যমতা। বরং, কয়েক সেনাপতির মধ্যে গজিয়ে উঠছিল বিদ্রোহের চিন্তা।

বাইরের যুদ্ধগুলোতে তাতার ও জর্জিয়ানদের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত বিজয় অর্জন সত্ত্বেও সুলতান জালালুদ্দীন প্রতিবেশী মুসলিম শাসকদের মন থেকে ভুল ধারণা

---

[২৬৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩২৩

ও হিংসার দাগ মুছে উঠতে পারেননি। সুলতানের বিজয়ের ক্রমধারা তাদের ভেতর জাগিয়ে তুলেছিল বৈরী মনোভাব। তারা সুলতানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধনের মওকা খুঁজছিল। এই অগ্নিলাভা তাদের ভেতরে-ভেতরেই প্রজ্বলিত ছিল।

সুলতানের খিলাত দখলের পর তার সবচেয়ে বড় শত্রু আল-মালিকুল আশরাফ তার থেকে বদলা নেবার জন্য অস্থির সময় কাটাচ্ছিলেন। এক্ষেত্রে সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের বন্ধুত্বও লাভ করতে পেরেছিলেন আশরাফ। মিশর ও সিরিয়ার শাসকরাও আশরাফের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর খুব দ্রুতই এই সম্মিলিত বাহিনী সুলতান জালালুদ্দীনের সেনাশক্তির উপর এক শক্ত আঘাত হেনেছিল। সেই আঘাত সামলাবার সক্ষমতা সুলতান জালালুদ্দীনের তখন ছিল না। নিচে বিগড়ে-যাওয়া এইসব মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

১. অভ্যন্তরীণ গাদ্দারদের আধিক্য :

সুলতান জালালুদ্দীনের দরবারিদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল মুনাফিক ও গাদ্দারের পুরো একটা দল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গাদ্দার ছিল সুলতানের উজিরে আজম শারফুল মুলক। সুলতান কিছুকাল ধরেই উজির-কর্তৃক রাষ্ট্রীয় অর্থের অনর্থক ব্যয় এবং বে-ইনসাফির অভিযোগ ক্রমাগত শুনতে শুনতে বিষাদিত হয়ে উঠেছিলেন। শারফুল মুলক সুলতানকে নীরব দেখে এই কাজে যেন আরো দ্বিগুণ ফুঁসে উঠেছিল। যদিও এখনো সুলতানের সামনে নিজেকে মহান করে তুলবার কোনো সুযোগই সে হাতছাড়া হতে দিতে চাইত না; কিন্তু আড়ালে সুলতান জালালুদ্দীনের শিকড় কেটে দিতে উঠেপড়ে লেগেছিল সে।

গাদ্দারদের আরো একটি দল শাহজাদা গিয়াসুদ্দীনের সাথে দেশান্তরিত হয়ে বিভিন্ন রাজ্যের সাথে মিলে সুলতানের বিরুদ্ধে তাদের উসকে দিতে লাগল। তাদের মধ্যে শাহজাদার সাথে শামিল ছিল 'আমির এলচি জাহাঁ পাহলোয়ান' ও 'উজির কারিমুশ শার্ক'। এরাই ইস্পাহানের যুদ্ধে সুলতানের সঙ্গ ছেড়ে ভেগে গিয়েছিল।

আন-নাসাবি লেখেন—গিয়াসুদ্দীন যখন তাতার-বিরোধী যুদ্ধে সুলতানের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল, তখন সে চলে গিয়েছিল খুজিস্তান।[২৬৯] সেখান থেকে কারিমুশ শার্ককে এই সংবাদ দিয়ে বাগদাদের খলিফার কাছে পাঠাল যে, সুলতানের থেকে গিয়াসুদ্দীন পৃথক হয়ে গেছে। চিঠিতে গিয়াসুদ্দীন বলেছিল—আমার শাসনকালে আমি দরবারে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত রাজ্যের সর্বোত্তম পড়শি ছিলাম। কিন্তু হিন্দুস্থান থেকে সুলতান জালালুদ্দীনের প্রত্যাবর্তনের পর আশপাশের বিভিন্ন

---

[২৬৯] ইরানের একটি প্রদেশ

রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযানে নামতে হয়েছে। গিয়াসুদ্দীন দরখাস্ত করল—আমি চাই, সুলতান আমার থেকে যে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে, তা ফিরিয়ে আনতে খেলাফতে বাগদাদ আমাকে সাহায্য করবে। আজীবন আমি খলিফার অনুগত হয়ে থাকব।

খলিফা গিয়াসুদ্দীনের দূতকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেরত পাঠালেন। গিয়াসুদ্দীনের জন্য দিয়ে দিলেন ৩০ হাজার দিনার। তারপর গিয়াসুদ্দীন আরো বেশি চক্রান্তের জাল বুনতে সুলতানের আরেক শত্রু আলামুতের শাসক আলাউদ্দীনের কাছে চলে গেল। খেলাফতে বাগদাদের কাছে যা-কিছু ব্যক্ত করেছিল, সেখানে গিয়েও তাই বলল।

২. গুপ্তচরদের আনাগোনা :

এই দিনগুলোতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় বাদশাহর (সুলতান জালালুদ্দীন) বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে গিয়েছিল আপন-পর সবাই। গড়ে উঠেছিল গুপ্তচরবৃত্তির বড়সড় একটা জাল। তাতার-রাজ্য থেকে শুরু করে বাগদাদ ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এদের আনাগোনা। সিরিয়ার খ্রিষ্টান শাসকরাও ছিল এই চক্রান্তে শামিল। চক্রান্তের এই জাল বিস্তারে বাতেনিরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছিল। তারা এই ক-বছরের ভেতর তাতারদের সাথে লাগাতার চিঠি চালাচালিতে ব্যস্ত ছিল। তাতারদের তারা সুলতানের বিরুদ্ধে গুপ্তচর নিয়োগের জন্য মদদ যোগাচ্ছিল।

তাতারদের দূত গোপনে বণিক-বেশে বাতেনিদের এলাকা-অভিমুখী কাফেলায় যুক্ত হয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের রাজ্য পেরোত। তারপর তাতারদের চিঠি নিয়ে সে পৌঁছে যেত বাগদাদ ও সিরিয়ায়।

খলিফা নাসির যেমনভাবে সুলতান আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে তাতারদের সাথে আঁতাত গড়ে তুলেছিলেন, তদ্রুপ তার স্থলাভিষিক্ত খলিফা মুসতানসিরও চেঙ্গিজ খানের উত্তরসূরিদের সাথে সম্পর্ক ভালো বানাতে এবং সুলতান জালালুদ্দীনের সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দিতে গোপনে-গোপনে মিশন আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন।

সুলতান জালালুদ্দীন যখন তাতারদের পরাজিত করে ইস্পাহানে অবস্থান করছিলেন, তখন বণিক-বেশে তাদের এক বার্তাবাহক এসে বাতেনিদের বাণিজ্য-কাফেলায় শামিল হয়, তারপর কাযে াথে রওনা দেয় বাগদাদ ও সিরিয়ার উদ্দেশে। গুপ্তচর এই তথ্য সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান উজিরে আজম শারফুল মুলকের কাছে হুকুম পাঠালেন—ইরাকের সীমানা পেরিয়ে আসা সমস্ত কাফেলায় পূর্ণরূপে তল্লাশি চালান। বণিক-বেশে এক তাতার বার্তাবাহক যাচ্ছে। সেই বার্তাবাহককে পাকড়াও

করুন। আমার দ্বিতীয় আদেশ না-পাওয়া পর্যন্ত তাকে আপনার প্রহরায় বন্দি করে রাখবেন।

সুলতানের উদ্দশ্যে ছিল—এই গুপ্তচরকে গ্রেফতার করতে পারলে প্রতিবেশী প্রতিপক্ষদের ব্যাপারেও মজবুত একটা প্রমাণ মিলে যাবে। সেই প্রমাণের ভিত্তিতে বাতেনি ইমাম, বাগদাদের খলিফা ও সিরিয়ার শাসকদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। সুলতানের আদেশে শারফুল মুলক বাণিজ্য-কাফেলার আগমনের উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকায় কঠিন প্রহরা নিযুক্ত করল। কিছুদিন পর সিরিয়া থেকে সত্তর-আশিজন বাতেনির একটি কাফেলা সীমান্ত এলাকায় এসে পৌঁছল। শারফুল মুলক ছিল নির্যাতনকারী ও অমিতব্যয়ী। কাফেলার মাল-দৌলত দেখে তার চোখ চিকচিক করে উঠল। মুখ ভরে এল লালসার লালায়। এখানে আতরারের অপরিণামদর্শী হাকিম ইয়ান্নাল খানের সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাল সে। পুরো কাফেলাকে হত্যা করে সমস্ত সম্পত্তি, সোনাদানা জব্দ করে ফেলল। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই এই সম্পত্তি তার বাছাইকৃত আমির ও সহচরদের মাঝে খরচ করে দিল।

সুলতান জালালুদ্দীন যখন জানতে পেলেন এ কথা, শারফুল মুলকের এই কুকর্মে তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে গেলেন। ওদিকে তার দরবারে বাতেনি শাসকেরও দূত আসবার মওকা মিলে গেল। দূত এসে নিহতদের রক্তপণ তলব করতে লাগল। সুলতান তখন তুতক খান বিন ইনাজ খান নামে এক বিশ্বস্ত আমিরের কাঁধে দায়িত্ব সঁপলেন—তুমি শারফুল মুলকের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পত্তি পাই পাই করে উসুল করে কয়েক কিস্তিতে তা বাতেনি শাসককে আদায় করো।

তারপর নিহতদের রক্তপণ সরকারি কোষাগার থেকে ধীরে-ধীরে আদায় করে দেওয়া হল। চক্রান্তকারী ও গুপ্তচরদের সাথে ঘটে-যাওয়া এমন ঘটনা ভারসাম্য আরো নষ্ট করে দিচ্ছিল।

৩. সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণহীনতা :

সুলতানের বাহিনীর পুরোনো, একনিষ্ঠ ও জানবাজ সিপাহিদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল লাগাতার বিভিন্ন যুদ্ধে তাদের শহিদ হয়ে যাওয়ার কারণে। এবার বাহিনীতে ব্যাপকহারে সৈন্য ভর্তি করতে গিয়ে সব ধরনের এবং সব মেজাজের লোক একত্র হচ্ছিল। দুঃসাহসী যোদ্ধা ছাড়াও পশ্চাৎপদ, মূর্খ, গোঁয়ার, নির্বোধ, নিরক্ষর গোত্রের লোকেরাও একটা বড় সংখ্যায় সৈন্যদলে জুড়ে গিয়েছিল। তারা যাচ্ছেতাই কর্মকাণ্ড আরম্ভ করেছিল। পূর্বেকার লড়াইগুলিতে অনুগত ও দুঃসাহসী সেনাপতিদের শাহাদাত ঘটে যাওয়ায় এবার একটা বড় জায়গা দখল

করে নিল কিছু অনুপযুক্ত লোক। সে-কারণে বাহিনীকে তাদের যথেচ্ছ কর্মকাণ্ড থেকে বাধা দেওয়া সুলতানের জন্য মুশকিল হয়ে পড়েছিল।

বিগত কয়েকটি বিজয়ের পর সৈন্যদলের এইসব ভবঘুরে অসৎ লোক বিজিত অঞ্চলগুলি ছাড়াও আশপাশের বিভিন্ন সীমান্তে ঢুকে গরম করে দিয়েছিল লুটপাটের বাজার। এজন্য সুলতানের কদর ও মর্যাদা বিভিন্ন গোত্রের চোখে কেমন যেন অবনতির দিকে যাচ্ছিল।

সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ

রোকনুদ্দীন আরজানুররোমির সাথে তার চাচাতো ভাই আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সম্পর্ক মন্দভাবে চলে আসছিল। খিলাত অবরোধের সময় আলাউদ্দীন কায়কোবাদ যখন দেখলেন রোকনুদ্দীন সুলতান জালালুদ্দীনকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে, তখন তিনি শংকা অনুভব করে উঠলেন যে, রোকনুদ্দীন সুলতান জালালুদ্দীনকে সহযোগী হিসেবে পেয়ে আমার বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠিয়ে বসতে পারে![২৭০]

সুলতানের কাছে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের ব্যর্থতা এবং সুলতানের খিলাত দখলের পর আলাউদ্দীন কায়কোবাদের এই সংশয় পরিণত হল চূড়ান্ত আশঙ্কায়। তিনি আল-মালিকুল আশরাফের সাথে পূর্বের সমস্ত দ্বন্দ্ব মিটিয়ে তার কাছে সুলতানের বিরুদ্ধে সাহায্য তলব করলেন।[২৭১] এমনকি মিশরের বাদশাহ আল-মালিকুল কামিলের কাছেও দূত পাঠিয়ে একই আবদার করেন তিনি। সেসময় কায়কোবাদের এতই অস্থিরতা ছিল যে, একদিনের ভেতর কামিল ও আশরাফের কাছে তিনি পরপর পাঁচজন দূত পাঠিয়েছিলেন।

এই দুই শাসক সুলতানের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই টগবগ করছিলেন ক্রোধের তপ্ত আগুনে। এজন্য অবিলম্বে তারা আলজেরিয়া ও সিরিয়ার শহরগুলো থেকে সৈন্য ডাকিয়ে এনে কায়কোবাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।[২৭২]

শিহাবুদ্দীন গাজি, আল-মালিকুল আজিজ উসমান ও আল-মালিকুল জাওয়াদ-সহ সিরিয়া ও মিশরের নামজাদা আমিরগণ নিজ-নিজ বাহিনী-সমেত এই মিশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা হল—স্বয়ং আল-মালিকুল আশরাফ ছিলেন বিরাট এই বাহিনীর সহযোদ্ধারা।[২৭৩]

---

[২৭০] ইবনুল আসির ৭/৬৬৪

[২৭১] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি, সাবত ইবনে জাওযি রহ. এর বর্ণনানুসারে

[২৭২] ইবনুল আসির ৭/৬৫৪

[২৭৩] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬৬৭ হিজরি, সেলজুকনামা ১৬৫

সুলতান জালালুদ্দীন আগত দিনের বিভিন্ন শঙ্কা থেকে উদাসীন ছিলেন না। তিনি সতর্কতাস্বরূপ আগে বেড়ে মানজিকার্ট শহরও অবরোধ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনজন মুসলিম শাসক তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যথারীতি একতাবদ্ধ হয়ে উঠেছে, এই খবর তিনি জানতেন না। তার মানজিকার্টের অবরোধ শুরুর পর তার মিত্র রোকনুদ্দীন আরজানুররোমি এসে তাকে সতর্ক করে তুলল যে, 'সুলতান, রোমের সেলজুক এবং সিরিয়া ও আলজেরিয়ার শাসকরা আপনার বিরুদ্ধে জবরদস্ত যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে রণযাত্রা করেছে।'

এই দিনগুলিতে সুলতানের হাজারো সিপাহি আজারবাইজান, আর্রান, ইরাক, মাজেন্দ্রান প্রভৃতি এলাকায় অবস্থান করছিল। এরা সবাই সৈন্যদল থেকে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল। এজন্য তিন রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নেওয়া মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন এ ব্যাপারে মিত্র রোকনুদ্দীনের সাথে পরামর্শে বসলেন। রোকনুদ্দীন অভিমত দিলেন—চলুন, আমরা আমাদের বাহিনী নিয়ে খার্তবারাত এলাকায় গিয়ে অবস্থান করতে থাকি।

ওখান থেকে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারব সম্মিলিত বাহিনীর মধ্য থেকে কাদের সেনাদল প্রথমে আসে? তাদের মধ্য হতে যে প্রতিপক্ষই আগে এসে পৌঁছবে, তাদের সাথেই আমরা যুদ্ধ শুরু করে দেব। এবং তাদেরকে অন্য মিত্রদের সাথে গিয়ে মেশার সুযোগ না দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণে পিছপা করে দেব।

সুলতান এই অভিমত পছন্দ করলেন। রোকনুদ্দীনকে সীমান্ত এলাকার পর্যবেক্ষণের জন্য বিদায় করে দিলেন। কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার, সেই দিনই সুলতানের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

ওদিকে ক্রমাগত রোকনুদ্দীনের চিঠি আসতে থাকে যে, সিরিয়া ও আলজেরিয়ার বাহিনী সীমান্তের দিকে রওনা দিয়েছে। রোমের সেলজুক বাহিনী তৈরি হচ্ছে। তারপর আরও উত্তেজনাকর চিঠি আসতে থাকে—'সুলতান, খাওয়ারিজমি বাহিনীর আজকালের ভেতর সীমান্ত পার হয়ে অগ্রযাত্রা শুরু করা উচিত, শত্রুবাহিনীর বিভিন্ন দল সমবেত হবার আগেই যাতে তাদের কোনো একটি দলকে নিঃশেষ করে ফেলা যায়!'

রোকনুদ্দীনের জানা ছিল না—সুলতানের অসুখের প্রকোপ কী পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সুলতান বাঁচবেন কি না, চিকিৎসক সে ব্যাপারেও দিন-দিন হতাশ হয়ে পড়ছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে রোকনের সেই চিঠির দিকে কী করে মনোযোগ দেওয়া যায়? সৈন্যবাহিনীর অগ্রযাত্রাই-বা কী করে সম্ভব?[২৭৪]

এই সুযোগে সিরিয়া ও আলজেরিয়ার সেনাদলগুলো আলাউদ্দীন কায়কোবাদের বাহিনীর সাথে সিওয়াস নামক স্থানে গিয়ে একত্র হলো। তারপর এই

স্থাপিতঃ ২০২০ইং

[২৭৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৩০, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৫-৩৭৬

সম্মিলিত বাহিনী মানজিকার্ট ও খিলাতের দিকে যাত্রা শুরু করে। সৈন্যসংখ্যার আধিক্যের কারণে সিওয়াস থেকে যাত্রা করে এরা পুরো এক সপ্তাহে আক শহরে গিয়ে পৌঁছে।[২৭৫]

সুলতান ইয়াসি চমনে...

কয়েকদিন পর সুলতানের অসুখ বহুগুণ বেড়ে গেল। এর ভেতর সম্মিলিত বাহিনীর অগ্রযাত্রার সংবাদও পেলেন তিনি।[২৭৬] এর মাঝে রোকনুদ্দীন আরজানুররোমিও এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

সুলতান তার কাছে পরামর্শ চাইলেন। জবাবে রোকন বললেন—সম্মিলিত বাহিনী আসবার আগেই আপনি সামনে বেড়ে ইয়াসি চমন পর্যন্ত পৌঁছে যান। আমি এটা সমুচিত বলে মনে করছি। এই সবুজ-শ্যামল মনোরম এলাকা যদি আপনার কব্জায় এসে যায়, নিশ্চিত বিজয় ও সাহায্য এসে চুম্বন করবে আপনার পদযুগল।'

সুলতান জালালুদ্দীন রওনা দেবার জন্য তৎক্ষণাৎ উদ্যত হয়ে উঠলেন। রোকনুদ্দীন আরজানুররোমির সঙ্গে ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে সারারাত ধরে অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে সফর করে ভোরবেলা গিয়ে উঠলেন ইয়াসি চমনে।[২৭৭] চারদিকে তখন জড়িয়ে রয়েছে ধলপহরের এক অপার্থিব কুহক। আকাশের জানালা বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে নামছে কোমল-মায়াবী আলো।

সুলতানের শারীরিক অবস্থা যেহেতু প্রথম থেকেই খারাপ ছিল, এজন্য রাতের এই দ্রুতগতির সফরে অসুখটা বাড়তে বাড়তে এতোই প্রকোপিত হয়ে উঠল যে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হবার মতোও ভারসাম্য রইল না তার।[২৭৮] এই অবস্থায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের সক্ষমতাও তার ছিল না।

সবাই ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। কারণ, যুদ্ধে বাদশাহ কিংবা সেনাপ্রধানের বীরত্ব ও কর্মপরিচালনার সাথেই সম্পৃক্ত থাকে বিজয়। যতক্ষণ সেনাপ্রধান এক হাতে তরবারি অন্য হাতে পতাকা বাগিয়ে শক্তভাবে দণ্ডায়মান থাকে, নির্ভীক ভঙ্গিতে লড়তে থাকে সিপাহিরা। নেতা নিজেই যদি জমিয়ে লড়তে না পারে; নিরাশ হয়ে অন্যরা এমনিতেই ময়দান ছেড়ে দেয়।

খানিক ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন সুলতান। তার মনে সংশয় জাগছিল—যুদ্ধের একটা সিদ্ধান্ত নিরূপণে তার অসুস্থতা হয়তো অনেক মন্দভাবে প্রভাব

---

[২৭৫] ইবনুল আসির ৭/৬৫৪, সেলজুকনামা ১৬৭

[২৭৬] জাহাঁকুশা ২/১৮১

[২৭৭] সেলজুকনামা ১৬৭

[২৭৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৩০, খাওয়ারিজম শাহি ১৯৭

ফেলবে। তা ছাড়া সুলতানের বাহিনীর একটা বিশেষ সংখ্যা তখন তার সঙ্গে ছিল না। যেসব সিপাহি তার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছিল, তাদের হাতিয়ার ও বাহনজন্তুগুলো খিলাত শহরের ক্লান্তিকর সুদীর্ঘ অভিযানেই বেহাল হয়ে গিয়েছিল।

এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে সুলতানের জন্য উত্তম ছিল ফিরে আসা। কিন্তু আরজানুররোমি সুলতানের সহযোগিতায় কায়কোবাদের বিরুদ্ধে নিজের মনের দহন মেটাতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য ফেরার সিদ্ধান্ত আর হয়ে ওঠেনি।

অগ্রবর্তী দলের আঘাত

দুশমন কাছাকাছি এসে গেছে খবর পেয়ে সুলতান জালালুদ্দীন আতর খানকে ২ হাজার সৈন্যের অগ্রবর্তী একটি দল দিয়ে সামনে পাঠিয়ে দিলেন।[২৭৯]

এদিকে সেলজুকদের অগ্রবর্তী বাহিনীর ৬ হাজার সৈন্য আমির মুবারিজুদ্দীনের নেতৃত্বে বিয়াবানমুশের পাহাড়গুলোর পাশ দিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের অভিমুখ ছিল খিলাতের দিকে। কারণ, তাদের ধারণা ছিল সুলতানের বাহিনী এখনো খিলাতে অবস্থান করছে। তারা নিশ্চিত খবর পায়নি যে খাওয়ারিজমি বাহিনী রাতারাতি তাদের পথে এসে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খাওয়ারিজমি অগ্রবর্তী দলের সিপাহিরা এই সেলজুকদের অজ্ঞাতসারে রাতের অন্ধকারে এদের চারপাশ থেকে ঘেরাও তৈরি করতে লাগল। ভোরের আলো ফুটতেই আচানকভাবে তাদের উপর হামলা করে বসল। তুমুল লড়াইয়ের পর শত্রুদলের ২০০ সিপাহি নিহত ও অনেকেই বন্দি হল। বন্দিদের মধ্যে কয়েকজন সেলজুক আমিরও ছিল। তাদেরকে সুলতানের সামনে উপস্থিত করা হল। সুলতান কল্যাণের প্রতি লক্ষ করে হুকুম দিলেন—এখন এদের বন্দি করে রাখা হোক। যুদ্ধের শেষদিকে দেখা যাবে এদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। আল্লাহই ভালো জানেন, বিজয় কার কপালে জোটে![২৮০]

রোকনুদ্দীনের অভিমত

তারপর সুলতান রোকনুদ্দীন আরজানুররোমিকে ডাকলেন। এই প্রথম লড়াইয়ের প্রচণ্ডতার কথা উল্লেখ করে তার অভিমত জানতে চাইলেন। রোকন চাটুকারিতা করে বললেন, সেলজুক বাহিনীর সহযোগীরা সবাই অশ্বারোহী ছিল। আল্লাহর

---

[২৭৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৩০, খাওয়ারিজম শাহি ১৯৭-১৯৮

[২৮০] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি, সেলজুকনামা ১৬৭-১৬৮

অনুগ্রহে এদের যখন পরাজয় ঘটে গেছে, মনে করুন, পুরো সেলজুক সাম্রাজ্যের উপর আপনারই কর্তৃত্ব।[২৮১]

কায়কোবাদকে আল-মালিকুল আশরাফের দেওয়া প্রবোধ

এদিকে আলাউদ্দীন কায়কোবাদ তার অগ্রগামী দলের পরাজয়ে পেরেশান হয়ে গেছেন। নিজের ও মিত্রদের দক্ষ, অস্ত্রসজ্জিত ও তাজাপ্রাণ সেনাদলগুলো নিয়ে তার খুব দম্ভ ছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদে সেই দম্ভ উড়ে গেল। ভাবতে লাগলেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি কেটে পড়বেন। যখন মিত্রদের সাথে এই নিয়ে পরামর্শ করলেন, এই সিদ্ধান্তকে তারা স্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা ও মানহানিকর বলে অভিহিত করল। কেউ তার সঙ্গে একমত হল না। আল-মালিকুল আশরাফ তার হিম্মত জাগিয়ে তুলতে বললেন, প্রথমদিকে যে বাহিনীর পরাজয় ঘটে, শেষদিকে তারাই সফল হয়।[২৮২] ওসব কিছু না। আপনি শান্ত থাকুন।

বাড়তি আক্রমণ

তিনদিন ধরে আলাউদ্দীন কায়কোবাদের বাহিনী ও খাওয়ারিজমি বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে লাগল। এতে উভয়পক্ষের একটা বড় সংখ্যা নিহত হল। এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে ছিল সিরিয়ান বাহিনীর ছাউনি। সেখান থেকে তারা আকাশে ধুলোর বাদল উঠতে দেখল। লোকজন বলল—খাওয়ারিজমি বাহিনী সেলজুকদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। তাদের ৭ হাজার সিপাহিকে হালাক করে দিয়েছে।

মুওয়াফফিক আবদুল লতিফ বাগদাদি আরযাঞ্জানের এক সিরিয়ান সৈন্যের প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেই সৈন্য বলেছে—সেলজুক সাম্রাজ্যের পুরো বাহিনী, যারা ছিল ১২ হাজার, এখানে জমা হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে এদের মধ্যে শুধু তারাই বাঁচতে পেরেছিল, যারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চলে গিয়েছিল, কিংবা আগেই পিছপা হয়ে গিয়েছিল। আলাউদ্দীন কায়কোবাদের কাছে রয়ে গিয়েছিল স্রেফ ৫ হাজার ক্লান্ত-শ্রান্ত সিপাহি।

তবে, অবশ্য সিরিয়া, আলজেরিয়ান ও মিশরি বাহিনী সুলতানের মোকাবেলায় বিদ্যমান ছিল। আসল শঙ্কা ছিল মূলত এরাই। কারণ, বহুকাল ধরে ক্রুসেড যুদ্ধে লড়াই করে-আসা এই বাহিনী ছিল নিতান্ত দক্ষ ও প্রশিক্ষিত।[২৮৩]

---

[২৮১] সেলজুকনামা ১৬৭-১৬৮

[২৮২] সেলজুকনামা ১৬৭-১৬৮

[২৮৩] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি, মুওয়াফফিক বাগদাদির বর্ণনাসূত্রে

যুদ্ধ এড়ানো যায়নি

২৭ রমজান। সম্মিলিত সেনাদল অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে খাওয়ারিজমিদের ছাউনির খুব কাছাকাছি এসে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হল শক্ত যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ জারি রইল রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে-পড়া পর্যন্ত। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে দু-পক্ষই নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল। রাতভর দু-পক্ষ নিজেদের অস্ত্র ও যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ ঠিক করবার কাজে ব্যস্ত রইল। প্রত্যেকের বিশ্বাস ছিল—আগামীকাল সংঘটিত হবে নিষ্পত্তিমূলক চূড়ান্ত যুদ্ধ।[২৮৪]

সুলতান জালালুদ্দীন সাফল্যের কিছু আগাম লক্ষণ দেখেও এই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চাচ্ছিলেন। এই শেষসময়ে এসে আবারও একবার ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এর ভেতর শত্রুবাহিনী থেকে দুই গোলাম পালিয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের দরবারে এসে পৌঁছল। সুলতানকে তারা আশা যোগাল যে, দুশমন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। কালকে বোধহয় বেশি কিছু করতে হবে না। এমনিতেই বিজয় আপনাদের পদচুম্বন করবে। সুলতান তাদের এই কথায় প্রভাবিত হয়ে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা স্থগিত রাখলেন।[২৮৫]

শেষযুদ্ধ

৬২৭ হিজরির ২৭ রমজান জুমার দিন। ১৯ আগস্ট, ১২৩০। উভয়পক্ষ নিজেদের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে মুখোমুখিভাবে সারিবদ্ধ হতে লাগল। সম্মিলিত বাহিনী খাওয়ারিজমিদের চেয়ে সর্বদিক দিয়েই এগিয়ে ছিল। তাদের স্রেফ অশ্বারোহী সিপাহির সংখ্যাই ছিল ২৫ হাজার।[২৮৬] আর পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা সীমাহীন। তাদের সমস্ত সিপাহি ছিল তাগড়া, বলিষ্ঠ, তাজাপ্রাণ ও হার কিসিমের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডুবে ছিল লৌহবর্মের ভেতর। তাদের চালাক-চতুর আরবি ঘোড়াগুলো দ্রুতগতিতে ও যুদ্ধক্ষেত্রের কর্মসম্পাদনে ছিল অনন্য।

বিপরীত দিকে, সামগ্রিকভাবে খাওয়ারিজমি বাহিনীর ছিল ক্লান্ত-শ্রান্ত ও লাগাতার বিভিন্ন যুদ্ধে লড়তে-লড়তে বিধ্বস্ত ২০ হাজার সিপাহি।[২৮৭] তাদের ছিল পুরোনো হয়ে-যাওয়া স্বল্পমূল্যের কিছু যুদ্ধাস্ত্র। ওদিকে সম্মিলিত সৈন্যদলের নতুন, ধারালো ও মজবুত সব অস্ত্রশস্ত্র। সেসবের সাথে খাওয়ারিজমিদের অস্ত্রের কোনো তুল্যমূল্য ছিল না।

---

[২৮৪] সেলজুকনামা ১৬৯-১৭০, তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি

[২৮৫] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি, মুওয়াফফিক বাগদাদির বর্ণনাসূত্রে

[২৮৬] ইবনুল আসির ৭/৬৫৪

[২৮৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/১৩৬

সুলতান জালালুদ্দীনের অশ্রু

লড়াইয়ের সময় ঘনিয়ে আসতেই সুলতান জালালুদ্দীন একটি উঁচু টিলায় উঠে গেলেন। অসুখের প্রকোপে তিনি পুরোপুরি নাকাল হয়ে পড়েছিলেন। দুর্বলতায় শরীর এতোটাই ভেঙে পড়েছিল যে, ঘোড়ার পিঠে জমিয়ে বসা তার পক্ষে ছিল খুবই কঠিন। টিলার উচ্চতায় দাঁড়িয়ে সুলতান তার প্রতিপক্ষের শানদার যুদ্ধসারিগুলো নিরিখ করছিলেন। ময়দানে সিপাহিরা দূর-সুদূর পর্যন্ত দামি দামি হাতিয়ার-সমেত দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মানুষ-সমান উঁচু ঢাল ও স্বর্ণনির্মিত লোহার পোশাকগুলো সূর্যের প্রখর আলোয় সিসার মতো চমকাচ্ছিল।

সিরিয়া ও মিশরের বাহিনী ছিল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে খুব দক্ষ। তাদের কামান প্রক্ষেপণকারী বাহিনীও চোখে পড়ছিল। তিরন্দাজ বাহিনীও দৈত্যাকৃতির বিশাল-বিশাল তির তাক করে প্রস্তুত হয়ে ছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এরা সবাই সেই জানবাজ মুজাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেতে উঠবে, যিনি ১০ বছর যাবৎ রাত্রদিন তাতার-সয়লাবের মুখে প্রতিরক্ষা-বাঁধ নির্মাণে মগ্ন।[২৮৮]

এ সবকিছু দেখে সুলতান জালালুদ্দীন ভাবছিলেন—হায়, আমাদের কত বড় দুর্ভাগ্য! চতুর্দিক থেকে কাফেররা আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে আর আমরা কিনা রমজান মাসের পবিত্র সময়ে একে অন্যের প্রাণ কেড়ে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেছি! যদি এই গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি আমাদের না হতে হতো, আমাদের সৈন্যদের আগ্রাসী তাতারদের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিমূলক যুগান্তকারী যুদ্ধে লড়তে পারত! হায়, এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ যদি আমাদের ভাগ্যে না ঘটত!

সম্ভবত তখন সুলতানের এইসব ব্যথাতুর অনুভূতি কেউই ধরতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ সুলতানের শক্ত মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল তার ধৈর্য ও সহনশীলতার আঁচল। মনের ভেতর ধকধক করে জ্বলে উঠল দুঃখের নীলাভ আগুন। অবচেতনে তার মুখ থেকে হৃদয় বিদীর্ণ করে-ফেলা এক আহ ধ্বনি বেরিয়ে এল।[২৮৯] তার সঙ্গে দাঁড়ানো আমির ও দেহরক্ষীরা পেরেশান হয়ে তার দিকে তাকাতে লাগল।

সুলতান জালালুদ্দীন সম্মিলিত বাহিনীর দিকে তাকিয়ে আক্ষেপের কণ্ঠে বলে উঠলেন—হায়! এই বাহিনী যদি আমার সাথে হতো, আমি যদি এইরকম বাহিনী নিয়ে তাতারদের মোকাবেলা করতে যেতাম, নিশ্চিত তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম। সেই রক্তপায়ী হায়নাদের রক্তের সিঞ্চনে বিকশিত করে তুলতাম জমিনের উদ্ভিদ।

---

[২৮৮] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি, জাহাঁকুশা ২/১৮১

[২৮৯] সেলজুকনামা ১৭৩

সেলজুকনামার সংকলক ইবনে বিবি লিখেছেন—এই কথাগুলো বলতে বলতে সুলতান জালালুদ্দীনের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল।[২৯০] তার যে-সকল অফিসার ও রক্ষীদল মৃত্যুমুখেও তাকে মুচকি হাসতে দেখে অভ্যস্ত ছিল, তখন খুব বিমূঢ় দৃষ্টিতে তারা দেখছিল এই অবস্থা। তাদের অন্তরাত্মাও দুঃখে-কষ্টে হারিয়ে যাচ্ছিল অতলে।

এক খাওয়ারিজমি সিপাহির বর্ণনা—'আমরা যখন সুলতানের এই অবস্থা দেখি, আমাদের হৃদয় ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়।'

যুদ্ধের ঢেঁড়ায় এক্ষুনি চোট পড়বে। সুলতান টিলা থেকে চোখ মুছতে মুছতে বাহিনীর সেন্টারে এসে দাঁড়ালেন।[২৯১]

যুদ্ধের শুরু

দ্রিম দ্রিম করে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল পুরো ময়দান ও পার্শ্ববর্তী উপত্যকা। উভয়পক্ষ একে অন্যের দিকে স্রোতের তোড়ের মতো ছুটে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিল। খাওয়ারিজমি বাহিনীর একটি দল সেলজুক বাহিনীর উপর আক্রমণ করল। ময়দানের এদিকটায় শুরু হয়ে গেল জবরদস্ত লড়াই।

যুদ্ধের পূর্বে সুলতান জালালুদ্দীনের বাহিনীর দুই লোক গাদ্দারি করে আল-মালিকুল আশরাফের সাথে গিয়ে দেখা করেছিল। আল-মালিকুল আশরাফ তাদের কাছ থেকে সুলতানের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা জেনে নিয়েছিলেন। এবার যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তেজিত গলায় তাদের জিজ্ঞেস করলেন—দ্রুত জানাও, এ মুহূর্তে জালালুদ্দীন খাওয়ারিজমি কোথায় অবস্থান করছে?

গাদ্দারগুলো ইশারা করে বলল—তিনি ওই টিলার উপর আছেন। তার চুল রেশমি কাপড়খচিত একটি টুপি দিয়ে ঢাকা। কাঁধে ছোট্ট একটা বর্শা আছে, তার কোর্তার সঙ্গে সেটি সেলাই করা।'[২৯২]

আল-মালিকুল আশরাফ সঙ্গে নিলেন আল-মালিকুল কামিলের পাঠানো মিশরীয় বাহিনীকে। তারপর হিমস, হিমাত ও হালবের বাহিনী ছাড়াও আরবীয় আমিরদের সৈন্যদল থেকেও দক্ষ সিপাহিদের বাছাই করে খাওয়ারিজমি বাহিনীর সেন্টারে—যেখানে সুলতান জালালুদ্দীন উপস্থিত ছিলেন—গিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন।

সুলতান জালালুদ্দীনকে তখন কাবু করে ফেলেছে শারীরিক রোগ-শোক। কষ্টের আতিশয্যে ঠিকভাবে তিনি বাহিনী পরিচালনা করতে পারছিলেন না।

---

[২৯০] সেলজুকনামা ১৭৩

[২৯১] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি, জাহাঁকুশা ২/১৮১

[২৯২] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি,

প্রতিমুহূর্তে বদলে-যাওয়া রণাঙ্গনের অবস্থাপট তিনি পুরোপুরি ধরে উঠতে পারছিলেন না। তা ছাড়া খাওয়ারিজমি সেনা-অফিসারদের মধ্যেও এমন কেউ ছিলেন না, যিনি সুলতানের এই অপূর্ণতা দূর করে উঠতে পারবেন এবং প্রতিপক্ষের ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারবেন প্রচণ্ড বিক্রমে।

'তারিখে খাওয়ারিজম শাহি'র লেখকের বক্তব্য—তখন সুলতানের বাহিনী বলা যায় কমান্ডারবিহীন লড়ছিল।' তাই, সুলতানের সৈন্যরা আল-মালিকুল আশরাফের সেন্টারের ভয়ানক আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। ফলে সম্মিলিত বাহিনী সামনে বাড়তে বাড়তে সেই টিলার কাছে এসে পৌঁছল, যেখানে বিদ্যমান ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীন।

তাকদিরের ফায়সালা

আল-মালিকুল আশরাফের আক্রমণের প্রচণ্ডতা ও স্বীয় বাহিনীর দুর্বলতা দেখে প্রবল অসুখ নিয়েও সুলতান জালালুদ্দীন উঠে দাঁড়ালেন। তার যুদ্ধের ঘোড়ায় আরোহণ করলেন তিনি। কিন্তু তখন তাকদিরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য বাহ্যিক উপকরণ ও সৈন্যদলের ছিল শেষসময়। তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ না-করে এই অচেতন মুসলিম শাসকদের পারস্পরিক বিক্ষিপ্ততা, গৃহযুদ্ধ ও জিহাদ-ত্যাগের মতো বিরাট অপরাধগুলোর সাজাপ্রাপ্তির সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালা সুলতান জালালুদ্দীনের মতো এক মহান অনুগ্রহকারীর বিরুদ্ধে মুসলিম শাসকদের সারিবদ্ধ হয়ে যেতে দেখে স্ব-অবস্থায় তাদেরকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন। তাদের জন্য তাতার-রূপে এক শিক্ষণীয় কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করছিলেন তিনিই। এই অপরিণামদর্শী, অনুভূতিশূন্য, ঘুমন্ত মুসলিমদের রক্ষা করা থেকে সুলতান জালালুদ্দীনকে মুক্ত করবার সিদ্ধান্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সুলতান খুব কষ্টে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলেন; কিন্তু তার হাত এতোই কাঁপছিল যে, তিনি ঠিকমতো ঘোড়ার লাগামটা ধরতে পারলেন না। তাই কাবু করতে পারেননি ঘোড়া। ঘোড়াটি সামনের দুই পা একবারের জন্য উঁচিয়ে ভারসাম্যহীনতায় ফের উলটোপায়ে কয়েক গজ পেছনে সরে এল।

এই দৃশ্য দেখে সুলতানের একনিষ্ঠ আমিররা আরজ করতে লাগল—আলিজাহ, আপনার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি খুবই প্রতিকূল। আপনি কিছুক্ষণ আরাম করুন, যাতে শরীর খানিক স্বাভাবিকতা ফিরে পায়। এই আমিররা সুলতানকে জোর করে সৈন্যদলের পেছন দিকের সংরক্ষিত জায়গাটার দিকে নিয়ে গেল।[১৯৩]

---

[১৯৩] জাহাঁকুশা ২/১৮১, রওজাতুস সফা ৪/৮৩২

ওদিকে আল-মালিকুল আশরাফের নামজাদা সেনাপতি ইজ্জুদ্দীন উমর খাওয়ারিজমি বাহিনীর উপর শক্ত আক্রমণ করে বসল।[২৯৪] খাওয়ারিজমিদের ডান ও বাম বাহুর সেপাইরা সেন্টার থেকে দূরে ছিল বিধায় ময়দান থেকে সুলতানের সরে পড়বার কী কারণ, বুঝে উঠতে পারল না। তাদের মনে এই ভুল ধারণা জেগে উঠল যে, সুলতান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন।

এই ভেবে তারা হিম্মত হারিয়ে বসল। সিরিয়ান বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে একটা মামুলি সংঘর্ষের পর দিগভ্রান্তের মতো তারা পালিয়ে গেল।[২৯৫] পেছনে যারা রয়ে গিয়েছিল, তারা সবদিক থেকে পড়ে গেল সেলজুকি ও সিরিয়ান বাহিনীর বেড়ের ভেতর।

আলগ খান, আতলাস মালিকসহ সুলতানের কয়েকজন বড় আমির ও মিত্র রোকনুদ্দীন আরজানুররোমি জীবিত গ্রেফতার হন।[২৯৬] সম্মিলিত বাহিনী খাওয়ারিজমি বাহিনীর পলায়নরত সিপাহিদের পেছনে শক্ত ধাওয়া করে অনেককেই হত্যা করে ফেলে। যারা বেঁচে পালিয়ে আসতে পারে, তারা ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছুটে যায় এদিক-ওদিক। তখন বিভিন্নদিকে তাদের শত্রু গোত্রগুলো তাদের ধরে ধরে হত্যা করতে থাকে।

প্রায় ৩ হাজার খাওয়ারিজমি বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে জানিয়াতের বস্তিগুলোতে গিয়েছিল। এই গোত্র ছিল জর্জিয়ানদের মিত্রশক্তি। তাই এখানকার গোত্রগুলো আশপাশের খ্রিষ্টানদের সাথে মিলে এদের সবাইকে ঘিরে ফেলল। একজনকেও জীবিত ছাড়ল না।

সম্মিলিত বাহিনীর সাধারণ ধারণা ছিল এই বিপুল হাঙ্গামায় সুলতান জালালুদ্দীনও মারা গেছেন। এজন্য কয়েকদিন পর্যন্ত তারা তন্নতন্ন করে সুলতানের লাশ খুঁজতে লাগল।

তাদের এক সরদার এ যুদ্ধের কেচ্ছা শোনাতে গিয়ে বলেছে—'আমরা সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজমির উপর হামলা করে তার বাহিনীকে এমন এক কিনার পর্যন্ত ঠেকিয়ে দিয়েছিলাম, যার নিচে ছিল একটা গভীর খাদ। তারা সবাই ঘোড়া-সহ ঝুপঝাপ সেই খাদের মধ্যে পড়তে লাগল। শক্ত ক্ষয়ক্ষতি হল তাদের।

পরদিন আমরা এই খাদের পারে গিয়ে উঁকি দিলাম, দেখলাম—এক আহত সেপাহি ছাড়া সবাই মরে গেছে। এই আহত লোকটারও আবার ভেঙে গেছে ঠ্যাং। আমরা কয়েকদিন পর্যন্ত নিহতদের লাশ ওলট-পালট করে দেখতে লাগলাম।

---

[২৯৪] ইবনুল আসির ৭/৬৫৫

[২৯৫] ২/১৮১

[২৯৬] সেলজুকনামা ১৭৩, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৩১-৩২, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৬

আমাদের কপালজুড়ে ফুটে উঠল চিন্তার গভীর বলিরেখা—সুলতান জালালুদ্দীন তো এদের মধ্যে নেই!'

খাওয়ারিজমি বাহিনী দিকশূন্য হয়ে-পড়ায় নিজেদের অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র, মহিষ, বাহন ও অন্যান্য আসবাবপত্র তারা যুদ্ধক্ষেত্রেই ফেলে গিয়েছিল। সেলজুক ও সিরিয়ান সৈন্যরা সবকিছু লুটে নিল। যেহেতু এই জিনিসগুলো তাদের কাছে খুব ভারী ঠেকছিল, এজন্য সব সিপাহি নিজ-নিজ অংশ স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দিল। লুণ্ঠনকারীদের অধিকাংশ ছিল আরব বেদুইন। তারা সবচেয়ে দামি যে জিনিসটা পেয়েছিল, তা ছিল পঁচিশ রিতল ওজনের একটি স্বর্ণখণ্ড। এটি সুলতান জালালুদ্দীনের তাঁবুর ভেতর থেকে পেয়েছিল।[২৯৭]

ঐতিহাসিকদের মতে, খাওয়ারিজমি বাহিনীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল সিরিয়ান সৈন্যরা। এক খাওয়ারিজমি বন্দির বক্তব্য ছিল এরকম—'সেদিন যদি সিরিয়ান বাহিনী না থাকত, সেলজুক সৈন্যদের আমরা পিষে ফেলতে পারতাম। এদের পঞ্চাশজন অশ্বারোহীকে তো আমি নিজেই হত্যা করেছিলাম।'[২৯৮]

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে স্পষ্ট পরাজয়ের কারণে খাওয়ারিজমি বাহিনী পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। সুলতানের হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল তলোয়ার। ভেঙে পড়েছিল তাতার-সয়লাব রুখে দেবার প্রতিরক্ষা-ব্যূহ।

নিরুপায় সুলতান

ইয়াসি চমনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে বুকে অসহ্য বোঝা নিয়ে ছুটে চলেছেন সুলতান জালালুদ্দীন। সফরের ও অসুখের বিভিন্নরকম কষ্ট সইতে সইতে তিনি খিলাতের দিকে ছুটে চলেছেন। তার সঙ্গে রয়েছে মাত্র সাতজন লোক। পথিমধ্যে পড়ল মানজিকার্ট। তখন মানজিকার্ট অবরোধ করে রেখেছিল উজিরে আজম শারফুল মুলক। সুলতান ও তার সঙ্গীরা ক্ষুধায়-পিপাসায় জর্জরিত হয়ে ওখানে গিয়ে উঠলেন। উজিরে আজম তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করল। শহর ছিল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু সুলতান উজিরে আজমকে তাৎক্ষণিকভাবে অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে চলার হুকুম দিলেন।

তারপর খিলাত পর্যন্ত পৌঁছে ওখানে না থেমেই সুলতান নির্দেশ দিলেন সামনে এগোবার। বাহনজন্তু কম থাকায় শুধু জরুরি আসবাবপত্র, ধনভান্ডার ও নারীদের সঙ্গে নিয়ে আজারবাইজানের দিকে পা বাড়ালেন।[২৯৯] খিলাত শহরে মোতায়েন-কৃত খাওয়ারিজমি নিরাপত্তারক্ষীরাও ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

---

[২৯৭] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি

[২৯৮] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি

[২৯৯] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি

সুলতান উজিরে আজমকে অবশিষ্ট ইরাকি সৈন্যদের সাথে সাকমানাবাদ রেখে, তাগিদ করেন সীমান্তের প্রহরার জন্য। আর তিনি চলে যান খুবি শহরে। এদিকে আল-মালিকুল আশরাফের সেনাদল সামনে বেড়ে খিলাত দখল করে ফেলে।[৩০০]

সন্ধি

আল-মালিকুল আশরাফ জানতেন যে, তাতারদের প্রতিরোধের জন্য সুলতান জালালুদ্দীনের অস্তিত্ব পুরো উম্মাহর জন্য এক বিরাট গনিমত। যদি এই প্রতিরক্ষা-দুর্গ ভেঙে পড়ে, তা হলে যেকোনো সময় তাতাররা তার রাজ্যেও আক্রমণ করে বসবে। তিনি এও জানতেন—সুলতানের এই পরাজয় আগত দিনে সুলতানের কোনো পালটা আক্রমণে বিজয়ের মাধ্যমেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এজন্য যুদ্ধে জয়ী হয়েও তিনি সন্ধি স্থাপনের জন্য চিঠি লিখলেন।

সুলতানের উজিরে আজম তখন সাকমানাবাদে অবস্থান করছিল। আশরাফ তার কাছে লিখলেন—'আপনার মনিব হচ্ছেন মুসলিমদের সুলতান, মুসলিমদের শাসক ও আশ্রয়স্থল। তিনি তাতার-জাতি ও মুসলিমবিশ্বের মধ্যখানে এক শক্ত প্রাচীর। তার পিতার মৃত্যুতে মুসলিম উম্মাহ কী-সমস্ত বালা-মুসিবতের শিকার হয়েছে, তা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আছে। আমরা জানি, সুলতান জালালুদ্দীনের পরাজয়ের অর্থ হচ্ছে ইসলামেরই পরাজয়। এক্ষেত্রে পুরো উম্মাহই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনি অভিজ্ঞ মানুষ। রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপার-স্যাপার খুব ভালো বোঝেন। শীত-গরম দুটোর স্বাদই চাখা হয়েছে আপনার। আপনি কি সুলতানকে এরকম চুক্তির জন্য উৎসাহ দিতে পারেন না, যা সবার জন্যই সঠিক ও উত্তম? কেন আপনি তাকে এমন কথায় রাজি করিয়ে তুলছেন না, যা দুনিয়া ও আখেরাতে খুব প্রশংসনীয় ও আল্লাহর অধিক নৈকট্যলাভের কারণ? আলাউদ্দীন কায়কোবাদ ও ভাই আল-মালিকুল কামিলের পক্ষ থেকে আমি প্রতিভূ হয়ে কাজ করছি—তারা সুলতানকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন। কাছে থাকি কিংবা দূরে, নিজেদের নিয়ত বিশুদ্ধ রাখব। এখন থেকে আমরা এমন আচরণ করব, আশা করি আমাদের দ্বান্দ্বিক মনোভাব ও বিচ্ছিন্নতা নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

আল-মালিকুল আশরাফের এই চমৎকার চিঠি ও তার জামানত, (অর্থাৎ, ভাই আল-মালিকুল কামিল ও আলাউদ্দীন কায়কোবাদকেও এই সন্ধিতে যুক্ত করবেন বলে তিনি যে দায়িত্ব নিলেন) উজিরে আজমকে খুবই প্রভাবিত করল।

---

[৩০০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৩৩, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৬, ইবনে খালদুন ৫/১৩৫

সে সুলতান জালালুদ্দীনকে সন্ধির উৎসাহ দিয়ে আল-মালিকুল আশরাফের চিঠির কথা জানাল। সুলতান জালালুদ্দীন সন্ধিচুক্তির জন্য তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে গেলেন। তার বক্তব্যই তো ছিল এমন—মুসলিম সৈন্যদলগুলো নিজেরা নিজেরা সংঘর্ষে জড়ায়, ফাঁকে কাফেররা এসে ভেড়া-বকরির মতো এদের ধরে ধরে জবাই করে।

এমনিতেও এই পরাজয়ের পর সুলতানের এতটা শক্তি ছিল না যে, তিনি যুদ্ধ জারি রাখবেন। তিনি আল-মালিকুল আশরাফের এই প্রস্তাব গনিমত মনে করলেন। বিশেষ কোনো অজুহাত বা বাহানা না দেখিয়ে আশরাফের পছন্দনীয় শর্তের ভিত্তিতেই সন্ধি করে ফেললেন।

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী খিলাত শহরে আশরাফের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকবে বলেও স্বীকার করে নিলেন। এবং সারমানরাই এলাকাও তার হাতে সোপর্দ করে দিলেন। আশরাফের দুই ভাই মুজিরুদ্দীন ও তাকিউদ্দীন খিলাত দখলের সময় থেকেই সুলতানের কাছে বন্দি ছিল। এই সন্ধির পর সুলতান তাদের সসম্মানে মুক্ত করে দিলেন।[৩০১]

হিন্দুস্থানের দখলীকৃত রাজ্যে ইলতুৎমিশের কর্তৃত্ব

ইয়াসি চমনে সুলতান জালালুদ্দীনের পরাজয় ঘটে যাওয়ায় সেসব বিরুদ্ধশক্তি ও হিংসুক স্পষ্টভাবে সামনে আসবার সুযোগ পেয়ে গেল, সুলতানের ভয়ে এতদিন যারা কুপোকাত হয়ে ছিল।

হিন্দুস্থানে সিন্ধুনদের তীরবর্তী এলাকাগুলোতে সুলতানের নায়েব জাহাঁ পাহলোয়ান উজবুক খুব ন্যায়-ইনসাফের সাথে রাজত্ব করছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে তার বিপুল গ্রহণযোগ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে প্রতিবেশী হিন্দুস্থানি শাসক তাকে হিংসা করতেন। সুলতান জালালুদ্দীনের তরবারি ভোঁতা হয়ে যেতে দেখে হিন্দুস্থানে তার বিরোধীরা, সব রাজা-মহারাজা ও হিন্দ সাম্রাজ্যের আমিরগণ দিল্লির বাদশাহ শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলল যে, 'এবার সুলতান জালালুদ্দীনের কাহিনি খতম হবার পথে। এ পরিস্থিতিতে হিন্দুস্থানের সীমান্ত এলাকাগুলো সংরক্ষিত রাখার জন্য জরুরি হল—সুলতান এখানে যেসব এলাকা দখল করেছিল, সেগুলো কবজা করে ফেলা।'

ইলতুৎমিশের পক্ষ থেকে সম্মতি দেওয়া হয়। অনুমতি পেয়ে দিল্লির সমস্ত সৈন্য সুলতানের নায়েব জাহাঁ পাহলোয়ানের শাসিত অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে তাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে।

---

[৩০১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৩৩-৩৩৪, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৬ তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৭ হিজরি, মিরআতুয যামান ৭/৬৫৯-৬৬২ এর হাওয়ালায়

জাহাঁ পাহলোয়ান প্রথমে কাশ্মির গিয়ে পা মজবুত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু হিন্দুস্থানি আমিররা তাকে সফল হতে দেয়নি। শেষমেশ তাকে ছাড়তেই হল হিন্দুস্থান। তিনি সিন্ধুনদ পেরিয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে যাবার জন্য ইরানের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।[৩০২]

আমির-উজিরদের মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ

সুলতানের শক্তি রোজ-রোজ পড়ে আসছিল দেখে তার আমিরগণ, যারা ক্রমাগত বিভিন্ন যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়ছিল, অত্যন্ত অসন্তোষ ও হতাশার শিকার হতে লাগল। উজিরে আজম শারফুল মুলকও নিজের মতো করে ধরে নিয়েছিল যে, সুলতানের ক্ষমতা এবার পতনের খাতে প্রবাহিত হতে চলেছে। এজন্য ভবিষ্যতের সতর্কতা হিসেবে গোপনে সে আল-মালিকুল আশরাফ ও আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিল। তাদের নিশ্চয়তা দিল যে, তাদের পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত ও অনুগত হয়ে থাকবে সে।[৩০৩]

তিবরিজ ও গনজায় চক্রান্ত

তিবরিজ, গনজাসহ অন্যকিছু শহরে সুলতানের যেসব প্রতিদ্বন্দ্বী দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের বিদ্রোহীসুলভ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত ছিল, এবার কঠিন চক্রান্তের জাল বুনতে আরম্ভ করল। তাদের সবার লক্ষ্য ছিল একটাই—এইবার তারা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের স্বাধীনতার ঘোষণা দেবে।[৩০৪]

---

[৩০২] ইবনে খালদুন ৫/১৩৭, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২২০, খাওয়ারিজম শাহি ২০৪

[৩০৩] ইবনে খালদুন ৫/১৩৮

[৩০৪] ইবনে খালদুন ৫/১৩৮

নবম অধ্যায়

নিভে গেল আশার প্রদীপ

তাতারদের অগ্রযাত্রা

সুলতান জালালুদ্দীন মোঙ্গলিয়ার তাতার-ঝড় রুখে দেবার মহাযজ্ঞে নিমগ্ন হয়েছেন প্রায় ১০ বছর হতে চলেছে তখন। এর ভেতর তার প্রচেষ্টা কখনো সফল হয়েছে, কখনো বিফল। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন পন্থায় অব্যাহত থেকেছে তার প্রাণান্তকর চেষ্টা-মুজাহাদা। কখনো তিনি প্রতিবেশীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ধ্বংসাত্মক তাতার-সয়লাবের পথ রুখে দিতে চেষ্টা চালিয়েছেন। কখনো-বা স্রেফ নিজ বাহুর শক্তির উপরই তাকে নির্ভর করতে হয়েছে।

কিন্তু এখন, ৬২৮ হিজরি সনের শুরুর দিকে, তার অবস্থা হয়ে পড়েছে এমন, তিনি যেন সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে এক টালমাটাল ডুবন্তপ্রায় জাহাজের অসহায় নাবিক। তার সহযোগী হিসেবে পাশে কোনো প্রতিবেশীই এখন আর নেই। বাহুতেও নেই পূর্বের সেই অপ্রতিরোধ্য শক্তি। তার উজিররা খেয়ানতকারী ও বদ-দীন হয়ে গেছে। আমিররা হয়েছে অবাধ্য, উদ্ধত। বাহিনীর সেনাপতিরা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ হতাশ ও বিরূপ মনোভাবাপন্ন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রায় শূন্য। সিপাহিদের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। তাদের জন্য অস্ত্র, খোরাকি ও রসদপত্রের যথেষ্ট ব্যবস্থাপনা নেই।

১২টি বছর ধরে অবর্ণনীয় পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট, বিরামহীন যাত্রা, অপূর্ণ থেকে-যাওয়া কোনো যুদ্ধের জটিলতা, দুর্দশা, মানসিক আঘাত এবং ঠান্ডা ও গরম অঞ্চলগুলোতে লাগাতার জলবায়ুর পরিবর্তন স্বয়ং সুলতানকেই করে দিয়েছে নিদারুণ অসুস্থ।

সর্বজনবিদিত যে, শারীরিক অসুস্থতার প্রভাব মানসিক মেজাজের মধ্যেও পড়ে। এজন্য এবার সুলতানের মধ্যে ছিল না পূর্বের সেই স্থৈর্য ও সহনশীলতা। এই রুক্ষ পরিস্থিতির ভেতর সাহস যোগাবার মতো কোনো খাঁটি বন্ধু যদি তার মিলে যেত, সেটা হতো তার জন্য বিরাট গনিমতের ব্যাপার। কিন্তু এবারকার চিত্রপট হয়ে গিয়েছিল পুরোপুরি ভিন্ন। তার সকল বিশ্বস্ত সহচর এবং উজিরে আজমও তার অবিশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। সুলতানের ভেতরের ও বাইরের শত্রুরা দীর্ঘ সময় ধরে এই সময়টারই দমবন্ধ অপেক্ষাতে ছিল।

এবার খুব দ্রুত বিপদের লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। এই ছিল যখন পরিস্থিতি, তখন তার সবচেয়ে বড় শত্রু তাতাররা কীভাবে পিছিয়ে থাকতে পারে? প্রায় ৩

বছর ধরে মুসলিমবিশ্বের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি ফেলে তারা চেয়ে ছিল। স্রেফ এই কারণে কদম ওঠাবার সাহস করেনি যে, সুলতানের ধারালো তরবারি এখনো তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এবার সেই ধারালো তরবারিই তারা ভোঁতা হয়ে পড়তে দেখল।

আলামুতের হাকিমের চক্রান্ত

সুলতানকে করপ্রদানকারী আলামুতের হাকিম আলাউদ্দীনও সুলতানের এই দুরবস্থা দেখে তাতারদের কাছে ক্রমাগত চিঠি পাঠাতে লাগল—তারা যেন এই সময়টাকে গনিমত মনে করে সুলতানের বিরুদ্ধে শিগগির যুদ্ধযাত্রা করে। সে তার চিঠিতে লিখল—'আলাউদ্দীন কায়কোবাদ ও আল-মালিকুল আশরাফের হাতে পরাজিত হওয়ার পর সুলতান জালালুদ্দীনের শক্তি অনেক কমে গেছে। এখন অন্যকোনো মুসলিম শাসক তাকে সাহায্যও করবে না।'

তাতারদের সম্রাটকে সে জানাল—জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে এখন অভিযানে নামলে বিজয় নিশ্চিত।[৩০৫]

তাতার শাহজাদারা এমন একটা সুযোগের জন্যই জাইহুন-নদীর পারে প্রাণপণে অপেক্ষা করছিল। এবার আলামুতের হাকিমের চিঠি পেয়ে বিপুলভাবে তারা যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে গেল।

তাতারদের বর্তমান খাকান উকতাই খানের পক্ষ থেকে কঠিন আদেশ জারি করা হল—যেভাবেই হোক এই মিশন সফল করে তুলতে হবে। তাতার-বাহিনী বোখারায় সুবিন্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল। শেষে প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে শরৎকালে তারা জাইহুন-নদীর দিকে যাত্রা শুরু করল।

সীমান্তে তাতারদের উৎপাত

শীত মৌসুম আসি আসি করছে। সুলতান জালালুদ্দীন স্বীয় কেন্দ্রস্থল তিবরিজে অবস্থান করছেন। আচমকা সীমান্তে তাতার-বাহিনীর উৎপাতের সংবাদ আসতে লাগল। সংবাদটা শুনে সুলতান এতই অস্থির হয়ে ওঠেন, যা অবর্ণনীয়। দুশমন এরকম একটা সময়ে তার বিরুদ্ধে চড়াও হতে চাচ্ছিল, যখন তার অবস্থা ছিল খুবই দুর্দশাপন্ন।

তিনি দ্রুত তাতার-বাহিনীর অবস্থান জানতে অ্যারগু নামের এক সেনা-অফিসারকে ১৪ জন সৈন্য দিয়ে সেদিকে পাঠিয়ে দিলেন। এই সিপাহিরা উভার ও যানজানের মধ্যবর্তী মার্জশিরওয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাতারদের একটি

---

[৩০৫] ইবনে আসির ৭/৬৫৭, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৯৩

দল এসে তাদের উপর হামলে পড়ে। সেই হামলায় শহিদ হয়ে যায় সকল খাওয়ারিজমি সিপাহি। অ্যারগু খুব কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে তিবরিজে ফিরে আসে।[৩০৬]

এই আক্রমণের স্পষ্ট অর্থ ছিল—সীমান্ত এলাকা এখন অরক্ষিত ও অনিরাপদ হয়ে গেছে।

তাতাররা নির্বিঘ্নে ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। সুলতান এক্ষুনি এদের রুখে দেওয়া প্রয়োজন ভেবে তিবরিজ থেকে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে মাওকানের উপকণ্ঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তার সেনাদের খুব শিগগির বিন্যস্ত করে তুলতে পারেন।

পাশাপাশি অবিশ্বাস্য সব অবস্থা দেখে তিনি নিজের পরিবার ও শাহি খাজানা উজিরে আজম শারফুল মুলকের দায়িত্বে কিরান দুর্গে পাঠিয়ে দেন। এই দুর্গ ছিল বিলকান ও তিবরিজের মাঝখানে অবস্থিত।[৩০৭] সুলতান কিছু বিশেষ সহচর ও অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিবরিজ থেকে বেরোচ্ছেন। তাদের কারুর জানা নেই—নিজেদের রাজধানী থেকে এটাই তাদের শেষসফর কি-না, এরপর আর কখনো এখানে ফিরবার ভাগ্য হয়ে উঠবে না কি-না তাদের। সুলতানের মনেও ব্যথার দোলা জাগছিল—হয়তো এখন তিনি স্বীয় আত্মীয়-পরিজন ও কাছের বন্ধুদের থেকে চিরকালের জন্য আলাদা হয়ে যাচ্ছেন!

তিবরিজ থেকে সুলতানের সাথে শিহাবুদ্দীন নাসাবিও বেরিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—সেসময় সুলতানের সাথে তার কাছের সহচরদের মধ্য থেকে আমি ছাড়া কেউ ছিল না। হ্যাঁ, সিরিয়ার আমিরদের মধ্য থেকে মুজিরুদ্দীন বিন মালিকুল আদিল সুলতানের সঙ্গে ছিলেন এই সফরে। সফরকালে তিনি ছিলেন আলাপে মত্ত।

একদিন, মুজিরুদ্দীন যখন সুলতানের সাথে কথাবার্তার পর তার থেকে খানিক আলাদা হয়ে গেলেন, তখন আমি দেখলাম—সুলতানের চোখ থেকে জল নেমে নেমে তার গাল ভিজিয়ে দিচ্ছে। বোধকরি—সাম্রাজ্যের এই পরিণতি, পরিবারের লোকেদের শত্রুদের কবলে পড়ে-যাওয়া, বিভিন্ন মুসিবতের মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের থেকে চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়ার আভাস তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন।[৩০৮]

সুলতান তার সৈন্যদলগুলি বিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে মাওকান পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে সীমাহীন অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। জানতে পারেন—বাহিনীর সৈন্যরা শীত মৌসুম কাটাতে শিরওয়ান থেকে শুরু করে মাকতুর পর্যন্ত

---

[৩০৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৫০, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৬, ইবনে খালদুন ৫/১৩৮

[৩০৭] জাহাঁকুশা ২/১৮২ নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৬

[৩০৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৫২

দূরদূরান্তের এলাকাগুলোতে চলে গেছে। ফলে পরিস্থিতি এরকম হয়ে ওঠে যে, দ্বিতীয়বার এরা সমবেত হতে গেলে লেগে যাবে প্রায় কয়েক মাস। সুলতান এমুহূর্তে মাওকানে থেমে-থাকা অনর্থক ভেবে আলজিবাল প্রদেশের আরমিয়া দুর্গে গিয়ে ডেরা স্থাপন করেন।

তখনো, বাহিনীকে কীভাবে সমবেত করবেন তার মাথায় জেঁকে আছে সেই চিন্তা। হঠাৎ করেই বাল্ক দুর্গের হাকিমের পক্ষ থেকে সংবাদ পাঠানো হল—যে তাতাররা অফিসার অ্যারগুর গোয়েন্দা বাহিনীর উপর আক্রমণ করেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০।[৩০৯]

এই খবর শুনতেই সুলতানের পেরেশানি ধীরে-ধীরে কেটে যেতে লাগল। মূলত, শীতকাল ও তুষারপাত দেখে সুলতানের মনে প্রথমেই এই চিন্তা জেগেছিল যে, শক্ত আক্রমণের জন্য তাতাররা তাদের স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুসারে বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এবার এই সংবাদটি যখন পেলেন, তার সৈন্যদের উপর আক্রমণকারী দুশমনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০, ধারণা করলেন—এ মুহূর্তে তাতারদের বড় কোনো সৈন্যদল আক্রমণ করবে বলে যে-সংবাদ এসেছিল, তা সঠিক নয়। এই ৭০০ আক্রমণকারী হয়তো তাতারদের ভ্রমণরত কোনো দল ছিল। তখন আন-নাসাবি আরজ করেন—'আলামপনা, বিষয়টা এমন তো নয় যে, এই ৭০০ সৈন্য তাতারদের অগ্রগামী দল এবং আসল বাহিনী তাদের পেছন-পেছন আসছে?'

সুলতান জবাব দেন—তাতাররা কখনো আমাদের মোকাবেলায় ৭০০ সৈন্য পাঠাতে পারে না। এরা যদি অগ্রবর্তী দল হতো, এদের সংখ্যা কমপক্ষে হতো ৭ হাজার।[৩১০]

সুলতান জালালুদ্দীন এ কথা শুধু নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। অন্যথায় বাস্তবতা তার কাছে মোটেই গোপন ছিল না।

নাসাবি বলেন—বোধ করে উঠি যে, সুলতান মানসিকভাবে নাজেহাল ছিলেন বলে বাস্তবতা যাচাই করে দেখতে চাচ্ছিলেন না। ভেতর থেকে তিনি এমন কোনো খবর শুনতে চাচ্ছিলেন, যা তার মানসিক ভার খানিকটা হালকা করবে।[৩১১]

যা হোক, বাস্তবতা হল—এই ৭০০ ছিল অগ্রবর্তী দলের কিছু দ্রুতগতিসম্পন্ন সেনা। এরা স্রেফ সুলতানের খোঁজ লাগাবার জন্য ঢুকে পড়েছিল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। এদের পেছনে যথারীতি আসছিল বড়সড় এক সৈন্যদল। অসংখ্য

---

[৩০৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৫১, খাওয়ারিজম শাহি ২০৫, ইবনে খালদুন ৫/১৪১

[৩১০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৫১ খাওয়ারিজম শাহি ২০৫, ইবনে খালদুন ৫/১৪১

[৩১১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৫১

তাতার-সেপাই তাদের খানে আজমের নির্দেশ অনুসারে জিরমাগুন নামের এক সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে জাইহুন-নদী পেরিয়ে খুব দ্রুতই সুলতানকে নিশ্চিহ্ন করতে অগ্রসর হবে—এমনই ছিল পরিস্থিতি।[৩১২]

কিছুদিন পর বিশ্বস্ত সূত্রে সুলতানের কাছে সীমান্ত এলাকায় তাতার-বাহিনীর নিশ্চিত আগমনের সংবাদ পৌঁছল। তাতারদের এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল কেবল সুলতান জালালুদ্দীনের খেল খতম করা। এজন্য তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল—কীভাবে সুলতানকে পাকড়াও করা যায়!

সীমান্তে সুলতানের আগমনের সাথে সাথে তাতাররাও নড়েচড়ে বসল। এইবার তারা শহরগুলো অবরোধ করতে কিংবা বস্তিতে বস্তিতে আগুন লাগাতে আসেনি। এই কাজ সুলতানকে হত্যা করার পরে প্রশান্ত মনে তারা করে ফেলতে পারবে বলে ভেবেছিল। এখন তাদের গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট ছিল সেই মহান লোকটিকে নিঃশেষ করা, যার বিদ্যমানতায় তারা স্বস্তিতে খানিক বসতেও পারছিল না।

মুজাহিদের ডাক

এখন সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে ইসলামের নামে প্রতিবেশী মুসলিম শাসকদের কাছে ফের একবার সাহায্য তলব করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। যদিও তিনি জানতেন, অধিকাংশ পড়শিই তার অকল্যাণ কামনা করে। জানা ছিল, আল-মালিকুল আশরাফ ও কায়কোবাদের সাথে সন্ধিচুক্তি স্থাপিত হলেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এখনো সহমর্মিতা, মহব্বত ও উম্মাহর জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে-ওঠার পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। জানা ছিল, উপহার হিসেবে খলিফাতুল মুসলিমিন রাজকীয় পোশাক প্রদানের পরও এখনো তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করাকে তিনি অকল্যাণকর গণ্য করেন।

কিন্তু এইসব রূঢ় বাস্তবতা জানা থাকা সত্ত্বেও, সুলতানের মনে একটা অলীক আশা ছিল, হয়তো এই অনুভূতিহীন শাসকরা তাতারদের ধারালো তরবারি তাদের শাহরগের কাছাকাছি এসে গেছে দেখে সাময়িকের জন্য হলেও এবার সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য সুলতানের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে সম্মত হয়ে উঠবে। তাই তিনি খলিফা মুসতানসির বিল্লাহ, সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদ, আল-মালিকুল আশরাফ-সহ অন্যান্য শাসকের নামে এক ঐতিহাসিক পত্র পাঠালেন।[৩১৩] লিখলেন—'তাতার-বাহিনী জাইহুন-নদী পার হয়ে গেছে। এই কঠিন-হৃদয় বাহিনীর সামনে শহর ও দুর্গ বাধাপ্রদানের কোনো সক্ষমতাই রাখে

---

[৩১২] জাহাঁকুশা ২/১৮৮, মুখতাসারুদ-দুওয়াল ২৪৬

[৩১৩] জাহাঁকুশা ২/১৮৩

না। আমজনতা এদের ভয়ে সদা কম্পমান। মনে রাখবেন, মাঝ থেকে আমি যদি সরে পড়ি, আপনাদের পক্ষে এদের রুখে ওঠা, এদের সাথে মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে যাবে। আমি আপনাদের সকলের প্রতিরক্ষার জন্য লৌহপ্রাচীর হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের কাছে দরখাস্ত করছি—আপনারা প্রত্যেকেই আমার সাহায্যে নিজ নিজ পতাকাসহ একটি করে সৈন্যদল পাঠান। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই ঐক্যবদ্ধতায় ভোঁতা হয়ে যাবে দুশমনের রাক্ষুসে দন্ত, বেড়ে উঠবে আমাদের সৈন্যদের সাহস।

এই চিঠির সাথে সাথেই আমার দায়িত্ব অনেকটা কমে যাচ্ছে, তা গিয়ে আরোপিত হচ্ছে আপনাদের উপর। আপনারা যদি গড়িমসি করেন, তবে এর খারাপ পরিণতি শিগগির নিজেরাই দেখতে পাবেন। ওয়াস-সালাম।'[৩১৪]

সৈন্যদলের একরোখা মনোভাব

মুসলিম শাসকদের আহ্বানের পাশাপাশি দূরদূরান্তের বিভিন্ন দুর্গ ও শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নিজের সৈন্যদেরকেও সুলতান তাগিদপূর্ণ নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন যে, তারা যেন শিগগির মাওকানে তার নিকটে এসে একত্র হয়। কিন্তু এবার সেনাবাহিনীর ভেতরেও প্রকাশ পাচ্ছিল বিদ্রোহের আলামত। অধিকাংশ সেনাপতি নিজের জায়গা থেকে নড়ল না।[৩১৫] এই দিনগুলিতে সুলতানের হাজারো সৈন্য শীতকালীন ছুটিতে ছিল। সুলতানের কর্মচারীরা গ্রামে গ্রামে হন্যে হয়ে তাদের খুঁজতে শুরু করে দিল।

এই কর্মচারীদের সাথে তিরখচিত শাহি আলামতও দিয়ে দিয়েছিলেন সুলতান, যে আলামত দেখামাত্র সর্বাবস্থায় প্রত্যেক সিপাহিকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য এসে উপস্থিত হতে হতো। কিন্তু এইসব চেষ্টাও এবার নিষ্ফল হতে লাগল।

এবার সেনাবাহিনীর প্রস্তুত না হয়ে-ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল উজিরে আজম শারফুল মুলকের গাদ্দারি। রাজ্যের অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ভার ন্যস্ত ছিল উজিরে আজমের উপর। তার বিদ্রোহী আচরণে তার অধীনস্থ হাজারো সিপাহির ভেতরেও জেগে ওঠে সাহস। সুলতানের দৃঢ় তাগিদপূর্ণ আদেশগুলো তারা এড়িয়ে যেতে থাকে। আল্লামা ইবনুল আসির লিখছেন—'সুলতানের উজির সেনাবাহিনীর অধিকসংখ্যক সৈন্য-সমেত সুলতানের আনুগত্যের বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল।'[৩১৬]

---

[৩১৪] জাহাঁকুশা ২/১৮৩

[৩১৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৫১

[৩১৬] আল-কামিল, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৬৫৮

দ্বিতীয় প্রধান কারণ—তাতারদের কয়েকটি সৈন্যদল জায়গায় জায়গায় টহল দিয়ে ফিরছিল। যেখানেই সুলতানের সিপাহিদের উপস্থিতির কথা জানতে পারছিল, সেখানেই গিয়ে শুরু করছিল ধ্বংসকাণ্ড। এজন্য, সুলতানের বিক্ষিপ্ত সিপাহিরা এদের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টায় আরো বেশি বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সুলতানের গুপ্তচরদের কোনো খবরই ছিল না। তারা নিজেদের দায়িত্বের কথা এমনভাবে ভুলে বসেছিল, যেন-বা তাদের কোনো কাজই নেই।

একদিন সুলতান জালালুদ্দীন মাওকানের বাইরে একটি টিলার দিকে ইশারা করে নাসাবিকে বললেন—আপনি ওই টিলার উপরে যান। আমি একটু পরেই আসছি। আমার আসবার আগেই আপনি একটি লেখা তৈরি করবেন। সেই লেখায় আরদাবিল ও ফিরোজাবাদের দুর্গপতিদের তাগিদ করে বলবেন—'আমি তাতারদের কর্মকাণ্ড জানার জন্য আমির এরগান সানকার ও আমির আর্সমানকে পাঠাচ্ছি। এদের জন্য প্রত্যেকটি মনজিলে ঘোড়া প্রস্তুত রাখবেন, খেয়াল রাখবেন এদের সমস্ত প্রয়োজনের দিকে।'

নাসাবি টিলার উপরে উঠে চিঠি লিখে দিলেন। কিছুক্ষণ পর সুলতানও ওখানে গিয়ে উঠলেন। এবং এই চিঠি উল্লিখিত দুই আমিরকে দিয়ে রওনা করিয়ে দিলেন। কিন্তু এই দুই নালায়েক আমির গন্তব্যে না গিয়ে নিজেদের বাড়িতে চলে গেল। এদের অনুভূতিই রইল না যে, এদের যে প্রবল আশঙ্কাজনক বিষয়ের খবর নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে, সেই শঙ্কা এখন একেবারে মাথার উপর ঝুলছে।[৩১৭] অন্যদিকে তাতারদের গুপ্তচর বাহিনী সুলতান জালালুদ্দীনের এলাকায় পুরোদমে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এই দিনগুলিতে তাতারদের সকল কর্মকাণ্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদও সুলতানের কাছে পৌঁছত সময় চলে যাবার পর, কিংবা যথেষ্ট বিলম্বে। এর কারণ ছিল সুলতানের গোয়েন্দাদের দায়িত্ববোধহীনতা। অথচ ওদিকে তাতাররা সুলতানের ব্যাপারে তাজা-তাজা সত্য-সঠিক সব তথ্য এমনভাবে পাচ্ছিল, বলা যায়, সুলতানের গোয়েন্দারাই হয়ে গিয়েছিল তাদের সহযোগী।

সৈন্যদলের আমির, সরদার ও সংবাদ সরবরাহকারীদের এই ভণ্ডামি ও অবিশ্বস্ততার কারণে তাকদিরের খাতায় লিখিত সুলতানের আশু পতনের দৃশ্য স্পষ্টভাবে চোখে ভাসছিল।

সুলতানের আবাসস্থলে তাতারদের হামলা

নিজের ও মুসলিমবিশ্বের শাসকদের সৈন্যদলের অপেক্ষায় সুলতানের অস্থিরতা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছিল দিনদিন। এই অস্থিরতা কাটাতে একদিন তিনি মাওকানের উপকণ্ঠে শিকারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। পশুশিকার ছিল তার একটি পছন্দনীয়

---

[৩১৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৫২

কাজ। তখন সুলতানের সঙ্গে ছিল মাত্র ১ হাজার সিপাহি। আল-মালিকুল আশরাফের ভাই মুজিরুদ্দীন এখানেও সুলতানের সঙ্গে ছিল।

মাওকান শহরের বাইরে এক উঁচু পাহাড়ের উপরে ছিল একটি মজবুত দুর্গ। দুর্গটিকে বলা হতো শিরকাবুত। পার্শ্ববর্তী সুগভীর পাহাড়ি খন্দকগুলো এটিকে অত্যন্ত সুরক্ষিত বানিয়ে দিয়েছিল। সুলতান এই দুর্গের পাদদেশে পাথর-ভরা গিরিপথে ছাউনি স্থাপন করলেন। কাফেলায় তার সঙ্গে এক তাতার কয়েদিও ছিল। খিলাত অবরোধের সময় সীমান্ত এলাকা থেকে আরো কিছু সহচরসহ একে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বাকিদের হত্যা করে ফেলা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল স্রেফ একেই।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সুলতান এই তাতার কয়েদিকে আন-নাসাবির কাছে সোপর্দ করে দিয়ে বললেন—ওকে দুর্গে নিয়ে যান। শক্ত পাহারায় রাখুন। সুলতানের আশঙ্কা ছিল—এই কয়েদি যদি মওকা পেয়ে পালিয়ে যায়, এর মাধ্যমে তাতাররা সুলতানের সৈন্যদলের বিচ্ছিন্নতা ও রাজ্যের অব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দুর্বলতার প্রত্যক্ষদর্শী তরতাজা সব সংবাদ জেনে যাবে বিস্তারিত। অথচ সুলতানের জানাই ছিল না যে, তাতারদের একটি দল তার কাছাকাছি এসে গেছে। তিনি শিকারে বেরিয়েছেন—তারা শুধু এই তথ্যই জানত তা না; বরং কোথায় খাটানো হয়েছে সুলতানের তাঁবু এবং তাঁবুর ভেতরের অবস্থা কী—পুরোপুরিভাবে সব জেনে গিয়েছিল।

এই চিত্রপট দেখে একটা সম্ভাবনা খুবই পোক্ত হয়ে ওঠে যে, সুলতানের আদেশপ্রাপ্ত সংবাদ সরবরাহকারী ও গোয়েন্দাদের অধিকাংশই তাতারদের হাতে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তারা সুলতানের আদেশের বিপরীত কাজ করছিল। নাসাবি তাতার কয়েদিকে তিন সিপাহির প্রহরায় দুর্গে নিয়ে গেলেন। কয়েদিকে আজকের রাতটা ওখানেই কাটাতে হবে।

আল-মালিকুল আশরাফের ভাই মুজিরুদ্দীন মাওকানের শিকারকেন্দ্রে সুলতানের সাথেই ছিল। সে-রাতে সুলতান তার কাছে ভাই আল-মালিকুল আশরাফের নামে বিশেষভাবে এই পয়গাম দিলেন যে, 'তাতারদের এই আক্রমণ ব্যক্তি আমার উপর নয়; নয় স্রেফ আমার সাম্রাজ্যের উপর। যদি এই ফেতনা ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়, অবশিষ্ট পুরো মুসলিমবিশ্বেও কায়েম হবে ধ্বংসযজ্ঞ। কাফেরদের এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চতুর্দিকে উড়তে শুরু করেছে। উসকে উঠেছে এই মুসিবতের আগুন। এখন উম্মাহর ঐক্যবদ্ধতাই এই ফেতনা নিশ্চিহ্ন করতে পারে।'

সুলতান মুজিরুদ্দীনকে রওনা করিয়ে দেবার পর সঙ্গে সঙ্গে উজিরে আজম শারফুল মুলকের কাছে এই চিঠি পাঠালেন যে, মুজিরুদ্দীনের সঙ্গে উপযুক্ত একজনকে দূত বানিয়ে আল-মালিকুল আশরাফের দরবারে পাঠাবেন।

শারফুল মুলক তার নায়েব মুঈনুদ্দীন কামিকে মুজিরুদ্দীনের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। অথচ মুঈনুদ্দীন মোটেই দূতিয়ালির জন্য উপযুক্ত ছিল না।

শিহাবুদ্দীন নাসাবি এ বিষয়ে পর্যালোচনা করে লিখেছেন—শারফুল মুলক যে এ ধরনের লোককে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, সেটা ছিল সুলতানের টার্গেট ও উদ্দেশ্যের বিপরীত। দূতিয়ালির জন্য অনুপযুক্ত লোক বাছাই করে উজিরে আজম নিমকহারামির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে চাচ্ছিলেন।[৩১৮]

তাতারদের অতর্কিত আক্রমণ

সুলতান জালালুদ্দীন যে শিরকাবুতের উপকণ্ঠে উপস্থিত আছেন, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সেই রাতেই তাতারদের একটি অতর্কিত আক্রমণকারী দল এসে এখানে পৌঁছল। অন্ধকারের সুযোগে অকস্মাৎ তারা তাঁবুতে হামলে পড়ল। রাতের এই আক্রমণে তাদের সামনে কোনো বাধাই ছিল না। সুলতান বড় মুশকিলের সাথে সেখান থেকে বেঁচে বেরোতে পেরেছিলেন। তাতাররা সুলতানের কাফেলার সব সামানপত্র লুট করে নিল। নাসাবি ছিলেন এই হাঙ্গামা সম্পর্কে বেখবর। তিনি শিরকাবুতের উঁচু দুর্গে রাত কাটাচ্ছিলেন। ভোরবেলা যখন দুর্গ থেকে বেরিয়ে সুলতানের সাথে দেখা করতে এলেন, বিস্ময়ভরা চোখে দেখলেন—শাহি তাঁবু সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে, উলটপালট হয়ে গেছে সামানপত্র। ওখানে শিকারের জন্য পোষা চিতাবাঘ ও বাজপাখি ব্যতীত কোনো লোকের উপস্থিতি নেই। নাসাবির চোখের সামনে জমাট বাঁধতে লাগল অন্ধকার। তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি সুলতানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তার বিশ্বাস ছিল—তাতারদের একটি সেনাদল তার সামনে সুলতানের পিছু-পিছু যাচ্ছে, তা হলে আরেকটি দল পেছন থেকেও আসছে নিশ্চয়।

পথে সুলতানখুই নামক স্থানে ইরস নদী থেকে বের হয়ে-আসা একটি নহর পড়ল। সেই নহরের উপরে ছিল পারাপারের একটা ব্রিজ। ব্রিজের মুখে তাতারদের ভয়ে অন্যত্র পাড়ি জমাতে-যাওয়া তুর্কমানদের ভীষণ ভিড়ভাট্টা ও হুড়োহুড়ি লেগে ছিল। কার আগে কে পেরোতে পারে, সেই প্রতিযোগিতা সবার ভেতর। ফলে, নিরাপদে অতিক্রম করা সবার জন্যই মুশকিল হয়ে উঠল।

নাসাবি সাতপাঁচ না ভেবেই সরাসরি নহরে নামিয়ে দিলেন ঘোড়া। তারপর নিরাপদেই ওপারে পৌঁছে গেলেন। বিলকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় মুহূর্তের জন্যও থামলেন না। সোজা গনজায় গিয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন। তবু আশপাশে সুলতানের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। পরদিন নাসাবি তাতার-বাহিনীকে সুলতানের সন্ধানে গনজার পাশ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে যেতে দেখলেন।[৩১৯]

---

[৩১৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৫

[৩১৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৫৩-৩৫৪, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৬

স্থাপিতঃ ২০২০

মাহানে অবস্থান

সেই রাতে আক্রমণকারী তাতাররা সুলতানকে ধাওয়া করে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছিল। শেষে সুলতান ইরস নদীর তীরে পৌঁছে তাতারদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের গনজার রাস্তায় ফেলে দিতে সক্ষম হলেন, আর নিজে চলে গেলেন সবুজ-শ্যামল নয়নাভিরাম মাহান এলাকায়। ওদিকে তাতাররা গনজার পথে পথে হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকল।

প্রকৃতিতে শীতকাল তখন নিজের সমস্ত প্রাবল্য ঢেলে দিয়েছে। বিরামহীনভাবে বয়ে যায় হাড় কাঁপিয়ে-দেওয়া শীতল বাতাস। সঙ্গে বর্ষিত হয় তুষার। তাই কোনো দিক থেকে তখন তাতারদের আগমনের কোনো শঙ্কা ছিল না। এজন্য কিছুকালের জন্য এখানে থাকবার সুযোগ জুটে গেল সুলতানের।

এখানে একটি উঁচু পাহাড়ি দুর্গ ছিল। সেই দুর্গের শাসক ছিলেন ইজ্জুদ্দীন। সুলতানের এখানে অবস্থানকালে ইজ্জুদ্দীন খুব আতিথেয়তার সাথে তার খোরাকি, রসদপত্রসহ অন্যসব প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করলেন। তাতারদের কর্মকাণ্ডের তথ্যও সাধ্যমতো সরবরাহ করতে লাগলেন। তার এই প্রীতিভাবাপন্নতা ও দায়িত্ববোধের কারণে এখানে ভালো নিরাপদ সময় কাটালেন সুলতান।

শীতের প্রকোপ কমে এল পূর্বের তুলনায়। খুব সন্নিকটে ছিল কসন্তকালের আগমন। ইজ্জুদ্দীন সুলতানকে জানালেন—তাতারদের একটি বাহিনী তিবরিজ থেকে দশ মাইল দূরের আওজান নামক স্থান থেকে আপনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। তারা নিশ্চিতভাবেই জানে আপনি আমাদের এখানে আছেন।

ইজ্জুদ্দীন পরামর্শ দিলেন—এখান থেকে আপনার এখন আর্রান চলে যাওয়া উচিত। সেখানে বহু তুর্কমান যোদ্ধা রয়েছে। তারা নিজ নিজ দুর্গে স্মিতহাস্যে আপনাকে খোশ আমদেদ জানাবে।[৩২০]

শারফুল মুলকের কুকর্ম, খারাপ পরিণতি

এদিকে সুলতান জালালুদ্দীন বহির্শত্রুদের মুখোমুখি হবার জন্য আসবাব-উপকরণের সন্ধানে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, ওদিকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহী শক্তি সুলতানকে বিপদে ফেলবার জন্য তৈরি হয়ে ছিল। এই অপশক্তির শীর্ষ তালিকায় ছিল উজিরে আজম শারফুল মুলক। তখন সুলতানের এই গাদ্দার উজির আর্রানে অবস্থান করছিল।

সুলতান আর্রান পৌঁছার আগেভাগেই তার বিরুদ্ধে প্রকাশ পেয়ে গেল উজিরে আজমের ঘৃণিত অপকর্ম। এই উজিরের বড় বড় কিছু অপরাধ ছিল, যেগুলো সুলতানের অসন্তোষের কারণ হয়ে ওঠে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে :

---

[৩২০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৫৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৬

১. সে প্রজাদের অর্থবিত্তে নির্বিচারে হস্তক্ষেপ করত।

২. সুলতানের অনুমতি ছাড়াই জাতীয় কোষাগার থেকে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ অর্থ সে একদম নিষ্প্রয়োজনীয় খাতে খরচ করে ফেলত। এতে প্রয়োজনের সময় সৈন্যদলের রসদ ও অস্ত্রপাতির যোগান দিতে গিয়ে ব্যাপক টানাটানি পড়ে যেত।

৩. সুলতান উজিরের অমিতব্যয়িতায় রেগে গিয়ে হুকুম জারি করে দিয়েছিলেন—আপনি রাজকীয় উপঢৌকন প্রদানের খাত ব্যতীত কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ খরচ করতে পারবেন না। উজির এই আদেশ সরাসরি এড়িয়ে গিয়েছিল। সুলতানের হুকুম অনুযায়ী আমল-করা কর্মচারীদের সে সাজা দিতে শুরু করেছিল।

৪. বিগড়ে-যাওয়া পারিপার্শ্বিকতা দেখে উজিরে আজম বুঝে গিয়েছিল—শিগগির সুলতানকে সবকিছু ছেড়েছুড়ে হিন্দুস্থানে পালিয়ে যেতে হবে। খতম হয়ে যাবে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য। তাই সে প্রতিবেশী শাসকদের সাথে গোপনে আঁতাত করে নিজের ভবিষ্যৎ-সহযোগী জুটিয়ে নিয়েছিল। কিছু চিঠিতে সে কায়কোবাদ ও আল-মালিকুল আশরাফের আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল। বিনিময়ে নিজের জন্য চেয়ে রেখেছিল আজারবাইজানের জায়গির।

৫. সে নিজের গোপন বৈঠক ও চিঠিতে সুলতানকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতেও কুণ্ঠিত হতো না। উজিরের এমন অনেক চিঠি সুলতানের হাতে এসে পড়েছিল, যেগুলিতে স্পষ্ট ভাষায় সুলতানকে জালেম ও মরদুদ বলেছিল সে।

৬. সে হিসামুদ্দীন কালিজ আরসালানকে—যে ছিল কিরান দুর্গে সুলতানের হেরেম ও শাহি খাজানার পাহারাদার—তাগিদ করল, হেরেম ও শাহি খাজানার ব্যাপারে আমি যে হুকুম করব, সে অনুসারেই কাজ করতে হবে। সুলতানের কথা মানা যাবে না।

উজিরে আজমের কুৎসিত অপকর্মের পরও সুলতান সেসব এড়িয়ে গিয়েছিলেন; এই আশায় যে, হয়তো সে নিজে থেকে পরিণতি বুঝে রূপ বদল করবে। কিন্তু এখন, তার দ্বারা এতো বড় বড় অপরাধ ঘটে যাওয়ায় সুলতানের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি উজিরে আজম নামের এই কাঁটাটাকে সাম্রাজ্য থেকে উপড়ে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

এই সংকল্প নিয়ে তিনি যখন হঠাৎ আর্রানে গিয়ে পৌঁছলেন, তার পরিবর্তিত রুদ্রমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল উজিরে আজম। উজির তখন অবস্থান করছিল হিজান দুর্গে। দুর্গটিকে মেরামত করে সে খুব মজবুত করে নিয়েছিল। কিন্তু খুব ভালো করেই সে জানত—সুলতানের প্রতিশোধের আগুন থেকে বাঁচতে পারা মুশকিল। তাই কাফন পরিধান করে সন্ত্রস্ত চেহারায় সুলতান জালালুদ্দীনের দরবারে এসে উপস্থিত হল। কাছে এসেই ধপ করে সুলতানের পায়ের উপর পড়ে গেল। কান্নায় তড়পাতে তড়পাতে প্রাণ ভিক্ষা চাইল সে।

এই বদ লোকের কোনো কিছুতেই ভরসা করতে পারতেন না সুলতান। কিন্তু এই কান্না-মেশানো ফরিয়াদ শুনে তার মন গলে গেল। প্রাণ ভিক্ষা দিলেন। কোনো কিছু না করে শুধু একটি দুর্গে তাকে নজরবন্দি করে রাখলেন। দুর্গের চার দেয়ালের ভেতরেও উজিরের রাজনৈতিক চক্রান্তধর্মী মেজাজ বিভিন্ন ঘোঁট পাকাতে লাগল। খুব দ্রুতই সে দুর্গ-পরিচালককে নিজের সহকর্মী বানিয়ে নিল। সুলতানের খাদেম ও গোলামদের সাথে গড়ে নিল গোপন আঁতাত।

তার এসব ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল—সুলতানের এই গোলাম ও খাদেমরাই জর্জিয়ানদের সাহায্যে উলটে দিতে পারবে সুলতানের মসনদ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উজিরে আজমের এসব চক্রান্তের ব্যাপারে গোলামদের প্রধান অফিসার সুলতানকে আগেভাগেই জানিয়ে দিল। সুলতান প্রথম থেকেই লাগাতার বিভিন্ন যুদ্ধে বিফল হবার কারণে পেরেশান ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ ঝগড়া-ফ্যাসাদকে বেশি দীর্ঘ হতে দেওয়ার মতো শক্তি তার ছিল না। তাই অনতিবিলম্বে তিনি উজিরে আজমকে হত্যা করে ফেললেন।

সুলতানের ধারণা ছিল—উজিরে আজমের এই পরিণতি দেখে অভ্যন্তরীণ যেসব বিরুদ্ধ শক্তি আছে, তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। এতে সুলতানের পেরেশানি অনেকটা কমে যাবে। কিন্তু আফসোস, সুলতানের ধারণারও অধিক আমির ও সিপাহির মধ্যে উজিরে আজম তার বিষ ঢুকিয়ে গিয়েছিল। তারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল উজিরে আজমের প্রদত্ত ভুল চেতনায়। তাই উজির-হত্যায় বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে কিছু আমির (তারা ভেতর থেকে ছিল উজিরের সহযোগী) সুলতানের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেল।[৩২১]

গাদ্দারদের তিবরিজ দখল

তিবরিজ শহর সুলতান জালালুদ্দীনের মিশন বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ একটা সময় ধরে কেন্দ্রের কাজ দিয়ে আসছিল। এর মধ্যেই সেখানে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ নামের এক আমির শহর দখল করে সুলতানের সৈন্যদের স্থানচ্যুত করে দিল।[৩২২] তিবরিজ সকল কাজে সুলতানের রাজধানীর ভূমিকা রাখত। কিন্তু তাতারদের রুখতে গিয়ে অনেক ঝুটঝামেলা বেধেছিল। তারপর আগমন ঘটেছিল নতুন নতুন বিপদের, এজন্য এদিকে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ মেলেনি সুলতানের। মূলত, বিদ্রোহী শক্তির হাত থেকে তিবরিজ ফিরিয়ে নিতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন ছিল, তা অর্জন করবার জন্য সুলতানের কিছু সময়ের দরকার ছিল। এবং এরও পূর্বে জরুরি ছিল তাতারদের প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধাস্ত্র ও সেনাশক্তির ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠা।

---

[৩২১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৬৪-৩৬৬; জাহাঁকুশা ২/১৮৫; ইবনে আসির ৭/৬৫৯

[৩২২] ইবনে খালদুন ৫/১৩৯; ইবনে খালদুন ৫/১৩৮

সুলতানের অবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল যে, তার কাছে তখন এরকম কোনো শক্ত প্রাচীর-বেষ্টিত শহরও ছিল না, যেখানে তার অধিকসংখ্যক সিপাহি রয়েছে। এমন কোনো শহর ছিল না, যেটিকে নিজের জন্য সংরক্ষিত মনে করে তাতারদের সাথে যথেষ্ট সময় ধরে দুর্গবদ্ধ থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন। কালের মহা আবর্তন তাকে আবারও একবার বাদশাহ থেকে ঘরহীন এক যাযাবর বানিয়ে দিয়েছিল।

বসন্তের শুরু, তাতারদের আগমন

বসন্তকালের শুরুতেই আকাশের মেঘপুঞ্জ ভেঙে ছানাছানা হয়ে গেল। মেঘের পাহাড় ছাপিয়ে ভেসে উঠল আকাশের তরতাজা নীলরঙা চাদর। সূর্যের মায়াময় আলোয় ঝলমলে হয়ে উঠল পূর্ব থেকে পশ্চিম। ফল-পাতাবিহীন শুকনো গাছগাছালির সবুজ পাতা, ফুল ও ফলে লালিত্যময়ী হয়ে উঠল। বিগলিত হয়ে গেল পাহাড়-পর্বতজুড়ে জমে থাকা বরফ। জমাটবাধা ঝর্নাধারা ফের নতুনভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসাগীতি গেয়ে গুনগুন করে বইতে লাগল।

কিন্তু প্রকৃতিতে মুচকি হাসি নিয়ে জেগে-ওঠা এই বসন্ত মুসলিমবিশ্বের জন্য নিয়ে এল রুক্ষ শরতের পয়গাম। বসন্তের এই মৃদুমন্দ বাতাসের পেছন-পেছন তীব্র আক্রোশে আসছিল ভীতিকর আওয়াজ। সূর্যের মিষ্টি আলোর পেছনে মাথা ওঠাচ্ছিল বিধ্বস্ততার কালো-কুৎসিত অন্ধকার। যেসব রাস্তা অনবরত বরফ বর্ষণের ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন খুলে গেল। এজন্য তাতারদের পশ্চিম দিকে যাত্রার পথে আর কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবার ছিল না।

তাতার কমান্ডার জিরমাগুন বিলকানে ছাউনি স্থাপন করেছিল। সুলতানের উদ্দেশে রওনা দিতে দরবারের পক্ষ থেকে শেষ একটি ইশারার জন্য অপেক্ষা করছিল সে। হয়তো এই প্রধান সেনা-কমান্ডার আক্রমণের পূর্বে, স্থানীয় শাসক ও বহির্শাসকদের পক্ষ থেকে সুলতান জালালুদ্দীন কোনো সাহায্য পান কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিল।

এক তাতার কয়েদিকে জিজ্ঞাসাবাদ

বিলকা নামে সেনাপতি জিরমাগুনের এক সিপাহি সুলতানের নায়েব ফখরুদ্দীনের কাছে এসে পৌঁছে। তাকে হুকুম প্রদানের কণ্ঠে এই পয়গাম জানায় যে, তুমি যদি নিজের কল্যাণ চাও, সুলতানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো। আমাদের যুদ্ধসারিতে শরিক হয়ে এই ভূমি থেকে সুলতানকে খেদিয়ে দাও।

ফখরুদ্দীন ছিল একজন আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন লোক। এই তাতার-সৈন্যকে গ্রেফতার করে সে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সুলতান নির্জনে এই তাতারকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন—জিরমাগুনের সৈন্যসংখ্যা কত?

সে জবাব দেয়—বোখারায় যখন সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করা হচ্ছিল, তখন আমাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হচ্ছিল যে, সৈন্যসংখ্যা ২০ হাজার। বাস্তবে সঠিক সংখ্যা ছিল এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশি।

শুনে চমকে ওঠেন সুলতান। মুসলিম সেনাদের বিভিন্ন গুজব ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচাতে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলেন—আমাদের সিপাহিদের কাছে তাতারদের এই সংখ্যার সংবাদ পৌঁছবার আগেই এই বন্দিকে হত্যা করে ফেলো। সাথে সাথে কয়েদিকে হত্যা করে ফেলা হয়।[৩২৩]

শেষপ্রচেষ্টা

সুলতান জালালুদ্দীনের চিঠি বিভিন্ন রাজ্য ও দরবার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সেই কবেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও থেকে ইতিবাচক জবাব এসে পৌঁছয়নি। সময় যতই গড়াচ্ছে, বেড়ে চলেছে সুলতানের পেরেশানি ও অস্থিরতা। দক্ষিণ ও পূর্বদিক থেকে শুরু হয়ে গেছে তাতারদের যুদ্ধযাত্রা। তারা সব বস্তি ও গ্রাম বিনাশ করে বড় শহরগুলির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এইরকম পরিস্থিতিতে সুলতান পরিকল্পনা আঁটেন—এখন বেছে বেছে আমার হুঁশিয়ার সহচরদের বিভিন্ন সেনা-ছাউনিতে পাঠিয়ে দিতে হবে। সেখানে যেসব সৈন্যকেই তারা পায়, তাদেরকে নিয়ে তাদের আত্মীয় ও সমগোত্রীয়দের সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করবে। সবাইকে সুলতানের সহযোদ্ধা হিসেবে যাবার জন্য রাজি করিয়ে তুলবে। কিন্তু এই বিরাট কর্ম আঞ্জাম দেবার জন্য এই সাধারণ সিপাহিদের মধ্যে তিনি যোগ্য কোনো লোক পাননি।

এর ভেতর একদিন, সৌভাগ্য-গুণে আহমাদ আন-নাসাবি সুলতানের কাছে এসে পৌঁছতে সফল হন। কয়েক মাস আগে শিরকাবুতের উপকণ্ঠে সুলতানের তাঁবুতে তাতারদের আক্রমণ ঘটে যাবার পর সুলতানের থেকে তিনি আলাদা হয়ে পড়েছিলেন। তখন থেকেই সুলতানের সন্ধানে পাগলের মতো দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। তুষারপাতের ৩টি মাস তিনি খুব গোপনে গনজায় কাটিয়েছিলেন। কারণ, সেখানেও প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল অবাধ্যতা। খাওয়ারিজমিদের জন্য বাইরে ঘোরাফেরা করা ছিল কঠিন শঙ্কাময়। সেখানে থাকাকালেই তিনি সুলতানের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেন।

তখন, প্রাণটাকে হাতের তালুর ভেতর রেখে ভীত পায়ে গমনোদ্যত হলেন একদিন। ভ্রমণকালে দিনেরবেলায় কোথাও লুকিয়ে পড়তেন। তারপর রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিতেন যাত্রাপথ। অবশেষে, বিভিন্নদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাতারদের ছোট-ছোট সৈন্যদল থেকে গা বাঁচিয়ে খুব কষ্টে তিনি সুলতানের কাছে

---

[৩২৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৬৩

এসে পৌঁছেন। সুলতান তখন জারিস দুর্গের পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থান করছিলেন। নাসাবি এসেছেন শুনতেই তাকে ডেকে পাঠান। রাজ্যের এখনকার অবস্থা সম্পর্কে নাসাবিকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন তিনি।

নাসাবি বলেন—'পুরো রাজ্য, বিশেষত আর্রান, তাতারদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। গতরাতে আমি যে পথটির পাশ দিয়ে আসছিলাম, সে পথের বাঁ-দিকে তাতারদের একটি ক্যাম্পে স্পষ্ট মশাল জ্বলতে দেখেছিলাম।'

এদিন আসরের সময়েও নাসাবিকে আবার সুলতান ডেকে তার বৈঠকে আনেন। সেখানে সমবেত হয় আরো কিছু আমির। সুলতান নাসাবিকে জিজ্ঞেস করেন—আপনি বলুন, এখন আমাদের কী করা উচিত?

নাসাবি বলেন—সুলতানের সিদ্ধান্ত যা হয়, তা-ই সই।

সুলতান বলেন—আমি ভাবছি, একজন মুখপাত্র পাঠিয়ে আর্রানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সিপাহি ও তুর্কমান গোত্রগুলোকে সমবেত করি। তাদের নিয়ে আমরা গনজার বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে নামব। হয় তারাই বাঁচবে, নই আমরা। তুর্কমানদের জিহাদের জন্য রাজি করাতে এমন একজন লোককে পাঠাতে হবে, যে তাদের কোনোপ্রকার ধনদৌলত কিংবা গনিমতের আশ্বাস না দিয়েই তাদের হৃদয় জয় করে ফেলতে পারবে। কিন্তু আমার কাছে এখন যে-সকল তুর্কি সেনা-অফিসার আছে, তাদের মধ্যে একজনও এই কাজের উপযুক্ত না।

নাসাবি এখন বিধ্বস্ত, এই মিশনও বিরাট কঠিন ও শঙ্কাজনক—এসব ব্যাপার সুলতান অনুভব করে উঠতে পেরেছিলেন। এজন্য নাসাবিকে সরাসরি হুকুম দিতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু নাসাবি ইশারা বুঝে ফেললেন। এই মিশনে যাবেন বলে তিনি সম্মত হলেন। সুলতান নাসাবিকে পাঠিয়ে দেন। প্রতিটি পদক্ষেপে ছিল তাতারদের উৎপাতের শংকা। তবু তিনি তুর্কমানসহ অন্যান্য গোত্রের কাছে ঘুরে ঘুরে নতুন স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের চেষ্টা করতে থাকেন।[৩২৪]

তারপর নাসাবি গোত্রগুলোর ভেতর জিহাদের দাওয়াত দেওয়ার মিশন থেকে যখন ফারেগ হয়ে আসেন, তখন দেখা গেল—গোত্রগুলোর ভেতর থেকে নতুন বহু স্বেচ্ছাসেবী সুলতানের পতাকাতলে এসে জড়ো হতে শুরু করেছে। এ ছিল এক বড় আশাজাগানিয়া দৃশ্য।

গনজার বিদ্রোহ

তুর্কমানদের কিছু দল যখন তৈরি হয়ে ওঠে, সুলতান জালালুদ্দীন গনজার পথ ধরেন। সেখানে পিন্দার নামে এক সরদার বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিল। সুলতান প্রথমে নাসাবিকে পাঠিয়ে পিন্দারকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু সে মানেনি। শেষে একদিন সুলতান নিজেই শহরের বাইরে এসে পৌঁছে যান।

---

[৩২৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৬২

এক বাগানে তাঁবু খাটিয়ে পিন্দারের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করেন। সবাইকে প্রতিশ্রুতি দেন নিরাপত্তা প্রদানের। কিন্তু তাতেও পিন্দারের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। সে শহর থেকে বের হয়ে আচমকা সুলতানের তাঁবুতে প্রচণ্ড তিরবৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে।

সুলতান নির্ভীক ভঙ্গিতে তলোয়ার খাপমুক্ত করে বেরিয়ে আসেন বাইরে। মুষ্টিবদ্ধ সেপাইদের সঙ্গে নিয়ে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করেন যে, পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় বিদ্রোহী পিন্দার। সুলতানের জানবাজ সৈন্যরা তাকে ধাওয়া করে; এবং শহরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার আগেই পেছন থেকে ছুটে গিয়ে তারা ঢুকে পড়ে ভেতরে। পিন্দার ও অন্যকিছু বিদ্রোহীকে হত্যা করে তাদের লাশ শহরের সড়কে-সড়কে টেনে-হিঁচড়ে বেড়াতে থাকে। সুলতানের সিপাহিরা বিদ্রোহীদের ঘর লুট করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কঠোর গলায় নিষেধ করে দেন সুলতান।[৩২৫]

শাসকদের নতুন জিহাদের ডাক

সুলতান গনজায় জেগে-ওঠা বিদ্রোহ নিঃশেষ করে ১৭ দিন ওখানেই কাটালেন। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে মুসলিমদের প্রতিরক্ষা-দায়িত্ব পালনের জন্য পরামর্শ করতে লাগলেন। সুলতানের কমান্ডে তুর্কমান গোত্রগুলো যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু একটি পেশাদার বাহিনী তৈরি না হলে শুধু অনভিজ্ঞ যুবকরাই যে তাতারদের প্রলয়ংকরী আগ্রাসন রুখে দিতে পারবে, তা যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

সুলতান মুসলিমবিশ্বের শাসকদের ব্যাপারে বহু আগেই নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। চিঠিপত্র পাঠিয়ে তিনি তাদের মধ্যে যতটুকু পারা যায় দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নিজ বাহুর জোরেই কিছু একটা করবার চেষ্টা চালাতে হবে। এ এলাকায় যদি প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব না হয়, তা হলে আমরা ইরানের দিকে চলে যাব। কিন্তু তুর্ক আমিররা আরো একবার সুলতানের অভিমতের বিপক্ষে অবস্থান নিল। জোর গলায় তারা সুলতানকে বলল—সুলতান, আরো একবার মুসলিম শাসকদের সমবেত করার চেষ্টা চালানো হোক। বিভিন্ন রাজ-দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হোক দূত।

আতর খানসহ কিছু হীনম্মন্য দুর্বল আমির সুলতানের বর্তমান অগ্রগামিতায় নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝে ফেলেছিল—তাতারদের বিরুদ্ধে এখন যে জয় লাভ করে ওঠা যাবে, কোনোভাবেই সেটা যুক্তিতে ধরে না।

আল-মালিকুল আশরাফের কাছ থেকে সাহায্য তলব করার জন্য বেশি জোর দেওয়া হচ্ছিল। তাদের কথা ছিল—কয়েকটি রাজ্যের সেনাবাহিনী একত্র হলে, তবেই আঞ্জাম দিয়ে-ওঠা যাবে এই কঠিন অভিযান, অন্যথায় নয়।

---

[৩২৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৬৯

সুলতানও সম্ভাব্য সব চেষ্টা নিজের মতো করে করেই দেখাতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি আল-মালিকুল আশরাফের কাছে সাহায্য চাইতে নিজেই কিলকোনের রাস্তা ধরে খিলাতের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তার আশা ছিল—ইসলামের ইজ্জতের দোহাই দিয়ে আশরাফকে তিনি মানিয়ে নিতে পারবেন।

ইবনে কাসির বলেছেন—তারপর সুলতান নিজেই বিকর, আলজেরিয়া ও বাগদাদে গিয়ে খলিফা-সহ সমস্ত মুসলিম শাসকের কাছে তাতারদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন। কিন্তু পেছনে তাতারদের প্রবল ধাওয়া লেগেছিল বলে খিলাত ছাড়া কোথাও যাবার সুযোগই তিনি আর পাননি।[৩২৬]

পথে সুলতানের কাফেলাকে তীব্র কষ্টের মুখোমুখি হতে হল। তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের দিন। আকাশ থেকে যেন বর্ষিত হচ্ছিল অগ্নিগোলক। দূর-সুদূর পর্যন্ত বৃষ্টির কোনো নাম-নিশানাও ছিল না। পিপাসায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল কাফেলা। শেষে ইসতিসকার নামাজ আদায় করা হল। সুলতান নিজে দোয়া করলেন। তারপর, আচমকা মুষলধারে এমন বৃষ্টি নামল যে, সবদিকের পথঘাট একেবারে জলমগ্ন হয়ে গেল। সুলতানের তাঁবুর অবস্থা হয়েছিল এমন—প্যাঁক-কাদার জন্য মানুষের পক্ষে তার তাঁবু পর্যন্ত যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থাতেও সুলতানের ছিল বুকভরা উদ্যম। তিনি সাথিদের নৈরাশ্য থেকে বাঁচাতে মুচকি হেসে আশাব্যঞ্জক কথা বলছিলেন।

বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেছে দেখে দিয়াহ নামের এক খাদেমা বলল—হুজুর, ইসতিসকার দোয়ায় আপনার এতো পারদর্শিতা কবে থেকে? এতবেশি পানি বর্ষিত হচ্ছে যে, আমরা একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছি। অন্যদের দোয়ায় তো দেখেছি শুধু প্রয়োজন পরিমাণ বৃষ্টি নামে।

সুলতান ঠোঁটের কোণে একটু মুচকি হাসি ঝুলিয়ে বললেন—আসলে তোমরা যা ভাবছ, তা না। দোয়ায় যেটুকু পাওয়া যায়, তা যার-যার হিম্মত পরিমাণই হয়। এই পানি আমার হিম্মতের পরিমাণ-অনুপাতে নাজিল হয়েছে। এটাকে তোমরা প্রজাদের হিম্মতের সাথে মেলাতে যেয়ো না।

এইসব মনোগ্রাহী কথাবার্তায় সেই কঠিন সফর খানিকটা সহজ হয়ে উঠেছিল।[৩২৭]

আল-মালিকুল আশরাফের ধৃষ্টতা

এদিকে আল-মালিকুল আশরাফ যখন জানতে পারেন—সুলতান জালালুদ্দীন খিলাতে আসছেন, তখন তিনি ছটফটিয়ে ওঠেন। সন্ধিনামায় দস্তখত হয়ে যাবার পরও সুলতানের প্রতি তার মনের ঘৃণা ও বিরোধিতা যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে

---

[৩২৬] ইবনে আসির ৭/৬৫৯, ইবনে খালদুন ৫/১৩৯

[৩২৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৭১-৩৭২

গিয়েছিল তখনো। এজন্য তিনি সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিলেন না। শেষমেশ সুলতানকে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে খিলাত থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুলতান জালালুদ্দীন যখন খিলাতের উপান্তে এসে পৌঁছলেন, জানতে পারলেন—আল-মালিকুল আশরাফ নেই। সুলতান খিলাতে আশরাফের নিযুক্ত নায়েবকে বলে পাঠালেন—আমরা না আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছি, না আপনাদের একঘরে করতে। বরং এই মহা দুশমন (তাতাররা) আমাকে আপনার দেশে আসতে বাধ্য করেছে।'[৩২৮]

সুলতান আশরাফের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে নিজ প্রতিনিধিদের আশরাফের দরবারে দামেশকে পাঠিয়ে দিলেন। এই প্রতিনিধিদল যখন দামেশক পৌঁছল, সুলতান জানতে পারলেন—আল-মালিকুল আশরাফ সুলতানের সাথে কোনোক্রমেই সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে না। সাক্ষাৎ থেকে বাঁচতে সে মিশর চলে গেছে।

আশরাফের এই ধৃষ্টতা সত্ত্বেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বারবার সুলতান তার কাছে সাহায্যের আবেদন করতে থাকেন। কিন্তু আশরাফ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন ও বাহানা দেখানো ব্যতীত কিছুই করেননি।

নাসাবি খুব আফসোস করে আশরাফের এইসব টালমাটাল চরিত্র উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন—সুলতানের দূত যখন দামেশকে পৌঁছে, আল-মালিকুল আশরাফ তখন মিশর চলে যান। সেখান থেকে চিঠি পাঠাতে থাকেন—আমি সুলতান জালালুদ্দীনের সাহায্যের জন্য মিশর থেকে একটি বাহিনী তৈরি করে শিগগির রওনা দিচ্ছি।

'তোর ওয়াদা যেন মরুসাহারার মরীচিকা। এইদিন না আরেকদিন, এইমাস না সামনের মাস!'

তখন চিঠি পাঠিয়ে খাওয়ারিজমি দূতেরা সুলতানকে সতর্ক করে দেয় যে, আশরাফের থেকে সহযোগিতা লাভের আশা না করাই উত্তম। প্রতিনিধিদলের আমির মুখতাসুদ্দীন চিঠিতে লেখেন—আল-মালিকুল আশরাফ ততক্ষণ পর্যন্ত মিশর থেকে আসবেন না, যতক্ষণ তাতারদের সাথে খতম না হবে আমাদের যুদ্ধ। অর্থাৎ তার চাওয়া হল—হয় আমরা বিজয়ী হই, না হয় তাতাররা আমাদের খতম করে দিক। এজন্য মহান সুলতানকে সংকট সমাধানের কোনো উপায় ভাবতে হবে। আল-মালিকুল আশরাফ থেকে জবাব পাওয়ার আশা না করা হোক।'[৩২৯]

---

[৩২৮] ইবনে আসির ৭/৬৫৯

[৩২৯] সবাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮২, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৮

সুলতান আল-মালিকুল আশরাফের থেকে নিরাশ হয়ে আবারও আমিরদের সাথে পরামর্শে বসেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—এখন আল-মালিকুল আশরাফের ভাই আল-মালিকুল মুজাফফর শিহাবুদ্দীন গাজির কাছে সাহায্য চাওয়া হবে।

আল-মালিকুল আদিলের এই পুত্র তখন সুলতানের সবচেয়ে নিকটবর্তী এলাকা মায়াফারকিন ও আলজেরিয়ার হাকিম। উনি ছিলেন অন্য ভাইদের চরিত্রের বিপরীত। তখনো সুলতানের বিরুদ্ধে কোনো দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হননি।

সুলতান জালালুদ্দীন আহমাদ আন-নাসাবির সঙ্গে কিছু বিশ্বস্ত আমির দিয়ে আদেশ করেন—এই মিশনে যাবার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করুন। আল-মালিকুল মুজাফফরকে গিয়ে বলবেন, তিনি যেন নিজ থেকেই জিহাদের জন্য সৈন্যদল-সমেত শিগগির আমার কাছে এসে পৌঁছেন। তাতার আগ্রাসনের মোকাবেলায় যেন হয়ে ওঠেন আমার বাহু। বলবেন—যেন মারদিন ও আমাদ-এর হাকিমকেও নিজের প্রতিপত্তির বলে এই ফরজ আদায়ের জন্য সম্মত করে তোলেন। মহান আল্লাহ যদি তাতারদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করেন, তা হলে খিলাত-সহ যত এলাকা তিনি চাইবেন, আমি দিয়ে দেব।'

আন-নাসাবি সুলতানের হুকুমের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন। সুলতান আশাব্যঞ্জক গলায় বললেন—এই শাসক যদি এসে পড়েন, আল-মালিকুল আশরাফের সাহায্যের কোনো দরকার পড়বে না।

পরামর্শসভা সমাপ্ত হলে সুলতান আন-নাসাবিকে নীরবে ডেকে নিয়ে বললেন—আমার খুব ভালো করেই জানা আছে, এই শাসকরা কখনোই আমাদের সাহায্য করতে রাজি হবে না। তারা চায় না, তাতারদের উপর আমরা জয়ী হই। এইসব নির্দয়-নিষ্ঠুর লোকের কাছে সহযোগিতা চাওয়া অনর্থক। কিন্তু আমার তুর্ক আমিররা আমাকে এমন আশা দিচ্ছে, যার মোটেই কোনো বাস্তবতা নেই। ওরা অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার বাহানায় নিজেরা জিহাদ থেকে প্রাণ বাঁচাতে চাইছে, থামিয়ে দিতে চাইছে যুদ্ধ।

এই ভিত্তিহীন আশায় নিমজ্জিত থেকে আমাকে তারা সঠিক একটা পরিকল্পনা সাজাবার সুযোগই দেয়নি। এবার দূত হিসেবে আপনাদের এজন্য পাঠাচ্ছি, যাতে এই সরকারি আদেশ পালন করতে গিয়ে আপনারা ওই শাসকদের থেকে এমন হতাশাপূর্ণ জবাব নিয়ে আসতে পারেন, যার পর এসব অলীক আশার সম্ভাবনা না থাকে; এবং না থাকে ওই শাসকদের প্রতি আমার সৈন্যদের নির্ভর করার কোনো সুযোগ। এই ঝঞ্ঝাট কেটে গেলে সকলের ঐকমত্যে আমরা ইস্পাহানের দিকে চলে যাব। এখনো ইস্পাহান নিরাপদ এলাকা।

সুলতানের এই অভিমত পুরোপুরি সঠিক ছিল। মুজাফফর কোনোভাবেই সুলতানকে সহায়তা করতে রাজি হলেন না। তিনি সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন—আমি আমার নিজের প্রাচীর-বেষ্টিত এলাকাতেই স্বাধীন নই। ভাই আল-মালিকুল

আশরাফ ও আল-মালিকুল কামিলের নায়েব হিসেবে হুকুমত করছি। তাদের সন্তুষ্টির বাইরে আমি কিছুই করতে পারি না।

তা ছাড়া সুলতানের বাহিনীর সামনে আমার বাহিনীর অবস্থা হচ্ছে এমন, যেমন পুরো সৈন্যদলের সামনে একজন মাত্র অশ্বারোহী। তা হলে আমার কাছে সাহায্য চেয়ে কী লাভ? আমাদ ও মারদিনের হাকিমকেও জিহাদের জন্য সঙ্গে নেওয়ার কথা বলছেন, এই দুই হাকিম তো আমার অনুগত না। তারা কেন আমার কথা শুনতে আসবে? আমি জানি, তাদের সাথে সুলতানের চিঠি চালাচালি হয়। তা হলে সুলতান নিজেই তাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দিয়ে পরীক্ষা করে নিক, তারা তাতারদের বিরুদ্ধে তাকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত আছে কি-না! সুলতান জেনে যেতে পারবেন, যাদের জীবনের নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নেই, তাদের ওয়াদা মিথ্যা।

আন-নাসাবি পূর্ণ চেষ্টা করে দেখলেন; কিন্তু শিহাবুদ্দীন গাজি সুলতানকে সহায়তা করতে রাজি হননি। অবশ্য নাসাবিকে সান্ত্বনা দিতে শিহাবুদ্দীন বললেন—আল-মালিকুল আশরাফের উপর আপনাদের ভরসা রাখা উচিত। তিনি তাতারদের বিরুদ্ধে সুলতানকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই বাহিনী গঠনের জন্য মিশর গিয়েছেন।[৩৩০]

মুসলিম শাসকদেরকে তাতারদের ধমকি

তাতার-সয়লাবের পাহাড়সম উত্তাল ঢেউ আরও একবার মুসলিমবিশ্বকে গিলে নিতে শুরু করল। এই তুফানময় সয়লাবের ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ হতে লাগল গ্রাম বস্তি দুর্গ শহর—সব। গত এক দশকে নিষ্প্রাণ বিরানভূমি থেকে পুনরায় গুলবাগিচায় পরিণত-হওয়া জনপদগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যেতে লাগল। ভেঙে ফেলা হতে লাগল মুসলিমদের অবশিষ্ট শহরগুলোর প্রাচীর।

সুলতান জালালুদ্দীন অসহায় ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। এদিক-ওদিক যেসব চিঠি পাঠিয়েছিলেন, খিলাতের উপকণ্ঠে ছাউনি খাটিয়ে সেগুলোর জবাবে তিনি কোনো গায়েবি সাহায্যের অপেক্ষা করছিলেন। সুলতানের পিছু-লাগা তাতারদের একটি বাহিনী বারকার্তি নদী পার হয়ে গিয়েছিল।৩৩১ আরেকটি দল দখল করে নিয়েছিল মারাগেহ। ইসলামি সাম্রাজ্যগুলো থেকে সুলতানের সহযোগিতা লাভের সম্ভাব্য সব পথ বন্ধ করে দিতে তাতারদের বার্তাবাহকরা মুসলিম শাসকদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদেরকে বলছিল—খবরদার, সুলতান জালালুদ্দীনকে কক্ষনো সহায়তা করবে না। যদি করো, তাতার-রাজ্যের সাথে তোমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। তখন অবস্থা বড় কঠিন হয়ে উঠবে তোমাদের।

---

[৩৩০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৩, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৮

[৩৩১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৪

সুলতানের পক্ষ থেকে তার প্রতিবেশী সাম্রাজ্য আমাদ ও মারদিনের আমিরদের নামেও চিঠি প্রেরণ করা হল। কিন্তু, এই বিলাসী শাসকদের এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।[৩৩২]

ভবিষ্যতের ফয়সালা

একদিকে সুলতান জালালুদ্দীনের আহ্বান এবং অন্যদিকে তাতারদের হুমকিধমকি মুসলিমবিশ্বের বড় বড় সব রাজদরবারে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলিম শাসকদের সামনে একই সঙ্গে পড়ে ছিল সুলতানের চিঠি এবং তাতারদের ইতাবনামা (তাতারদের আদেশের অন্যথা হওয়া তিরস্কার-যোগ্য ব্যাপার)।

রাজ্যের পরিচালকরা মর্মর পাথরে নির্মিত নিজেদের বিলাসবহুল মহলের ভেতর আমির-সহচরদের নিয়ে মনোলোভা ভোজসভায় বসে, কাফেরদের আগুন ও তরবারির কবলে পড়ে-যাওয়া মুসলিমদের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, সেই সিদ্ধান্ত নিরূপণ করছিল।

কালের ঐতিহাসিকরা দমবন্ধভাবে অপেক্ষমাণ ছিলেন—হয়তো এই নাজুক মুহূর্তে মুসলিম শাসকদের তাওফিক হবে সঠিক ও সাহসী কোনো সিদ্ধান্ত নেবার এবং উন্মোচিত হবে ইসলামি ইতিহাসের এক আলোকিত দুয়ার। কিন্তু, ঐতিহাসিকদের বড় হতাশ হতে হয়েছে। কারণ, তখন মরে গিয়েছিল ইসলামি শাসকদের চেতনা ও আত্মসম্ভ্রমবোধ। ধ্বংসশীল এই পার্থিব জগতের মোহ ও বিলাসিতার অন্ধ নেশায় তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার সমস্ত শক্তি লোপ পেয়েছিল। মৃত্যুর কথা মনে হতেই তারা কেঁপে উঠত আমূল, মাথা নত করে বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকত দাসত্বের জীবন। লাঞ্ছনার জীবনকে ইজ্জতের মৃত্যুর উপর প্রাধান্য দিয়েছিল। তাতারদের অসন্তুষ্টির ভয় তাদেরকে করে দিয়েছিল অনুভূতিহীন। কালের বাস্তবতা-সমৃদ্ধ সুলতানের সেই চিঠিগুলোও তাদের চোখের সামনের অন্ধকার পর্দা সরাতে পারেনি।[৩৩৩]

বলা যায়—আল-মালিকুল আশরাফকে যেন বিষাক্ত সাপে এসে কেটে গিয়েছিল, কায়কোবাদের ধর্মরক্ষার উত্তেজনা-ভর্তি শিরাগুলো এবার আর নেচে উঠল না, শিহাবুদ্দীনরাখবার চেষ্টা করল না নিজের গাজি উপাধিটুকুর লাজ।[৩৩৪] আমাদ ও মারদিনের শাসকরা তো সুলতানের চিঠির বক্তব্য একবারের জন্যও শুনে দেখতে চাইল না। বাকি আছেন খলিফাতুল মুসলিমিন, তিনি 'পুরো মুসলিম

---

[৩৩২] ইবনে আসির ৭/৬৬৩

[৩৩৩] ইবনে খালদুন ৫/১৩৯, রওজাতুস সফা ৪/৮৩২, জাহাঁকুশা ২/১৮৩ ইবনে আসির ৭/৬৫৯ তারিখ লি ইবনিল ওয়ার্দি ৩/২২৬

[৩৩৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৪

উম্মাহর লিডার' হয়েও সর্বদা নিজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে কদম ওঠাতে পছন্দ করতেন! তা হলে তিনি কেন আবার সুলতান জালালুদ্দীনকে সঙ্গ দিতে গিয়ে তাতারদের সুযোগ তৈরি করে দেবেন বাগদাদে আক্রমণ চালাবার?!

দূতদের প্রত্যাবর্তন

শিহাবুদ্দীন নাসাবি আল-মালিকুল মুজাফফরের শাহি বালাখানা থেকে সবে রওনা দেবেন, এরই মধ্যে বারকারি অঞ্চল থেকে সংবাদ-সরবরাহকারী খবর পাঠাল যে, তাতাররা নদী পার হয়ে গেছে। এই চিঠি হাতে নিয়ে আল-মালিকুল মুজাফফর পড়ে দেখেন। পড়ামাত্র তিনি আন-নাসাবিকে আটকে দেন, যেতে দেবেন না।

বলেন—তাতাররা খিলাতের উপান্তবর্তী নদী পার হয়ে গেছে। তা হলে নিশ্চয় কয়েকদিনের মধ্যে সুলতানের সাথে সেখানে বেধে উঠবে এক চূড়ান্ত যুদ্ধ। এখন আপনার রওনা দেওয়াটা শঙ্কামুক্ত নয়। উত্তম হবে—এখানেই কদিন অপেক্ষা করুন। দেখুন, কী ঘটতে চলেছে।

নাসাবি মুজাফফরের এই আজব প্রস্তাব খণ্ডন করবার জন্য সুরা নিসার ৯৫ নম্বর আয়াতটি তেলাওয়াত করেন—

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِم

কোনো ধরনের ওজর ছাড়া জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে-থাকা ব্যক্তি এবং আল্লাহর পথে স্বীয় জান-মাল নিয়ে জিহাদ করতে-যাওয়া ব্যক্তি কখনোই সমান হতে পারে না।

তারপর বললেন—আমি সুলতানের চেয়ে অধিক সম্মানিত কেউ নই, সুলতানের মৃত্যুর পর আর বেঁচেও থাকতে চাই না।

এ কথা বলে সফরের জন্য কোমর কষে উঠে দাঁড়ান তিনি। রওনা দেবার আগে বিদায়ী মুসাফাহার জন্য মুজাফফরের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বলেন—শুনুন, দুইটা থেকে যেকোনো একটাই তো হবে—হয়তো সুলতানের বিজয়, নয়তো পরাজয়। আর যা কিছুই হোক না কেন, পরিণতি আক্ষেপ ও অনুশোচনা ছাড়া কিছু হবে না।

মুজাফফর হয়রান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—এটা কী করে হবে?

হ্যাঁ, বলছি। যদি সুলতানের বিজয় ঘটে, তা হলে আজকে যে আপনি তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকছেন, তখন এই আপনিই যদি তার সম্মুখে পৃথিবীর সমস্ত ধনভান্ডারও হাজির করে ফেলেন, তবু কোনো লাভ হবে না।

আর যদি—আল্লাহ না করুন—সুলতানের পরাজয় ঘটে যায়, তা হলে আপনাকে যখন তাতারদের মুখোমুখি হতে হবে, তখন সুলতানের কথা স্মরণ করে-করে আফসোস ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

একদম সত্য বলেছেন। কিন্তু আমি কী করব, বলুন? আমি যে অপারগ! ঠান্ডা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন আল-মালিকুল মুজাফফর।[৩৩৫]

ভয়ংকর স্বপ্ন

নাসাবি আল-মালিকুল মুজাফফরের ওখান থেকে বিদায় হয়ে খুব দ্রুত সুলতানের দরবারে উপস্থিত হবার জন্য হানি অঞ্চলের দিকে রওনা হয়ে যান। তিনি খবর পেয়েছিলেন, সুলতান এখন আল-জাওর পাহাড়ের আশপাশেই কোথাও আছেন। দিনভর খুব দ্রুততার সাথে সফর করে তিনি মাগরিবের সময় একটি জায়গায় কিছুক্ষণ আরাম করেন। তারপর নবোদ্যমে রাতভর জারি রাখেন সফর। এই সফরের ভেতরেই হঠাৎ একবার নাসাবির খানিক তন্দ্রা ধরে যায়। চলমান সফরে তন্দ্রার ঘোরে ভয়ংকর এক স্বপ্ন দেখেন তিনি। দেখেন—তার মাথা পাথরের নিচে পড়ে থেঁতলে গেছে। দাড়ি এবং মাথার চুল ছাইয়ের মতো উড়ে যাচ্ছে, যেন-বা এগুলিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাসাবি বলেন, আমি স্বপ্নের ভেতরেই এর একটা ব্যাখ্যা বের করে ফেললাম। এই মাথা হচ্ছে সুলতান জালালুদ্দীনের। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সুলতানের মৃত্যু। দাড়ি কাটার অর্থ হল—খানদানের নারী ও দাসিদের গ্রেফতার হওয়া। মাথার চুল মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এর অর্থ—ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া।[৩৩৬]

তিনি আতঙ্কগ্রস্তের মতো ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তার ভেতর জাঁকিয়ে বসে গভীর দুশ্চিন্তা। তারপর সফরকালে একটিবারের জন্যও আর চোখ লেগে আসেনি তার। মন এতো বিমর্ষ হয়ে পড়ে যে, সকাল পর্যন্ত কারুর সাথে কথা পর্যন্তও বলতে পারেননি তিনি।

পৃথিবীর উপর থেকে উঠিয়ে নেওয়া হল রাত্রির ঘনকৃষ্ণ চাদর। ধীরে-ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দিনের আলো। সারারাত সফরের পর কাফেলা এবার হানিতে এসে পৌঁছল। এখানে একটি উপত্যকায় সুলতানের পরিবার-পরিজন ও হেরেমের তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন তখন ভয় ও আশার মধ্যে খিলাত থেকে কিছুদূরের আল-জাওর পাহাড়ের কাছে গোপন এক আশ্রয়স্থলে অবস্থান

---

[৩৩৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৭৪

[৩৩৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৫

করছিলেন।[৩৩৭] অনেক আগেই একের-পর-এক তার সমস্ত দূত এসে পৌঁছে গিয়েছিল। সবাই এসে জানিয়েছিল তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার সংবাদ।[৩৩৮]

এর মধ্যেই সুলতানের কাছে নাসাবি এসে উপস্থিত হন। দূতিয়ালির পরিণতি সম্পর্কে জানান তাকে। সুলতানের বিশ্বাস জন্মে যায়—এবার তার পরিণতি খুব কাছাকাছি এসে গেছে। বাস্তবায়িত হতে চলেছে ভাগ্যের অনড় সিদ্ধান্ত।

এই অবস্থায় শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুলতান আর জিজ্ঞাসনীয় রইলেন না। তবু নিজের এবং নিজের অবশিষ্ট সঙ্গীদের জান ও ইজ্জতের হেফাজতের জন্য এখনো তিনি বাহ্যিক উপকরণ গ্রহণের পক্ষে ছিলেন।

আতর খানের গাফলতি

সুলতান জালালুদ্দীন সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করছিলেন, তখন তার সামনে কুকাহ এহকাম নামে এক সরদারকে পেশ করা হল। এই লোক প্রথমদিকে তাতারদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু তারপর কোনো-একটা অপরাধ করে ফেলেছিল সে। তাতাররা তাকে সাজা দিতে নিয়েছিল। এই সাজার ভয়েই একদিন সে নিজের ১ হাজার সৈন্য নিয়ে তাতার-বাহিনীর ভেতর থেকে পালিয়ে এল। সে সুলতানকে বলল—তাতাররা তাদের ক্যাম্পে নিজেদের ঘোড়াগুলির খুরের নিচে লোহার নাল লাগাচ্ছে, যাতে বহুদূর পর্যন্ত সুলতানকে ধাওয়া করতে পারে।

সে পরামর্শ দিল—সুলতান, তাতাররা যখন রাস্তায় খুন ও লুটতরাজে মত্ত থাকবে, তখন গোপনে গিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করা হোক।

এই পরামর্শ সুলতানের খুব পছন্দ হল। এর মধ্যেই সংবাদ এল, তাতার-বাহিনী খুব কাছাকাছি এসে গেছে। ভেতরে-ভেতরে পরাজিত এই সৈন্যদল নিয়ে তাতার-বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করা তখন সহজ কথা ছিল না। যা হোক, সুলতান যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলেন। সাজালেন সূক্ষ্ম পরিকল্পনা।

সেনাপতিদের বিস্তারিত সব বুঝিয়ে আমির আতর খানকে আদেশ দিলেন—তুমি ৪ হাজার সৈন্য নিয়ে আগে আগে চলে যাও। সরাসরি শত্রুর উপর আক্রমণ করো। তারপর, বাকি মুজাহিদরা যেখানে প্রথম থেকেই ওত পেতে থাকবে, তুমি পিছু হটে সেই পর্যন্ত চলে আসবে।

সুলতানের কমান্ডে তখন মাত্র ৪ হাজার সিপাহি। তারা এই উপায়-উপকরণহীন সময়েও নিঃস্বার্থভাবে সুলতানকে সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছিল। সুলতানের সেনাপতিরা যদি তার দেখানো পথ ও পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে যেত, তা

---

[৩৩৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৫, ইবনে খালদুন ৫/১৩৯

[৩৩৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৮ খাওয়ারিজম শাহি ২১৫, ইবনে আসির ৭/৬৫৮

হলে কালের এই সংকল্পবদ্ধ সুলতান ছাই-ভস্মের স্তূপ থেকেও তৈরি করে ফেলতে পারতেন নতুন কোনো দুর্গ। এবং সময়ের প্রতিকূল স্রোতকে প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা দিয়ে ফের একবার নিজের অনুকূল করে নিতে পারতেন। কিন্তু শত আফসোস, সুলতানের বিশ্বস্ত অফিসাররাও তখন নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে বেখবর হয়ে গিয়েছিল। তাদের ভেতর সুলতানের খালাতো ভাই আতর খানও ছিল। কাপুরুষত্ব ও অবিশ্বস্ততার জীবাণু আত্মিকভাবে তাকেও রুগ্‌ণ করে ফেলেছিল। সে-ও ভাবতে লেগেছিল—এখন তাতারদের সাথে যুদ্ধ করা হল আত্মহত্যার নামান্তর।

এজন্য সুলতানের নির্দেশ শুনে কিছুদূর পর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়েও সে গেল। তারপর সেনা-শিবির থেকে চার মাইল দূর পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে তাতার-বাহিনীর কোনো লক্ষণ না পেয়ে উলটোদিকে ফিরে এল। সুলতানকে নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত করতে সে বানিয়ে বানিয়ে বলল—তাতাররা মোড় নিয়ে মানজিকার্ট অঞ্চলের দিকে চলে গেছে।

সুলতান একথা নাসাবিকে যখন বললেন, নাসাবি অবাক কণ্ঠে বলে উঠলেন—এ কী করে সম্ভব! তাতাররা আপনার উপর আক্রমণ করার জন্য ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এসেছে, আবার পথেই ইচ্ছে করে অন্যদিকে মোড় নিয়ে গেছে!

সুলতান জবাব দিলেন—এটা আশ্চর্যের কিছু না। তোমাদের কি মনে নেই, আমরা যখন খিলাত অবরোধ করেছিলাম, তখনো কিছু প্রতিপক্ষ আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল! তারা যখন জানতে পেরেছিল, আমরা সিরিয়ার সীমান্তে ঢুকে গেছি, তখন ঘাবড়ে গিয়ে নিজে থেকেই উলটোপথে ফিরে গিয়েছিল।[৩৩৯]

কিন্তু নাসাবির মনের দ্বিধা-সংশয় দূর হল না। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না—যুদ্ধ না করেই তাতাররা কীভাবে ফিরে যেতে পারে!

মূলত কথা তো ছিল এটাই। অথচ তাতার-বাহিনী পুরোদমে এদিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। শুধু এক-আধ দিনের দূরত্বের ভেতর ছিল তারা। মুখের উপর আতর খান মিথ্যে বলে দিয়েছিল।[৩৪০] হায়, সে যদি এই ধ্বংসাত্মক গাফলতি না দেখাত! যদি এই ভয়াবহ ভুল বর্ণনা সে না দিত! হায়, সুলতান যদি নাসাবির কথাটি ভেবে দেখতেন একটিবার!

এমন যদি হতো, তবে আশা ছিল, এ যুদ্ধে সুলতান কমপক্ষে নিজের প্রতিরক্ষাটুকু হলেও করে উঠতে পারতেন। হয়তো, সামনে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে আল্লাহর মদদ ও সাহায্যে তাতারদের পরাজিত করবার মওকাও পেয়ে যেতেন।

---

[৩৩৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৭৮

[৩৪০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৫, ইবনে খালদুন ৫/১৩৯, খাওয়ারিজম শাহি ৩১৫

আমাদ-এর শাসকের প্রতারণা

আতর খানের প্রবঞ্চনাপূর্ণ কথা বিশ্বাস করে সুলতান জালালুদ্দীন ও তার আমিররা তাতারদের এ মুহূর্তের আক্রমণ থেকে উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেদের মাঝে সিদ্ধান্ত করছিলেন, ভারী যত সামানপত্র আছে, তা বাকির নদীর কোনো দুর্গে সংরক্ষণ করে শুধু নিজেদের বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে ইস্পাহানে চলে যাবেন। ইস্পাহানের প্রাচীরগুলো মজবুত হওয়ায় এখনো এই শহর তাতারদের কবল থেকে মুক্ত ছিল।

এই সিদ্ধান্তটি ছিল খুবই মজবুত। এতে সুলতান ও তার সঙ্গীরা কম করে হলেও পাঁচ-ছয় মাসের অবসর পেয়ে যেতেন। এর ভেতর গঠন করে উঠতে পারতেন সম্পূর্ণ নতুন একটি বাহিনী। কিন্তু এর মধ্যেই আমাদ-এর প্রতারক শাসক আল-মালিকুল মাসউদের পত্রবাহক আলামুদ্দীন সানজার এসে হাজির হল। সে সুলতানকে আল-মালিকুল মাসউদের ধোঁকাবাজিপূর্ণ একটি দাওয়াতনামা দিল। দাওয়াতনামায় মাসউদ বলেছিল, আপনি অন্য কোথাও সফর না করে আমার কাছে চলে আসুন। এখানে ক্যাম্প ফেলে রোম ও সিরিয়ার সুলতানদের সীমান্তের দুর্গগুলো কবজা করে ফেলুন। কেননা, এ মুহূর্তে এদের রক্ষা করার মতো কেউ নেই। এই মিশনে আপনার সাথে স্বয়ং আমি উপস্থিত থাকব। আমার ৪ হাজার সৈন্য নিয়ে আপনার পক্ষে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এমনকি, এখানে এসে আপনি কিপচাক গোত্রগুলোরও আপনজন হয়ে উঠতে পারবেন। প্রয়োজনের সময় এদের থেকে সাহায্যও নিতে পারবেন।

এই চিঠির প্রত্যেকটি কথা ছিল স্পষ্ট কুমতলবপূর্ণ। সে নিছক সুলতানকে নিজের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে রোম ও সিরিয়ার শাসকদের থেকে নিজের এলাকা হাসিল করতে চাচ্ছিল। তাতার-বিরোধী জিহাদে সুলতানকে সঙ্গ দেবার যে ওয়াদা তার পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, তা ছিল নিছক প্রতারণা। কিন্তু পত্রবাহক আলামুদ্দীন সানজার তোষামুদে ভঙ্গিতে এমন ভাব দেখাল যে, সুলতান ও তার অসতর্ক সাথিদের মনে হল, আমাদের জন্য এটাই উত্তম। এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যের আবেদন ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

সুলতান এই প্রস্তাব বিনাবাক্যব্যয়ে কবুল করে নেন। ইস্পাহান সফরের চিন্তা বাদ দিয়ে যাত্রা করেন আমাদের দিকে।[৩৪১]

নাসাবি লেখেন, সুলতানের তখনকার অবস্থা ছিল এমন, যেমন একজন সাঁতারু, যে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে মধ্যসাগরে ক্ষণে-ক্ষণে ডুবছে-ভাসছে, ডুবছে-ভাসছে। পানির ভেতর থেকে হাবুডুবু খেতে খেতে নিজের দিকে এগিয়ে-আসা সবকিছুই সে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে। অর্থাৎ, তখন সুলতান ছিলেন পুরোপুরি অবলম্বনহীন।

---

[৩৪১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৭; খাওয়ারিজম শাহি ২১৬; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৮

তাতারদের অবরোধের ভেতর

আমাদ-অভিমুখে সফরের সময় রাতেরবেলা সুলতান জালালুদ্দীন একটি পুলের কাছে ছাউনি ফেলেন। তখন কারুর জানা ছিল না, এই নিঃঝুম অন্ধকার রাত তার কালো আঁচলের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে কী-সব ট্রাজেডি।

সুলতানের কাতেব শিহাবুদ্দীন নাসাবিকে যেন অচেনা একটা অস্থিরতা ঘিরে ধরেছিল। শান্তিমতো কিছু করতে পারছিলেন না তিনি। ঘুম আসছিল না তার। একবার ভাবলেন জেগে জেগে কিছু একটা লিখবেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের তাঁবুতে মশাল জ্বালিয়ে কলম পিষে লেখালেখি করতে লাগলেন। জানা নেই তিনি কীসব লিখছিলেন। হয়তো মুসলিম শাসকদের নামে চিঠি অথবা সুলতানের বর্তমান অবস্থাপট। আহা, তিনি কি জানতেন, আজকের রাতটাই স্বীয় মনিবের সঙ্গে তার জীবনের সর্বশেষ রাত?

এদিকে, এ রাতে সুলতান জালালুদ্দীন খুব গভীর এক ঘুমে ডুব দিয়েছিলেন। মূলত মানসিক চাপ ছাড়াও শারীরিকভাবে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। খুব ঠান্ডাও লেগেছিল। শোবার আগে পেট ভরে খুব বেশি নাবিজ[৩৪২] পান করেছিলেন। এতে তার উপর গভীর একটা আচ্ছন্নতা নেমে এসেছিল। এজন্য তখন তিনি ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে আছেন বেখবর।

এর মধ্যেই তাতারদের একটি বাহিনী এই এলাকায় এসে পৌঁছে। এই ফৌজ ছিল তাতারদের সেই বাহিনীর অংশ, আতর খান যাদের ব্যাপারে মানজিকার্টের দিকে মোড় নিয়ে গেছে বলে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল। তাদের নেতৃত্ব করছিল মোঙ্গল সরদার বাইমাস নৈয়ান। বাইমাসকে তাতার-সম্রাট উকতাই খান সিপাহসালার জিরমাগুনের অধীনে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিল।

রওনা দেবার সময় বাইমাসের বুক চাপড়ে সাহস দিয়ে উকতাই বলেছিল, এখানকার সরদারদের মধ্যে তুমিই একমাত্র বীর, যে সুলতান জালালুদ্দীনের খেল খতম করতে পারবে!

সুলতান জালালুদ্দীনকে গ্রেফতার করা ছিল চেঙ্গিজ খানের জীবনের অপূর্ণ এক বাসনা। এবার তাতারদের জন্য সেটা জাতীয় চ্যালেঞ্জে রূপান্তরিত হয়েছিল। নতুন খাকান উকতাইয়ের কাছেও তখন সুলতানকে গ্রেফতার করা সবকিছু থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

বাইমাস কয়েক মাস ধরে সুলতানের পিছে লেগে ছিল। এবার গুপ্তচরদের থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সঠিক জায়গায় পৌঁছে গেল সে। তার একেবারে নিশ্চিত জানা ছিল সুলতান জালালুদ্দীন কোন ছাউনিতে বিদ্যমান আছেন। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে খুব সহজেই সে সুলতানের ঘুমন্ত বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে

---

[৩৪২] খেজুর-ভেজানো পানি।

পারত। কিন্তু ভেবেছিল এতে তার প্রধান টার্গেট ফসকে যাবে। তাতারদের অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল যে, সুলতানের জন্য এখনো রাতের অন্ধকার হতে পারে স্রেফ একটা মাকড়সার জাল। তা ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারেন সুলতান। এজন্য বাইমাস তাকে দিনের আলোতেই পাকড়াও করতে চাচ্ছিল।

তাতার-সৈন্যদলটা সুলতানের ছাউনি থেকে এক মনজিল দূরে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এর মধ্যে, মাঝরাতের কাছাকাছি সময়ে এক তুর্কমান মুসলমান ঘোড়া নিয়ে এদের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। হঠাৎ রাতের নীরবতা ভেদ করে তুর্কমান সৈন্যের কানে ভেসে এল অচেনা অশ্বারোহীদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল সে। খুব গভীরভাবে তাকাতেই এমন বহু অশ্বারোহীর আবছা অবয়ব ভেসে উঠল, যারা কালো ঘোড়ার পিঠে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে ছিল। রাতের অন্ধকার সত্ত্বেও শারীরিক অবয়ব দেখে এদেরকে ভিনদেশি মনে হল।[৩৪৩]

তুর্কমান মুসলমানটি দ্রুত সুলতানের ছাউনির দিকে দৌড় লাগাল। সেখানে পৌঁছে সুলতানের অফিসারদের বলে সুলতানকে জাগাবার চেষ্টা করল সে। গভীর ঘুম, হিমহিম ঠান্ডা ও সারাদিনের ক্লান্তির কারণে তিনি জাগলেন অনেক ডাকাডাকির পর। তুর্কমানিকে তার কাছে নিয়ে আসা হল। সে সুলতানকে বিপদের আশঙ্কা থেকে সতর্ক করতে বলল—সুলতানে আলি, গতকাল যেখানে আপনার সৈন্যদলের ছাউনি স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে আজ এক অজানা বাহিনী দেখতে পেয়েছি আমি। তাদের দেহের গঠনপ্রকৃতি আপনার সেনাদল থেকে পুরোপুরি আলাদা। ঘোড়াগুলোর রঙ অদ্ভুত রকমের কালো।

তার এই কথায় সুলতানের মাঝে কোনো ভাবান্তর দেখা যায়নি। খবরটা শোনার সময় রীতি-অনুসারে তার চোখ-মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠার কথা ছিল।

মূলত, এই দিনগুলিতে সুলতানের ফৌজ যে এলাকা দিয়েই যেত, সেখানকার স্থানীয় সব লোক অস্বাভাবিক আতঙ্কিত হয়ে উঠত। তাদের ভয় ধরে যেত, সুলতানের কারণে তাতাররা না আবার আমাদের পিষে ফেলে! এজন্য সব শহরের বাসিন্দারা খাওয়ারিজমি কাফেলাকে নিজেদের এলাকা থেকে যত দ্রুত পারা যায়, বের করে দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠত।

এজন্য 'তাতাররা আসছে! তাতাররা আসছে!' বলে গুজব রটিয়ে দিত চতুর্দিকে। এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য সুলতান এই তুর্কমান লোকটির সত্য সংবাদও মিথ্যা মনে করলেন। বললেন, এটা স্রেফ একটা কৌশল। এখান থেকে

---

[৩৪৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৭-৩৭৮, জাহাঁকুশা ২/১৮৮, মুখতাসারুদ-দুওয়াল ২৪৭, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৮

আমাদের তাড়াবার জন্য এটা এই লোকদের বাহানামাত্র। এদের কাছে পছন্দনীয় হল এদের এলাকা থেকে আমরা চলে যাই।

এ কথা বলেই সুলতান ফের শুয়ে পড়লেন। অন্য সময় হলে হয়তো সুলতানের থেকে এইরকম চিন্তাহীনতার প্রকাশ ঘটত না। কিন্তু জানা নেই, এই রাতে অভ্যাসবহির্ভূতভাবে তিনি কেন এতোটা বেপরোয়া ও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, মন থেকে সমস্ত শঙ্কা ও পেরেশানি ঝেড়ে ফেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম করতে চাচ্ছিলেন।

এই গাফলতির সুযোগে তাতার-বাহিনী এসে সুবহে সাদিকের পূর্বে ঘিরে ফেলে সুলতানের তাঁবু। তাতাররা জানত, ১ লক্ষ মুসলিম সৈন্যকে হত্যা করলেও মুসলমান ততটা দুর্বল হবে না, যতটা দুর্বল হয়ে পড়বে ওই এক সুলতানকে গ্রেফতার করলে। এজন্যই অন্ধকারে সুলতানের পুরো বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার সুযোগও তারা কাজে লাগায়নি। তারা খাওয়ারিজমি ছাউনির চারদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। চুপচাপ অপেক্ষা করছিল সকালের আলো ফুটবার। ভেবেছিল, সকালে যদি সুলতান ঘেরাও ভেদ করে বেরিয়েও যান, পেছনে ধাওয়া করা কঠিন হবে না।

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন আওর খান নামে সুলতানের বাহিনীর এক সাহসী সরদার নিজের কিছু সৈন্যের সাথে পেছনে রয়ে গিয়েছিল। সে সকাল হবে হবে সময়ে তাতারদের এই কর্মকাণ্ডের কথা জেনে ফেলে। তৎক্ষণাৎ সিপাহিদের প্রস্তুত করে দুশমনের উপরে এসে জোরদার হামলা করে বসে। মুসলিমরা ঘুমঘোরে তলিয়ে আছে ভেবে তাতাররা একদম বেপরোয়াভাবে অবস্থান করছিল। এজন্য পেছন থেকে আসা এই আক্রমণে তাদের সবাই একেবারে হতভম্ব ও জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। আওর খান এদের ঘেরাও ভেঙে ফেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।[৩৪৪]

শেষধাওয়া

এর মধ্যেই সুলতানের ছাউনিতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যার অভিমুখ যেদিকে ছিল, সেদিকেই সে পালাতে লাগল। শিহাবুদ্দীন নাসাবি রাতের শেষপ্রহরে শুয়ে পড়েছিলেন। এখনো তিনি নিজের তাঁবুর ভেতর ঘুমঘোরে নাক ডাকছিলেন। হঠাৎ এক গোলাম এদিক থেকে ছুটে যাবার সময় চিৎকার করে উঠল—উঠুন উঠুন, দেখুন কী ভয়ংকর কেয়ামত ভেঙে পড়েছে!

---

[৩৪৪] ইবনে খালদুন ৫/১৪০, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৮-৩৭৯

আন-নাসাবির বক্তব্য—আমি সেদিন ধড়মড় করে উঠে বসেছিলাম। তারপর জলদি জলদি কাপড় বদলে নিলাম। নিজের সবকিছু ওখানেই ছেড়েছুড়ে রওনা দেবার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। অস্বাভাবিক হলেও সত্যি, সুলতান জালালুদ্দীন এই হাঙ্গামার মধ্যেও শুয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল, সমস্ত চিন্তা-ফিকির, পেরেশানি ও দায়দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গা থেকে নামাচ্ছিলেন বহু বছরের গভীর ক্লান্তি-অবসাদ।

আওর খান ছুটে শাহি তাঁবুতে ঢুকে সুলতানকে জাগিয়ে তুললেন এবং শোনালেন পুরো কাহিনি। তাতাররা পিছপা হয়ে বেশিদূর গিয়ে পৌঁছয়নি। বিপদ তখনো মাথার উপর ঝুলছিল। দুশমন যেকোনো মুহূর্তে এসে ফের দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে বসতে পারত। অপ্রস্তুত সুলতান পরিস্থিতির নাজুকতা অনুভব করে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া জরুরি মনে করলেন।[৩৪৫]

ততক্ষণে নাসাবি তার ঘোড়ার পিঠে উঠে গেছেন। তিনি বড় অস্থির চোখে সুলতানের তাঁবুর দিকে তাকাচ্ছিলেন। কখনো তাকাচ্ছিলেন আশপাশে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে—সুলতানের হাত ধরে তার খাস খাদেম তাকে তাঁবু থেকে বাইরে নিয়ে আসছে। ক্লান্তি ও আরামহীনতায় সুলতানের অবস্থা তখন পুরোপুরি নাকাল। তিনি রাজকীয় পোশাকের পরিবর্তে সাদা রঙের একটি দরবেশি টুপি পরে ছিলেন। এটিকে বলা হতো তাকিয়া।

নাসাবির এই দেখাটিই ছিল সুলতানকে সর্বশেষ দেখা। এরপর প্রিয় এই মানুষটিকে দ্বিতীয়বার দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার। খাদেম সুলতানকে নিয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি ঘোড়ায় সওয়ার করাল। ঘোড়া ছোটানোর পূর্বে সুলতান তার সম্রাজ্ঞী খাতুন বিনতে আতাবেগ সাআদকে ডাকলেন। উনি জীবন-মৃত্যুর এসব অঙ্গনে এই পর্যন্ত সুলতানের সাথে ছিলেন। সুলতান তাকে দুই আমিরের হেফাজতে রেখে হুকুম দিলেন—এখান থেকে যত দূরে পারো, চলে যাও। নিরাপদ ও সংরক্ষিত কোনো এলাকায় গিয়ে ওঠো।[৩৪৬]

তাতার-বাহিনী যেহেতু পিছপা হয়ে খুব বেশি দূরে যায়নি এবং যেকোনো মুহূর্তে দ্বিতীয়বার এসে পড়তে পারে, এজন্য সুলতান জালালুদ্দীন বিপদের থাবা থেকে অনেক দূরে চলে যেতে তৎক্ষণাৎ একদিকে রওনা হয়ে গেলেন। এই দিকশূন্যতার ভেতর নাসাবি, বহু আমির ও সিপাহি বেরিয়ে গেলেন এদিক-ওদিক। তাদের কারুরই জানা রইল না, সুলতান কোথায় আছেন, বাকি খাওয়ারিজমি সৈন্যরাইবা কোন দিকে গেছে।

---

[৩৪৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৮-৩৭৯ নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯

[৩৪৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৯; ইবনে খালদুন ৫/১৪০; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯

ওদিকে সুলতান রওনা হতেই তাতাররা ছায়ার মতো তার পিছু লেগে গেল। শেষমেশ সুলতান তাদের চমকে দিতে বাহিনীর কমান্ড আওর খানের হাতে সোপর্দ করে দিলেন। আওর খানকে তাগিদ দিলেন—তাতারদের সাথে জমিয়ে কিছুক্ষণ মোকাবেলা করো। খাওয়ারিজমি পতাকাকে আপন জায়গা থেকে হটতে দিয়ো না।

আওর খান কিছুক্ষণের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে তাতারদের মোকাবেলা করতে থাকেন। কিন্তু তাতারদের পালটা আক্রমণ যখন অনেক বেড়ে গেল, তখন মুসলিম সেনাদের পিছপা হতে আদেশ দিলেন আওর খান। তাতাররাও ছায়ার মতো তাদের পেছন-পেছন ছুট লাগাল। এই হাঙ্গামার সুযোগে কিছু সিপাহিকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান অন্য দিকে মোড় নিয়ে গেলেন। সুলতানের বিশ্বাস ছিল, গোপনে কোনো-একদিকে যদি তিনি বেরিয়ে যান, কেউ তা জানতে পারবে না। তাতাররা আওর খানের সৈন্যদলের পেছনে যথারীতি ছুটতে ছুটতে অনেকদূর পর্যন্ত চলে যাবে। কিন্তু চিরসত্য হল—তকদিরের সামনে তদবির (অগ্র-পশ্চাত ভাবনাচিন্তা) কোনো কাজে আসে না। শত্রুবাহিনীকে দেওয়া সুলতানের এই চমক সবসময় সফল হয়ে আসছিল। কিন্তু এইবার কোনো কাজে দিল না।

সৈন্যদলের পেছনে ধাবমান তাতাররাও খুব শিগগির জেনে গেল—সুলতান এই বাহিনীর সাথে না গিয়ে অন্যদিকে মোড় নিয়েছেন। ফলে তাতাররা সৈন্যদলের পিছু ছেড়ে সুলতানকে খুঁজতে লেগে গেল। তাদের কেউ কেউ উলটো সুলতানের তাঁবুতে ফিরে গেল। তাঁবু থেকে তারা দুষ্প্রাপ্য জহরতের সেই কোমরবন্ধনীটাও পেয়ে গেল, যা শতাব্দীকাল ধরে ইরানি বাদশাহদের মাঝে পরম্পরাগতভাবে চলে আসছিল। সুলতান এটা ঈদের দিন পরতেন। তাতাররা এই কোমরবন্ধনী তাদের খাকান উকতাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিল।[৩৪৭]

আওর খান তাতারদের হাত থেকে বেঁচে বিশেষ কোনো ভোগান্তির কবলে না পড়ে সৈন্যদলের ৪ হাজার সিপাহিকে সঙ্গে নিয়ে সংরক্ষিত ইরবিল শহরে গিয়ে পৌঁছেন। তারপর সুযোগমতো তাতারদের চোখ এড়িয়ে বাহিনীকে নিয়ে তিনি ইস্পাহানে পৌঁছে যেতে সক্ষম হন।[৩৪৮] অন্যদিকে সুলতানের সমস্যা আরো বেড়ে ওঠে। পৃথক রাস্তা অবলম্বন করে তিনি কিছুক্ষণের জন্য তাতারদের থেকে দূরে চলে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু এবার সৈন্যদল থেকে পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। কোনো বাহিনী কিংবা দেহরক্ষী ছাড়াই কিছু বিশ্বস্ত লোকের সাথে অজানার পথে তিনি ছুটে চললেন। রাতের অন্ধকারে নিঃঝুম ও শঙ্কাযুক্ত

---

[৩৪৭] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯ জাহাঁকুশা ২/১৮৯ তারিখে ইসলাম যাহাবি ৬৩, ৬২৮ হিজরি

[৩৪৮] ইবনে খালদুন ৫/১৪০ নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯

সমস্ত রাস্তায় ঘোড়া দৌড়িয়ে রওনা দিলেন এক অজানা মনজিলের দিকে। কিন্তু তাতাররা চুপিচুপি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষুধার্ত পশুর মতো পাগল হয়ে তাকে খুঁজতে আরম্ভ করল।

মনজিল হ্যাঁয় কাহাঁ তেরি?

সম্মুখে কিছুদূর এগিয়ে সুলতান জালালুদ্দীন ফের আমাদ-এর পথ ধরলেন। কিছুদিন আগে ওখানকার হাকিম তাকে দাওয়াতনামা পাঠিয়েছিল। কিন্তু এবার সুলতানের দুরবস্থা দেখে তোতাপাখির মতো সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। শহরের দরজা পর্যন্ত খুলল না। নগর-প্রাচীরের উপর থেকে সুলতানের বিধ্বস্ত কাফেলার উপর পাথর নিক্ষেপ করা হল। এই বিপদগ্রস্ত লোকটিকে বাধ্য করল এখান থেকে ফিরে যেতে।

এখান থেকে বাম দিকে একটা রাজপথ গিয়েছিল। সুলতান সেই পথে রওনা হয়ে গেলেন। এ পথটা গিয়েছিল আলজেরিয়ার দিকে। সৌভাগ্যক্রমে আচমকা এখানে সৈন্যদলের প্রায় ১০০ সিপাহির দেখা পেয়ে গেলেন তিনি। এদের সকলেই এদিক-ওদিক ছুটছিল। সেই ছোটাছুটির ফলে আচমকা এই রাজপথের ভেতর সাক্ষাৎ ঘটে যায় সবার। এদের নিয়ে সুলতান সম্মুখে রওনা দিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে দারবান্দাতের উঁচু পাহাড় এবং ভয়াবহ গিরিপথ পড়ল।

এই জায়গাটায় ঘাপটি মেরে থাকত ডাকাতের দল। এখানে তাদেরই একক কর্তৃত্ব ছিল। এজন্য আর সামনে বাড়তে পারেননি সুলতান।[৩৪৯] এমনকি এই বিপজ্জনক এলাকায় তার কয়েকজন সঙ্গী এই অনিষ্টকারীদের হাতে শহিদ হয়ে গেল।[৩৫০]

আতর খানের অসাধুতা ও পরিণতি

সুলতানের সেনা-অফিসার আতর খান এতক্ষণ পর্যন্ত সুলতানের সহযাত্রী হিসেবেই ছিল। সে সুলতানকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলল, হুজুর, এ মুহূর্তে সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা সেটাই, যেখান দিয়ে তাতাররা এসেছিল।'

সুলতান এই রাস্তায় সফর করে মায়াফারকিন পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেন। মায়াফারকিন ছিল শিহাবুদ্দীন আল-মালিকুল মুজাফফর ইবনে আল-মালিকুল আদিলের এলাকা।[৩৫১]

---

[৩৪৯] ইবনে খালদুন ৫/১৪০, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯

[৩৫০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮০, খাওয়ারিজম শাহি ২১৭

[৩৫১] ইবনে খালদুন ৫/১৪০ নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯

আতর খানের এই পরামর্শে সুলতানের কল্যাণকামিতার চাইতে তার নিজস্ব ফায়দার উদ্দেশ্যই ছিল বেশি। মূলত সে এতক্ষণ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে সুলতানের সঙ্গে ছিল। পৃথক হয়ে যাওয়ার জন্য খুঁজছিল উপযুক্ত মওকা। এই বিপজ্জনক পর্বতশ্রেণির ভেতর একা সে সফর করতে পারত না, এজন্য সুলতানের কাফেলার সাথে চলে যেতে চাচ্ছিল শিহাবুদ্দীন আল-মালিকুল মুজাফফরের এলাকার কাছাকাছি।

আল-মালিকুল মুজাফফরকে গোপন এক চিঠির মাধ্যমে আগেভাগেই নিজের আনুগত্যের কথা জানিয়ে রেখেছিল। সে ভাবছিল, আইয়ুবি খানদানের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে ওখানে সুলতানের কোনো আশ্রয় না মিললে না মিলুক, আমার গোপন সম্পর্কের কারণে আমি নিশ্চয় সেখানে ঠিকানা পেয়ে যাব।

মায়াফারকিনের উপকণ্ঠে রাত্রিযাপন

সুলতান জালালুদ্দীন তার প্রায় ১০০ সিপাহি নিয়ে, অসংখ্য দুশমন ও তাদের গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়িয়ে মায়াফারকিনের কাছাকাছি পৌঁছলেন।[৩৫২]

পৃথিবীর উপর রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে রেখেছে ঘনকৃষ্ণ একটা জাল। মায়াফারকিনের সমস্ত দরজা বন্ধ। বাসিন্দারা ঘুমের সমুদ্রে ডুবে আছে। চারপাশে থম মেরে আছে অদ্ভুত নীরবতা।

শহরের দরজা বন্ধ দেখে বাধ্য হয়ে শহরতলির এক গ্রামের দিকে চলে গেলেন সুলতান। কিন্তু গ্রামের কোনো ঘরে তার আশ্রয় মিলল না। শেষে সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের এক খোলা মাঠে তিনি রাত্রি কাটাতে লাগলেন। ঘোড়াগুলি ভীষণ ভেঙে পড়েছিল। এজন্য হেঁটে হেঁটে ঘাস খেতে এদেরকে উন্মুক্ত মাঠের ভেতর ছেড়ে দিলেন।[৩৫৩]

আতর খানের গাদ্দারি ও পরিণতি

আতর খানের জন্য এটা ছিল সোনালি সুযোগ। সে আল-মালিকুল মুজাফফরের এলাকার কাছে এসেই গিয়েছিল। তাই মাঠে সুলতানকে ঘুমের ভেতর ছেড়ে রাতের আঁধারে আল-মালিকুল মুজাফফরের কদমবুসির জন্য মায়াফারকিনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। আতর খানের ধারণা ছিল—সে খাওয়ারিজমি মহলের সাবেক বিশ্বস্ত আমির হওয়ার সুবাদে আল-মালিকুল মুজাফফরের ওখানে খুব আদর-আপ্যায়ন পাবে। কিন্তু এ ছিল তার অলীক ভাবনা।

---

[৩৫২] ইবনে খালদুন ৫/১৪০ নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯

[৩৫৩] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯

আদিলের সন্তানরা খাওয়ারিজমি আমিরদের নিজেদের ঘৃণ্য শত্রু মনে করতেন। তাই, আল-মালিকুল মুজাফফর আতর খানের সাথে কোনোপ্রকার ভালো আচরণ না দেখিয়ে তাকে সরাসরি কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেন। কিছুকাল পর মিশরের বাদশাহ আল-মালিকুল কামিল তাকে জিঞ্জির পরিয়ে মিশরে নিয়ে যেতে বলেন। তারপর আল-মালিকুল কামিলের জেলখানাতেই একদিন ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায় আমির আতর খান।[৩৫৪]

মুসাফির হেঁটে যায় একা

সুলতান জালালুদ্দীন ও তার সঙ্গীরা খেতের মধ্যে ছাউনি স্থাপন করে রাতভর অবস্থান করলেন। রাতটা মোটামুটি শান্তিতেই কেটে গেল। কিন্তু এখানেও বিদ্যমান ছিল দুশমনের গুপ্তচর। এজন্য সকাল নাগাদ তাতাররা জেনে গেল এখানে সুলতানের উপস্থিতির কথা। ভোরের সফেদ আলো ফুটে উঠতেই তাতারদের একটি দল সারা এলাকা অবরোধ করে সুলতানের তাঁবুর উপর এসে হামলা করে। সুলতান জালালুদ্দীন তৎক্ষণাৎ তার দুই জানবাজ দাসকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একদিকে চলে যান।

এই অতর্কিত আক্রমণে শহিদ হয়ে যায় সুলতানের অধিকাংশ সাথি। কিছু অংশকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর গ্রেফতারকৃতদের মধ্য থেকে এক কাপুরষ জান বাঁচাবার জন্য তাতারদের বলে দেয় যে, একটু আগেই ওদিকে যে অশ্বারোহীটি ছুটে গেছে, তিনিই সুলতান জালালুদ্দীন। একথা শুনতেই তাতারদের সেনা-অফিসার ১৫জন উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী নিয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের পেছনে ছুট লাগায়, যাতে চিরকালের জন্য এই কঠিন দুশমনের থেকে লাভ করা যায় মুক্তি।[৩৫৫]

ততক্ষণে সুলতান জালালুদ্দীন দুই দাসের সঙ্গে দুশমনের কবল থেকে সাময়িকভাবে বেরিয়ে গেছেন অনেকদূর। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তিনি বিপদের মুখোমুখি হতে লাগলেন। সুলতানের এই সর্বশেষ দুই বিশ্বস্ত দাসও তাকে বেশিক্ষণ সঙ্গ দিতে পারল না। কিছুদূর গিয়ে কুর্দিস্তানের রক্তপায়ী দস্যুদলের এক আক্রমণে নিজেদের মনিবের জন্য তারা কোরবান হয়ে গেল।[৩৫৬] পৃথিবীতে অজস্র বিপদ-যন্ত্রণার মাঝে সুলতান জালালুদ্দীন হয়ে পড়লেন পুরোপুরিভাবে নিঃসঙ্গ।[৩৫৭]

---

[৩৫৪] ইবনে খালদুন ৫/১৪০

[৩৫৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮১, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯, ইবনে খালদুন ৫/১৪০

[৩৫৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮১, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/১৫৪ তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৮ হিজরি, খাওয়ারিজম শাহি ২১৭

[৩৫৭] তারিখু মুখতাসারিদ্দুওয়াল ২৪৭

এদিকে যে পনেরজন অশ্বারোহী তাতার সুলতানের পেছন-পেছন আসছিল, খানিক বাদেই তারা সুলতানের কাছে এসে পৌঁছতে সক্ষম হল। তাদের বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা ও ধারালো তরবারি সুলতানের খুনে গোসল করবার জন্য ছটফট করে উঠছিল।

উকতাইয়ের কাছ থেকে এই সিপাহিরা হুকুম পেয়েছিল—সুলতানকে গ্রেফতার করতে যেন চেষ্টার কোনো কমতি না করা হয়। যদি সহজে সে ধরা দিতে না চায়, নিশ্চিন্তে তাকে হত্যা করে চিরতরে মিটিয়ে দিতে হবে এই ঝঞ্ঝাট।[৩৫৮]

সুলতান পেছন ঘুরে দেখেন—দুশমন একেবারে মাথার উপর এসে গেছে। সুলতানের ক্লান্ত ঘোড়া দুশমনের থেকে বেশিক্ষণ আর তাকে দূরে রাখতে পারত না। স্বয়ং সুলতানের অবস্থাও ছিল নাজেহাল। কিন্তু সহস্র প্রশংসা তার উদ্দাম সাহসিকতার উপর—এই পরিস্থিতিতে তার মন না খানিক ভীত হয়েছে, না তার লৌহ-কঠিন বাহু সামান্য কেঁপেছে।

সুলতান খাপ থেকে টান দিয়ে তার চিকচিকে তলোয়ারটি বের করলেন। তার চোখে ছিল জ্বলন্ত আগুনের শিখা। তখনো কমেনি তলোয়ারের ধার। বাহুর জোরও ছিল সেই আগের মতো। যদিও দেশ ও জাতির বাগডোর তার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু দুশমনের থেকে নিজের প্রতিরক্ষার কৌশল তখনো ভোলেননি তিনি।

সুলতান জালালুদ্দীন তার তলোয়ারের বাঁট শক্তভাবে আকঁড়ে ধরলেন। নরপশুদের ধীরে-ধীরে কাছে আসতে দিলেন। পশুগুলো এগোতে লাগল রক্তের উন্মাতাল নেশায়। যখনই এক তাতার অশ্বারোহী তার কাছাকাছি আসল, সুলতানের তলোয়ার শূন্যে ঘূর্ণমান অগ্নিশিখা হয়ে চমকে উঠল। গর্দান থেকে আলাদা হয়ে দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল দুশমনের মস্তক।

পরমুহূর্তেই সুলতানের উপর আক্রমণ করল আরেক তাতার। কিন্তু সুলতান এক কোপে এরও কল্লা উড়িয়ে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে পেছন থেকে আসা বাকি ১৩ অশ্বারোহী ভীষণ ভড়কে গেল। তাদের উপর এতটাই ভীতি ও বিহ্বলতা ছেয়ে গেল যে, সামনে অগ্রসর হবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে উলটোপায়ে ফিরে এল তারা।[৩৫৯] সুলতান জালালুদ্দীন পা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে আঘাত করলেন। খানিক পরেই ঘোড়া নিয়ে গাঢ় আঁধারের সুবিস্তৃত সাগরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

---

[৩৫৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮১ খাওয়ারিজম শাহি ২১৭ সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/৩২৯

[৩৫৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮১, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯

সুলতানের পরিণতি : বিপরীতমুখী বিভিন্ন অভিমত

আমাদ-এর এই বেদনাবিধুর দাস্তানের সমাপ্তিতে শেষ পর্যন্ত একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নই কেবল ফুটে থাকে যে, তা হলে সুলতানের পরিণতি কী হয়েছিল?

এ এক দুর্বোধ্য ধাঁধা, স্পষ্টভাবে যার জবাব দেওয়া মুশকিল।[৩৬০] বহুদিন পর্যন্ত সুলতানের ব্যাপারে কারুর কিছু জানা ছিল না। এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর তার ব্যাপারে বিভিন্নরকম খবর ও গুজব রটিয়ে পড়তে লাগল মানুষের ভেতর। এসবের অধিকাংশই ছিল স্পষ্ট মনগড়া। কিছু কিছু কোনোরূপে গ্রহণযোগ্য ছিল বলা যায়।

যা হোক, সুলতান সম্পর্কে সাধারণ ও বিশিষ্ট শ্রেণির সবার মুখে মুখে বিভিন্ন কাহিনি ফিরতে লাগল। সেসবের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন শিহাবুদ্দীন নাসাবি। এই ঘটনা তার ভাষাতেই নিচে উল্লেখ করছি। অবশ্য বন্ধনীর মাধ্যমে তার কথা খানিক স্পষ্ট করে দিয়েছি আমি।

সুলতান জালালুদ্দীন (পেছন থেকে ধাওয়া করে আসতে-থাকা দুশমনদের চমকে দিয়ে কুর্দিস্তানের) একটি পাহাড়ে পৌঁছে গেলেন। কুর্দি বাসিন্দারা নিজেদের এলাকার নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে যাতায়াতকারীদের কড়াভাবে নজরদারি করত। যার উপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারত, লুটে নিত তার সর্বস্ব।

(যেহেতু সুলতান তখন স্বীয় বাহনজন্তু থেকে বঞ্চিত হয়ে পদব্রজে পথ চলছিলেন, জ্বলন্ত ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় এবং ক্লান্তিতে খুবই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এজন্য কোনোপ্রকার হাঙ্গামা ছাড়াই) কুর্দিরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী সুলতানকেও গ্রেফতার করে ফেলল। সুলতানের মূল্যবান পোশাক ও অস্ত্রপাতি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল।

সুলতান তখন কুর্দিদের সরদারদের বললেন—আমি সুলতান জালালুদ্দীন। আমাকে হত্যা করতে তোমরা এতো তড়িঘড়ি শুরু করে দিয়েছ কেন? তোমরা হয়তো আমাকে আল-মালিকুল মুজাফফর বিন আল-মালিকুল আদিলের কাছে নিয়ে চলো, সে তোমাদের ধনসম্পদে পরিপূর্ণ করে দেবে; নতুবা আমাকে আমার শহর পর্যন্ত পৌঁছে দাও। আমি তোমাদের হাকিম বানিয়ে দেব।

---

[৩৬০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮১-৩৮২

সুলতানের এই আবেদনে কুর্দিদের সরদার তাকে তার শহর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সম্মত হয়ে উঠল। সে সুলতানকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। তাকে তার স্ত্রীর প্রহরায় রেখে নিজেই বেরিয়ে গেল সুলতানের জন্য সওয়ারি প্রস্তুত করতে।

(যেহেতু ততক্ষণে বস্তিজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এক খাওয়ারিজমি মুসাফিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এজন্য) বস্তিবাসীর এক বদমাশ গুণ্ডা (খাওয়ারিজমিদের প্রতি যে খুব বেশি ঘৃণা পোষণ করত) তাৎক্ষণিকভাবে হনহন করে সরদারের ঘরে গিয়ে পৌঁছল। (সরদারকে না পেয়ে) তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল—এই খাওয়ারিজমি লোকটা কে? ওকে তোমরা এখনো হত্যা করোনি কেন?

সরদারপত্নী জবাব দিল—তাকে আমার স্বামী আশ্রয় দিয়েছেন। কারণ, তিনি খাওয়ারিজমিদের সুলতান।

বদমাশ লোকটা প্রচণ্ড ঘৃণায় নাক-মুখ কুঁচকে বলে উঠল—তোমরা বিশ্বাস কীভাবে করলে যে, সে সুলতান? যদি সুলতান হয়ও, তবু তাতে কী? খাওয়ারিজমিদের হাতে আমার এক ভাই খিলাত অবরোধের সময় মারা গিয়েছিল। আল্লাহর কসম, আমার ভাই তোমাদের এই সুলতান লোকটার চেয়ে অনেক বেশি ভালো ছিল। তার প্রতিশোধ আমি নিয়েই ছাড়ব।

বলেই গুণ্ডা কুর্দি নিজের তীক্ষ্ণ বর্শাটা বাগিয়ে ধরে সুলতানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল (সুলতান ছিলেন নিরস্ত্র; ক্লান্তি ও বেহালদশার দরুন নিজের প্রতিরক্ষাটুকু করতে পারলেন না)। কুর্দি তাকে সেখানেই হত্যা করে ফেলল। (দুর্ধর্ষ বীরত্ব ও সাহসিকতার অমর ইতিহাস রচনাকারী সেই প্রিয়তম মুজাহিদ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মহান রবের কাছে সোপর্দ করে দিলেন নিজের প্রাণ। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

উপর্যুক্ত বর্ণনাটিকে সংক্ষেপে, সবিস্তারে এবং বাড়িয়ে-কমিয়ে বর্ণনা করেছেন বহু ইতিহাসবিদ। এর থেকে খানিক ভিন্ন আরেকটি বর্ণনা রওজাতুস সফায় বর্ণিত হয়েছে। রওজাতুস সফার লেখক লিখেছেন—কিছু লোকের বক্তব্য হল, সুলতান কুর্দিস্তানের পার্বত্য এলাকায় পৌঁছে বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় থেমেছিলেন। (তিনি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিলেন, এ জগৎ এবং জগতের সমস্তকিছু থেকে বেখবর হয়ে গভীর এক ঘুম দিয়েছিলেন) এর ভেতর কিছু কুর্দি তার থেকে পোশাক ও ঘোড়া ছিনিয়ে নেবার জন্য তার বুকে বর্শা বিঁধিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল (সুলতান ঘুমের মধ্যেই শহিদ হয়ে মহান স্রষ্টার সাক্ষাতে চলে গেলেন)।[৩৬১]

---

[৩৬১] রওজাতুস সফা ৪/৮৩২

হাফেজ ইবনে কাসির এই বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন—একা হয়ে গেলেন সুলতান। যেতে যেতে হঠাৎ মায়াফারকিনের কোনো-এক সবুজ গ্রামে এক কৃষকের সাথে তার দেখা। কৃষক বড় বিস্মিত চোখে সুলতানকে দেখতে লাগল। কারণ, সুলতানের পোশাক ছিল রত্ন ও স্বর্ণখচিত। কৃষক টানা টানা গলায় তাকে বলল—আপনি কে?

সুলতান জবাব দিলেন—আমি খাওয়ারিজমিদের বাদশাহ।

ইতিপূর্বে খাওয়ারিজমিরা যেহেতু এই কৃষকের ভাইকে হত্যা করেছিল, এজন্য কৃষক সুলতানকে বাহ্যত খুব আদব-সম্মানের সাথে নিজের মেহমান বানিয়ে নিল; কিন্তু সুলতান যখন বিশ্রামের জন্য একটু শুলেন, চুপি চুপি এসে সুলতানের উপর আক্রমণ করে তাকে শহিদ করে দিল কৃষক, ছিনিয়ে নিল তার হিরেখচিত পোশাক।

(মায়াফারকিনের হাকিম) শিহাবুদ্দীন গাজি তৎক্ষণাৎ পেয়ে যান এই সংবাদ। তিনি কৃষককে ডেকে রত্নখচিত পোশাক বাজেয়াপ্ত করেন, সুলতানের ঘোড়াও তার থেকে নিয়ে নেন।[৩৬২]

সুলতানের গুম হয়ে যাওয়ার কিছুকাল পর যখন আমাদ শহরে কুর্দিস্তানের কিছু সন্দেহভাজন লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তখনই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার শাহাদাতের এসমস্ত বর্ণনা।

এই লোকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান পোশাক ও অস্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলো দেখে মনে হয়েছিল এসব নিশ্চয় কোনো বাদশাহর হবে। রাজা-বাদশাহ ছাড়া সাধারণত এসব কেউ ব্যবহার করে না। তারপর সরকারি কর্মচারীরা তদন্ত শুরু করে দিল। হঠাৎ করেই সুলতান জালালুদ্দীনের সাবেক দাসদের কেউ-একজন শনাক্ত করে উঠল যে, এই জিনিসগুলো সুলতানের। দাস চোখ বড় বড় করে বলল—আরে, এই পোশাক আর অস্ত্রপাতি তো সুলতান জালালুদ্দীনের! তার ব্যতীত অন্য কারুর হতে পারে না।

একথা উন্মোচিত হয়ে উঠলে গ্রেফতারকৃতদের শক্তভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল যে, এই পোশাক ও অস্ত্রপাতি তোমরা কীভাবে পেয়েছ, বলো? ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রেফতারকৃতরা তখন শুনিয়ে দিল উল্লিখিত ঘটনা।

আমাদ-এর শাসক আল-মালিকুল মাসউদ এই তদন্তের পর গ্রেফতারকৃতদের হত্যা করে ফেলেন। আমাদে একটি কবর বানানো হয়, সুলতানের মরদেহ আনিয়ে দাফন করা হয় তাতে।[৩৬৩]

---

[৩৬২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫/১৫৪ আরো দেখুন : সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৪৫ ইবনে ওয়ার্দি ৩/২৩১, জাহাঁকুশা ২/১৯১, শাযারাতুয যাহাব ৫/১৩১ ইবনে খালদুন ৫/১৪৪ খাওয়ারিজম শাহি ২১৭-২১৮

এদিকে আল-মালিকুল মুজাফফরও এই কাহিনি শুনে ফেলেন। তিনি গ্রেফতারকৃত নিহতদের হাতিয়ার, তলোয়ার, পোশাক ও ঘোড়ার জিন চেয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের কয়েকজন অফিসারকে দিয়ে (এদের মধ্যে আতর খান এবং আমির আখওয়ারও ছিল) প্রকৃত সত্য বের করে আনেন যে, এগুলো বাস্তবেই সুলতানের সামানপত্র।

তারপর (সুলতানের) হত্যার ঘটনাস্থলে কিছু লোক পাঠিয়ে নিহতের (সুলতানের) হাড্ডি বের করে দিতে বলা হল। সেসব এনে খিলাতে দাফন করা হল।[৩৬৪] এভাবে সুলতানের হয়ে গেল দু-দুটো কবর, যে-কারণে বাস্তব অবস্থা আরো বেশি সন্দেহপূর্ণ ও ঘোলাটে হয়ে গেছে।

শিহাবুদ্দীন নাসাবি সুলতানের শাহাদাতের এই সংবাদ কিছুটা বিলম্বে পেয়েছিলেন। সুলতানের থেকে পৃথক হয়ে যাবার পর, তিনদিন পর্যন্ত তিনি জঙ্গলে-জঙ্গলে লুকিয়ে কাটিয়েছিলেন। তারপর কয়েক সপ্তাহ ধরে ছুটে ফিরছিলেন এদিক-ওদিক। এর মধ্যে দুইমাস পর্যন্ত তাকে আমাদে নজরবন্দিও রাখা হয়েছিল। বহুদিন পর বন্দিদশা থেকে পালাবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। আর তখনই তিনি জানতে পারেন—কুর্দিদের হাতে শহিদ হয়ে গেছেন প্রিয় সুলতান![৩৬৫]

আন-নাসাবি বুক বিদীর্ণ করে-দেওয়া এই সংবাদ শুনে শোকগাথা রচনা করেছেন—'দুঃখভারাক্রান্ত এই ট্রাজেডির ক্রন্দনধ্বনিতে ফেটে গিয়েছে আজ জামানার সব গর্ভকোষ। দল বেঁধে ঘনিয়ে আসছে বিপদ। দীনের নিশান ভেঙে পুরোপুরি হেলে গেছে। ধসে পড়েছে ইসলামের ইমারত।'[৩৬৬]

আল-মালিকুল আশরাফের চাটুকার দরবারিরা আনন্দিত গলায় আশরাফকে সুলতানের মৃত্যুসংবাদ জানাল। আশরাফ তখন ভীষণ রেগে ওঠেন। কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলতে থাকেন—'জানো কি, কোন বিষয়টিকে তোমরা মোবারকবাদ দিচ্ছ? জানো, কীসে তোমরা প্রফুল্লিত হয়ে উঠছ? খুব শিগগির তোমরা দেখতে পাবে সুলতান জালালুদ্দীনের এই অবিদ্যমানতার করুণ পরিণতি! মুসলিমবিশ্বে তাতারদের অপ্রতিরোধ্য-অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে উঠবে এই ঘটনা। সুলতান জালালুদ্দীন তাতার ও আমাদের মাঝখানে মহান বাদশাহ আলেকজান্ডারের

---

[৩৬৩] জাহাঁকুশা ২/১৯১ তারিখু মুখতাসারিদ্দুওয়াল ২৪৭

[৩৬৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮২-৩৮৩ খাওয়ারিজম শাহি ২১৮

[৩৬৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৪৬ খাওয়ারিজম শাহি ২৬৯

[৩৬৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮২

লৌহপ্রাচীরের মতো শক্ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।' বলতে বলতে আর্দ্র হয়ে ওঠে আল-মালিকুল আশরাফের কণ্ঠ।[৩৬৭]

হাফেজ যাহাবি বলেছেন—সুলতান জালালুদ্দীনের শাহাদাতের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ৬২৯ হিজরি সনের প্রথমদিকে। কারণ, তার শাহাদাতের ঘটনা ৬২৮ হিজরির শাওয়াল মাসের মাঝামাঝিতে (আগস্ট, ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দ) এসে জানা গিয়েছিল। ইবনে খালদুনের বক্তব্য এটাই।[৩৬৮]

দ্বিতীয় অভিমত

সুলতানের বিশিষ্টজনদের কিছু লোক কুর্দিদের হাতে সুলতানের শহিদ হওয়ার ঘটনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন। এই ঘটনাকে তারা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেন। এরা হলেন সুলতানের সেসব সহচর, যারা আমাদ ও মায়াফারকিনের আশপাশে সুলতানের যাত্রা ও অবস্থানের শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে ছিলেন।

তাদের বক্তব্য হল—কিছু লোকের নিকট সুলতানের পোশাক ও অস্ত্রপাতি পেয়ে যাওয়া থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, তারা যেই নিহত ব্যক্তির থেকে এই পোশাক ও অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল, তিনি সুলতানই ছিলেন।

এদের বক্তব্য হল—সুলতান জালালুদ্দীন যখন শেষবারের মতো সঙ্গীদের থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তখন তার রাজকীয় পোশাক ও অস্ত্রপাতি সিলাহদারের (অস্ত্রসংরক্ষণকারী) কাছে জমা রেখে দিয়েছিলেন। আর তিনি নিজে এক দরবেশের রূপ ধরে চলে গিয়েছিলেন অজানা কোনো দিকে।

(আন-নাসাবির রচনা থেকেও এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছিলেন—পাহাড়ের গিরিপথে ছাউনিতে হামলা হবার সময় তার দৃষ্টি যখন শেষবারের মতো প্রিয়তম সুলতানের উপর গিয়ে পড়েছিল, সুলতান তখন তাকিয়া অর্থাৎ দরবেশদের টুপি পরে ঘোড়ার পিঠে বসে ছিলেন।)

এজন্য রাজকীয় পোশাক ও অস্ত্রপাতি বহনকারী যে লোকটি নিহত হয়েছিল, সে সুলতান ছিল না। অধিকতর ধারণা হল—সে ছিল সুলতানের অস্ত্র বহনকারী। তার কাছে রাজকীয় পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল বলে তাকে সুলতান জালালুদ্দীন মনে করা হয়েছিল।[৩৬৯]

---

[৩৬৭] আন-নুজুমুয যাহিরাহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০৮, শামেলা

[৩৬৮] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৮ হিজরি, তারিখে ইবনে খালদুন ৫/১৪০

[৩৬৯] জাহাঁকুশা ২/১৯১, তারিখে মুখতাসারুদ-দুওয়াল ২৪৭, (প্রকাশ থাকে যে, সিলাহদার সৈন্যদলের সেই দায়িত্বশীলকে বলা হয়, যে হয় শাহি অস্ত্রপাতির পাহারাদার কিংবা তদারককারী।)

এই দ্বিতীয় অভিমতটিকেও একটা বড় শ্রেণি গ্রহণ করে নিয়েছিল। এবং দীর্ঘ সময় ধরে বহুলোক মনে করতে থাকল সুলতান জালালুদ্দীন কোনো সুফি কিংবা দরবেশের রূপ ধরে নগরে-নগরে এখনো পরিভ্রমণ করে চলেছেন।[৩৭০] প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

সুলতানের গুম হয়ে যাবার পর, দীর্ঘ সময় ধরে তাতারদের উপর চড়ে রইল তার অজানা আতঙ্ক। কোথাও যদি গুজব রটে যেত, সুলতান অমুক এলাকা দিয়ে গিয়েছেন, তখন তাতারদের ভীত মনে খানিকটা পানি আসত। তৎক্ষণাৎ তাদের বাহিনী ওদিকে ছুট লাগাত এবং সুলতানের সন্ধানে দিনরাত্রি এক করে ফেলত। শেষ পর্যন্ত মিলত না সুলতানের কোনো খোঁজ। কিন্তু সেখানকার আমজনতার কপালে দুর্ভোগ নেমে আসত। তাদের উপর তাতারদের কঠোরতা ও চাপপ্রয়োগ, অনাকাঙ্ক্ষিত নজরদারি, জিজ্ঞাসাবাদ এবং লুটপাটের বাজার গরম হয়ে যেত।[৩৭১]

তারা সুলতান জালালুদ্দীনের ঠিকানা জানার জন্য মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে কত লোককে যে ধ্বংস করে দিল! কত জনকে যে সুলতান জালালুদ্দীন মনে করে হত্যা করা হয়েছিল, এর সঠিক কোনো ইয়ত্তা মেলে না। ওদিকে কিছু মাতাল মাস্তান প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য অথবা তাতারদের সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য নিজেদেরই জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ দাবি করে বসেছিল।

'আমিই জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ'—এমনতরো ভুয়া ঘোষণা দিয়ে চারপাশের জনস্রোতের ভেতর ভূকম্পন সৃষ্টি করে ফেলত তারা। আর খুব দ্রুতই জনতার সামনে খুলে যেত তাদের বাস্তব মুখোশ।

৬৩৩ হিজরি সনে ইসপিদার এলাকায় এক ব্যক্তি দাবি করল—আমি সুলতান জালালুদ্দীন।

সঙ্গে সঙ্গে তার মোকাবেলার জন্য তাতার হাকিম জিনাতমোর নিজের সেসব সরদারকে পাঠিয়ে দিল, যারা সুলতান জালালুদ্দীনকে খোলা ময়দানে কোথাও ভালোভাবে দেখেছিল। এই সরদাররা গিয়ে জালালুদ্দীন দাবিদার সেই লোকটাকে গ্রেফতার করে ফেলে। তারপর একে মিথ্যা দাবিদার দেখে হত্যা করে দেয়।

৬৫২ হিজরি সনে একটি বাণিজ্য-কাফেলা জাইহুন-নদীর পারে এসে পৌঁছে। নদী পেরোবার আগে টহলরত তাতার-সৈন্যরা এদের মধ্যে তল্লাশি শুরু করে দেয়। এই কাফেলার ভেতর তারা দরবেশ ধরনের এক ব্যক্তিকে দেখতে পায়। সেই ফকিরকে দেখে সন্দেহ জাগে তাতার-সৈন্যদের মনে। তাকে প্রহরায় নিয়ে গিয়ে শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদ। তদন্তের ভেতর এই ফকির দুম করে স্বীকার করে ফেলে যে, সে সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ। তাতাররা তার উপর

---

[৩৭০] জাহাঁকুশা ২/১৯১ রওজাতুস সফা ৪/৮৩২, তারিখে মুখতাসারুদ-দুওয়াল ২৪৭

[৩৭১] খাওয়ারিজম শাহি ২১

অধিক কঠোরতা আরোপ করতে থাকে। কিন্তু তবু, নিজের স্বীকারোক্তি থেকে একমুহূর্তের জন্যও নড়তে চায়নি এই লোক। শেষমেশ বিভিন্নরকম টর্চার করতে করতে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়।[৩৭২]

হরেক রকমের গুজব আর নিজেকে সুলতান দাবি করে বসার এই ধারাবাহিকতা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জারি থাকে। যা হোক, সময় গড়াবার সাথে সাথে ধীরে-ধীরে সবার বিশ্বাস জন্মে যায় যে, সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ পৃথিবী থেকে গত হয়ে গেছেন।

তাতারদের উপর যে চড়াও হয়ে গিয়েছিল সুলতান-ভীতি, তার একটা আন্দাজ একথা থেকে করে-ওঠা যায় যে, তারা সুলতান জালালুদ্দীনের শাহাদাত কিংবা আত্মগোপনের পর বহুকাল নাগাদ নিজেদের ইবাদতে কাল্পনিক 'ত্রাণকর্তা আত্মা'র কাছে এই অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করত যে, প্রভু, কেবল তোমার সাহায্যেই সুলতান জালালুদ্দীনের মতো এক বাহাদুর ও ভয়ংকর দুশমনের পরাজয় ঘটেছে।[৩৭৩]

তাদের এই মুনাজাতের অর্থ থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে—তাতাররা সুলতান জালালুদ্দীনকে জাতিগতভাবে নিজেদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিধর শত্রু মনে করত।

---

[৩৭২] জাহাঁকুশা ২/১৯১-১৯২, তারিখে মুখতাসারুদ-দুওয়াল ২৪৭

[৩৭৩] দুনিয়া ক্যা জালেম হুকুমরান ৬৯

দশম অধ্যায়

জালালুদ্দীনের তিরোধানের পর মুসলিমবিশ্বের বিপন্ন অবস্থা

তাতাররা (ইরবিল, কারখিনি ও দাকুকায়) গণহত্যা চালিয়ে এমন নিরাপদে-নির্বিঘ্নে ফিরে গিয়েছিল যে, তাদের কোনো কিছুরই ভয় ছিল না।

একজন অশ্বারোহীও তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বাকির নদী, আলজেরিয়া, ইরবিল ও খিলাতে যাচ্ছেতাইভাবে তারা কর্তৃত্ব খাটাল। কেউই তাদের বাধা দেয়নি। কেউ এসে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। মুসলিম সুলতানরা গর্তে গিয়ে লুকিয়েছিল। তার উপর সুলতান জালালুদ্দীনের ব্যাপারে সুখকর কোনো সংবাদও আসছিল না।'[৩৭৪]

সুলতান জালালুদ্দীনের পর...

সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের শাহাদাত কিংবা আত্মগোপনের পর তাতারদের প্রচণ্ড ঝড় এসে নির্বিঘ্নে-নির্দ্বিধায় ইসলামি রাজ্যগুলিতে ঘটিয়ে চলে জুলুম-নির্যাতনের মহা তাণ্ডব। একেকজন মুসলিমের রক্ত হয়ে যায় পানির চেয়েও সস্তা। চতুর্দিকে শুধু বিরাজ করতে থাকে অগ্নিলাভা এবং চমকে ওঠা তরবারির আধিপত্য। মুসলিমদের উপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে এমন-সব জুলুম-নিপীড়ন, যা পৃথিবীর কেউ আগে কখনো দেখেনি।

তার চেয়েও বড় কথা হল—সাধারণ ও বিশিষ্ট শ্রেণির সবার ভেতর শত্রুবাহিনীর এতো ভয় বাসা বেঁধে নেয় যে, তারা তাতারদের হাতে নিতান্ত দুর্বল ও অসহায়ভাবে ভেড়া-বকরির মতো সারি বেঁধে জবাই হতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে ওঠে। তবু শক্ত হাতে কেউ ধরতে চায়নি তলোয়ার।

যতক্ষণ সুলতান জালালুদ্দীনের মতো এক দুর্ধর্ষ নেতা তাতারদের সামনে শক্ত জগদ্দল হয়ে বাধ সেধে ছিলেন, মুসলিম জনসাধারণের সাহসিকতাও ততক্ষণ স্থিরভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই জগদ্দলটি টুকরো-টুকরো হয়ে যেতেই ধপাধপ নিভে গেল আশার সকল প্রদীপ। হতাশা ও দুর্বলতার কালো মেঘে চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল অন্ধকার। এবার মুসলমান তাতারদের বিরুদ্ধে তরবারি ওঠাবার কল্পনাও করে উঠতে পারছিল না।

সবচেয়ে আফসোসের বিষয় হল—কায়কোবাদ, আশরাফ ও আল-মালিকুল কামিলের মতো শক্তিমান শাসকবর্গ, যারা সুলতান জালালুদ্দীনকে তাদের রাস্তা

---

[৩৭৪] তারিখুল কামিল লি ইবনিল আসির

থেকে হটাতে নিজেদের মধ্যকার সমস্ত অনৈক্য ভুলে গিয়ে যূথবদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, এই সংকটসংকুল নাজুক পরিস্থিতিতে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। এরা একমুহূর্তের জন্যও সমষ্টিগত কিংবা এককভাবে এই শত্রুর মুখোমুখি হবার হিম্মতও করতে পারেননি। চূড়ান্ত গাফলতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে যার যার আশ্রয়স্থলে নিশ্চুপ পড়ে ছিলেন।

সুলতানের অদৃশ্য হয়ে যাবার কয়েক মাস পরেই, তাতাররা বিপুল শক্তিমত্তায় আজারবাইজান, পারস্য ও ইরাক পেরিয়ে রোম ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় শুরু করে দিয়েছিল আগুন ও রক্তের হোলিখেলা। আলজেরিয়ার কোনো শহরই এদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সাইহুন ও জাইহুনের ময়দানগুলোতে থেমে-থাকা অগ্নিলাভা দজলা ও ফোরাতের উপত্যকাগুলোতে ঢুকে গিয়েছিল। আমাদ, আরজুন, মায়াফারকিন ও আসআর্দে পড়ে গিয়েছিল লাশের স্তূপ। তানাযা, মারদিন, খাবুর, ইরাবানের মতো ছোট শহরগুলোই নয় কেবল, বরং তিবরিজ, নাসিবিন, মুসেল, ইরবিলের মতো বড়-বড় শহরও ধ্বংস ও বিধ্বস্ততা থেকে রক্ষা পায়নি।[৩৭৫]

মুসলিম সুলতানগণ শক্তিহীন হয়ে কেবল আফসোস করে যাচ্ছিলেন। এইবার তারা বুঝতে পেরেছিলেন—সুলতান জালালুদ্দীনকে সঙ্গ না দিয়ে কী করুণভাবে নিজেদের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষাকারীকে তারা নিঃশেষ করে ফেলেছেন। সুলতানের সাথে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খারাপ আচরণ করে গিয়েছিলেন যে আশরাফ, সেও অনুতপ্ত ও হতাশ কণ্ঠে বলে উঠছিলেন—জালালুদ্দীন আমাদের ও তাতারদের মাঝে ছিলেন শক্তিশালী দুর্গপ্রাচীরের মতো শক্ত প্রতিবন্ধক, যেমনভাবে মনুষ্যজাতি ও ইয়াজুজ-মাজুজের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে বাদশাহ আলেকজান্ডারের রক্ষা-প্রাচীর।[৩৭৬]

সেসময়কার বিখ্যাত ঐতিহাসিক মুওয়াফফিক আবদুল লতিফ বাগদাদি এই খুনি তাতারদের কিছু ব্যাপার ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন—তাতারদের জেলখানা থেকে যে ব্যক্তিই পালিয়ে যেত, তাকে মেরে ফেলার জন্য সম্ভাব্য সব কৌশল তারা অবলম্বন করত।

তারা যখন বিভিন্ন জমকালো উৎসবের আয়োজন করত, সেই উৎসব দ্বিগুণ জমজমাট করে তুলতে ভরা মজলিশে বন্দিদের ডেকে আনত। তারপর লাইন ধরে কেটে যেত এদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বন্দিদের অসহ্য যন্ত্রণায় তড়পাতে দেখে, তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে খুশিতে তাতাররা অট্টহাসি লাগাত। এই করুণ দৃশ্যে তারা বিপুল আনন্দ পেত। তরবারির তীক্ষ্ণ ফলা তাদের পেট বরাবর ঠেলে

---

[৩৭৫] ইবনে আসির ৭/৬৬০-৬৬৩

[৩৭৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/১৫৪

একটু একটু করে গেঁথে দিত। বন্দিরা যতই অনুগ্রহ চেয়ে হাহাকার করত, ততই বেড়ে যেত তাতারদের নির্যাতনের মাত্রা। সুশ্রী-সুন্দরী নারীদের পেয়ে গেলে কিছুদিন তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম লুট করে তারপর হত্যা করে ফেলত।[৩৭৭]

এই ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ইবনুল আসির এইসব ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী দৃশ্যগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—'এক লোক বলল, আমি তাতারদের থেকে বাঁচার জন্য ভুসির গুদামঘরে লুকিয়ে পড়েছিলাম। সেখান থেকে একটি ছিদ্রে উঁকি দিয়ে ভয়কাতুরে চোখে আমি তাদের দেখছিলাম। তাতাররা কাউকে হত্যা করবার জন্য যখন দানবের মতো তার উপর ঝাপটে পড়ত, নিরীহ সেই লোকটি আগেভাগেই চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করত যে, লা-বিল্লাহ, আল্লাহর কসম, না, না না!... আল্লাহর ওয়াস্তে, আমাকে মেরো না! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতাররা তাকে হত্যা করেই ছাড়ত।

বস্তির সমস্ত লোককে হত্যা করে তারা যখন ফারেগ হল, তখন শুরু করল ধনসম্পদ লুটপাট; বন্দি করে ফেলল নারীদের। তারপর একটি বড় আশ্চর্য দৃশ্য দেখি—ধ্বংসযজ্ঞ শেষে তারা তাদের ঘোড়ায় চেপে হাসতে হাসতে রওনা দেয়, আর বেসুরো কণ্ঠে একসঙ্গে সবাই ব্যঙ্গ করে দুলে দুলে গেয়ে চলে—'লা-বিল্লাহ! লা-বিল্লাহ! লা-বিল্লাহ!

আল্লামা ইবনুল আসির আরো লেখেন—আল্লাহ তায়ালা লোকদের মনে তাতারদের এমন ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই ভীতুদের সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনাগুলো যদি কেউ শোনে, হয়তো এগুলোকে অতিপ্রাকৃত ও অবাস্তব বলে অস্বীকার করে বসবে।

ঘটেছে তো এমন—বিপুল জনসংখ্যাপূর্ণ কোনো গ্রামে কিংবা স্থানে একজন মাত্র তাতার ঢুকেছে, তারপর সে ওখানকার সবাইকে একাই হত্যা করে চলে গেছে। তাদের মধ্য থেকে একজনেরও হিম্মত হয়নি এই এক তাতার অশ্বারোহীর উপর হাত ওঠাবার।

আরেক লোক আমাকে শুনিয়েছে—আমি ১৭ লোকের সাথে পথ চলছিলাম, হঠাৎ এক তাতার অশ্বারোহী এসে উদয় হল। আমাদেরকে সে আদেশ দিল—তোমরা সবাই একে অন্যের হাত বেঁধে ফেলো! সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ এই হুকুম পালন করতে লেগে গেল। আমি হয়রান হয়ে তাদের বললাম—আরে! এ তো একা। একে আমরা মেরে ফেলছি না কেন? চলো, একে মেরে আমরা পালিয়ে যাই।

সঙ্গীরা জবাব দিল—আমাদের খুব ভয় হচ্ছে!

---

[৩৭৭] তারিখে ইসলাম যাহাবি

আমি তাদের বোঝালাম—দেখো, ও এক্ষুনি তোমাদের সবাইকে হত্যা করে ফেলতে চাচ্ছে। তার বদলে চলো আমরাই ওকে হত্যার চেষ্টা করি। মহান আল্লাহ হয়তো এই লোকের অনিষ্ট থেকে আমাদের মুক্তি দেবেন।

আল্লাহর কসম, আমার সঙ্গীদের মনে তবু হিম্মত জাগেনি তাতারটাকে কিছু করবার। শেষে একটি ছুরি দিয়ে আমিই তাকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আমরা সবাই প্রাণ বাঁচালাম। এরকম অনেক ঘটনাই চোখের সামনে ভাসছে এখনো।'

ইবনুল আসির আরো লিখেছেন—আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এবার বিশেষ গায়েবি সাহায্য নাজিল করুক। শাসকদের ভেতর জিহাদের প্রতি কিংবা দীনকে সাহায্য করার প্রতি এখনো কোনো আগ্রহ প্রকাশ পেতে দেখছি না। তারা বরং সবাই পার্থিব রঙ-তামাশা এবং প্রজাদের উপর জুলুম-নিপীড়ন ও কঠোরতা আরোপে লিপ্ত। এ হচ্ছে এমন এক মুসিবত ও দুর্ঘটনা, লোকে প্রাচীনকাল থেকে এই সুদূর বর্তমান পর্যন্ত কোনো-ক্ষেত্রেই এর সাথে সামঞ্জস্যশীল কোনো মুসিবত ঘটতে দেখেনি। সুতরাং, মহান আল্লাহ মুসলিমদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুক। এই শয়তান শত্রুপক্ষকে এখান থেকে হটিয়ে দিক।

এ বছর (৬২৮ হিজরি) পুরোটা কেটে গেছে। কিন্তু জালালুদ্দীনের কোনো খবর মেলেনি আমাদের। জানি না তাকে হত্যা করা হয়েছে, নাকি তাতারদের ভয়ে তিনি আত্মগোপন করেছেন, অথবা হিজরত করে অন্য কোনো রাজ্যে চলে গেছেন।

তাতারদের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তিনি লেখেন—তাতাররা (ইরবিল, কারখিনি ও দাকুকায়) গণহত্যা চালিয়ে এমন নিরাপদে-নির্বিঘ্নে ফিরে গেল যে, তাদের কোনো কিছুরই ভয় ছিল না। একজন অশ্বারোহীও তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বাকির নদী, আলজেরিয়া, ইরবিল ও খিলাতে যাচ্ছেতাইভাবে তারা কর্তৃত্ব খাটাল। কেউই তাদের বাধা দেয়নি। কেউ এসে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। মুসলিম সুলতানরা গর্তে গিয়ে লুকিয়েছিল। তার উপর সুলতান জালালুদ্দীনের ব্যাপারে সুখকর কোনো সংবাদও পাচ্ছিল না।

শেষে ইবনুল আসির লিখেছেন, আমি এক ব্যবসায়ীর চিঠি পড়েছি। গতবছর (৬২৮ হিজরিতে) তাতারদের আগমনের পূর্বে সে রায় শহরে বাস করছিল। তাতাররা যখন রায় শহরে চড়াও হল, নগরবাসী আনুগত্য প্রকাশ করে তাদের হাতে শহর তুলে দিল। তারপর তাতাররা আজারবাইজানের দিকে চলে গেল। এই ব্যবসায়ীও (তাতারদের দাস হয়ে) তাদের সাথে তিবরিজে পৌঁছে গেল।

তারপর সে মুসেলে বসবাসরত তার আত্মীয়দের কাছে চিঠি লিখল—এই কাফের দুশমনের উপর আল্লাহর লানত নেমে আসুক। এদের অবস্থা বর্ণনা করবার এবং এদের সৈন্যসংখ্যার আধিক্য উল্লেখ করবার হিম্মত আমার নেই।

আশঙ্কা করছি, এদের ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে মুসলিমদের অন্তর। নিঃসন্দেহে পরিস্থিতি খুব ভীতিকর হয়ে উঠেছে। তোমাদের মনে যেন এই খামখেয়ালি চিন্তা বাসা না বাঁধে যে, যে বাহিনীটি নাসিবিন ও খাবুর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, আর যে দ্বিতীয় সৈন্যদলটি ইরবিল ও দাকুকায় আক্রমণ করেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্রেফ লুটপাট করা। না, বরং এরা জানতে এসেছিল ইসলামি রাজ্যগুলিতে এদের রুখে দেবার মতো কেউ আছে কি-না।

তারপর ফিরবার সময় তাদের বাদশাহকে তারা জানিয়ে দিয়েছে, এই রাজ্যগুলিতে সংঘর্ষ বাধাবার উপযুক্ত কেউ নেই। এজন্যই এদের লোভ আরো বেড়ে গেছে। এবার বসন্তকাল এলে তোমাদের উপর ফের এরা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে। তোমাদের জন্য মুসলিমবিশ্বের পশ্চিমের সীমান্ত এলাকাগুলো ব্যতীত অন্য কোনো জায়গা এখন নিরাপদ কিংবা সংরক্ষিত নয়। তাতাররা সবকটি রাজ্যে আক্রমণ করবে বলে সংকল্প করে ফেলেছে। তাই সবাই নিজেদের কল্যাণের কথা ভাবো!

এই ছিল তার চিঠির বিষয়। এখন, এই পরিস্থিতিতে, কেবল ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন, ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিমই জপতে হবে। আর আছেন সুলতান জালালুদ্দীন। ৬২৮ হিজরির শেষ নাগাদ তার কোনো খোঁজই মেলেনি। তদ্রুপ, ৫২৯ হিজরির সফর মাস কেটে যাওয়া পর্যন্তও তার সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারিনি।[৩৭৮]

সুলতানের সঙ্গীদের পরিণতি

সুলতান জালালুদ্দীন পুরোপুরিভাবে গোপন হয়ে যাবার পর তার আমির ও সৈন্যরা এদিকে-ওদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আমির আওর খান যে ৪ হাজার সৈন্যের সাথে ইস্পাহান পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল, ৬৩৯ হিজরি পর্যন্ত সেখানেই রইল সে। শেষে তাতাররা এই ইস্পাহানও দখল করে ফেলল। সুলতানের বহু সিপাহি আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে গেল।

৬৩৪ হিজরিতে কায়কোবাদের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করে তার পুত্র গিয়াসুদ্দীন। তখন সন্দেহের ভিত্তিতে সে প্রধান সেনা-অফিসারকে বন্দি করে ফেলে। অবশিষ্ট খাওয়ারিজমি সিপাহিরা পালিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা বন্য

---

[৩৭৮] ইবনুল আসির ৭/৬৬০-৬৬৩; ৬২৯ হিজরির ঘটনাবলিতে এসেই সমাপ্ত হয়েছে আল্লামা ইবনুল আসিরের আল-কামিল ফিত-তারিখ গ্রন্থ। এর পরের বছরে ৬৩০ হিজরি সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বোধহয়—মহান আল্লাহ তাকে বিস্তারিতভাবে এই মহা ট্রাজেডি লিপিবদ্ধ করে যাওয়ার জন্যই জীবিত রেখেছিলেন। এবং এই কাজ সমাপ্ত হতেই তাকে নিজের কাছে ডেকে নেন।

প্রাণীর মতো এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায় এবং লুটপাট করতে থাকে মানুষের সম্পদ। শেষমেশ মালিক আস-সালিহ নাজিমুদ্দীন আইয়ুব, যিনি তার পিতা আল-মালিকুল কামিলের পক্ষ থেকে হাররান, আমাদ ও কিফার শাসক ছিলেন, পিতার অনুমতিক্রমে এই খাওয়ারিজমি সৈন্যদের নিজের বাহিনীতে ভর্তি করে নেন।[৩৭৯]

বাগদাদ-ট্রাজেডি

তাতাররা মুসলিমবিশ্বের একটা বড় অংশ দখল করে নেবার পর রাজধানী বাগদাদের সামনে কয়েক বছর নাগাদ উপদ্রব চালাতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা অলসতার ঘুমঘোরে নিমজ্জিত এই খেলাফতের মুকুটধারীদের নিজেদের অপরাধের ক্ষতিপূরণ দেবার দীর্ঘ একটা সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এরা যখন সেই সুযোগ থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারেনি, আল্লাহর সেই সাধারণ নিয়ম এদেরকেও পৃথিবীবাসীর জন্য শিক্ষণীয় বস্তুতে পরিণত করে ছেড়েছে।

তখন বাগদাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন খলিফা মুসতানসির বিল্লাহর পুত্র মুসতাসিম বিল্লাহ। খলিফা মুসতানসির বিল্লাহ তাতারদের থেকে নিরাপদ থাকবার জন্য কমপক্ষে ১ লক্ষ পরীক্ষিত অশ্বারোহী তৈরি রেখেছিলেন। কিন্তু পুত্র মুসতাসিম বিল্লাহ তার মুনাফিক রাজেফি উজির ইবনে আলকামির পরামর্শে এই ১ লক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে সৈন্য ছাঁটাই করতে থাকেন। কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত ছিল ১০ হাজার অশ্বারোহী। আর ঠিক তখনই, মুনাফিক ইবনে আলকামির ইশারায় চেঙ্গিজ খানের নাতি হালাকু খান ২ লক্ষ নরপশু নিয়ে রাজধানী বাগদাদে আক্রমণ করে। ৬৫৬ হিজরির মহররম মাসের ১৬ তারিখে (১৯ জানুয়ারি, ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) তাতাররা কঠিনভাবে অবরোধ করে বাগদাদ শহর।

প্রবল আতঙ্ক ও প্রচণ্ড অবরোধের কারণে শহরবাসীর ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। বাগদাদের বাহিনীর ভেতর যুদ্ধ করার মতো একটুও শক্তি ছিল না। খলিফা দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা দূর করবার জন্য সর্বদা সুশ্রী নর্তকীদের নৃত্য ও গানে মত্ত হয়ে থাকতেন। তাতাররা চতুর্দিক থেকে শহরে বর্ষণ করছিল তিরবৃষ্টি।

হঠাৎ রাজমহলের খিড়কি দিয়ে সাঁই করে একটি তির উড়ে এসে আরাফা নামে খলিফার এক প্রিয় বাঁদির গায়ে বিদ্ধ হয়। নৃত্যরত এই বাঁদির দেহটা তড়পাতে তড়পাতে মুহূর্তের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যায়।

খলিফা ভীত-ভীত চোখে মৃত আরাফার গায়ে বিদ্ধ তিরটির দিকে তাকান। দেখতে পান—তিরের গায়ে লেখা আছে, 'যখন আল্লাহ তায়ালা তার নির্ধারিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ঘটাবেন বলে ইচ্ছা করেন, জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বুদ্ধিশুদ্ধিও তখন ছিনিয়ে নেন।'

---

[৩৭৯] ইবনে খালদুন ৫/১৪২

তারপর খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ উজিরে আজম ইবনে আলকামির জোরাজুরিতে ৭০০ আলেম, ফকিহ, সুফি এবং সাম্রাজ্যের আমির নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে হালাকু খানের ছাউনিতে গিয়ে পৌঁছেন। এই নরপশু হালাকু খান খলিফা ও তার কিছু সাথিকে পৃথক করে বাকি সকলের গর্দান উড়িয়ে দেয়, আর খলিফাকে শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদ।

সেই ভয়ংকর পরিবেশে এবং নিজের অপমানে খলিফার কণ্ঠ অনবরত কাঁপতে থাকে। তখন সীমাতিরিক্ত অর্থ দাবি করে হালাকু খান। পরদিন খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ নিজে স্বর্ণ-রৌপ্য ও হিরে-জহরতের সমস্ত ভান্ডার এনে হালাকু খানের পায়ের সামনে ছড়িয়ে দেন।

খলিফার ধারণা ছিল—এবার তিনি জীবনের নিরাপত্তা পেয়ে যাবেন। কিন্তু এটিই ছিল তার জীবনের শেষদিন। তাকে পশমি বিছানায় শুইয়ে পিষে মেরে ফেলা হয়। তারপর তাতাররা ঢুকে পড়ে শহরের ভেতর এবং চুরমার করে দেয় স্বপ্নের বাগদাদ। নারী-পুরুষ, বাচ্চা-বুড়ো, সাধারণ-বিশিষ্ট এবং আমির-গরিব সবাইকে হত্যা করে ফেলা হয়। বহুসংখ্যক লোক প্রাণ বাঁচাতে কুয়া, নালা, ফলের গুদাম, বদ্ধ কামরা ও ছাদে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতাররা শিকারি কুকুরের মতো খুঁজে খুঁজে তাদের হত্যা করতে থাকে। আবদ্ধ কামরা ও বাসস্থানগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে অবস্থানকারীদের ঘরের ভেতরেই পুড়িয়ে কয়লা বানিয়ে দেওয়া হয়। একদল তাতার গিয়ে ছাদে ওঠে। খুঁজে খুঁজে যাকেই পায় জবাই করে ফেলতে থাকে। বাগদাদের পথে-পথে গলিতে-গলিতে আক্ষরিক অর্থেই বয়ে যেতে থাকে সহস্র রক্তের নদী। ৪০ দিন পর্যন্ত পুরো প্রচণ্ডতায় অব্যাহত থাকে গণহত্যা।

বাগদাদে বসবাসরত ইহুদি, খ্রিষ্টান, রাফেজি এবং ইবনে আলকামির মতো গাদ্দারের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিল, তারা ব্যতীত অন্য কারুর এখানে আশ্রয় মেলেনি।

বাগদাদের নিহতের সংখ্যা ১৮ থেকে ২০ লক্ষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়। এসব নিহতের রক্তে কয়েকদিন পর্যন্ত লাল হয়ে ছিল পুরো দজলা-নদীর পানি। তারপর বাগদাদের হাজারো কুতুবখানার দামি দামি অসংখ্য কিতাব নিক্ষেপ করা হয় দজলার জলে। তারপর কয়েকদিন পর্যন্ত এসমস্ত কিতাবের কালিতে কালো কুচকুচে হয়ে থাকে সারা নদীর পানি।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, এই বাগবাগিচা-ভরা বাগদাদ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে নয়নাভিরাম শহর। এই শহর এবার সম্পূর্ণ বিরানভূমিতে পরিণত হল। বাজারে-বাজারে পথে-পথে দূর থেকে চোখে ভাসছিল লাশের উঁচু উঁচু পিরামিড। একদিন বৃষ্টি নামলে লাশগুলো ময়লাটে ও বিকৃত হয়ে গেল।

শহরজুড়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় দূষিত হয়ে উঠল আবহাওয়া। ছড়িয়ে পড়ল মহামারি, এই মহামারির প্রাদুর্ভাব একদম সিরিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। এই দূষিত আবহাওয়া ও মহামারিতে বহুসংখ্যক লোক ধ্বংস হয়ে গেল। অভাব, মৃত্যু, মহামারি—তিনটেরই তখন রাজত্ব চলছিল।[৩৮০]

তখন বাগদাদ আর শহর থাকেনি, হয়ে পড়েছিল ছাই-ভস্মের স্তূপ। কিন্তু একদা, ৪০ বছর পূর্বে, তাতারদের এই পাশবিক জুলুম-নির্যাতনের আগুন বাগদাদের রাজমহল থেকেই উসকে দেওয়া হয়েছিল। মুসলিমবিশ্বের দিকে স্বয়ং তখনকার খলিফা নিজে ডেকে এনেছিলেন ক্রোধ ও গজবের এই ঝড়।

যে হায়নার দল আজ বাগদাদি মুসলিমদের দেহের মাংস নিষ্পেষিত করে ফেলছে, সেই হায়নাদের মুসলিমদের রক্ত-মাংস নিয়ে খেলবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এই বাগদাদেরই একজন—খলিফা নাসির লি দীনিল্লাহ। তিনি তখন ভুলে গিয়েছিলেন, আগুন জিনিসটা সর্বদা আগুনই। দপ করে যখন জ্বলে ওঠে, তখন কে খাওয়ারিজমি আর কে বাগদাদি—তাতে কোনো পার্থক্য দেখে না সে।

---

[৩৮০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/২৩৫-২৩৬-২৩৭

একাদশ অধ্যায়

জীবন ও অবদান

সুলতান জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতির পুরো জীনচরিত ও কীর্তিমালা ঘাঁটলে দেখা যায়—তিনি ছিলেন এমন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে একইসঙ্গে সমাহার ঘটেছিল অসংখ্য উৎকৃষ্ট গুণ এবং যোগ্যতার। তিনি পৃথিবীজুড়ে ছিলেন এক অনুপম বিজেতা, দক্ষ রাজনীতিক, সাম্রাজ্যের পরিচালক, পাশাপাশি সেনাবাহিনীর একজন শক্তিমান সেনাপতি। তিনি ইসলামের শত্রুদের জন্য হয়ে উঠেছিলেন এক কঠিন প্রতিপক্ষ। কিন্তু মুসলিমদের জন্য ছিলেন প্রেম-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, ত্যাগ ও সহমর্মিতার গুণে সমৃদ্ধ এক মহাপুরুষ। ছিলেন পাহাড়ের মতো শক্তপ্রাণ। তার সংকল্প ছিল লোহার মতো কঠিন। বুকের ভেতর পুষে রাখতেন এক অদ্ভুত দরদমাখা হৃদয়। সেই হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন ছিল ইসলামিবিশ্বের কল্যাণকামিতার জন্য ওয়াকফ।

বীরত্ব-সাহসিকতা, নিপাট ভদ্রতা, প্রশস্ততা-দানশীলতা, বাৎসল্য ও অনুগ্রহশীলতা, ক্ষমা ও সহনশীলতা, স্বল্পভাষিতা, ওঠাবসায় অকৃত্রিম সাদাসিধে ভাব, অনর্থক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা এবং প্রতিমুহূর্তে কর্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকা—এগুলো ছিল তার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট গুণ। চলুন, সুলতান জালালুদ্দীনের এসব গুণের এবং তার জীবনচরিতের নানাদিক সুস্পষ্টভাবে খানিক নিরীক্ষণ করে-ওঠা যাক!

বীরত্ব

বীরত্ব সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনচরিতের সবচেয়ে উজ্জ্বল গুণ এটি। বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন যে কজন মনীষী, তাদের মধ্যে অন্যতম তিনি। সৈনিকসুলভ সূক্ষ্মদর্শিতা এবং অবিমিশ্র যুদ্ধকৌশল ছিল তার পুরো সত্তাজুড়ে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত। অসংখ্য যুদ্ধাভিযানে দুর্ধর্ষ সাহসিকতার এক মহা বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি।

সেসময়, যখন পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তাতারদের একক কর্তৃত্ব ও অপতৎপরতা, তখন মুসলিমবিশ্ব তো বটেই, এমনকি ইউরোপের শাসকরাও চেঙ্গিজ খানের নাম শুনলে আপাদমস্তক কেঁপে উঠত, ঠিক তখনই চেঙ্গিজীয় আগ্রাসনের মুখে শক্ত বাধ সেধেছিলেন সুলতান জালালুদ্দীন। তারপর ১২ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন উত্থান-পতনের ভেতর দিয়েও এই তাতার-তাণ্ডবের

সামনে সুকঠিন লৌহপ্রাচীর হয়েই ছিলেন তিনি। এটিই তার সুউচ্চ মনোবল ও নিরুপম সাহসিকতার স্পষ্ট প্রমাণ।

সুলতানের ট্রাজেডিকে যিনি ইতিহাসের ফ্রেমে আবদ্ধ করে গিয়েছেন, সেই নাসাবি লিখেছেন—সুলতান যে কী বিপুল বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, তার প্রমাণ হিসেবে সেসব ঘটনা ও যুদ্ধই যথেষ্ট, ইতিপূর্বে যা আমি উল্লেখ করেছি। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এক দুঃসাহসী শার্দূল, সমুন্নত মহাবীর এবং অগ্রবর্তী অশ্বারোহী আক্রমণকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর।[৩৮১]

তারিখে খাওয়ারিজম শাহির লেখক বলেছেন—নিশ্চয় সুলতান তার অনুপম বীরত্বের দরুন পুরো পৃথিবীর বাছাইকৃত সেসব নামজাদা ব্যক্তিত্বের মধ্যে অগ্রগণ্য হবার উপযুক্ত, যারা সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধির আকাশে চাঁদ-সূর্য হয়ে চমকাচ্ছেন সবসময়, যারা কখনো কোনোধরনের বিপদের পরোয়া করেননি, যারা ছিলেন ঈমানের ঐশ্বর্যে সুসমৃদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাসের জগতে একেকজন মুকুটবিহীন শাহানশাহ।

সুলতান জালালুদ্দীন চেঙ্গিজ খানের মতো এক শত্রুর সাথে এত অবিচলভাবে লড়াই গিয়েছিলেন, তার কাছের লোকজন তো পরের কথা, তা দেখে বিস্ময়ে বাহবা দিয়ে উঠেছিল স্বয়ং শত্রুরাও। বড় বড় বীরসেনা সুলতানের বিপুল মাহাত্ম্যের সামনে হয়ে গিয়েছিল পুরোপুরি বিবর্ণ। সুলতানের শ্রেষ্ঠত্বের সামনে তাদের নাম যেন সম্পূর্ণ অদৃশ্য।[৩৮২]

পরীক্ষা ও উৎসর্গের সাতকাহন

সুলতানের জীবনের দ্বিতীয় বৃহৎ যে গুণটি ছিল, তা হল সত্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। ত্যাগ ও কোরবানির যত প্রকার রয়েছে, সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনে সবকটির সন্নিবেশ ঘটেছিল।

তার পুরো জীবনটা ছিল অসংখ্য পরীক্ষায় মোড়ানো এক বিস্ময়কর অধ্যায়। আমরা সেই পরীক্ষার প্রতিটি স্তরেই তাকে বিস্ময়কর সব কোরবানি দিতে দেখেছি। একজন স্বাধীন শাসক হয়েও তিনি সম্প্রদায়ের জন্য যে-পরিমাণ কোরবানি দিয়ে গেছেন, সম্ভবত পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাসের প্রশস্ত ক্যানভাসে সেই দৃষ্টান্ত কোনো বাদশাহ ফুটিয়ে তুলতে পারেননি এবং পারবেন না। পরিস্থিতি তার থেকে সব-রকমের কোরবানি উসুল করে নিয়েছিল। আর তিনিও নিজের অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব মনে করে তা আদায় করে গেছেন।

---

[৩৮১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮৪, তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৮ হিজরি

[৩৮২] খাওয়ারিজম শাহি ১১

এ-যুগে যদি সুলতান জালালুদ্দীনের সেসব কোরবানির ছিঁটেফোঁটাও কোনো শাসক কিংবা নেতা করে দেখাতে পারেন, নিশ্চিতভাবে সবসময়ের জন্য ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত হয়ে যাবে তার নাম। কিন্তু হায়, আজো পর্যন্ত সুলতান স্বজাতীয় মুসলিমদের এক আশ্চর্য গুরুত্বহীনতা ও অমনোযোগিতার শিকার হয়ে আছেন। সহমর্মিতা ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসনীয় গুণ ছিল তার পুরো অস্তিত্বজুড়ে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। জীবনের প্রথম দিক থেকেই এসব গুণে তাকে সমৃদ্ধ দেখা গেছে।

যখন শাহজাদা ছিলেন, পিতার অলি আহাদ হবার তার যে অধিকার ছিল, আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ তা জালালুদ্দীনের পরিবর্তে শাহজাদা কুতুবুদ্দীনকে দিয়েছিলেন। তখনো কিন্তু সুলতান পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন। আর এটিই ছিল তার জীবনে ক্ষমতার মোহকে কোরবান করে দেওয়ার প্রথম দৃষ্টান্ত। আজো তা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে।

মুসলিমবিশ্বে তাতারদের আগ্রাসন শুরুর পর থেকে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অগ্নি-জ্বলন্ত একেকটি পরীক্ষা। প্রতিটি সেকেন্ড তার থেকে কোনো-না-কোনো কোরবানি পেতে অপেক্ষমাণ ছিল। যেদিন তিনি তাতারদের সাথে জিহাদের উদ্দেশে আরগেঞ্চের রাজমহল থেকে বের হয়েছিলেন, সেই দিনটিই ছিল তার আরাম কিংবা বিশ্রামের শেষদিন। সে মুহূর্তেই তিনি জীবনের সমস্ত আরাম-আয়েশ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তার কেবল একটাই ছিল জগৎ, তির-তলোয়ার ও বর্শার জগৎ। সে জগতে প্রবেশের পর ইহলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ছিঁটেফোঁটাও তার ছিল না। সম্মান ও সুখ্যাতি লাভের চিন্তা সেদিনই তিনি বর্জন করেছিলেন। সেসময়কার অনেক নিম্নমানের মুসলিম শাসকেরও যে পরিমাণ ধনৈশ্বর্য ছিল, এই কঠিন জীবনে সুলতানের কপালে তার কণামাত্র জোটেনি।

পিতার মৃত্যুর পর নিয়মানুযায়ী তিনিই হয়েছিলেন রাজ্যের শাসক। কিন্তু তার জীবনের মূল লক্ষ্যের সামনে অর্জিত এই ক্ষমতাও তিনি কোরবান করে দিয়েছিলেন। রাজমুকুট ও শাসন-ক্ষমতা ছুড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়েছিলেন আরগেঞ্চ থেকে। সেপথে তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন সেসব মুসিবতের, যা নেমে এসেছিল স্বদেশিদের জীবনে। নিকটাত্মীয় ও বন্ধুসজ্জনের ধ্বংস ও বিধ্বস্ততার বিষাদময় বেদনা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল তার সমস্ত হৃদয়।

বিস্ময়কর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী দাদি তুর্কান খাতুন একটি ডানাভাঙা পাখির মতো জীবনভর পড়ে ছিলেন দুশমনের কয়েদখানায়। আর এদিকে সুলতান অপেক্ষা করছিলেন সেইদিনের, কখন মুসলিম শাসকরা দুশমনের কয়েকখানা থেকে পবিত্র নারীদের মুক্ত করতে তার সঙ্গে এসে ঐক্যবদ্ধ হবে।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ইসলামি সাম্রাজ্যের শাসক আলাউদ্দীন তারই চোখের সামনে জনশূন্য এক উপত্যকায় কবর-কাফন ছাড়াই মাটির নিচে প্রোথিত হয়েছিলেন। বোন খান সুলতান জীবনভর তাতারদের উন্মত্ত নেশার শিকার হয়ে গেছে। নিজের সমস্ত ভাইকে সুলতান তাতার কিংবা উম্মাহর গাদ্দারদের হাতে নিহত হতে দেখেছেন। জিহাদের জন্য ছেড়েছেন ঘরবাড়ি ও স্বদেশের মাটি। হিজরতের মতো এক কঠিন পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে বারবার।

কখনো খাওয়ারিজম থেকে খোরাসান, কখনো খোরাসান থেকে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ থেকে ইরান। এই যাযাবর-জীবন শুধু দেশ ও উম্মাহর জন্যই তিনি সাদরে বরণ করেছিলেন। জিহাদি অভিযান এবং বিরামহীন সফর তার জীবনের এক আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এই বিরামহীন পরিশ্রম তাকে পুরোপুরিভাবে অসুস্থ বানিয়ে দিয়েছিল। নিজের সমস্তকিছু কোরবান করে তো দিয়েছিলেনই, এমনকি স্বীয় মিশনের সামনে স্বাস্থ্যও দিয়েছিলেন বিসর্জন।

সিন্ধুপারের যুদ্ধে তাকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তখন তিনি তার গর্ভধারিণী মা এবং স্ত্রীদের তাতার পশুদের হাত থেকে বাঁচাতে নিজ হাতেই বিসর্জন দিয়েছিলেন নদীর ভেতর। সে যুদ্ধেই তার সাত বছরের পুত্র চেঙ্গিজ খানের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হয়েছিল। পুত্রের ঘাড়ের উপর থেকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মাথার খুলি।

তারপর নদী পেরোবার পর, সেদিনই নিজ চোখে এই দৃশ্যও তাকে দেখতে হয়েছিল যে, তাতাররা তার গোত্র ও খানদানের অবশিষ্ট বাচ্চাকাচ্চা ও নারীদের লাইন ধরে জবাই করে যাচ্ছে। আত্মীয়দের বিসর্জন দেওয়া ছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে তাকে রক্তের সম্পর্কও উম্মাহর কল্যাণে কোরবান করে দিতে হয়েছে। যেমন : ভাই গিয়াসুদ্দীন এবং ভগ্নীপতি আইগান তাইসিরও মুখোমুখি হয়েছিলেন স্রেফ উম্মাহর জন্য। তার একমাত্র পুঁজি ছিল সেসব সহচর মুজাহিদ, যারা সবকিছু ভুলে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রচনা করছিল ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। কিন্তু সুলতানের এই পুঁজিও বারবার এমনভাবে লুণ্ঠিত হয়ে গেছে যে, শেষমেশ তিনি একদম একা হয়ে পড়েছিলেন।

মুসলিম শাসকদের গুরুত্বহীনতার বেদনা জীবনভর তিনি নীরবে সহ্য করে গেছেন; কিন্তু শেষদিকে এসে কাছের কিছু সঙ্গীর গাদ্দারসুলভ কর্মকাণ্ড তাকে একেবারে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছিল। মুসলিম উম্মাহর এই মহান সেনাপতিকে যেসব পরীক্ষা ও কোরবানির মুখোমুখি হতে হয়েছিল, এগুলো তার একটুখানি ঝলক মাত্র। কিন্তু খুবই প্রশংসার বিষয় হল—পরীক্ষার সেসব ঘাঁটি অত্যন্ত সফলভাবে ইসলামের লাজ রক্ষা করেই তিনি পেরোতে পেরেছিলেন।

হিম্মত

পৃথিবীর কোনো শাসকই হয়তো নিজের প্রজাদের এতবেশি রক্ত প্রবাহিত হতে দেখেননি, যেমন সুলতান জালালুদ্দীনকে দেখতে হয়েছিল তার জনসাধারণের বেলায়। এসব রক্তাক্ত অধ্যায় দেখেও বিপুল সাহস ও আত্মশক্তি নিয়ে সবকিছু সহ্য করে-যাওয়া, কিংবা ভয়-বিমূঢ়তা, আতঙ্ক ও হতাশার কোনো প্রভাব নিজের মধ্যে পড়তে না-দিয়ে অবিচলভাবে শত্রুকে প্রতিরোধ করে যাওয়া মহান সুলতান জালালুদ্দীনের আত্মিক শক্তিরই অনন্য দৃষ্টান্ত।

সৈনিকসুলভ বৈশিষ্ট্য

সুলতান জালালুদ্দীন ছিলেন তার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ জেনারেল। যুদ্ধের কলাকৌশল ও সূক্ষ্মদর্শিতায় সেসময়কার কোনো কমান্ডারই তার সমপর্যায়ের ছিলেন বলে দেখি না। সুলতানের নেতৃত্ব ও সৈনিক-জীবন নিয়ে চিন্তাসমৃদ্ধ একটি পর্যবেক্ষণ করে উঠলে তার অসংখ্য বিরল বৈশিষ্ট্য সামনে চলে আসে আমাদের। মনে করি, যারা সৈনিক, যুদ্ধাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং যারা মুজাহিদ, তাদের জন্য এই বিষয়ের পাঠগ্রহণ খুবই জরুরি এবং কল্যাণকর। সুলতানের জীবনের এ দিকটি নিয়ে মেহনত করতে পারলে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থও রচিত হয়ে উঠতে পারে।

তবে, এখানে আমি শুধু ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে যাচ্ছি :

১. বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থার মাঝেও সৈন্যদলের নেতৃত্বের পরিপূর্ণ যোগ্যতা :

সুলতান জালালুদ্দীন সৈনিক হিসেবে যেসব অভিযানে নেমেছিলেন, সেগুলোতে তার পতাকাতলে আমরা ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ পর্যন্ত সিপাহিও কখনো দেখতে পাই। কখনো তার সহযোদ্ধাদের সংখ্যা দেখতে পাই মাত্র ৫০০, কখনোবা শয়েরও কম।

এ থেকে সহজেই আন্দাজ করে-ওঠা যায়, সুলতান জালালুদ্দীন ছোট-ছোট দলের গেরিলা যোদ্ধাদের থেকে শুরু করে সারিবদ্ধ বৃহৎ বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ারও পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রাখতেন। তিনি সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং সর্ববৃহৎ সৈন্যদলের থেকেও সুযোগমতো কাজ নেবার দক্ষতা খুব ভালোভাবেই রপ্ত করতে পেরেছিলেন।

২. কয়েকগুণ বড় বাহিনীর মুখোমুখি হবার যোগ্যতা :

সুলতানের নেতৃত্বে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে নিরীক্ষণ করতে গেলে এটিও জেনে উঠি যে, তার প্রতিপক্ষ দলের সৈন্যসংখ্যা সাধারণত তার বাহিনীর তুলনায় কয়েকগুণ বেশি হতো। কিন্তু সুলতান তার অভিজ্ঞতা ও

দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সৈন্য-স্বল্পতা সত্ত্বেও দুশমনের সাথে জমজমাট মোকাবেলা করে যেতেন। অধিকাংশ সময় তিনি সফলও হয়ে উঠতেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েকগুণ বড় সৈন্যদলের সাথেও যুদ্ধ করার বিপুল অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের।

৩. নীরব অথচ তেজি আক্রমণ :

নীরবে, কিন্তু খুবই দ্রুতগতিতে অল্পসময়ের মধ্যে কাজ আঞ্জাম দিয়ে-ওঠা ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের যুদ্ধকৌশলের পৃথক একটি বৈশিষ্ট্য। বেশিরভাগ সময়ে তিনি কয়েক সপ্তাহের দূরত্ব মাত্র কয়েকদিনে অতিক্রম করে সরাসরি দুশমনের মাথার উপর গিয়ে পৌঁছে যেতেন। এতে করে দুশমন থাকত পুরোপুরি অপ্রস্তুত। তারা নিজেদের সামলে-নেবার আগেই সুলতান তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অনেক ক্ষেত্রে একই সময়ের মধ্যে দু-দুটো কিংবা তিন-তিনটে রণক্ষেত্রে সৈন্যদল পাঠাবার প্রয়োজন পড়ত। এইরকম পরিস্থিতিতে সৈনিকদের সংখ্যার স্বল্পতা তিনি পূরণ করে নিতেন খুব দ্রুত অভিযান সম্পন্ন করার মাধ্যমে। এক অভিযান সম্পন্ন করে তৎক্ষণাৎ চলে যেতেন অন্য রণক্ষেত্রে। এ হিসেবে বলতে পারি—দ্রুতগতিতে যুদ্ধযাত্রা করা ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের হেকমতপূর্ণ একটি কর্মপন্থা, আবার একধরনের অপারগতাও।

৪. প্রজ্ঞাপূর্ণ শক্ত কর্মপদ্ধতি ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা :

সুলতান জালালুদ্দীন সবসময় যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি লক্ষ রেখে লড়াইয়ের পরিকল্পনা সাজাতেন। এতে ময়দানে সংক্ষিপ্ত বাহিনী নিয়েও শক্তপ্রাণ বিশাল বাহিনীর সামনেও সিসাঢালা প্রাচীরের মতো অটল থাকতে পারতেন তিনি। আমরা তার সিন্ধুতীরের যুদ্ধে দেখতে পাই—তিনি নিজের মাত্র ৩০ হাজার সিপাহিকে চেঙ্গিজ খানের লক্ষ সৈন্যের মোকাবেলায় এমনভাবে দাঁড় করিয়েছিলেন যে, দুশমন সামনে অগ্রসর হতে অপারগ হয়ে গিয়েছিল। পেছন-দিকে রেখেছিলেন সুউচ্চ পর্বতসারি। এতে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন পেছন দিকের আক্রমণ থেকে। বাম বাহুকে রেখেছিলেন পাহাড়ের নিরাপদ ঘাঁটির ভেতর। তা ছাড়া সতর্কতাস্বরূপ সেখানে কিছু সৈন্যকেও পাহারায় লাগিয়ে রেখেছিলেন। আর ডান বাহুর যুদ্ধসারিগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন যে, তারা মজবুতভাবে জমে ছিল সিন্ধুনদের একটি বাঁকের কাছে।

গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়—সুলতানের এই বিন্যাসরীতিতে উহুদযুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহীত যুদ্ধকৌশলের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রয়েছে। বুঝতে পারি যে, এই পন্থা তিনি সেই উহুদযুদ্ধের চিত্র থেকেই

গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সহজেই আন্দাজ করতে পারি—সিয়ার ও মাগাজি[৩৮৩] সম্পর্কে কী অগাধ জ্ঞান ছিল সুলতানের।

৫. দুর্বল দিকগুলোতে আক্রমণ ও শত্রুপক্ষের কমান্ডারদের উপর আঘাত : শত্রুপক্ষের দুর্বল দিক কী কী, সেদিকে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখতেন সুলতান জালালুদ্দীন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমণ চালিয়ে খুব দ্রুতই অর্জন করে নিতেন বিজয়। সুলতানের বিশেষ যুদ্ধকৌশল ছিল—প্রতিপক্ষের বাদশাহ ও সেনাপতিদের বেকায়দায় ফেলে তাদের সার্বিক শক্তি চুরমার করে দেওয়া। এই সূক্ষ্ম চাতুর্যের মাধ্যমে তিনি তার সংকল্পবদ্ধ সৈনিকদের নিয়ে অনেক বড়-বড় বাহিনীকেও একেবারে বিক্ষিপ্ত করে ফেলতেন।

হিন্দুস্থানের এক যুদ্ধের কথা। সুলতানের সঙ্গে তখন হাতেগোনা কয়েকজন লোক। এক হিন্দু রাজা বাহিনী-সমেত সুলতানের উপর আক্রমণ করে বসল। সুলতান নিজ স্থানে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাজাকে সুযোগ দিলেন কাছাকাছি আসার। দু-দিকের মাঝখানের দূরত্ব যখন অনেক কমে এল, সুলতান সাঁই করে একটি তির নিক্ষেপ করলেন। তিরটি সোজাসুজি উড়ে গিয়ে ঢুকে গেল রাজার বুক বরাবর। এই তিরের শক্ত আঘাতে রাজার লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই হিন্দুবাহিনী দিকশূন্যের মতো এদিক-সেদিক পালাতে লাগল।

একদা খলিফা নাসির সুলতানের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য কাশাতমুর ও মুজাফফর উদ্দীন কোকোবরার নেতৃত্বে দুটো বড় সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন। সুলতানের সঙ্গে যে সেনাদলটি ছিল, তা বাগদাদের এই দুই বাহিনীর দশ ভাগের একভাগও ছিল না। কিন্তু সুলতান উল্লিখিত কৌশল অবলম্বন করেই দু-দুটো বাহিনীকে সেদিন পরাজিত করেছিলেন। প্রাণে মারা গিয়েছিল কাশাতমুর, আর মুজাফফর উদ্দীন কোকোবরা গ্রেফতার হয়ে সুলতানের সামনে অনুতপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল।

সিন্ধুতীরের ঐতিহাসিক যুদ্ধেও এই কৌশলই ছিল সুলতানের শেষ সমরাস্ত্র। সেদিন কৌশল খাটিয়েই তিনি চেঙ্গিজ খানের সেন্টারের সমস্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে অত্যাচারী চেঙ্গিজের একেবারে সন্নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো বাকি ছিল চেঙ্গিজ খানের ইহজীবন ও মুসলিমদের মুসিবতের দিন। নাহয় চেঙ্গিজ খানকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য নিজের দিক থেকে সুলতানের প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না।

---

[৩৮৩] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত ও যুদ্ধপর্ব

৬. যুদ্ধের চাল :

সুলতান জালালুদ্দীন সকল যুদ্ধাভিযানে বিভিন্নধরনের চাল চেলে তারপর অগ্রসর হতেন। আমরা দেখতে পেয়েছি—অধিকাংশ যুদ্ধে তার বিজয়ের পেছনে কোনো-না-কোনো বিস্ময়কর ফন্দি কাজ করেছে। যুদ্ধের রীতি হিসেবে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রতারণা ও কৌশলের পথ অবলম্বন করতে হয়—সুলতান জালালুদ্দীনের বক্তব্য ছিল—শক্তির চেয়ে সেসবের মাধ্যমেই দুশমনকে বেশি বশ করা যায়।

তিনি তাই করেছেন। হিন্দুস্থান থেকে ফিরবার পর তার যতগুলো বিজয় ঘটেছে, সেগুলোতে নিজের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই তিনি বেশি কাজে লাগিয়েছেন। মাঝেমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে এইসব চাল-কৌশল বাহ্যিকভাবে আঁটেননি বটে; কিন্তু এমন পন্থা অবলম্বন করতেন, যা শত্রুপক্ষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করে তুলত, যার দরুন যুদ্ধের পূর্বেই তারা সন্ত্রস্ত হয়ে লড়াই থেকে মন ভাঙিয়ে বসত। সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবেলায় সুলতানের এই বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধকৌশলেরই ছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকা। সেদিন তিনি এক টুকরো রুটি ও লবণের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের এক সেনাপতির মনে আত্মমর্যাদাবোধ ও অনুতাপ জাগিয়ে তুলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাকে সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তারপর শুরু হল মল্লযুদ্ধ। তাতে দুশমনের মনে প্রচণ্ড ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে মূল যুদ্ধের পূর্বেই তাদের এতটা ভীত করে তুলেছিলেন যে, লড়াই যখন শুরু হল, সঙ্গে সঙ্গে হয়রান হয়ে তারা ভাগতে আরম্ভ করল।

৭. প্রতিপক্ষের আমিরদের সাথে সাজশ :

লড়াই চলাকালে সুলতান যদি দেখতেন এখনো কোনো ফল আসছে না, অথবা দুশমনের শক্তি অনেক দৃঢ় হয়ে উঠেছে, কিংবা তিনি যদি স্বল্প রক্তপাতে লাভ করতে চাইতেন বিজয়, তা হলে শত্রুপক্ষের কিছু সেনাপতি ও আমিরের কাছে গোপন চিঠি পাঠিয়ে ভুলিয়ে-ফাঁসিয়ে তাদেরকে নিজের দলে ভেড়াবার চেষ্টা চালাতেন।

সাধারণত এই কাজে তিনি সফলও হতেন। হিন্দুস্থান থেকে ফিরবার কালে গিয়াসুদ্দীন পিরশাহের সেনা-অফিসারদের সাথে গোপন যোগসূত্র তৈরি করা, এবং জর্জিয়ানদের সম্মিলিত রণশক্তির মোকাবেলায় কিপচাক সরদারদের কাছে চিঠি প্রেরণ করা—সুলতানের এই বিষয়েরই সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

৮. সত্তাগত পূর্ণাঙ্গ শক্তি :

সুলতান সৈন্যবাহিনী পরিচালনার সমস্ত গুণে সমৃদ্ধ তো ছিলেনই, পাশাপাশি তিনি দৈহিক শক্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতায় ছিলেন একজন বীরপুরুষ। সে-যুগে তলোয়ার ও বর্শা চালনায় তার কোনো জুড়ি ছিল না। সুলতান যে মল্লযুদ্ধে পাঁচ

জর্জিয়ান পাহলোয়ানের সবক'টাকেই একে একে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করেছিলেন, এটিই তার শক্তিমত্তা ও যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার জ্বলজ্বলে প্রমাণ।

৯. দুশমনের ঘেরাও ভাঙার এবং ধাওয়া থেকে বাঁচার অভিজ্ঞতা :
দুশমনের দুর্ভেদ্য ঘেরাও ভেঙে ফেলা এবং তাদের আগ্রাসী ধাওয়া থেকে বেঁচে-ওঠা—এগুলো ছিল সুলতানের নিতান্ত বাঁ-হাতের খেল। জিহাদের মিশন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শত্রুদের ঘেরাওয়ের ভেতরেও তিনি পড়ে যেতেন। কিন্তু প্রতিবারই অত্যন্ত সফলভাবে সেই ঘেরাও ভেদ করে তিনি বেরিয়ে পড়তে পারতেন।

তারপর প্রতিবারই দুশমন তার পিছু লাগত, আর সুলতান যেভাবেই হোক তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এদিক-সেদিক কেটে পড়তে সক্ষম হতেন। এ-ধরনের পরিস্থিতির মধ্য থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসবার বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করে উঠেছিলেন সুলতান। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এই শাস্ত্রের ইমাম।

নোট : এসব ছাড়াও সুলতানের সৈনিক-জীবনের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ পর্যন্ত এই গ্রন্থের যে অধ্যায়গুলো গিয়েছে, সেখানে চিন্তা করে দেখলেই স্পষ্টভাবে সেগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এজন্য আমরা এখানে সেসব দৃষ্টান্তের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখকে বাহুল্য মনে করে পরিত্যাগ করছি।

রাষ্ট্র পরিচালনার ধরন

সুলতান জালালুদ্দীনের দশ বছরের শাসনকাল ছিল ক্রমাগত বিভিন্ন বিপদ-মুসিবত ও কষ্ট-ক্লেশের ভেতর দিয়ে সম্পন্ন-হওয়া এক অমর উপাখ্যান। এই দশ বছরের ভেতর একটিবারের জন্যও স্থির হয়ে বসবার সুযোগ মেলেনি তার। তিনি বিরামহীনভাবে কয়েক মাস যুদ্ধাভিযানে পরিব্যাপ্ত থাকতেন। তার সফর হতো খুবই দীর্ঘ। সেগুলোকে মাইল হিসেবে নয়, একেকটি শহরের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততার বিবেচনায় পরিমাপ করাই সুন্দর ও সমুচিত। তদুপরি এক মিশন থেকে ফারেগ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার অপেক্ষায় থাকত দ্বিতীয় কোনো রণক্ষেত্র। কখনোবা একই সময়ের মধ্যে ভেতরের ও বাইরের দু-দুটো শত্রুদলের মুখোমুখি হতে হতো তাকে।

তার শাসিত এলাকা তাতারদের হাতে একেবারে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। এই এলাকাগুলো পুনরায় আবাদ করে তোলার জন্য আবশ্যক ছিল যেসব আসবাবপত্র, তা সুলতানের হাতে কখনোই ছিল না। এই যখন অবস্থা, তখন সুলতানের জন্য খুবই মুশকিল ছিল জনসাধারণের সাফল্য, উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। তবু, এতসব সমস্যা সত্ত্বেও, সুলতানের উপর রাজ্য-চালনার যে কঠিন দায়ভার ছিল, তা পালন করা থেকে কোনো ক্ষেত্রেই তিনি

গাফেল ছিলেন না। যথাসাধ্য আমজনতার তাবৎ সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করে গেছেন। সুলতানের শাসনকার্যের ধরন কেমন ছিল, তার কিছু দিক নিচে উল্লেখ করছি।

নতুনভাবে শহর আবাদ

তাতারদের প্রথমদিকের আক্রমণে যেসব শহর ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো তিনি নতুনভাবে মেরামত করিয়েছিলেন। সুলতান এই শহরগুলোর চারপাশ থেকে ইটের শক্ত প্রাচীর নির্মাণ করে শহরগুলোকে নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। তাতারদের হাতে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল যে মারাগেহ, বিলকান, ইরবিল প্রভৃতি শহর, সুলতান সেগুলোকে তার নির্মাণের রুচি দিয়ে এমনভাবে গঠন করে তুলেছিলেন যে, এগুলোর চাকচিক্যের কাছে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন সব শহরের জাঁকজমকতা।[৩৮৪]

শিক্ষাদীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির আয়োজন, মাদরাসা ও খানকার আলোচনা

তখনকার দিনের রাজা-বাদশাহ, আমির-উমারা এবং নেককার লোকেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও খরচে মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করতেন। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে প্রতিষ্ঠানের নামে স্বতন্ত্র কিছু জায়গির ওয়াকফ করে দিতেন। এই ধরনের বড় বড় প্রোজেক্টগুলোর যাত্রা সরকারি খরচেই আরম্ভ হতো। সুলতান জালালুদ্দীনকে উপর্যুপরি বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল বলে শুরুর দিকের কয়েক বছরে রাষ্ট্রের এই শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ তিনি একেবারেই পাননি। তবু দেখতে পাই যে, তার শাসনকালের শেষ চার বছরে আবাদ হয়ে উঠেছিল নতুন অনেক মাদরাসা ও খানকা।

পিতা আলাউদ্দীনের ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে ইস্পাহান শহরে বড় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন সুলতান। এই মাদরাসার দেয়ালও ওঠানো হয়েছিল; কিন্তু তাতারদের শেষ আক্রমণের জন্য সুলতানের এই প্রকল্পটি পূর্ণতা পেতে পারেনি।[৩৮৫]

শামসুদ্দীন তাগরাই নামে তিবরিজের এক আমির তিবরিজ শহরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মাদরাসার পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়েছিল

---

[৩৮৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২২২, ইবনে আসির ৭/৬১৫, খাওয়ারিজম শাহি ১৬৮

[৩৮৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩১৩

কাজি ইজ্জুদ্দীন কাজবিনির উপর। কাজি সাহেব পাশাপাশি আরো কিছু মাদরাসার দেখভাল ও সেখানে পাঠদানের দায়িত্ব পালন করতেন।[৩৮৬] কিছু আমির খানকা খুলবার জন্যও আগ্রহী হয়েছিলেন। স্বয়ং নাসাবি তার খোরাসানের দুর্গে নির্মাণ করেছিলেন একটি খানকা। এই খানকার খাদ্যসংস্থান-সহ আর্থিক যত খাত ছিল, সেগুলোর ব্যবস্থাও তিনি করতেন।[৩৮৭]

ন্যায়বিচার

একজন সফল শাসকের জন্য তার মৌলিক গুণাবলি ও অবশ্য-কর্তব্যাবলির ভেতর ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের অবস্থান হল সবচেয়ে বড়। এই গুণে যে শাসক গুণান্বিত হবেন, তার শাসনকালে খুলে যাবে সাফল্য-নিরাপত্তা, আনন্দ-স্থিরতা ও নতুন নতুন নির্মাণ এবং উন্নতির সমস্ত দরজা। কিন্তু যেসব হতভাগ্য শাসক ক্ষমতার মসনদে বসে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে, ইতিহাসের পাতায় তার শাসনকাল কালো কুৎসিত একটি অধ্যায় হয়ে পড়ে থাকবে।

হিজরি সপ্তম শতকের সুলতান জালালুদ্দীনকে সেসব সৌভাগ্যবান ও সর্বোত্তম শাসকের মধ্যে গণ্য করতে পারি, ইতিহাসের জানালায় যাদের ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের সমুজ্জ্বল অধ্যায়গুলো জ্বলজ্বল করে উঁকি দিয়ে আছে। সুলতানের ন্যায়বিচারের কিছু উদাহরণ পেশ করা যাক :

১. সুলতান যখন তিবরিজ দখল করেছিলেন, তারও পূর্বের ঘটনা। তিনি তিবরিজের আমিরদের কাছে তার সৈন্যদলের খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তিবরিজ থেকে ক্রয় করার অনুমতি তলব করলেন। আমিররা তিবরিজ থেকে দ্রব্যাদি ক্রয়ের অনুমতি দিল। ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তিবরিজে শুরু হল খাওয়ারিজমি সৈন্যদের আসা-যাওয়া। তারা খুব সহজেই সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় রসদপাতি কিনে নিতে লাগল। কিছুদিন কেটে গেলে কিছু খাওয়ারিজমি সৈন্য শহরের ব্যবসায়ীদের সাথে খারাপ আচরণ করতে শুরু করে। কেনাকাটার নামে তিবরিজে এসে শুরু করে দেয় লুটপাট।

   সুলতানের কাছে খুব দ্রুতই এই অন্যায়ের অভিযোগ পৌঁছে যায়। তিনি সৈন্যদের এই কঠোরতা ও মাত্রাতিরিক্ত গর্হিত কর্ম বন্ধ করানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে তিবরিজে একজন অফিসার নিযুক্ত করেন। ঘোষণা করে দেন—কোনো সিপাহি যদি জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের মালপত্রে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে, তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

---

[৩৮৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ২০৮

[৩৮৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৪৩

এই হুকুমের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বার সাথে সাথে বদ সিপাহিদের কান খাড়া হয়ে ওঠে। তারপর আর কখনো তারা কোনোধরনের অপতৎপরতা চালাবার হিম্মত করে ওঠেনি।[৩৮৮]

২. সুলতানের তিবরিজ জয়ের পর সেখানকার পলাতক শাসক উজবুক ইবনে বাহলোয়ান একটি দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করেছিল। সেই দুর্গ যখন সুলতানের সৈন্যরা অবরোধ করে, আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় তারা আরম্ভ করে লুটতরাজ। উজবুক এই চিত্রপট দেখে দ্রুত সুলতানের কাছে চিঠি পাঠায়—আপনার সৈন্যদের এই অনৈতিক কাজ বন্ধ করতে বলুন।

সুলতান কোনো কিছু না-ভেবেই প্রতিপক্ষের এই বৈধ আবেদন সাথে সাথে মঞ্জুর করে নেন। তাৎক্ষণিক হুকুম জারি করে তিনি থামিয়ে দেন সৈন্যদের এই অনৈতিক আচরণ।[৩৮৯]

৩. সুলতান জালালুদ্দীনের উজিরে আজম শারফুল মুলক চরিত্রগতভাবে ছিল অতি লোভীপ্রকৃতির লোক। সে সুলতানের অজ্ঞাতে আমজনতার উপর অবৈধ ট্যাক্স চাপিয়ে তাদের নানাভাবে নিপীড়ন করতে শুরু করেছিল। ৬২৪-৬২৫ হিজরিতে তাতার-বিরোধী জিহাদে সুলতান খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য অভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়ের পরিচালনার দায়িত্ব সোপর্দ করেছিলেন উজিরে আজম শারফুল মুলকের কাঁধে। এই দীর্ঘ সময়ে আমজনতার থেকে খুব বেশি অর্থ লুট করেছিল উজিরে আজম। তারপর এক সময় যখন সুলতান তিবরিজে ফিরে এলেন, তখন সারা শহর নিশ্চুপ-নিস্তব্ধ দেখে তিনি হয়রান হয়ে গেলেন। সুলতান অবাক কণ্ঠে শহরের মান্যবর লোকদের জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে? এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার কী কারণ?

তারা বলল—উজিরে আজমের পক্ষ থেকে আমজনতার উপর সহ্যাতীত ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়ে পড়েছে শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা।

শহরের মান্যবর লোকেরা যখন সুলতানের কাছে জনসাধারণের এই যাতনার কথা জানাচ্ছিল, প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে উঠছিল সুলতানের চোখমুখ। জনসাধারণের অসহনীয় দুঃখযাতনার মাত্রা গভীরভাবে অনুভব করে উঠলেন তিনি। তার এই অনুশোচনাও জাগতে লাগল যে, এখানকার এই অবস্থা সম্পর্কে এতদিন আমি কেন জানতে পারিনি?

---

[৩৮৮] ইবনে আসির ৭/৬১৬

[৩৮৯] ইবনে আসির ৭/৬১৯

শেষমেশ সুলতান হুকুম দিলেন—তিবরিজ থেকে যারা বেরিয়ে গেছে, তাদের শিগগির নিজ নিজ ঘরবাড়িতে ফিরিয়ে আনা হোক। নিজেদের বাসস্থানে আবার তাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেওয়া হোক। আগামী ৩ বছর পর্যন্ত শহরবাসীকে অবশ্যপালনীয় সরকারি বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। তারা সবাই নিশ্চিন্তে অবস্থান করুক।[৩৯০]

খরচের ধরন

সুলতান জালালুদ্দীন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন একটি বিধ্বস্ত রাজ্য। এজন্য তার রাজকোষে জমা ছিল না স্বর্ণ-রৌপ্যের বিপুল ভান্ডার। তার অনর্থক খাতে সীমাতিরিক্ত অর্থ ব্যয়েরও অভ্যাস ছিল না। কিন্তু তিনি ক্ষেত্র-মহলে খরচ করতে একটুও কৃপণতা করতেন না। বিশেষত, যুদ্ধের মিশন বাস্তবায়নের কাজে তিনি সর্বদা অত্যন্ত প্রশস্ত মনে অর্থব্যয় করতেন। বরং, কখনো এমনও হতো—তার দানশীলতা পেরিয়ে যেত সতর্কতা-অবলম্বনের পরিসীমাও। উদারচিত্তে দান কেবল করতেই থাকতেন।

যখন খিলাত অবরোধ করেছিলেন, সে সময়কার কথা। একরাতে সুলতানের কাছে এক বুড়ি এসে উপস্থিত হল। বয়সের ভারে বুড়ির পিঠ প্রায় নুয়ে পড়েছে। বিরতিহীনভাবে চোখের পলক পড়তে থাকে। চেহারার চামড়া কুঞ্চিত। বুড়ি মাথা নেড়ে নেড়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল—আমাকে আল-মালিকুল আশরাফের কাতেব জকি আজমি পাঠিয়েছে। আপনি যদি জকি আজমিকে ৫ হাজার দিনার প্রদান করেন, সে রক্ষীবাহিনীকে রাজি করিয়ে নগর-প্রাচীরের ফটক খুলে দেবে।

এ কথা শুনে সুলতানের লেখক আহমাদ আন-নাসাবি সুলতানকে বলে উঠলেন—সুলতান, পুরো একটি শহর সোপর্দ করে দেবার বিনিময়ে মাত্র ৫ হাজার দিনার কেউ চাইতে পারে না। বিষয়টা যুক্তিতে ধরছে না। নিশ্চয় বুড়ি মিথ্যা বলছে। ওকে কিছু না দিলেই বরং ভালো। বিদেয় করে দিন।

আহমাদ আন-নাসাবির কথা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য ছিল। কিন্তু সুলতান বললেন—এখন বায়না হিসেবে ওকে ১ হাজার দিনার দিই। এতে আমি কোনো সমস্যা দেখছি না। বুড়ির বর্ণনা যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তা হলে বাকি অর্থ পরে আদায় করে দেব।

বুড়ি সুলতানের থেকে ১ হাজার দিনার উসুল করে চলে গেল। কিন্তু পরবর্তীতে আহমাদ নাসাবির কথাই সঠিক প্রমাণিত হল। না শহরের ফটক খোলা হল, না মিলল বুড়ির কোনো খোঁজ। সুলতান এই লোকসান বরদাশত করবার

---

[৩৯০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৮১-২৮২, খাওয়ারিজম শাহি ১৫৮

জন্য প্রথম থেকেই তৈরি ছিলেন। ১ হাজার দিনার নষ্ট হয়ে যাবে বলে তার মনে একটা শঙ্কাও জেগেছিল। তবু তিনি বুড়ির ঝুলি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে সুলতান যখন শহর জয় করে নিলেন, তখন শহরের এক কোণে দেখা মিলল সেই বুড়ির। বুড়ি ততক্ষণে ১ হাজার দিনার থেকে ৩০০ দিনার খরচ করে ফেলেছে।[৩৯১]

ক্ষমাশীলতা

সুলতান জালালুদ্দীনের আরেকটি নিরুপম গুণ ছিল ক্ষমাশীলতা। তার পুরো জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যেগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নিজের জঘন্য শত্রুদের ক্ষমা করে দেওয়ার মতো হিম্মতও তিনি রাখতেন। ঈমানের এবং চরিত্রের অধঃপতনের সেই যুগে সুলতানের চরিত্র ছিল সমুন্নত, নিষ্কলুষ। একারণেই শ্রেষ্ঠত্বে সমকালীন বহু শাসককে তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সুলতানের ক্ষমা ও উদারতার কিছু দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন :

১. বুরাক হাজিব ছিল খাওয়ারিজমি দরবারের এক দুরাচারী ধুরন্ধর সদস্য। খাওয়ারিজমি খানদানের শেকড় কেটে দেবার কোনো সুযোগই সে হাতছাড়া করত না। কিন্তু যতবারই সুলতান তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইতেন, ততবারই সে অনুতপ্ত হয়ে নিজের অপারগতা প্রকাশ করত। আর সুলতান জালালুদ্দীন প্রতিবাই তাকে ক্ষমা করে দিতেন।

   একবার বুরাকের অবাধ্যতাকে ধূলিসাৎ করে দিতে জর্জিয়া থেকে কিরমান পর্যন্ত ১৭ দিনের বিরামহীন সফরও সুলতানকে করতে হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ দূরত্ব পাড়ি দেওয়া এবং সীমাহীন কষ্ট সহ্য করার পর বুরাক হাজিবের ঘাড় চেপে ধরবার সুযোগ যখন এল, তখনই সে ক্ষমা চেয়ে নিল। কিন্তু সুলতান আর কী করবেন, সফরের অবর্ণনীয় কষ্টের কথা মনে না রেখে প্রশস্তচিত্তে বুরাককে ক্ষমা করে দিলেন।

২. বাগদাদের খলিফার সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ বাধার পর, বাগদাদি বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করেছিল ইরবিলের হাকিম মুজাফফর উদ্দীন কোকোবরা। সে সুলতানের সিপাহিদের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল। তখন স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে নিজের কর্মকাণ্ডের দরুন সুলতানের পক্ষ থেকে নমনীয় আচরণপ্রাপ্তির আশা করতে পারত না। কিন্তু সুলতানের সামনে যখন তাকে পেশ করা হল, সুলতান তার ভুলই শুধু ক্ষমা করলেন না; বরং

---

[৩৯১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩১৩-৩১৪, খাওয়ারিজম শাহি ১৯১-১৯২

তার সাথে তিনি খুবই সম্মানজনক আচরণ দেখালেন। এজন্য সুলতানের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল মুজাফফর উদ্দীন।

৩. সুলতান জালালুদ্দীনের উজিরে আজম শারফুল মুলক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুলতানের মেজাজের বিপরীত মনগড়াভাবে অপতৎপরতা চালিয়ে গেছে। উজিরের অপরাধ এতটাই কঠিন ছিল যে, সাধারণত অন্যকোনো শাসক হলে তাকে আর এক মুহূর্তও ছাড় দিত না। তার সাহস মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। নিজের বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় সুলতানকে যা-তা বলে ফেলত সে। সুলতান দীর্ঘদিন ধরে তার এই আচরণ সহ্যই করে যাচ্ছিলেন। শেষমেশ ব্যাপারটা যখন একেবারে সীমা অতিক্রম করে গেল, তখন সুলতান উজিরের এই কুকর্মের দিকে মনোনিবেশ করলেন। ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল উজিরে আজমের চেহারা। সে হাতে কাফন নিয়ে সুলতানের পায়ের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সুলতানের বড় মায়া হয়ে গেল। কেমন দ্রবীভূত হয়ে উঠল তার মন। তিনি এই চরিত্রহীন লোকের অপরাধ থাকা সত্ত্বেও কিছুই করেননি। জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে শুধু নজরবন্দি করেই ক্ষান্ত দিয়েছিলেন। (কিন্তু বড় আফসোসের কথা—এরপরেও উজিরে আজম সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে এবং শেষমেশ পৌঁছেছে স্বীয় পরিণতির দোরগোড়ায়)।

৪. এইরকম একটি ঘটনা সিদিস্তান (সিস্তন, সিন্ধ) আক্রমণের সময়ও ঘটেছিল। সিদিস্তানের শাসক পরাজিত হয়ে হাতের মধ্যে ভাঁজ-করা একটি কাফন এবং কাফনের উপর আড়াআড়িভাবে শোয়ানো একটি তরবারি নিয়ে সুলতানের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন সুলতান তাকে শুধু ক্ষমাই করেননি, বরং তাকে তার পূর্বের শাসন-ক্ষমতা বহালও রেখেছিলেন।

৫. সুলতান জালালুদ্দীনের সৎভাই গিয়াসুদ্দীন সুলতানের ক্ষমতা নিয়ে শক্ত মনঃক্ষুণ্ণ ছিল। সে সুলতানকে পরাজিত করবার স্বপ্ন দেখত। এজন্য সে একদিন সুলতানের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করতে মাঠে নেমে এল। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়ে গ্রেফতার হল।

আরেকবার তাতারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত একটি যুদ্ধে সুলতানকে সে কঠিন সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। যুদ্ধের আসল মুহূর্তে ময়দান ছেড়ে ভেগে গিয়েছিল। আলামুতের হাকিমের কাছে গিয়ে গ্রহণ করেছিল আশ্রয়। পরবর্তীতে আলামুতের শাসক সুলতানের কাছে পত্র পাঠিয়ে গিয়াসুদ্দীনের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিল। সুলতানের মনে যদিও গিয়াসুদ্দীনের প্রতি দানা বেঁধেছিল শক্ত অসন্তোষ, কিন্তু সে-বারও মায়া করে সুলতান তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

৬. সুলতান জালালুদ্দীন যখন খিলাত অবরোধে ব্যস্ত ছিলেন, তখন খিলাতে অবরুদ্ধ সুলতানের কঠিন শত্রু মুজিরুদ্দীন বিন আল-মালিকুল আদিল (আল-আশরাফের ভাই) প্রাচীরের চূড়ায় উঠে অশ্রাব্য ভাষায় সুলতানকে গালিগালাজ করতে থাকে। তা শুনে ক্রোধে ছলকে উঠতে থাকে সুলতানের সিপাহিদের রক্ত। কিন্তু সুলতান এসব গালির কোনো জবাব দেননি। শহর যখন বিজিত হয়ে গেল, তখন বন্দিদের মধ্যে ছিল মুজিরুদ্দীনও। তাকে সুলতানের দরবারে পেশ করা হল।

লোকেরা ধারণা করে নিয়েছিল যে, এখন নির্দেশ দেওয়া হবে মুজিরুদ্দীনের গর্দান উড়িয়ে দেবার। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন তার সাথে খুব মিষ্টি আচরণ করেছিলেন। ক্ষমা করে দিয়েছিলেন মুজিরুদ্দীনের সমস্ত কুকর্ম। তখন সুলতানের এই উত্তম চরিত্রে খুবই প্রভাবিত হয় মুজিরুদ্দীন। তারপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে সুলতানের খেদমতে নিয়োজিত ছিল। ভাই আল-মালিকুল আশরাফকেও সুলতানের সঙ্গে থাকার জন্য খুব জোরাজুরি করেছে।[৩৯২]

এই কাজের মাধ্যমে সে সুলতানের উত্তম আচরণের প্রতিদান দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু আফসোস, আল-মালিকুল আশরাফ তার ভাইয়ের কথায় সম্মত হননি। তবু, সুলতানের অনুগ্রহপ্রাপ্তির প্রমাণ মুজিরুদ্দীন অবশ্যই পেশ করে গেছে।

৭. তাতারদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে একদা চেঙ্গিজ খানের পরিবারের এক শাহজাদা সুলতানের হাতে বন্দি হয়ে পড়েছিল। তাতারদের সাথে কঠিন শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও, এই শাহজাদার সাথে সুলতান ইসলামি আখলাক অনুযায়ী মহোত্তম আচরণ দেখিয়েছিলেন। তাতার শাহজাদাকে তিনি সম্মানের সাথে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সুলতান যে কী পরিমাণ উদারচিত্ত ছিলেন, এই ঘটনা বর্ণনা করে আল্লামা ইবনুল আসির তার প্রমাণ পেশ করেছেন।

অকৃত্রিমতা ও সাদাসিধে মনোভাব

সুলতান জালালুদ্দীনের চরিত্র ছিল কৃত্রিমতামুক্ত, স্বচ্ছ, নিষ্কলুষ। এমন বহু বিষয়কে মানুষ সাধারণত রাজা-বাদশাহদের কাজের বিপরীত মনে করত, সুলতানের কাছে তা কোনো লজ্জার বিষয় ছিল না। তার পুরো জীবন ছিল অকৃত্রিমতা, সাদাসিধে হালচাল ও সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল ছায়াচিত্র। এক্ষেত্রে পাঠকদের জন্য দুটো উদাহরণ দেওয়ার লোভ আমি সামলাতে পারছি না :

১. তিবরিজ বিজয়ের পর সুলতানকে শহরের আমিররা সাবেক শাসক উজবুক মুজাফফরের সুউচ্চ রাজমহলে নিয়ে গেল। এই মহল ছিল জাদুকরী সৌন্দর্য,

---

[৩৯২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৫৫, খাওয়ারিজম শাহি ১৯৪-১৯৫, ২২৪

অনন্য সৌকর্য, চাকচিক্য ও পূর্ণ শাস্ত্রীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে নির্মিত প্রাসাদের এক অতুল্য নমুনা। সুলতান কিছুক্ষণ ভেতরের চারপাশটা ঘুরেফিরে দেখলেন। উপস্থিত লোকেরা ভাবছিল, সুলতান বুঝি এখানেই অবস্থান করবেন। কিন্তু অকস্মাৎ সুলতান একথা বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এলেন যে, এটি তো হচ্ছে বিলাসী লোকদের আবাস। এই প্রাসাদে অবস্থান করা আমার জন্য মুনাসিব নয়।[৩৯৩]

২. আট মাস ধরে চলমান খিলাত অবরোধকালের ঘটনা। সুদীর্ঘ অবরোধের ভেতর পড়ে অসহ্য যাতনায় খিলাতবাসী উশখুশ করতে শুরু করেছিল। আক্ষরিক অর্থেই ঘাম ছুটে গিয়েছিল সবার। দিন-দিন কঠিন হয়ে-ওঠা পরিস্থিতি আর সওয়া যাচ্ছিল না। সে-সময় একদিন হাকিম মুজিরুদ্দীন ইবনে আল-মালিকুল আদিল বড় অসহিষ্ণু হয়ে প্রাচীরের চূড়ায় গিয়ে উঠে দাঁড়াল। সেই উচ্চতা থেকে সুদূর নিচের দিকে তাকিয়ে সুলতান জালালুদ্দীনকে সম্বোধন করে সে বলল—দেখুন, এইবার বিপদের চূড়ান্ত ঘটেছে আমাদের। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি তো দেখতেই পাচ্ছেন। লড়তে লড়তে দুই পক্ষই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা বলুন, আপনার কি হিম্মত আছে, একলা এসে আমার সাথে সামনা-সামনি মোকাবেলা করার? এই মোকাবেলায় আমি-আপনি যে-ই জিতি, সেই ভিত্তিতে দুই পক্ষের হার-জিত নির্ধারণ করা হবে। আছে সেই হিম্মত আপনার?'

মুজিরুদ্দীন 'আছে সেই হিম্মত আপনার' হুংকারটা পূর্বোক্ত কথাগুলোর চাইতে বিকট জোরে হেঁকে উঠল। সেই হুংকার বাতাসে ভেসে দূরের পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা খেল। বারবার তাতে অনুরণিত হয়ে উঠতে লাগল—'আছে সেই হিম্মত? আছে সেই হিম্মত...?'

নিতান্ত সাধারণ এক প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে ছুড়ে দেওয়া এমন প্রস্তাব গ্রহণ করাকে রাজকীয় গাম্ভীর্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মনে করত খাওয়ারিজমিগণ। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন। প্রাচীরের চূড়ার দিকে চোখ তুলে খানিক মুচকি হাসি নিয়ে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—বোলো, কব ক্যরনা হ্যায় মোকাবেলা?'

মুজিরুদ্দীন চিৎকার করে জানাল—কাল সকালবেলা!

পরদিন সকালে হাতিয়ার নিয়ে সুলতান জালালুদ্দীন যখন মোকাবেলার জন্য বেরোতে যাচ্ছেন, তখনই সাম্রাজ্যের আমিরগণ, যারা এই 'ব্যক্তিযুদ্ধ'কে খাওয়ারিজমি সিংহাসনের জন্য সরাসরি অপমান বলে মনে করছিল, সুলতানের মাঝপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

---

[৩৯৩] ইবনে আসির ৭/৬১৬

উজিরে আজম শারফুল মুলক এগিয়ে এসে তর্কের গলায় বলতে লাগল—আপনি এই লোকের সাথে মোকাবেলা করতে কী করে সম্মত হয়ে উঠলেন, যে কোনোভাবেই আপনার সমমানের নয়? ও তো বরং আপনার একজন সেবায়েতের সমান হবে, এর বেশি কিছু না। তবু আমাদের যদি একিন হতো—ওর সাথে আপনি জয়ী হতে পারলেই খিলাত শহর বিজিত হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করা হবে, তা হলে চুপ থাকতাম। কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, এমন কিছু হবে না। এই লোক কখনো শহর হস্তান্তর করবে না।

সুলতান উজিরে আজমের কথার কোনো প্রতিক্রিয়া গায়ে মাখলেন না। তিনি বললেন—আমি সবই জানি। কিন্তু যেচে কেউ লড়তে আসছে আর আমি পিছিয়ে থাকব, এ কী করে সম্ভব! প্রতিদ্বন্দ্বী যখন শক্ত আওয়াজ লাগিয়েছে—'হ্যাঁয় কোই ল্যড়নেওয়ালে?' আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি, বলো?

এই বলে সুলতান একাই, লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে একছুটে শহরের বাদলিস ফটকের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। লড়াইয়ের জন্য এই জায়গাটাই নির্ধারণ করা হয়েছিল গতকাল।

মুজিরুদ্দীন যখন দেখল, সুলতান বাস্তবেই তরবারি হাতে প্রাচীরের সামনে এসে আজ উপস্থিত, তখন তার সর্বাঙ্গে শুরু হয়ে গেল কম্পন।

সুলতানকে একটুখানি রাগিয়ে তোলার জন্যই কেবল এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল সে। আশা করেনি যে, বাস্তবেই লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবেন সুলতান। তাই মুজিরুদ্দীন নিজে আর সামনে এগোল না। শহর থেকে কিছু সিপাহিকে ডাকিয়ে এনে প্রাচীরের উপর দাঁড় করিয়ে দিল।

সিপাহিরা এসে সুলতানকে লক্ষ করে উপর থেকে একের পর এক তির ছুড়তে লাগল। সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে তাকে রাগাতে চেষ্টা করল। সুলতান মুজিরুদ্দীনের আগমনের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর সেখান থেকে চলে এলেন।[৩৯৪]

এই ঘটনায় আমরা যেমন সুলতানের অকৃত্রিমতা ও সাদাসিধে মনোভাবের একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠতে দেখি, তদ্রূপ তার সাহসিকতা, সহনশীলতা ও ধৈর্য-স্থৈর্যেরও খানিক আন্দাজ লাগাতে পারি।

অনর্থ কর্ম থেকে বিরত থাকা : কল্যাণকর কাজে যুক্ত হওয়া

সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উন্নত ও মহৎ কাজকর্মের ভেতর দিয়ে কেটেছে। তিনি ফালতু রঙ-তামাশা, বিলাসিতা, উদ্ভট ও অনর্থক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থেকেছেন সারা জীবন। তিনি যে উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করেছেন,

---

[৩৯৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩১৩, খাওয়ারিজম শাহি ১৯১

সে জীবনে ফালতু কর্মকাণ্ডের অনুপ্রবেশের কোনো সুযোগ ছিল না। তবে, কখনো মানসিক রিফ্রেশমেন্টের জন্য শিকার কিংবা পোলো-খেলার মতো স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী খেলাগুলোয় অংশগ্রহণ করতেন।

ভুল সংশোধনের চেষ্টা

প্রকৃতপক্ষে মানুষমাত্রই ভুল করার একটি যন্ত্র। ভুলবিচ্যুতি ঘটাবার মতো প্রবণতা তার মজ্জাগত বিষয়। তবে এ অবশ্য ঠিক যে, আল্লাহর নেক বান্দাগণ তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠতেই তা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে ফেলেন নিজেদের। ভুল স্বীকার করে নিয়ে প্রচণ্ড অনুতপ্ত বোধ করেন, চেষ্টা চালান ভুলের ক্ষমাগ্রহণের কিংবা ক্ষতিপূরণের। কিন্তু, ফাসেক ও নাফরমান শ্রেণির লোকেরা সবকিছু জেনে-শুনেও, শেষ পর্যন্ত নিজেদের পাপাচারই আঁকড়ে থাকে। অনুশোচিত হওয়া তো দূরের কথা, দম্ভের সাথে লেগে থাকে তারা নিজেদের সেই কুকর্মে।

সুলতান প্রথমোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কখনো নিজের ভুল হচ্ছে জানতে পারলেই তা থেকে ফিরে আসাকে তিনি অবমাননাকর মনে করতেন না। কালাবর্তের কাছে পরাজিত হয়ে অনেকবারই তিনি ভারসাম্য ও ন্যায়-ইনসাফের প্রতি লক্ষ রাখার ক্ষেত্রে ভুলচুক ঘটিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু নিজের ভুল সম্পর্কে সতর্ক হয়ে ওঠার সাথে সাথে সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে তিনি বিষয়গুলো সংশোধনও করে নিয়েছিলেন। তিবরিজ বিজয়ের পর সুলতান জালালুদ্দীন যখন জর্জিয়ার যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত ছিলেন, উজিরে আজম শারফুল মুলক তখন সংবাদ পাঠিয়েছিল—তিবরিজের হাকিম নেজামুদ্দীন তাগরাই ও তার চাচা শামসুদ্দীন তাগরাই বিদ্রোহের চক্রান্ত আঁটছে।

আহমাদ আন-নাসাবি বর্ণনা করেন—এটি ছিল স্পষ্ট অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ। হাকিম শামসুদ্দীন তাগরাই অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ, পরহেজগার ও আমানতদার ছিলেন। তিনি কারুর কুমন্ত্রণা গ্রহণ করতেন না। রাজ্য-পরিচালনার ক্ষেত্রে কারুর কোনো সুপারিশে হতেন না বিন্দুমাত্র প্রভাবিত। উজিরে আজম শারফুল মুলকের নায়েবরা তখন আমজনতার উপর খুব কঠোরতা আরোপ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তারা হাকিম শামসুদ্দীন তাগরাইয়ের এই নিষ্ঠতার কারণে হারামপন্থায় লোকদের সম্পত্তি লুটপাট করা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তারা ক্রোধান্বিত হয়ে নেজামুদ্দীন ও শামসুদ্দীনের বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্ত ফাঁদে। তৈরি করে কিছু মিথ্যা সাক্ষী। আর উজিরে আজমের মাধ্যমে কান ভারী করে তোলে সুলতানের।

একারণে পেরেশান হয়ে সুলতানকে দ্রুত জর্জিয়া থেকে তিবরিজে আসতে হয়েছিল। তারপর চক্রান্তকারীরা সুলতানের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানের মাধ্যমে

নেজামুদ্দীন ও শামসুদ্দীনের অপরাধ সত্য বলে আখ্যা দেয়। সুলতান তখন বিদ্রোহের সাজা হিসেবে তিবরিজের হাকিম নেজামুদ্দীনকে হত্যা করে তার লাশ রাজপথে নিক্ষেপ করান। আর, তার চাচা শামসুদ্দীনের উপর জরিমানা হিসেবে ১ লক্ষ দিনার চাপিয়ে দিয়ে তাকে জেলখানায় পুরে রাখেন।

কিছুকাল পরে শামসুদ্দীন তাগরাইকে মারাগেহ শহরের জেলখানায় স্থানান্তর করা হয়। এদিকে উজিরে আজমের মনে দানা বেঁধে ওঠে শঙ্কা—সুলতানের সামনে শামসুদ্দীন যদি কখনো প্রকৃত বাস্তবতা খুলে বলবার সুযোগ পেয়ে যায় তা হলে অবস্থা ভয়ংকর হয়ে উঠবে। তাই সে শামসুদ্দীনকে হত্যা করে ফেলার জন্য ক্রমাগত সুলতানকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। শেষমেশ সুলতানের সিল-স্বাক্ষরসংবলিত একটি হত্যার পরোয়ানা হস্তগত হয় তার। হত্যার এই হুকুমনামা সে মারাগেহ শহরের শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাকে মেরে ফেলতে পারে এমন কেউ নেই। শামসুদ্দীন তাগরাই যে নির্দোষ, সে সম্পর্কে মারাগেহ শহরের হাকিম আগে থেকেই অবগত ছিলেন।

তিনি একজন বেকসুর মানুষের রক্তে হাত রঞ্জিত করতে চাইলেন না। বরং, শামসুদ্দীনকে দেশান্তরিত করবার জন্য ইচ্ছে করে জেলখানা থেকে বের করে দিলেন। তারপর মারাগেহ শহরের হাকিম ও শামসুদ্দীন—একসঙ্গে দুজনই দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়া নিয়ে রাতারাতি সুলতানের রাজ্য-সীমা থেকে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে যান ইরবিল, তারপর সেখান থেকে সরাসরি পৌঁছে যান বাগদাদ। এর ২ বছর পর শামসুদ্দীন তাগরাই হজের নিয়তে রওনা হয়ে যান মক্কা মুওয়াজ্জমায়।

হজের মৌসুমে সারা পৃথিবী থেকে হাজিদের বিভিন্ন কাফেলা গিয়ে একের-পর-এক মক্কায় পৌঁছতে থাকে। সেই কাফেলাগুলোর মধ্যে তিবরিজ থেকে আগত একটি কাফেলাও ছিল। হজের সময় লোকেরা মসজিদুল হারামে নামাজ আদায় করে যখন ফারেগ হল, শামসুদ্দীন তাদের সামনে বাবে রহমতের নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন। কুরআন মাজিদের একটি নোসখা মাথার উপর তুলে ধরে উচ্চকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন—'হে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান, আমার নাম শামসুদ্দীন তাগরাই। আমি তিবরিজের বাসিন্দা। আমি এই পবিত্র শহরের এমন পবিত্র ইবাদতখানায় দাঁড়িয়েছি, যার চাইতে অধিক সম্মানিত কোনো ইবাদতখানা নেই। আর আজকের দিনটি হচ্ছে সেই দিন, যার চাইতে অধিক বরকতময় কোনো দিন নেই। আমার হাতে রয়েছে সেই কিতাব, যার চাইতে অধিক পবিত্র কোনো গ্রন্থ নেই। আমি আপনাদের সম্মুখে এই পবিত্র ইবাদতখানায়, এই পবিত্র দিনে, এই পবিত্র গ্রন্থ হাতে নিয়ে কসম খেয়ে বলছি—উজিরে আজম শারফুল মুলক আমার উপর যে অপরাধ আরোপ করেছিলেন, তা পুরোপুরি মিথ্যা। সেই অপরাধ থেকে

আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। আমার এই জবানবন্দি যদি মিথ্যে হয়ে থাকে, তা হলে মহান আল্লাহ যেন আমাকে হালাক করে দেন।'

মক্কায় আগত তিবরিজের হাজিরা শামসুদ্দীনের এই শপথ-সংবলিত বক্তব্য শুনতে পান। ফিরে এসে হাজি-কাফেলার আমির সুলতান জালালুদ্দীনকে শোনান পুরো ঘটনা। এই নির্মম সংবাদ শোনামাত্র আমূল কেঁপে ওঠেন সুলতান। তাৎক্ষণিকভাবে শামসুদ্দীনকে ফিরিয়ে আনতে মক্কায় লোক পাঠান। তারপর তার থেকে তিবরিজের যে হুকুমত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সুলতান তার অতিরঞ্জনের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দ্বিতীয়বার তা শামসুদ্দীনের হাতে সোপর্দ করেন।[৩৯৫]

বড়দের আনুগত্য

সুলতান জালালুদ্দীনের আরেকটি দারুণ বৈশিষ্ট্য ছিল আনুগত্য ও হুকুমপালন। বাল্যকাল থেকে তিনি পিতামাতার পূর্ণ আনুগত্যের যে আদর্শ নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন, বড়দের সামনেও তা সর্বদা সঠিকভাবে পালন করে গেছেন। পিতা আলাউদ্দীনের উত্থানকালেই না শুধু, পতনকালেও তিনি তার পূর্ণ আনুগত্য করেছেন। তুর্কান খাতুনের জোরাজুরিতে খাওয়ারিজম শাহ যখন নীতিবিরুদ্ধ পন্থায় সুলতানের ছোটভাই কুতুবুদ্দীন আযলাককে অলি আহাদ বানিয়েছিলেন, সুলতানের মুখে তখনো তর্কের কোনো শব্দ ফুটে উঠতে দেখা যায়নি। তিনি বরং পূর্বের মতোই প্রতিটি ক্ষেত্রে পিতার খেদমত ও আনুগত্যে নিমগ্ন থেকেছিলেন।

আলাউদ্দীনের পতনকালেও সুলতান জালালুদ্দীনের বিশ্বস্ততায় কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায়নি। ইচ্ছা করলে পিতাকে তখন দুর্বল দেখে বিদ্রোহ করে নিজের স্থলাভিষিক্ততার অধিকার আদায় করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি একমুহূর্তের জন্যও এই ঘৃণ্য ইচ্ছা মনের ভেতর উদয় হতে দেননি।

তাতারদের আক্রমণের পর আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ প্রাণ বাঁচাবার জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। সেই কঠিন সময়েও পিতার সঙ্গে বাধ্য ও অনুগত পুত্রের মতো ছিলেন সুলতান। যদিও সেই পরিস্থিতির প্রতি তিনি শক্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবং আদব-সীমার ভেতরে থেকেই পিতাকে বারবার বোঝাচ্ছিলেন—আমাদের জন্য এই পলায়নপর জীবন যাপন করে যাওয়ার কোনো বৈধতা নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবাকে যখন তার কথায় সম্মত করে তুলতে পারেননি, তখন পূর্ব থেকে পশ্চিমে এই নিরর্থক সফরে তিনি বাবার বাহু হয়েই আঁকড়ে থেকেছেন।

---

[৩৯৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২০২-২০৪; খাওয়ারিজম শাহি ১৬০; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭০-৩৭১

মাহমুদ গজনবির মাজার খুঁড়ে তার হাড্ডিগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে ছাইভস্ম করে ফেলেছিল।

আন-নাসাবি যে শঙ্কিত হয়েছিলেন, পরবর্তীতে খুব বেশিদিন কাটেনি, তার সেই শঙ্কাই সঠিক সাব্যস্ত হয়েছিল। তখনো ইস্পাহানের মাকবারা ও মাদরাসা ছিল নির্মাণাধীন। এর মধ্যেই ওলটপালট হয়ে গেল সুলতান জালালুদ্দীনের রাজ্যের তাবৎ শৃঙ্খলা। আর খাওয়ারিজম শাহের লাশ সেই আর্ধান দুর্গেই প্রোথিত হয়ে রইল। কিন্তু এখানেও শাহের বেশিদিন থাকবার ভাগ্য হল না। সুলতান জালালুদ্দীনের অন্তর্ধানের কিছুদিন পরেই তাতাররা আর্ধান অবরোধের মাধ্যমে দখল করে নিল। সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের প্রোথিত অবশিষ্ট মরদেহ উদ্ধার করে তারা উকতাই খানের কাছে পাঠিয়ে দিল। উকতাই খাওয়ারিজম শাহের হাড়গোড় জ্বালিয়ে ছাইগুলো উড়িয়ে দিল বাতাসে।[৩৯৭]

খলিফাকে দেওয়া সম্মান

সুলতান জালালুদ্দীন ছিলেন পুরো মুসলিমবিশ্বের ঐক্যবদ্ধতার অতুলনীয় স্বপ্নদ্রষ্টা। উম্মাহর ঐক্যবদ্ধতার প্রাণকেন্দ্র খেলাফতে বাগদাদকে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের যুগে খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ ও খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য পরস্পরে শত্রু হয়ে গিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন দুদিকের এই দ্বন্দ্ব নিঃশেষ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তবে খলিফা নাসিরের যুগে যে তার চেষ্টা সফল হয়ে ওঠেনি, সেটা ভিন্ন আলাপ। এর প্রধান কারণ ছিল স্বয়ং খলিফার মনের বিদ্বেষ ও খাওয়ারিজমি শাসকদের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব।

এ কারণেই, হিন্দুস্থান থেকে ফিরে এসে সুলতান জালালুদ্দীন যখন খেলাফতের দরবারে হাজিরি দেওয়ার জন্য বাগদাদের উদ্দেশে সফর শুরু করেছিলেন, তখন খলিফা নাসির সন্ধিচুক্তির জন্য প্রেরিত সুলতানের চিঠির প্রতিউত্তরে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন বড় একটি বাহিনী।

তখন নিরুপায় সুলতানকে নিজের প্রতিরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে তরবারি ওঠাতেই হয়েছিল। এ যুদ্ধের পর আরো বেশি খারাপ হয়ে গিয়েছিল দুদিকের সম্পর্ক। সুলতানও কিছুকাল নাগাদ খলিফার বিরুদ্ধে পুষে রেখেছিলেন ক্রোধ। তবে খুব শিগগিরই তিনি আবেগের লাগাম টেনে ধরেছিলেন। নতুন করে আরম্ভ করেছিলেন সম্পর্ক সুন্দর করে তুলবার প্রচেষ্টা। তার এই প্রচেষ্টা খলিফা নাসিরের মৃত্যু অবধি অব্যাহত ছিল।

---

[৩৯৭] আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ১৪১, খাওয়ারিজম শাহি ১৯০-১৯১, জাহাঁকুশা ২/১১৭

তিনি খলিফার নামে লিখিত চিঠিপত্রে নিজের নামটি এভাবে লিখতেন—'পিতৃসম আনুগত্যকারী খাদেম মুনকাবিরাতি ইবনে সুলতান সানজার।'[৩৯৮]

এতটুকুই শুধু নয়; বরং খেলাফত পদের সম্মান দেখাতে গিয়ে সুলতানের কিছু অভ্যাস যেন একেবারে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যেত। খলিফা নাসিরের শাসনকালে সুলতান যখন তিবরিজ বিজয় করেছিলেন, তখন সেখানে জুমার নামাজের সমবেত মজলিশে খলিফার সম্মানে সুলতান জালালুদ্দীন যা করেছিলেন, ইবনুল আসির সেটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—'জুমার দিন পর্যন্ত সুলতান তিবরিজেই অবস্থান করলেন। জুমার নামাজের জন্য তিনি জামে মসজিদে গিয়ে হাজির হলেন। খতিব সাহেব যখন খুতবা দিতে গিয়ে খলিফাতুল মুসলিমিনের জন্য দোয়া করতে আরম্ভ করলেন, তখন সুলতান জালালুদ্দীন আদবের সাথে নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন। খলিফার উদ্দেশ্যে পঠিত দোয়া খতিব সাহেব যখন সম্পন্ন করলেন, সুলতান জালালুদ্দীন চুপচাপ ফের নিজ স্থানে বসে গেলেন।'[৩৯৯]

খলিফা জাহের ও খলিফা মুসতানসিরের যুগে দরবারে খেলাফতের সাথে সম্পর্ক ভালো করে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছিলেন সুলতান। মুসতানসির বিল্লাহ তাকে আল-জানাবুল আলি আশ-শাহিস্তানির মতো এক বিরল সম্বোধনে ডেকেছিলেন। পাঠিয়েছিলেন মূল্যবান রাজকীয় পোশাকের উপঢৌকন। দুদিক থেকে প্রতিনিধিদলের যাওয়া-আসাও অব্যাহত ছিল।

মুসতানসিরের নামে লেখা চিঠিতে খলিফাকে সুলতান জালালুদ্দীন 'সাইয়িদুনা, মাওলানা, আমিরুল মুমিনিন, ইমামুল মুসলিমিন, খলিফাতু রাব্বিল আলামিন, কুদওয়াতুল মাশারিক ওয়াল মাগারিব'—এরকম বিভিন্ন উপাধি দ্বারা সম্বোধন করতেন। শেষদিকে নিজের নামের জায়গায় লিখে দিতেন—খলিফার অনুগত দাস।[৪০০]

কাজের দ্রুততা

বিশেষ প্রয়োজন পড়ে গেলে সুলতান জালালুদ্দীন অগ্রযাত্রার জন্য এক মুহূর্তের বিলম্বও সহ্য করতে পারতেন না। তার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকত। বিরোধীরা মাথা ওঠাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শায়েস্তা করতে ছুটে যেতেন

---

[৩৯৮] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯; ইবনে খালদুন ৫/১৪০; আবুল ফিদা ৩/১৫১; সুলতান জালালুদ্দীনের নিজেকে ইবনে সানজার বলার কারণ, তাঁর পিতার উপাধি ছিল সানজার এবং দ্বিতীয় সিকান্দার।

[৩৯৯] ইবনে আসির ৭/৬১৬

[৪০০] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯, ইবনে খালদুন ৫/১৪০

তিনি। ফেতনার অগ্নিশিখা উসকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একে ঠান্ডা করে দেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

একদিন তিবরিজের ময়দানে তিনি পোলো খেলছিলেন। তখন জানতে পারলেন, তার ভাই গিয়াসুদ্দীন—কিছুকাল আগে যে যুদ্ধের ময়দান থেকে গাদ্দারি করে ভেগে গিয়েছিল—ইস্পাহানে আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছে। এই খবর শোনামাত্র পোলো খেলার লাঠি তৎক্ষণাৎ হাত থেকে ছুড়ে ফেলে দিলেন তিনি। সেই মুহূর্তেই দ্রুতগতিসম্পন্ন বাহিনী নিয়ে ইস্পাহানের সুরক্ষার জন্য সেদিকে ছুট লাগালেন। অনেকদূর অগ্রসর হয়ে তিনি জানতে পারেন যে, তাকে ভুল সংবাদ দেওয়া হয়েছে; গিয়াসুদ্দীন ইস্পাহান নয়, বরং আলামুতের দিকে গেছে।[৪০১]

পরিণামদর্শিতা, সতর্কতা ও সন্দেহ

যেকোনো কাজ খুব দ্রুত আঞ্জাম দেওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সুলতান। কিন্তু তবু হাত থেকে সে-কাজের সতর্কতা ও পরিণামদর্শিতার আঁচল তিনি ছেড়ে দিতেন না। তিনি যখন জর্জিয়ার প্রথম অভিযানে লিপ্ত ছিলেন, তখন জানতে পেলেন তিবরিজে কেউ বিদ্রোহ করে উঠেছে। এই খবর ছিল অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক। কিন্তু সুলতান পরিণতির প্রতি লক্ষ করে সেই দুশ্চিন্তা জব্দ করে রেখেছিলেন। জর্জিয়ার মিশন বাদ দিয়ে ফট করেই ওইদিকে ছুট লাগাননি। এমনকি কাছের সহযোদ্ধাদের গায়েও তিবরিজের এই দুশ্চিন্তাজনক সংবাদের কোনো হাওয়া লাগতে দেননি। সুলতান আশঙ্কা করছিলেন, জর্জিয়ানদের সাথে প্রচণ্ড রক্তপাতকারী যে যুদ্ধ চলছে এখন, এর মাঝে সেনা-অফিসার ও আমিররা যদি এখনকার এই বেগতিক পরিস্থিতির কথা কোনোভাবে জেনে ফেলে, তারা অস্থিরচিত্ত ও ছটফটে হয়ে উঠবে। পূর্ণ একাগ্রতা ও দুঃসাহস বুকে নিয়ে শত্রুপক্ষের সাথে মোকাবেলা করে যেতে পারবে না।

তারপর জর্জিয়ানদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধ থেকে যখন অবসর হলেন, তখন নায়েব ও আমিরদের জানালেন তিবরিজের পরিস্থিতির সংবাদ। বললেন—'আমি এখানকার যুদ্ধ শুরুর আগে একথা আপনাদের বলিনি, কারণ, আশঙ্কা ছিল, এই সংবাদ শুনে হয়তোবা আপনারা অস্থিরচিত্ত কিংবা মনোবলহারা হয়ে পড়তেন। যা হোক, আমি এখন যাচ্ছি। আপনারা এই ভূখণ্ডে পা মজবুত রাখুন। শত কষ্ট হলেও দুশমনকে খুঁজে খুঁজে পাকড়াও করুন।' এই বলে সুলতান নিজে তিবরিজের বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।[৪০২]

---

[৪০১] ইবনে আসির ৭/৬৪৩

[৪০২] ইবনে আসির ৭/৬১৮

এই ঘটনা থেকে সুলতানের সাহসিকতা, সহনশীলতা, হুঁশিয়ারি ও তীক্ষ্ণ সতর্কতার একটি আন্দাজ করে উঠতে পারি আমরা। সুলতানকে একজন তাড়াহুড়োপ্রিয় লোক বলে যেসব ঐতিহাসিক গণ্য করেছেন, তারা হয়তোবা সুলতানের জীবনের এসব আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারেননি।

সত্তাগত কিছু গুণাবলি : তোষামোদি ও চাটুকারিতার প্রতি ঘৃণা

তোষামোদি কিংবা চাটুরিকার প্রতি সুলতান প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করতেন। হোক কোনো দরবারি কিংবা আলেম, সবার কাছ থেকেই তিনি রসালো কথাবার্তার পরিবর্তে বাস্তবসম্মত কথা শুনতে পছন্দ করতেন। কেউ যদি সুলতানের প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের কিছু ঘটিয়ে বসত, সুলতানের মন থেকে কমে যেত সে-লোকের স্তর ও মর্যাদা। তিনি সর্বদা—যতই নির্মম হোক—কড়া সত্য-বলা-লোকদের ভালোবাসতেন। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে লেখক আন-নাসাবি সুলতান জালালুদ্দীনের ৬২২ হিজরি সনের রমজান মাসের কর্মব্যস্ততা উল্লেখ করে লিখেছেন—সুলতান পুরো রমজান মাস তিবরিজে কাটালেন। সেখানেই রোজা রাখলেন এবং রাজধানীতে একটি মিম্বার স্থাপন করলেন।

বিভিন্ন দিক থেকে যে-সকল উলামা-ফুজালা নিজেদের মাসআলা ও আরজ-অনুযোগ নিয়ে সুলতানের কাছে আসতেন, তাদের মধ্য থেকে ৩০ জনকে তিনি নির্বাচন করলেন। মিম্বারে এই ৩০ জন আলেমের মধ্য থেকে প্রতিদিন একজন করে নসিহত করতেন। এই মাহফিলে স্বয়ং সুলতান মিম্বারের একপাশে এসে বসতেন। যে-সকল আলেম ওয়াজে হক কথা বয়ান করতেন, সুলতান তাদের শোকরগুজারি করতেন। কিন্তু যারা তার প্রশংসা করতে গিয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেন, তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতেন তিনি।[৪০৩]

কোমলপ্রাণতা

যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতান জালালুদ্দীন সবসময় থাকতেন কঠিনহৃদয় এবং পর্বতের মতো দৃঢ়। কাফেরদের মোকাবেলায় তিনি যেন ছিলেন ধাতুনির্মিত শক্ত প্রাচীর। সেই প্রাচীরে ছিল না কোমলতার খানিকমাত্র নামনিশানা। কিন্তু, পাশাপাশি বুকের ভেতর বয়ে চলতেন ভালোবাসায় পরিপূর্ণ কল্লোলিত এক নদী। তিনি লাভ করেছিলেন আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দসী চোখের বিপুল দৌলত। তার জীবনকাহিনিতে এমন অনেক অধ্যায় রয়েছে, যেখান থেকে স্পষ্ট অবগতি লাভ করা যায়—কেমন ছিল তার হৃদয়ের কোমলতা?

---

[৪০৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২০৪, নিহায়াতুল আরাব ৬/৩৭১

ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবি বলেছেন, অধিকাংশ সময় তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে জারজার হয়ে কাঁদতেন।[৪০৪]

পারওয়ান যুদ্ধে চেঙ্গিজ খানের পরাজয়ের পর, সুলতানের প্রিয় দুই মিত্র সাইফুদ্দীন ও আমান মালিক যখন গনিমতের ভাগবণ্টন নিয়ে নিজেদের মধ্যে তুমুলভাবে লড়ে যাচ্ছিল, সাইফুদ্দীন তখন উম্মাহর কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সুলতানের থেকে পৃথক হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। সেই পরিস্থিতিতে সাইফুদ্দীনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করবার জন্য সুলতান জালালুদ্দীন খুব অনুনয় করেছিলেন। আদর-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন।

এই বিষয়টি আল্লামা ইবনুল আসির এভাবে উল্লেখ করেছেন, সুলতান নিজেই গেলেন সাইফুদ্দীনের কাছে। তাকে জিহাদের অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আল্লাহ তায়ালার ধড়-পাকড়ের ভয় দেখালেন। সাইফুদ্দীনের সামনে তিনি বুক ভাসিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু তবু ফিরল না সাইফুদ্দীন।[৪০৫]

একবার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ আল্লামা আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে জাওযির পুত্র শায়েখ মুহিউদ্দীন ইউসুফ ইবনে জাওযি খেলাফতের দরবার থেকে দূত হিসেবে সুলতান জালালুদ্দীনের দরবারে এসে উপস্থিত হন। তখন সুলতান স্বীয় নির্জন বাসগৃহে ছিলেন। শায়েখ সেই গৃহে পৌঁছে দেখেন—সুলতান জালালুদ্দীন কুরআনের একটি নোসখা সামনে রেখে দুলে দুলে তেলাওয়াত করে চলেছেন এবং তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে অশ্রুর বান।[৪০৬]

সুন্নি হানাফি মুসলমান

সপ্তম শতকের অবক্ষয় ও অধঃপতনের সেই যুগে বিভিন্ন আকিদাগত ফেতনার প্রভাব আমজনতার মধ্যে তো পড়েছিলই, এমনকি তাদেরকে ছাড়িয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর শাসকশ্রেণির দোরগোড়াতেও হানা দিয়েছিল। প্রিয় পাঠক, সেসময়কার ইতিহাসে আপনি স্পষ্ট দেখতে পাবেন—একজন বিশুদ্ধ আকিদাসম্পন্ন বাদশাহ মারা গেছেন, তো তারপরে তার সিংহাসনে উপবিষ্ট পুত্র হয়ে গেছে মুতাজিলি। সাম্রাজ্য ছিল মুসলিমদের, কিন্তু শাসক হয়ে গেছিল ইসমাইলি ফেরকার। শাহি খানদানের বাপ-দাদারা ছিল আহলে সুন্নাত ওয়াল

---

[৪০৪] আল-ইবার ৩/২০৩

[৪০৫] ইবনে আসির ৭/৫৯৪

[৪০৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/৩২৮

জামাআত; কিন্তু নতুন বাদশাহ এসে পূর্বসূরিদের সেই সরল পথ পরিত্যাগ করে হয়ে গেছে শিয়া। সেই শতকে তো মুতাজিলা হওয়া একপ্রকার ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর শিয়া হওয়া? বলা যায়—এটি যেন ছিল আহলে বাইতের মহব্বতের একটি সার্টিফিকেট। শিয়া না হতে পারলে রাসুলের পরিবারের ভালোবাসাই যেন কারুর মধ্যে নেই।

আব্বাসি খলিফা নাসির ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির সন্তান আল-মালিকুল আফজাল সম্পর্কেও গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হচ্ছে—এরা শিয়া ছিলেন।[৪০৭] কিন্তু মাজহাব পরিবর্তনের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মহা দুর্যোগেও খাওয়ারিজমি শাসকদের ঈমানের দেয়ালে কোনোপ্রকার চিড় ধরতে দেখা যায়নি। তাদের বিশ্বাসের আঁচল ছিল ফেতনার কলঙ্ক থেকে নিরাপদ।

এই খানদানের শাসকরা ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদায় অবিচল এবং হানাফি মাসলাকের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। তাদের বিশুদ্ধ আকিদা ও ধার্মিকতার কথা সমস্ত ঐতিহাসিকদের কাছেই সুপ্রসিদ্ধ।

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের উপর অনেকে দোষ চাপাতে চান—তিনি নাকি রাফেজি ছিলেন। তিনি যে খলিফার মোকাবেলায় বেরিয়ে পড়েছিলেন—শুধু সে-কারণেই তার উপর আরোপ করা হয়েছে এই দোষ। কিন্তু এই অভিযোগের কোনো সত্যতা নেই। বরং বোধকরি—তিনি যদি খলিফা নাসিরের বন্ধু হতেন, তা হলে যুক্তি এটাই বলে যে, তিনিও একসময় তার মতো শিয়া হয়ে যেতেন। কারণ, খোদ খলিফাই যে ছিলেন শিয়া!

তদ্রুপ সুলতান জালালুদ্দীনকেও বাগদাদের অধিবাসীরা খারেজি বলত। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, সুলতান খারেজি আকিদা পোষণ করতেন। বরং, বাগদাদের লোকেরা খলিফার সমস্ত প্রতিপক্ষকেই নিজেদের পরিভাষায় খারেজি গণ্য করত। সুলতান জালালুদ্দীন যে খারাপ আকিদা পোষণের সর্বপ্রকার দোষারোপ থেকে মুক্ত ছিলেন, তা প্রমাণ করতে গিয়ে হাফেজ যাহাবির মতো মহান ইতিহাসকার ও রিজালশাস্ত্রের ইমাম লিখেছেন—'সুলতান জালালুদ্দীন ছিলেন একজন বিশুদ্ধ আকিদাসম্পন্ন মুসলমান।'[৪০৮]

চরিত্র, দৈহিক সৌষ্ঠব ও অভ্যাস-প্রকৃতির কিছু ঝলক

সুলতানের মহা ট্রাজেডির রচয়িতা আহমাদ আন-নাসাবি তার প্রিয় নেতার দেহসৌষ্ঠব ও চরিত্র বয়ান করতে গিয়ে লিখেছেন—সুলতান জালালুদ্দীন ছিলেন গোধুম বর্ণের। শরীরের গড়ন ছিল খানিক খাটো। বরং বলা যায়, তিনি ছিলেন

---

[৪০৭] দেখুন : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/১২৭

[৪০৮] আল-ইবার ৩/২০৩

মধ্যমাকৃতির। চেহারাজুড়ে অঙ্কিত ছিল তুর্কি গোত্রগুলোর প্রতিবিম্ব। তুর্কিই ছিল তার মূল ভাষা। কিন্তু ফারসিতেও কথা বলতেন।[৪০৯] তিনি খুবই স্বল্পভাষী ছিলেন। মেজাজ ছিল সহিষ্ণু। গোসসা ও গালিগালাজ থেকে সবসময় দূরে থাকতেন। তার ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি কখনো খিলখিল করে হাসতেন না। স্রেফ মুচকি হাসি উপহার দিতেন। বলতেন না ফালতু কথাবার্তা। ন্যায়-ইনসাফের সাথে কাজ করতেন। কিন্তু, যেহেতু এক কঠিন ফেতনা-ফাসাদের যুগে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই কখনো (পরিস্থিতি কিংবা স্বীয় জজবায়) তিনি প্রভাবিতও হয়েছেন।[৪১০]

সাধারণত সুলতান জালালুদ্দীন তুরতুরা (একপ্রকার সূক্ষ্মাগ্র লম্বা টুপি) পরতেন। এই টুপি বানাতে ঘোড়ার চুলও ব্যবহার করা হতো। আর তা হতো বিভিন্ন রঙের।[৪১১]

সুলতানের দরবারিরা তাকে খোদাবন্দে আলম বলে সম্বোধন করত[৪১২] (প্রকাশ থাকে যে, ফারসি ভাষায় খোদাবন্দ শব্দটি মনিব ও সরদার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটিকে আবার খোদা শব্দের সমার্থক বুঝলে ভুল হবে)।

সুলতান তার চিঠিপত্র ও আদেশনামায় যে সিলমোহর লাগাতেন, তার শব্দগুচ্ছ ছিল—'সাহায্য কেবল আল্লাহর তরফ থেকেই মেলে।' মুসেল ও তার মতো ছোট ছোট রাজ্যের শাসকদের নামে যে চিঠিপত্র পাঠাতেন, সেগুলোতে নিজের নামের স্থলে এই সিলমোহরই তিনি লাগিয়ে দিতেন।

রোম, মিশর ও সিরিয়ার মর্যাদাবান সুলতানদের নামে চিঠি পাঠাতে গেলে, তিনি সুলতান শব্দের সাথে নিজের নাম ও বংশধারা লিখে দিতেন। অর্থাৎ লিখতেন—'সুলতান মুনকাবিরাতি ইবনে সানজার'। দম্ভ বা অতি বিনয়ের প্রকাশ ঘটায় যেসব উপাধি, সেগুলোর ব্যবহার এড়িয়ে যেতেন।[৪১৩]

সুলতান জালালুদ্দীনের তবিয়তে অনেকটা জজবা কিংবা আবেগের চাঞ্চল্যও ফুটতে দেখা গেছে। তিনি ধৈর্য-সহনশীলতা, হিম্মত-সহিষ্ণুতা, বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছা সত্ত্বেও কখনোসখনো আত্মিক জজবার অপ্রতিরোধ্য স্রোতেও বয়ে গেছেন। সুলতানের জীবনের শেষ-ক'টি বছরে এই ধরনের আবেগনিয়ন্ত্রিত ঘটনা বেশি ঘটতে দেখা গেছে। তার পুরো জীবনটাই ছিল ক্রমাগত ঘটে-যাওয়া অজস্র দুঃখ-কষ্টের একটা সামষ্টিক রূপ।

---

[৪০৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৮৪; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯; আবুল ফিদা ৩/১৫১; ইবনে খালদুন ৫/১৪০

[৪১০] সিরাতু সুলতান ৩৮৪; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯; আবুল ফিদা ৩/১৫১; ইবনে খালদুন ৫/১৪০

[৪১১] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬৩, ৬২৮ হিজরি; সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/৩২৮

[৪১২] আবুল ফিদা ৩/১৫১

[৪১৩] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯, ইবনে খালদুন ৫/১৪০, আবুল ফিদা ৩/১৫১

মদিনা মাদরাসা ও মসজিদ
পিতঃ ২০২০ইং

তাতারদের হাতে তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রজাদের গণহারে হত্যা হয়ে যেতে দেখে তার মনে যে জ্বলন্ত ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ক্ষত জীবনভর আর শুকিয়ে ওঠেনি; তার উপর ছিল স্বজাতির পক্ষ থেকে আসা হরেক রকম কষ্ট এবং শত্রুদের কুকর্ম। যখন অজস্র বিপদের সেই অসহনীয় বোঝা সুলতানের মাথায় এসে পড়ল, আক্ষরিক অর্থেই ভেতর থেকে তিনি পুরোপুরি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেন। এজন্য, জীবনের শেষদিকে নিজেকে জব্দ করে রাখবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জজবার নদীতে বারবার তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতেন। ঠিক এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে তার থেকে কয়েকবার ভারসাম্যহীন সিদ্ধান্তও প্রকাশ পেয়েছে।

কিছু সহচরের প্রতি তার যে পরিমাণ নির্ভরতা ছিল, তা কখনো সতর্কতার সীমাও অতিক্রম করে যেত। এই সহচররা তার কাছে যে সংবাদ ও অভিযোগ পেশ করত, সেই ভিত্তিতে কখনো-কখনো তদন্ত ও বিশ্লেষণ ছাড়াই কাজ আঞ্জাম দিয়ে বসেছেন। এতে মাঝেমধ্যে তাকে বিপুল ক্ষতির মুখেও পড়তে হয়েছে। বিশেষত, উজিরে আজম শারফুল মুলকের প্রতি একটা সময় নাগাদ 'অন্ধভাবে নির্ভর' করে থেকে সুলতানকে শক্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে।

মানকাবিরাতি শব্দের প্রকৃত অর্থ

সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে জায়গায় জায়গায় ঐতিহাসিকরা তার নামের সাথে মানকাবিরাতি কিংবা মিনকাবারানি শব্দের ব্যবহার করেছেন। এই শব্দের হাকিকত ও অর্থ কী? কাজি আহমাদ গিফারি 'তারিখে জাহাঁ আরা'য় লিখেছেন—মূলত এই শব্দটি মিনকাবারানি। তুর্কি ভাষায় তিলকে মেঙ্গ বলা হয় আর নাসিকাকে বুরুন। যেহেতু সুলতানের নাকে একটি সুন্দর তিল ছিল, এজন্য লোকজন তাকে মিনকাবারানি (তথা নাকে তিলওয়ালা) বলে ডাকত।

সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, তাবাকাতে নাসিরি ও মুজামুল বুলদানে যদিও এই নামকরণের কোনো কারণ উল্লেখ নেই; কিন্তু এই শব্দটিকে সেখানে মিনকাবারানিই লেখা হয়েছে। অন্যদিকে বহুসংখ্যক লোক শব্দটিকে মুনকাবিরাতি (শব্দের শেষে ت যুক্ত করে) লিখেছেন। এই সুরতে শব্দটি مونكو (খোদা অর্থে) ও برتى (দেওয়া অর্থে) শব্দযুগল নিয়ে গঠিত হয়েছে। ফলে, মুনকাবিরাতি (আল্লাহর দান) শব্দটি হয়ে ওঠে ইংরেজি God's given'র সমার্থক।

পশ্চিমা গবেষক অ্যাডওয়ার্ড থমাস তার The coine of the kings of ghasni (গজনি প্রদেশের সরকারি মুদ্রা) রচনায় সুলতান জালালুদ্দীন কর্তৃক প্রচলিত তিনটি মুদ্রার খোদাইকৃত ভাষ্যের বিবরণ দিয়েছেন। সেই বিবরণ অনুযায়ী দুটি মুদ্রায় السلطان الاعظم جلال الدين والدنيا এবং অন্য একটি মুদ্রায় الناصر لدين الله امير المؤمنين جلال الدين والدنيا منكبرين بن السلطان খোদাই করা আছে।

এখন বাকি রইল—এই মুনকাবিরাতি, মিনকাবিরানি কিংবা মুনকাবিরিন সুলতানের নাম, নাকি উপাধি?

কিছু বিশ্লেষক বলেছেন—এটি সুলতানের নাম আর জালালুদ্দীন তার উপাধি। যেমন, সে যুগের রাজা-বাদশাহগণ কুতুবুদ্দীন, আলাউদ্দীন, সাইফুদ্দীন ইত্যাদি উপাধি বেশি গ্রহণ করতেন। তদ্রুপ সুলতানও জালালুদ্দীন উপাধিটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অন্য কিছু বিশ্লেষক মুনকাবিরাতি শব্দটিকে উপাধি আর জালালুদ্দীনকে তার নাম বলে অভিহিত করেছেন।

আমার (ইসমাইল রেহান) খেয়াল হল—প্রথমোক্ত মতটিই সঠিক। মতব্য সময় আলাউদ্দীন মুহাম্মদ তাকে স্থলাভিষিক্ত বানাবার সময় মুনকাবিরাতি বলেই সম্বোধন করেছিলেন, যেমন শিহাবুদ্দীন নাসাবি সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীনগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এমনকি সুলতানের চিঠিপত্রেও মুনকাবিরাতি শব্দটিই লেখা হতো, জালালুদ্দীন নয়।

সুলতান জালালুদ্দীনকে নিয়ে ইতিহাসবিদদের প্রশংসা

হাফেজ যাহাবি বলেন—'তাতাররা সবসময় সুলতান জালালুদ্দীনের ভয়ে কম্পমান ছিল। সুলতান না থাকলে তাতাররা পুরো পৃথিবী পদপিষ্ট করে ছাড়ত।'[৪১৪] অন্যত্র বলেন—'সুলতান সেসমস্ত ব্যক্তিত্বের অন্যতম, যাদের বীরত্ব ও অগ্রগামী যুদ্ধের কথা লোকমুখে দৃষ্টান্ত হয়ে ফেরে।'[৪১৫]

তিনি বলেন—'আমি শাসকদের মধ্যে আর কারুর বিচরণক্ষেত্র সুলতানের চেয়ে বিস্তৃত দেখিনি। সুলতানের ঘোড়া ছুটেছে হিন্দুস্থানের সীমানা থেকে মা-ওয়ারাউন-নাহার, ইরাক, পারস্য, কিরমান, আজারবাইজান, আর্মেনিয়াসহ বহু এলাকা।'[৪১৬]আল্লামা ইবনে আম্মাদ হামবলি বলেন—'সুলতান জালালুদ্দীন মুসলিম ও কাফেরদের মাঝখানে ছিলেন এক শক্ত প্রাচীর। তার মৃত্যুর সাথে সাথে সেই প্রাচীরটি ভেঙে পড়ে।'[৪১৭]

আল্লামা ইবনে তাগারি বারদি বলেন—'জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ কখনো কখনো তার সৈন্যদলকে নিয়ে টানা ১০ দিন তাতারদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। জালালুদ্দীনের সিপাহিরা ঘোড়া থেকে নেমে পদাতিকভাবে তরবারি হাতে দুশমনের মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। এ সময় তাদের খাবারদাবারও গ্রহণ করতে হতো যুদ্ধের মধ্যে।'[৪১৮]

---

[৪১৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৩২৮

[৪১৫] আল-ইবার, ৩/২০৩

[৪১৬] আল-ইবার ফি খাবারি মান গুবার, ৩/২০৩

[৪১৭] শাজারাতুয যাহাব, ৫/১৩১

[৪১৮] আন-নুজুমুয যাহিরা, ২/২০৮, শামেলা

আল্লামা আকবর শাহ নজিবাবাদি বলেন—'তিনি ছিলেন একজন বীরপুরুষ। বহুসংখ্যক রণক্ষেত্রে তিনি নিজের বীরত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে ইতিহাসে একজন যোগ্য ব্যক্তির আসনে ঠাঁই করে নিয়েছেন।'[৪১৯]

আল্লামা রাব্বানি আজিজ (পাকিস্তানি ঐতিহাসিক) বলেন—'এই বিখ্যাত সিপাহি পৃথিবীর সেই অমর শাসকদের অন্যতম, যারা বৃহৎ কোনো আশঙ্কাকেও তিল পরিমাণ পরোয়া করেননি, প্রতিকূল ও বিরূপ পরিবেশ দেখে কখনো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেননি। তারা যদি কখনো অবাধ্য জামানার মুখে লাগাম পরাতে না পেরেছেন, তো, জামানাও তাদের মর্জির বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারেনি। জালালুদ্দীন কুফরের ও খোদাদ্রোহিতার অন্ধকারের বিরুদ্ধে ছিলেন ঈমান, ইনসাফ ও ইসলামের সুমহান জানবাজ বীর।'[৪২০]

ডক্টর ব্রাউন (ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদ) বলেন—'সুলতান জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি ছিলেন আগ্রাসী তাতার-জাতির বিরুদ্ধে ইসলামের শেষ-আশ্রয়।'[৪২১]

হ্যারল্ড ল্যাম্ব (আমেরিকান ঐতিহাসিক) বলেন—জালালুদ্দীন ছিলেন খাওয়ারিজমিদের প্রিয় শাহজাদা ও খাওয়ারিজম শাহের অলি আহাদ। ছিলেন খাঁটি তুর্কি। গায়ের রঙ পেস্তার মতো সুন্দর ছিল। তিনি দীর্ঘকায় ও শ্যামবর্ণের ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ারের নৈপুণ্য দেখানোতে ছিল তার বড় আগ্রহ।[৪২২]

জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ একাই পৃথিবীজুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে-থাকা মুসলিমদের একত্র করে আক্রমণকারী তাতারদের মোকাবেলায় নেমে আসার যোগ্যতা রাখতেন।[৪২৩]

বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া

চেঙ্গিজ খান বলেন—ছেলে হলে এমনই হওয়া উচিত![৪২৪]

আল-মালিকুল আশরাফ মুসা বলেন—'তিনি আমাদের ও তাতারদের মাঝে এক শক্ত প্রাচীরের মতো এমনভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেমন মনুষ্যজাতি ও ইয়াজুজ-মাজুজের মাঝখানে বাদশাহ আলেকজান্ডারের লৌহপ্রাচীর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে আছে।'[৪২৫]

---

[৪১৯] তারিখে ইসলাম নজিবাবাদী, ৩/১৩১২

[৪২০] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, পৃষ্ঠা : ১১

[৪২১] তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান, ২/৩০৭

[৪২২] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় : ১৪, পৃষ্ঠা ১০৮

[৪২৩] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় : ১৮, পৃষ্ঠা : ১৩৯

[৪২৪] জাহাঁ কুশা জুয়াইনি : ২/১৪২

[৪২৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১৫৪

দ্বাদশ অধ্যায়

সুলতান জালালুদ্দীনের আপন-পর

সুলতান জালালুদ্দীনের পরিবারবর্গ, নিকটাত্মীয় ও সম্পৃক্তদের কিছু অংশের আলোচনা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের বিগত অংশে বিক্ষিপ্তভাবে চলে গেছে। এ অধ্যায়ে সুলতানের বংশীয় অবস্থা ও বংশগত সম্পর্কসূত্রগুলো স্পষ্ট ও সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করব। সেজন্য সংগত মনে করেছি যে, সুলতানের সাথে সম্পৃক্তদের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে একটি অধ্যায়ের ভেতরেই নিয়ে আসি। তা ছাড়া এখানে সুলতানের বিশ্বস্তদের এবং তার দরবারে অবস্থানকারী আলেম ও সাহিত্যিকদের পরিচিতিও ফুটিয়ে তোলা হবে। এতে বিষয়টি পাঠকদের একটা আগ্রহেরও কারণ হয়ে উঠবে। পাশাপাশি সুলতানের সাথে যারা গাদ্দারি করেছিল, তাদের পরিণতিও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে যাব। সেক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণের দিকগুলোতে সবিশেষ আলো ফেলবার চেষ্টা করা হবে। এবার চলুন, সুলতানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের অবস্থা ধারাবাহিকভাবে জেনে নিই।

সুলতানের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ শ্রেণি

সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের অধিকাংশ আত্মীয় তার জীবৎকালেই মারা গিয়েছিল। খানদানের অল্পকিছু লোকই কেবল ছিল, যারা তার তিরোধানের পরও জীবিত ছিল কালের আরো দুর্যোগ দেখবার জন্য।

যেহেতু সুলতানের সময়কাল পর্যন্ত এসে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে গিয়েছিল, সেজন্য এই বিশাল বংশের অবশিষ্ট লোকজন বাস করতে শুরু করেছিল পৃথিবীর দিগদিগন্তে, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভিন্ন অঞ্চলে। সেখানেই নিজেদের দুর্যোগময় জীবন পার করে একসময় পৃথিবীর অজ্ঞাতে জীবন-বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়েছিল। এরা সকলেই অজানা-অচেনা দেশান্তরে নিরালম্ব কিংবা বন্দিত্বপূর্ণ জীবন কাটিয়ে গেছে। ইতিহাসের বিশাল পৃষ্ঠায় এদের দুয়েকজন ছাড়া কারুর জীবনকথা সংরক্ষিত হয়নি।

দাদি তুর্কান খাতুন

সুলতান জালালুদ্দীনের দাদি তুর্কান খাতুন প্রথমে কী ভীষণ ডাঁটপাটের সাথে রাজত্ব করেছিলেন এবং শেষে কী আফসোস-জাগানিয়া পন্থায় গ্রেফতার হয়েছিলেন, তা আপনারা পড়ে এসেছেন। এই হতভাগ্য নারী সুলতানের

গুপ্তজীবন কিংবা শাহাদাতের সময়ও গোবি মরুভূমিতে তাতারদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জীবন পার করছিলেন। তারপর ২ বছর পেরিয়ে গেলে ৬৩০ হিজরি সনে তার মৃত্যু ঘটে।[৪২৬]

সুলতান জালালুদ্দীনের ভ্রাতৃবৃন্দ

সুলতানের ভাই ছিল চারজন—কুতুবুদ্দীন আযলাক, আক সুলতান, রোকনুদ্দীন ঘুরশাহ ও গিয়াসুদ্দীন পিরশাহ। এরা সকলেই ছিল বৈমাত্রেয় ভাই। এদের কেউ-ই সুলতান জালালুদ্দীনের সহোদর ছিল না।

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ জালালুদ্দীনের স্থলে কুতুবুদ্দীনকে সাম্রাজ্যের অলি আহাদ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর খানিক পূর্বে তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন জালালুদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা। একারণে পরবর্তীতে কুতুবুদ্দীন আযলাক-পক্ষীয় আমিররা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

সম্ভবত আক সুলতান ছিল খুব কম বয়স্ক। ইতিহাসে তার জীবনের বিশেষ কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। শেষে কুতুবুদ্দীন আযলাকের সঙ্গে তাতারদের মোকাবেলায় লড়তে লড়তে সেও শহিদ হয়ে গিয়েছিল। তবে, কাজি মিনহাজুস সিরাজ বলেন, আক সুলতান ও গিয়াসুদ্দীন একজনেরই দুটি নাম।[৪২৭]

তাতার-বিরোধী জিহাদে পুরোপুরিভাবে অংশগ্রহণ করেছিল রোকনুদ্দীন ঘুরশাহ। প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে সে শহিদ হয়ে গিয়েছিল। মিনহাজুস সিরাজের বর্ণনানুসারে, তার আসল নাম ছিল রোকনুদ্দীন ঘুরশানেস্তি, যার অর্থ হল, ঘুরিদের বিধ্বস্তকারী। মূল ঘটনা হল—এই শাহজাদা ৬০১ হিজরিসনে সেসময় জন্মগ্রহণ করেছিল, যখন সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরি খাওয়ারিজম আক্রমণে সৈন্যদল প্রেরণের পর নিষ্ফলভাবে ফিরে যাচ্ছিলেন। এই দিকে সম্বন্ধ করেই তার নাম রাখা হয়েছিল ঘুরশানেস্তি। যা পরবর্তীতে সবার ব্যবহারে সংক্ষিপ্ত হয়ে শুধু থেকে গিয়েছিল ঘুরশাহ। এই শাহজাদা ছিল ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সি, সুদর্শন ও সাহসী বীর।[৪২৮]

গিয়াসুদ্দীন

শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন ছিল যথেষ্ট সুদর্শন; কিন্তু সে খুবই জেদি ও একরোখা প্রকৃতির ছিল।[৪২৯] তাতারদের আগ্রাসনের সময় পিতা আলাউদ্দীন মুহাম্মদের নির্দেশে শাহি খানদানের বেগমদের নিয়ে মাজেন্দ্রানের কারুনদাজ দুর্গে লুকিয়ে

---

[৪২৬] জাহাঁকুশা ২/৩০০

[৪২৭] তাবাকাতে নাসিরি ১৬/৩৭১

[৪২৮] তাবাকাতে নাসিরি ১৬/৩৭০

[৪২৯] তারিখে ইসলাম যাহাবি ৬৩, ৬২৮ হিজরি

পড়েছিল সে। পরবর্তীতে তাতাররা এই দুর্গ দখল করে সকল বেগম-সহ অন্য মহিলাদেরও গ্রেফতার করে ফেলেছিল। কিন্তু তাদের হাত থেকে বেঁচে পালিয়ে গিয়েছিল গিয়াসুদ্দীন। ৩০ জন অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে সে পৌঁছে গিয়েছিল ইরানে। সফরকালে, একদিন কিছু সঙ্গী মিলে গিয়াসকে হত্যা করে তাতারদের কাছে তার মাথা পাঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা আঁটল। এদের মধ্যে এক সুফিও ছিলেন। সুফি সাহেব মন থেকে গিয়াসুদ্দীনেরই বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি চুপচাপ সবকিছু শুনলেন। তারপর যখন এই চক্রান্তকারীরা ঘুমিয়ে পড়ল, তিনি দ্রুত গিয়ে গিয়াসুদ্দীনকে জাগালেন এবং খুলে বললেন চক্রান্তকারীদের পুরো প্রকল্প। তক্ষুনি গিয়াসুদ্দীন এদেরকে ঘুমের মধ্যে গিয়ে ধরে ফেলে এবং সেখানেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এভাবে কোনোক্রমে বাঁচতে বাঁচতে সে পৌঁছে যায় ইস্পাহান। সেখানকার বাসিন্দারা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে খুবই আপ্যায়ন করে। খাওয়ারিজমি বাহিনীর কিছু বিক্ষিপ্ত সৈন্যও এসে তার পাশে জড়ো হয়।[৪৩০] গিয়াসুদ্দীন তাদের সাথে ইস্পাহানের উপকণ্ঠে অবস্থিত মারুত দুর্গে গিয়ে ওঠে। সেখানে অবস্থান করে তাতারদের আগ্রাসন থামার অপেক্ষায় দিন কাটাতে থাকে।

আর তখনই, আজারবাইজান-অভিমুখে যাত্রা শুরু-করা একটি তাতার-সেনাদল মারুত দুর্গ অবরোধ করে; কিন্তু এই দুর্গ এতোটাই মজবুত ছিল যে, তাতাররা বহু চেষ্টার পরেও তা দখল করতে পারেনি।

৬২০ হিজরি পর্যন্ত (প্রায় ৩ বছর) এই দুর্গেই লুকিয়ে ছিল গিয়াসুদ্দীন। তাতারদের সয়লাব যখন এখান থেকে চলে গেল, গিয়াসুদ্দীন এই বিধ্বস্ত রাজ্যের পশ্চিমাংশ—যা ছিল ইরান ও পারস্যের অন্তর্গত—দ্বিতীয়বার দখল করে নতুন এক রাজ্য গড়ে তুলবার চেষ্টা শুরু করে দিল।[৪৩১]

কিছুকাল পর হিন্দুস্থান থেকে ফিরে এলেন সুলতান জালালুদ্দীন। গিয়াসুদ্দীনের অফিসারদের খানিক সহযোগিতায় রাজ্যের বাগডোর নিজ হাতে নিয়ে নিলেন। সুলতানের এই ক্ষমতা ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা গিয়াসুদ্দীনের সহ্য হল না। এজন্য সুলতানের ক্ষতি করার জন্য সে সুযোগ খুঁজতে লাগল। কিছু না করতে পারলেও, কমপক্ষে সুলতানের অধীনস্থতা থেকে হলেও সে মুক্তি পেতে চাচ্ছিল।

কিছুকাল পরে এমন একটি ঘটনা ঘটল, যে ঘটনার সূত্রে গিয়াসুদ্দীনের উপর সুলতান জালালুদ্দীন খুবই রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। গিয়াসুদ্দীনও তার থেকে পৃথক হয়ে যেতে উৎপাত শুরু করে দেয়।

---

[৪৩০] তারিখে ইসলাম যাহাবি ৬৩, ৬২৮ হিজরি

[৪৩১] আফগানিস্তান দর মুয়াসসার তারিখ ১৪১, ইবনে খালদুন ৫/১১৭

ঘটনা হল—সুলতানের বিশেষ সহচরদের মধ্য থেকে এক লোকের নাম ছিল মালিক নুসরাত উদ্দীন। সুলতান জালালুদ্দীন তাকে ইস্পাহানের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। মালিক নুসরাত উদ্দীন ছিল খুবই প্রাণবন্ত, বীর ও খোশমেজাজি যুবক। তার প্রতি সুলতানের যথেষ্ট ভরসা ছিল[৪৩২] (মালিক নুসরাত উদ্দীনের বিশ্বস্ততার একটি ঘটনা হিন্দুস্থান-অভিযানের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে)।

গিয়াসুদ্দীনের কিছু খাদেম তখন গিয়াসের সংশ্রব ছেড়ে মালিক নুসরাতের ওখানে চাকুরি নিল। বিষয়টা জানতে পেরে গিয়াসুদ্দীনের খুবই খারাপ লাগল। সে দুম করে প্রতিপক্ষ হয়ে উঠল মালিক নুসরাতের। একদিন সুলতানের উপস্থিতিতেই সে মালিক নুসরাতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল—তুমি আমার মর্জি ছাড়া আমার সহচরদের নিজের কাছে রেখে দিয়েছ কেন?

মালিক নুসরাত তার স্বভাবসিদ্ধ রীতি হিসেবে খোশমেজাজে বলল—জনাব, সহচররা তো সেখানেই কাজ করতে চায়, যেখানে কাজ করা তাদের জন্য সহজ হয়। ভুখা পেটে তো তারা কাজ করতে পারে না!

গিয়াসুদ্দীন এই কথাকে নিজের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবমাননাকর জবাব মনে করল। ক্রোধে অগ্নিময় হয়ে উঠল সে। সুলতান জালালুদ্দীনের উপস্থিতির কারণে নিজের সেই ক্রোধ প্রকাশ করতে পারছিল না। কিন্তু তার চোখের ভেতর ঠিকই টকটক করে উঠেছিল রক্ত।

সুলতান ব্যাপারটা রফাদফা করে দিতে চাইলেন। গিয়াসুদ্দীনকে ঠান্ডা করবার জন্য নুসরাতকে তিনি ইশারা করলেন—তুমি মজলিশ থেকে উঠে চলে যাও।

মালিক নুসরাত বাইরে চলে গেল।

গিয়াসুদ্দীন তখনই নুসরাতকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। তারপর, সে-রাতেই ছাদে ওঠার পথে সে মালিক নুসরাতের ঘরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হিংস্র ভঙ্গিতে খঞ্জর দিয়ে একের-পর-এক আঘাত করতে করতে নুসরাতকে সে আধমরা বানিয়ে দিল। তারপর আঘাতের প্রচণ্ডতায় দু-দিন পরেই মারা যায় নুসরাত উদ্দীন।

গিয়াসুদ্দীনের এই জুলুমে সুলতান এতোই ক্রুদ্ধ হলেন যে, গিয়াসের মনের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে লাগল যেকোনো সময় প্রাণ চলে যাবার শঙ্কা।

সুলতান তাকে লিখে পাঠালেন : তুমি কসম খেয়েছিলে, আমার যারা দুশমন, তারা তোমারও দুশমন এবং আমার বন্ধুরা তোমারও বন্ধু। নিহত নুসরাত ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ও সহচর। তার পাশে বসলে আমি আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার কথা ভুলে যেতাম। তুমি জুলুম করে তাকে হত্যা করেছ। তুমি গাদ্দার, ওয়াদা ভঙ্গ করেছ, তুমি খেয়ানতকারী। যা হোক, তোমার সাথে নিয়মানুযায়ী

---

[৪৩২] জাহাঁকুশা ২/৩০৩, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৪০, খাওয়ারিজম শাহি ১৭৪

আচরণ করা আমার দায়িত্ব। তাই এই অবস্থার মধ্যেও আমি সেই সিদ্ধান্তই নেব, যা প্রদান করে শরিয়াহ আদালত। এক্ষুনি নিহতের ভাইকে আদালতে হাজির করো। চাইলে সে মাফ করে দেবে, নতুবা কেসাস নেবে।

সুলতানের এই সিদ্ধান্তের পর গিয়াসুদ্দীনের চোখে নাচতে লাগল নিজের স্পষ্ট মৃত্যু। কিন্তু মোকাদ্দমার সিদ্ধান্ত হবার আগেই আল্লাহর ইচ্ছায় ইস্পাহানের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

গিয়াসুদ্দীনের কাছে সাধারণত পালাবার কোনো পথ ছিল না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর সময় তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—এই নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে সুলতানের সৈন্যরা দুশমনের মোকাবেলা ছেড়ে তাকে ধাওয়া করতে আসবে না। এজন্য সেদিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে নিরাপদে পালিয়ে গিয়েছিল।

বিষয়টি আন-নাসাবি আরেকটু স্পষ্ট করে তুলেছেন, লিখেছেন—গিয়াসুদ্দীন সেখান থেকে পালিয়ে প্রথমে বাগদাদের খলিফার কাছে গেল। সেখানে তার সাহচর্য লাভে ধন্য হতে এবং দরবারে খেলাফতকে সুলতানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। খলিফার সামনে সে আর্জি পেশ করল—'ফেদাইরা অনেক আগে থেকেই খেলাফতের আওতাভুক্ত শহরগুলোর প্রতিবেশী হয়ে ছিল। তারা সর্বদা প্রতিবেশিত্বের হক আদায়ের প্রতিও লক্ষ রাখছিল। কিন্তু যখন থেকে আমার ভাই জালালুদ্দীন হিন্দুস্থান থেকে ফিরে এসেছে, দরবারে খেলাফতের সীমান্তপ্রদেশেগুলোতে সে হামলা করেই যাচ্ছে। তাই তার মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য করে তার দখলীকৃত এলাকা আমাকে প্রদান করুন।'

খলিফা তাকে ভালো আশ্বাস দিয়ে বিদায় করে দিলেন। ফলে গিয়াসুদ্দীন নিজের একটি সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বাতেনিদের প্রাণকেন্দ্র আলামুতে চলে গেল।[৪৩৩] কিছুদিন আলামুতের হাকিম আলাউদ্দীনের কাছেই রইল সে। পরে সুলতান জালালুদ্দীন যখন আলামুতের উপকণ্ঠে যুদ্ধাভিযান চালালেন, আলাউদ্দীন তখন ঘাবড়ে গেল যে, সুলতানের দুশমনকে আশ্রয় দিয়ে আমি ফেঁসে যেতে পারি! তাই সে সুলতানকে সুপারিশ করল—সুলতান, গিয়াসুদ্দীনকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক। আমি তাকে আপনার খেদমতে পাঠাচ্ছি।

তারপর সুলতান খুবই প্রশস্ত মনে এই দাগাবাজ ভাইটাকে ক্ষমা করে দিলেন। গিয়াসের মন থেকে শঙ্কা দূর করবার জন্য হলফও করলেন—'গিয়াসুদ্দীনকে কিছুই বলা হবে না'।

এই নিশ্চয়তা দেবার পর আলামুত থেকে বেরোল গিয়াসুদ্দীন। কিন্তু পথিমধ্যে তার মনের মাটিতে কেঁচোর মতো কিলবিল করে উঠতে লাগল বিভিন্ন সংশয়। সেই সংশয়ে তাড়িত হয়ে সুলতানের কাছে না এসে কিরমানের হাকিম বুরাক

---

[৪৩৩] জাহাঁকুশা ২/৩০৩

হাজিবের আশ্রয়ে চলে গেল সে। যাত্রাকালে তার সঙ্গে তার আম্মাজানও ছিল।[৪৩৪] জাহাঁ পাহলোয়ান ও কারিমুশ শার্ক নামের দুই খাওয়ারিজমি সহচরও বরাবর তাকে সঙ্গ দিয়ে যেতে থাকল।

বুরাক হাজিব গিয়াসুদ্দীনকে খুব আদর-আপ্যায়ন করল কিছুদিন। কিন্তু খুব শিগগির বুরাকের পরিবর্তিত ভাবমূর্তি দেখে শাহজাদার মনে হতে লাগল—আমি এক নির্দয় পশুর কয়েদখানায় এসে গেছি!

মূলত বুরাক হাজিব ছিল খাওয়ারিজম শাহি খানদানের শত্রু। সে চাচ্ছিল—এই খানদানের নামনিশানা মুছে ফেলে স্থাপন করবে এক নতুন সাম্রাজ্য। এজন্য নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সে গিয়াসুদ্দীনের মাকে (সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের বেগমদের মধ্যে যিনি ছিলেন তখনকার একমাত্র জীবিত নারী এবং নিজ পুত্রের সাথে বুরাকের ওখানে মেহমান হিসেবে ছিলেন) জোর করে বিয়ে করে ফেলল। ব্যাপারটাতে গিয়াসুদ্দীন বড় অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় কিছুই করে উঠতে পারেনি সে।

কিছুদিন পর বুরাক হাজিবের দুই বিশেষ সহচর শাহজাদা গিয়াসুদ্দীনের কাছে আসে। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সম্মত করে তুলতে থাকে—আপনি বুরাকের সিংহাসন উলটে দেবার চেষ্টা শুরু করুন। আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, দুজনই আপনাকে সহযোগিতা করব। এই মিশন সফলও হবে। কিন্তু শাহজাদা সম্মত হল না। ঘটনাক্রমে, শাহজাদার এক অবাধ্য খাদেম এদের এই গোপন কথাবার্তার কয়েকটি বাক্য শুনে ফেলল। সে গিয়ে বুরাক হাজিবকে বলল—শাহজাদা ও তার সহচর-খাদেমরা এবং আপনার কিছু সহচর বিদ্রোহের চক্রান্ত করছে।

শোনামাত্র বুরাকের সর্বাঙ্গে খলবলিয়ে উঠল পশুত্ব। সে কোনোধরনের তদন্ত-বিশ্লেষণ ছাড়াই শাহজাদাকে একটি দুর্গে বন্দি করে রাখল। শাহজাদার উপর দোষারোপ করল—গিয়াসুদ্দীন আমার খাদ্যে বিষপ্রয়োগের পরিকল্পনা আঁটছিল।

গিয়াসের সহচর ও চাকর-কর্মচারীদের ডেকে জবরদস্তি করে তাদের থেকে বিদ্রোহের অপরাধ স্বীকার করাতে চাচ্ছিল বুরাক। কিন্তু তারা সবাই তা অস্বীকার করলে বুরাক তাদের কল্লা উড়িয়ে দিল। এই নিহতদের মধ্যে কারিমুশ শার্ক ও জাহাঁ পাহলোয়ানও ছিল।

এদের সবাইকে মেরে ফেলার পর শাহজাদাকে এনেও মৃত্যুর তখতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। শাহজাদা নিরুপায় হয়ে খুব চিৎকার-চেঁচামেচি করতে শুরু করল। বোঝাতে চেষ্টা করল যে, সে ওরকম কিছু করেনি। কিন্তু বুরাকের পাথরমনে এতে কোনো রেখাপাত ঘটল না। কোনোকিছু না ভেবেই শাহজাদাকে সে পাড়িয়ে দিল মৃত্যু-ঘুম।

---

[৪৩৪] জাহাঁকুশা ২/৩০৩

পুত্রের অসহ্য চিৎকার ও চেঁচামেচি মায়ের কান পর্যন্তও পৌঁছে গিয়েছিল। বেচারি বেহুঁশ হয়ে জারজার করে কেবল কাঁদতে থাকলেন। বুরাক হাজিব ক্রুদ্ধ হয়ে তাকেও এই জীবন ও জগৎ হতে চিরতরে ওপারে পাঠিয়ে দিল।[৪৩৫]

এই বিরাট রক্তপাত আঞ্জাম দিয়ে চরিত্রহীন বুরাক হাজিব সুলতানের উদ্দেশে চিঠি লিখল—আমি মহান সুলতানের একটি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছি। আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু গিয়াসুদ্দীনকে ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছি।[৪৩৬]

সুলতানের ভগ্নীগণ

ইতিহাসের গ্রন্থাবলির পৃষ্ঠা উলটেপালটে সুলতান জালালুদ্দীনের শুধু তিনজন বোনের সন্ধানই পাওয়া যায়।

প্রথম বোন : খাওয়ারিজমি দরবারের আমির আইগান তাইসির জীবনসঙ্গিনী হয়েছিল যে, এই তিন বোনের মধ্যে সে একজন। এই বোনের সুপারিশেই একদা সুলতান জালালুদ্দীন আইগান তাইসির বিদ্রোহের অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন।[৪৩৭] এ বোন সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

দ্বিতীয় বোন : দ্বিতীয়জন ছিলেন মিশরের বাদশাহ সাইফুদ্দীন কুতুজের মা। এই দ্বিতীয় বোনও পুরোপুরি অচেনা ও অজানা এক জীবন কাটিয়ে গেছেন। মাওদুদ নামের এক লোকের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তাদের পুত্র মাহমুদ বিন মাওদুদ একজন যোগ্য সেনানায়ক হয়ে উঠেছিলেন, যিনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন সাইফুদ্দীন কুতুজ নামে। তিনিই মিশরের ক্ষমতার মসনদ সামলে নিয়ে ৬৫৮ হিজরিসনে আইনজালুতের ঐতিহাসিক যুদ্ধে তাতারদের পরাজিত করেছিলেন।[৪৩৮]

উপর্যুক্ত দুই বোনের নাম কী ছিল, এরা সহোদর ছিলেন নাকি সৎবোন, এবং সুলতানের মৃত্যুর পর এদের জীবন কীভাবে কেমন কেটেছিল—সে ব্যাপারে ইতিহাস নীরব।

তৃতীয় বোন : শাহজাদি খান সুলতান

শাহজাদি খান সুলতানের আলোচনা এই গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে। সুলতান জালালুদ্দীনের সৎবোন ছিল সে। এ ছিল সেই হতভাগ্য নারী, যে তার পুরো জীবনে বিভিন্ন বিপদের ঝড়তুফান মোকাবেলা করে গেছে। বঞ্চনা ও ব্যর্থতা যেন তাকে পিষে ফেলেছিল। কিন্তু তিনি সকল দুঃখকষ্ট সইবার যোগ্যতা রাখতেন।

---

[৪৩৫] জাহাঁকুশা ২/৩০৫-৩০৬, রওজাতুস সফা ৪/৮২৬, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৪০-১৪৫, খাওয়ারিজম শাহি ১৭৫

[৪৩৬] ইবনে খালদুন ৫/১২৯

[৪৩৭] ইবনে খালদুন ৫/১২৩

[৪৩৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২৩/২০০

তিনি দেশান্তর ও বন্দিত্বের মধ্যেও সঠিক বুদ্ধি, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, চমৎকার পরিকল্পনা ও আল্লাহর নিরুপম তাওফিকে ইসলাম প্রচারের বিরাট দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তাতার-জাতির প্রকৃতি বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি।

শাহজাদির জীবনের প্রথম দিককার দিনগুলো তো খুব আরাম-আয়েশ, স্থিরতা ও প্রশান্তির ভেতর কেটেছিল; কিন্তু বিয়ের পরই শুরু হয়ে গিয়েছিল তার চির বঞ্চনার অধ্যায়।

তার বিয়ের গল্পটা বলি। পিতা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ যখন তুর্কানেখাতার বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছিলেন, তখন যুদ্ধাভিযানের সেই ধারাবাহিকতায় সমরকন্দ আক্রমণেরও ইচ্ছা করেছিলেন তিনি। তখন সমরকন্দ ছিল তুর্কানেখাতাদের আশ্রয়স্থল। সমরকন্দের দুর্বল মুসলিম শাসক উসমান খান খাতাইদের অধীনে সেখানকার মসনদ অলংকৃত করেছিল। সে নিজেও এই কাফেরদের আচরণে কুণ্ঠিত হয়ে গেছিল। এজন্য নিজে থেকেই সে সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদকে সমরকন্দ আক্রমণের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। শহরের দরজাও খুলে দিয়েছিল সে-ই। তারপর খাওয়ারিজম শাহ সমরকন্দ দখল করে ফেললেন। তখন উসমান খানের এই প্রশংসনীয় খেদমতে খুশি হয়ে শাহজাদি খান সুলতানকে তিনি উসমানের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এই বিবাহ খাওয়ারিজমের রাজধানী আরগেঞ্চে খুব ধুমধামের সাথে সম্পন্ন হল। উসমান খান ছিল অত্যন্ত সুদর্শন। তার সৌন্দর্য এতোই বেশি ছিল যে, যখন সে আরগেঞ্চে এসে পৌঁছেছিল, লোকজন তাকে একটু দেখবার জন্য হুড়োহুড়ি করে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিল। খাওয়ারিজম শাহ উসমান খানকে ২ বছর পর্যন্ত শাহিমহলেই মেহমান হিসেবে রাখলেন। পরবর্তীতে তাকে সমরকন্দের কর্তৃত্ব প্রদান করে কন্যা খান সুলতানকে তার সঙ্গে বিদায় দিলেন। কিন্তু শাহজাদি খান সুলতান উসমান খানের ঘরে সুখে থাকতে পারলেন না। তার সাথে উসমান খানের ব্যবহার তেমন ভালো ছিল না। যতই দিন গড়াচ্ছিল, উসমান খানের খারাপ আচরণ পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলছিল। শাহজাদি পুরোপুরি হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন। আসল ঘটনা কী—তিনি বুঝতে পারছিলেন না।

আসল ঘটনা হল—সমরকন্দ শহরে যেসব খাওয়ারিজমি সৈন্যকে মোতায়েন করা হয়েছিল, তাদের বিভিন্ন কঠোরতা উসমান খানের মনে খাওয়ারিজমিদের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছিল। আর উসমান এসে সেই ক্রোধ ঝাড়ত স্ত্রী খান সুলতানের উপর। কিছুকাল পর উসমান খান তুর্কানেখাতার সাথে যথারীতি আঁতাত করে ফেলল। তুর্কানেখাতার সরদার গোর খানের কন্যাকে বিয়ে করার চিত্তাকর্ষক প্রস্তাব পেয়ে তাদের আপন হয়ে গেল সে।

তারপর একদিন, তুর্কানেখাতার সহযোগিতায় সমরকন্দে নিয়োজিত খাওয়ারিজমি বাহিনীকে হত্যা করে ফেলল উসমান খান। তাদের লাশগুলো টুকরো-টুকরো করে শহরের বাজারে-বাজারে, গলি-উপগলিতে লটকিয়ে দেওয়া হল; সমরকন্দে তুর্কানেখাতার ক্ষমতা-বিস্তারের পথ মসৃণ করে দেওয়া হল।

শাহজাদি খান সুলতান এই ঘটনা জানতে পেরে দ্রুত খাওয়ারিজম শাহের উদ্দেশে অবগতিপ্রদানমূলক একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিটা এক বিশ্বস্ত খাদেমের হাতে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে আরগেঞ্চে পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে উসমান খান শহরে নিযুক্ত খাওয়ারিজমিদের হত্যা করে ক্রুর ভঙ্গিতে নিজের রাজমহলে চলে আসে। শাহজাদিকেও হত্যা করতে চাচ্ছিল সে। স্বামীর চেহারায় ফুটে থাকা পাশবিক ক্রোধের ছাপ দেখে শাহজাদি ছুটে গিয়ে নিজ কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন।

তার কিছু বাঁদিও মালকিনকে বাঁচাবার জন্য সামনে এসে গেল। শাহজাদি বাঁদিদের মাধ্যমে স্বামীকে বললেন—আমাকে হত্যা করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমি নারীজাতি। আমাকে হত্যা করা তোমাদের জন্য (পুরুষজাতি) হবে অত্যন্ত অবমাননাকর। তোমার হাতে তেমন কোনো বৈধতাও নেই, যার জের ধরে আমার উপর হাত ওঠাতে পারো। ভেবে দেখো—আমাকে মুক্ত করে দেওয়াই হবে পরিণতি হিসেবে উত্তম।

উসমান খান অনেকক্ষণ ধরে বাইরে থেকে হিংস্র চেহারায় বকাঝকা করে যাচ্ছিল। শেষে ক্রোধ কিছুটা শীতল হয়ে এলে হত্যার ইচ্ছা থেকে ফিরে এল। কিন্তু তারপর দুজনের পক্ষে একসঙ্গে থাকা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

কিছুদিনের ভেতরেই রাজধানী থেকে খাওয়ারিজমি সৈন্যদের তাজাপ্রাণ একটি দল এসে সমরকন্দে পৌঁছল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তারা বিদ্রোহী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। অসংখ্য অবাধ্য বিদ্রোহীকে হত্যা করা হল। উসমানকেও হত্যা করে ফেলা হল। পিতার ঘর থেকে বিদায় হবার এক বছরের মাথায় খান সুলতান বিধবা হয়ে পুনরায় সেই পিতার ঘরেই ফিরে এলেন।[৪৩৯]

বাবার বাড়িতে এসে স্থিরতা ও প্রশান্তির সাথে বেশিদিন কাটাবার সুযোগ মিলল না তার। কিছুকাল পরে তাতারদের সয়লাব এসে গুঁড়োগুঁড়ো করে দিল খাওয়ারিজমি মহলের ইট।

খাওয়ারিজম শাহ খানদানের নারীদের মাজেন্দ্রানের দুর্গে ছেড়ে নিজে গিয়ে আশ্রয় নিলেন কাসপিয়ান সাগরের উপত্যকায়। তার আত্মগোপনের পর তাতাররা এই দুর্গগুলো জয় করে নিয়ে এখানে অবস্থানরত শাহি খানদানের নারীদের

---

[৪৩৯] ইবনে আসির ৭/৫০৮-৫১৩, তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ৮০-৮১, তারিখে ইবনে খালদুনে খান সুলতানকে আলাউদ্দীন মুহাম্মদের বোন বলা হয়েছে, যা স্পষ্ট ভুল। দেখুন : ইবনে খালদুন ৫/১০৪

(যাদের মধ্যে শাহজাদি খান সুলতানও ছিলেন) গ্রেফতার করে তাতার শাহজাদা ও সরদারদের মাঝে ভাগ-বণ্টন করে দিল।[৪৪০] শাহজাদি খান সুলতানকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিল চেঙ্গিজ খানের বড় ছেলে জোচি খান (ঐতিহাসিকরা যাকে জোচি, যোজি, তুশি ও তুশি খান শব্দেও উল্লেখ করেন)।

এভাবে এই বিধ্বস্ত শাহজাদি লোহার এমন পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হয়ে গেলেন, যেখান থেকে মুক্তি লাভ করা তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। শাহজাদির গর্ভ থেকে জোচি খানের সন্তানও হয়েছিল। কয়েক বছর পর জোচি খান মারা গেল; কিন্তু সেই বন্দিত্ব থেকে মুক্তি মিলল না শাহজাদির। এই সঙ্গিন পরিস্থিতির মধ্যেও বাচ্চাদের তিনি ধারাবাহিকভাবে কুরআন মাজিদের তালিম দিয়ে যেতে থাকলেন। এর জন্য তাতারদের পক্ষ থেকে তাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।[৪৪১]

আল্লাহর কালামের প্রভাবে তাতারদের শাহি খানদানের এই নতুন প্রজন্ম ক্রমশ প্রভাবিত হয়ে উঠতে লাগল। পরবর্তীতে জোচি খানের সন্তানসন্ততি যখন ইসলামের নীরব ও গোপন মুবাল্লিগদের সাথে চুপিচুপি সম্পর্ক গড়ে তুলতে লাগল, তখন খুব শিগগিরই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য জুটল তাদের। জোচি খানের পুত্রদের মধ্যে বারকি খান নামের এক শাহজাদা তাতারদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।[৪৪২]

সুলতানের পত্নীগণ

জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির ভেতর সুলতান জালালুদ্দীন একাধিক বিয়ে করেছিলেন। সিন্ধুতীরের যুদ্ধের সময় নিজের যে বেগমদের তিনি তাতারদের হাত থেকে বাঁচাতে নদীর ভেতর ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের জীবনকাহিনি সম্পর্কে জানা যায় না। তারা ব্যতীত সুলতান অন্যান্য যেসব বিয়ে করেছিলেন, সে-সম্পর্কে যে বিস্তারিত বিবরণ জানা গেছে, নিচে তা উল্লেখ করছি :

১. সুলতান গজনিতে আমান মালিকের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।[৪৪৩] তার এই স্ত্রীই সিন্ধুপারের যুদ্ধে দুশমনের অবরোধ থেকে বেরিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হিন্দুস্থানের যুদ্ধ-বর্ণনার অধীনে চলে গেছে।[৪৪৪]

---

[৪৪০] রওজাতুস সফা ৪/৮২৫, জাহাঁকুশা ২/২০০, ইবনে খালদুন ৫/১৩৫

[৪৪১] ইবনে খালদুন ৫/১৩৫, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৩, খাওয়ারিজম শাহি ১৮৮

[৪৪২] তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত ১/৩২৫

[৪৪৩] জাহাঁকুশা ২/১৩৫

[৪৪৪] জাহাঁকুশা ২/১৪৫

২. হিন্দুস্থানে বিভিন্ন বিজয়ের সময় রাজা খোঁখর সাংকিনের ইচ্ছায় তার কন্যাকে সুলতান বিয়ে করেছিলেন।[৪৪৫]

৩. হিন্দুস্থান থেকে ফেরার পর, কিরমানে বুরাক হাজিব বিদ্রোহ থেকে ফিরে এসে সুলতানের সামনে আনুগত্য প্রকাশের জন্য নিজের কুমারী কন্যাকে সুলতানের কাছে বিয়ে দিয়েছিল।[৪৪৬]

৪. সুলতান যখন শিরাজে গেলেন, সাআদ ইবনে জঙ্গি (শিরাজের শাসক) নিজের কন্যা সালগুরি খাতুনকে সুলতানের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন।[৪৪৭] তার গর্ভ থেকে সুলতানের কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। এই বেগম ৬২৩ হিজরিসনে সেইদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যেদিন বাতেনিদের হাতে নিহত হয়েছিলেন সুলতানের আমির আওর খান নিশাপুরি।

তারপর ৬২৫ হিজরিতে সুলতান যখন তাতারদের সাথে জিহাদ করার জন্য ইস্পাহানে আটকে ছিলেন, তখন সাআদ বিন জঙ্গি নিজের দ্বিতীয় কন্যাকে সুলতানের সাথে বিয়ে দেন।[৪৪৮] এই বেগম জীবনের শেষসময় পর্যন্ত সুলতানের সঙ্গেই ছিলেন। শেষে সুলতান তাতারদের থেকে বাঁচতে বিশেষ কিছু সহচর নিয়ে অজানা পথে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। আর এদিকে এই বেগম রোমের সেলজুকদের এলাকায় পৌঁছে সেখানেই থেকে গেলেন। পরে নিজের আত্মীয়দের সাথে শিরাজে চলে আসেন।[৪৪৯]

৫. তিবরিজের হাকিম উজবুক মুজাফফর উদ্দীন বিন বাহলোয়ানের বিবি বেগম বিনতে তুগরুল তার স্বামীর দিক থেকে তালাক সাব্যস্ত হয়ে গেছে বলে নিজে থেকেই সাক্ষী-সমেত সুলতানের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। সুলতান সেই প্রস্তাব কবুল করে নিয়েছিলেন।[৪৫০] কিন্তু হিংসুক ও চক্রান্তকারীদের গোপন চাতুর্যে, স্বামীর ঘরে আসার কয়েক বছর পরই সুলতান ও বেগম বিনতে তুগরুলের মাঝে বিরক্তি ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়। সুলতানের জীবনের এই ঘটনাটি দুটো রাজ্যের সাথে গিয়ে সম্পৃক্ত হয়; এজন্য সুলতানের এই স্ত্রীর অবস্থা আমরা একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

---

[৪৪৫] জাহাঁকুশা ২/১৪৫

[৪৪৬] জাহাঁকুশা ২/১৪৯

[৪৪৭] জাহাঁকুশা ২/১৫১

[৪৪৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ২৭৮

[৪৪৯] ইবনে খালদুন ৫/১৪০, তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৭৪, জাহাঁকুশা ২/১৯০

[৪৫০] ইবনে আসির ৭/৬১৬, ইবনে খালদুন ৫/১২৪

আপনারা পড়েছেন—বিয়ের পর সুলতান জালালুদ্দীন বেগম বিনতে তুগরুলকে তার নিজস্ব জায়গির খুবি এলাকাতেই শান্তিতে-নিরাপদে থাকতে দিয়েছিলেন। ওই এলাকার ক্ষমতাও বিনতে তুগরুলের জন্য বহাল রেখেছিলেন। পরবর্তীতে সুলতান বাড়তি অনুগ্রহ হিসেবে সালমাস ও আর্মিয়া এলাকাও এই জায়গিরের সাথে যুক্ত করে দেন। রাজ্য চালাতে গিয়ে মালকিনের যাতে কোনো ঝামেলা না হয়, সেজন্য উজিরে আজম শারফুল মুলককে অন্যান্য দায়িত্ব দেওয়ার পাশাপাশি মালকিনের পরামর্শদাতাও নিযুক্ত করে দেন সুলতান।

শারফুল মুলক কিছুকাল ঠিকঠাক এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যেতে থাকে। মালকিনের সাথে সুলতানের সম্পর্কও থাকে প্রেমময়। ৬২৪ হিজরিতে সুলতান যখন ইরাক, কিছু অনারব এলাকা ও পারস্যের ময়দানে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন উজিরে আজমের মনমতো যা-তা করবার সুযোগ মিলে যায়। ফলে, একদিকে সে আমজনতার ধনসম্পদে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এতে ক্ষেপে ওঠে আমজনতা; অন্যদিকে মালকিন বিনতে তুগরুলের ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপারেও নির্বিঘ্নে নাক গলানো আরম্ভ করে। সেলজুক শাসকের প্রতিপালিত কন্যার জন্য উজিরের এই আচরণ হয়ে ওঠে সহ্যাতীত। শারফুল মুলক ও মালকিনের মাঝে দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়তে থাকে দিনদিন। কুশলী উজিরে আজম আশঙ্কা করে—মালকিন যদি আমার এই উৎপাতের সংবাদ যুদ্ধলিপ্ত সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেন, আমার দুর্দশার একশেষ হবে। তাই সে নিজেই সুলতানের কাছে গিয়ে সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসে।

সে মালকিনের উপর সুলতানের সাথে গাদ্দারি করার অপবাদই শুধু লাগায়নি; বরং বলে যে, তিবরিজে যে বিদ্রোহ জেগে উঠেছিল, তাতে মালকিনের ছিল একটা বড় ভূমিকা। মূলত, সম্রাজ্ঞী তখন চাচ্ছিলেন না, তিবরিজে তার পূর্ব-স্বামীর বিশ্বস্ত সৈন্যদের ছাড়া কারুর রাজত্ব করবার সুযোগ মিলুক।'[৪৫১]

শারফুল মুলকের প্রতি সুলতানের চূড়ান্ত ভরসা ছিল। বাস্তবতা হল—শারফুল মুলক ছিল তীক্ষ্ণ হুঁশিয়ার ও মারাত্মক চতুর। এজন্য সে এমন এক ভঙ্গিতে কথা বলত, তার ধোঁকাবাজিও শ্রোতার কাছে সত্য বলে মনে হতো, যেন সে খুবই বিশ্বস্ত এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন। এজন্য নিজের বোধবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বেও উজিরের গোপন চক্রান্ত ধরতে পারতেন না সুলতান।

---

[১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৫৮-২৫৯ খাওয়ারিজম শাহি ১৮০-১৮১

সুতরাং, মালকিন সম্পর্কে উজির শারফুল মুলক যে বক্তব্য দিয়েছিল, তা তিনি প্রত্যাখ্যান কিংবা তদন্ত কোনোটাই করেননি। উজিরের এই দোষারোপেই তিনি বিশ্বাস করে বসেছিলেন। অন্যদিকে মালকিনের মনেও সুলতানের বিরুদ্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা শুরু করে দেয় উজির, যাতে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ ও তাদের দ্বন্দ্ব-মীমাংসার কোনো সুযোগই আর না মেলে এবং ফাঁকে ঢাকা পড়ে যায় উজিরের কুকীর্তি।

উজিরের এই চেষ্টাও সফল হয়। মালকিনও সরল মনে উজিরের চক্রান্তের জালে ফেঁসে যান। সুলতানের প্রতি তিনি অত্যন্ত হতাশ ও ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়েন। উজিরে আজমের চোগলখোরিতে এতটাই প্রভাবিত হন যে, মুহূর্তের মধ্যে পালটে যায় সুলতানের প্রতি পুষে-রাখা তার মনের চমৎকার ধারণাগুলো। তার দুশ্চিন্তা, বিরক্তি, আক্ষেপ, আফসোস ও দুর্ভাবনার আগুন রোজ-রোজ তেজি হয়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে সুলতান জালালুদ্দীন বহুদূরের এক যুদ্ধক্ষেত্রে মিশন বাস্তবায়নে এতোটাই মগ্ন ছিলেন যে, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মালকিনের সাথে যোগাযোগ রাখবার কোনো সুযোগই তিনি পাননি।

সুলতানের এই ভ্রুক্ষেপহীনতাও ক্রমাগত মালকিনের মানসিক যাতনা বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠেছিল। হৃদয়ের গোপন শিশমহলে সযত্নে পুষে রেখেছিলেন মায়াময় যেই স্বপ্ন, আশা আর ভালোবাসা, তা ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল। মালকিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন—সুলতান জালালুদ্দীন ও তার নিযুক্ত আমলাদের থেকে তিনি পুরোপুরিভাবে সম্পর্কহীন হয়ে যাবেন।

সুলতানের প্রতি তার যে বিপুল ভালোবাসা ছিল, সেই ভালোবাসা প্রতিমুহূর্তে রূপান্তরিত হতে লাগল ঘৃণায়। এজন্য তিনি নিজের খুবি জায়গির ছেড়ে আর্মিয়া চলে যান। সেখানকার ঝিলের মাঝখানে অবস্থিত এক উঁচু-নিরাপদ পাহাড়ি দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেন।

শারফুল মুলক এই সুযোগটিকে বিরাট গনিমত মনে করেছিল। সে খুবিতে অবস্থিত মালকিনের সামানপত্র ও ধনদৌলতের বিপুল ভান্ডার হাতিয়ে নিতে বিলম্ব করল না। মালকিন তখন অত্যন্ত অস্থির হয়ে দূত-মারফত উজিরে আজমের কাছে দরখাস্ত পাঠালেন—আপনি আমার ধনসম্পদে হস্তক্ষেপ করবেন না। কিন্তু উজিরে আজম মালকিনের এই দরখাস্তের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করল না। শেষে সম্রাজ্ঞী আবেদন করেন যে, অন্তত আমাকে সুলতানের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থাটুকু হলেও করুন।

এতেও উজিরে আজম কান দিল না। পূর্বের মতো ধমকধামকপূর্ণ চিঠিপত্র পাঠিয়ে মালকিনের কাছে সে দাবি করতে লাগল—আপনি নিঃশর্তভাবে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে আমার হাতে সোপর্দ করে দিন।

মালকিন যেখানে দুর্গবদ্ধ ছিলেন, সেখান থেকে কিছুদূর পরেই শুরু হতো সিরিয়ার শাসক আল-মালিকুল আশরাফ মুসার রাজ্য। ওখান থেকে আশরাফের সুদৃঢ় খিলাত দুর্গ খুব বেশি দূরে ছিল না। আল-মালিকুল আশরাফ ও সুলতান জালালুদ্দীনের সম্পর্ক দীর্ঘ সময় ধরে দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে চলে আসছিল।

যেহেতু মালকিন তখন অন্যান্য খাওয়ারিজমি আমলা ছাড়াও, স্বয়ং সুলতানের প্রতিও বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন, সেজন্য ওই পরিস্থিতিতে তার কাছে সমুচিত মনে হল, এই ভূমি ছেড়ে তিনি পড়শি শাসক আল-মালিকুল আশরাফের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবেন।

তার এই তাড়াহুড়োপ্রবণ আবেগি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য গোপনে তিনি আল-মালিকুল আশরাফের নায়েব খিলাতের শাসক হাজিব আলির কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাকে সীমান্ত পেরিয়ে এদিকে আসার জন্য ডাকলেন। সিরিয়ার শাসকরা সুলতান জালালুদ্দীনকে মনে করত নিজেদের সবচেয়ে কঠিন শত্রু। সবসময় সুলতানকে কষ্টে ফেলবার সুযোগ খুঁজে বেড়াত। মালকিনের চিঠি পেয়ে এই শ্রেণিটি যেন খাওয়ারিজমি সিংহাসনকে অপদস্থ করবার একটি সুযোগ হাতে পেয়ে গেল।

হাজিব আলি কোনো নিয়মকানুন ও বিধিবদ্ধতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সীমান্ত পেরিয়ে মালকিনের কাছে গিয়ে পৌঁছল। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে থেকে মালকিনের পৃথক হয়ে যাবার এই সিদ্ধান্তকে দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য মালকিনকে তার লটবহরসহ পাহাড়ি দুর্গ থেকে বের করে খিলাতে নিয়ে গেল।[৪৫২] এই যে দুর্গ থেকে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তারপরে মালকিনের কেমন হয়েছিল অবস্থা, তার কোনো খোঁজ ইতিহাসের কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। তবে বাহ্যত মনে হয়—শেষ পর্যন্ত বিনতে তুগরুল আল-মালিকুল আশরাফের রাজ্যেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে তার সম্পর্ক নতুন করে আর গড়ে ওঠেনি।

বেগম বিনতে তুগরুল যে এরকমভাবে অন্যের রাজ্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন, সেটা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের জন্য ছিল শক্ত অপমানজনক। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সুলতান এই ঘটনায় যে কী পরিমাণ আঘাত পেয়েছিলেন, তা আন্দাজ করাও কঠিন। এই ঘটনার প্রভাবে সুলতান যে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন, ইতিহাসে তা স্পষ্টভাবে আছে। এর প্রভাব পড়েছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও।

---

[২] ইবনে খালদুন ৫/১২৮, ইবনে আসির ৭/৬৪১

উজিরে আজমের ধোঁকাবাজি, মালকিনের নির্বুদ্ধিতা ও সিরিয়ার শাসকদের সুযোগসন্ধানী মতলবে মালকিনের যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছিল, তা পরবর্তীকালের জন্য দুই ইসলামি সাম্রাজ্যের শত্রুতা-বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠেছিল। একারণেই খাওয়ারিজমি ও সিরিয়ান সৈন্যদের মাঝে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী কয়েকটি যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। এই ঘটনাই, পরবর্তীতে খিলাতে সুলতানের বারবার আক্রমণ চালাবার এবং শেষে সেই এলাকা দখল করে নেবার কারণ হয়ে উঠেছিল।

৬. উপর্যুক্ত স্ত্রীগণ ছাড়াও হিন্দুস্থানের বাদশাহ শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশও সুলতানকে নিজের কন্যার স্বামী বানাতে চেয়েছিলেন।[৪৫৩] খানসার যুদ্ধের পর সন্ধিচুক্তিকে দৃঢ় করে তোলার জন্য নিজের মেয়েকে সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। কিন্তু ইতিহাসে কোথাও স্পষ্ট করে বলা নেই—এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে কি-না। তবে বাহ্যত এটাই দেখি যে, আকদের কথাবার্তা সম্পূর্ণ পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। তবে তা সম্পন্ন হবার আগেই দুই শাসকের সম্পর্ক ফের এত বেশি খারাপ হয়ে পড়ে যে, আত্মীয়তা করবার স্থলে তাদের মাঝে বাধতে থাকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আর এ কারণেই সুলতান জালালুদ্দীনের মন ভেঙে যায়। তিনি হিন্দুস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুলতানের স্ত্রীদের পরিণতি

সুলতান জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তার বেগমদের পরিণতি কেমন হয়েছিল? তারিখে জাহাঁকুশা গ্রন্থের পাদটীকা থেকে জানা যায়—সুলতানের বেগম সালগুরি খাতুন, যিনি শেষ পর্যন্ত সুলতানের সঙ্গে ছিলেন, কিছু বিশেষ লোকের সাথে রোমের সেলজুক সাম্রাজ্য থেকে সিরিয়ায় পৌঁছে গেছিলেন। পরবর্তীতে তার ভাই শিরাজের হাকিম আবু বকর ইবনে সাআদ তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। এতে করে তার বাকি জীবন সসম্ভ্রম ও প্রশান্তিতে কেটে যায়।[৪৫৪]

তারিখে জাহাঁকুশার বর্ণনা থেকে এ-ও জানা যায় যে, সুলতানের কিছু বেগমকে তাতার-সেনাপতি জিরমাগুন গ্রেফতার করেছিল। তারপর তাদের জীবনে নেমে এসেছিল কীসব করুণ পরিস্থিতি, তা একমাত্র সর্বজ্ঞ আল্লাহই খুব ভালো জানেন।[৪৫৫]

---

[৪৫৩] দেখুন : নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৭

[৪৫৪] জাহাঁকুশা ২/১৯০, তাবাকাতে নাসিরি ১৬/৩৭৪

[৪৫৫] জাহাঁকুশা ২/৩০০

সুলতানের সন্তানসন্ততি

সিন্ধুতীরের যুদ্ধের পূর্বেও সুলতানের সন্তানাদি ছিল। এই যুদ্ধে তার সাত বছরের এক পুত্র গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিল। সেই নিষ্পাপ পুত্রটিকে চেঙ্গিজ খানের নির্দেশে শহিদ করে দেওয়া হয়েছিল।[৪৫৬] কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়—সুলতানের তখন আরো কিছু সন্তান ছিল। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ছিল দুগ্ধপোষ্য। এরা সকলেই সেই যুদ্ধে তাতারদের হাতে শহিদ হয়ে গিয়েছিল।[৪৫৭] এদের মধ্য থেকে কোনো বাচ্চার অবস্থাই জানা যায় না।

সিন্ধুনদের ঐতিহাসিক ঘটনার পর থেকে সারা জীবনে কিমকারশাহ নামে সুলতানের এক পুত্র ও তুর্কান খাতুন নামে এক মেয়েরই শুধু উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুজন ব্যতীত ইতিহাসে অন্য কারুর উল্লেখ নেই। কিমকারশাহ খিলাত অবরোধের সময় ৩ বছর বয়সে মারা গিয়েছিল।[৪৫৮] আর তুর্কান খাতুন সুলতান জালালুদ্দীনের শাহাদাতের পর গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিল তাতারদের হাতে।[৪৫৯]

তুর্কান খাতুন বিনতে সুলতান জালালুদ্দীন

সুলতানের সকল পুত্রসন্তান তার জীবদ্দশাতেই পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তার এক অল্পবয়স্ক কন্যাসন্তান জীবিত ছিল। সেই কন্যার নাম সুলতানের দাদির নামের সাথে মিলিয়ে তুর্কান রাখা হয়েছিল। সুলতানের গুম হয়ে যাবার পর জিরমাগুন যখন সুলতানের বেগমদের গ্রেফতার করেছিল, তখন এই মেয়েটিকেও পেয়ে গিয়েছিল সে। তখন মেয়েটির বয়স ছিল ২ বছর। জিরমাগুন তাকে খাকান উকতাই বিন চেঙ্গিজ খানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর উকতাই খানের নির্দেশে এই বাচ্চাটিকে প্রতিপালন করা হতে লাগল।

এই কন্যা যখন যুবতী হয়ে উঠল, তখন তাকে হালাকু খানের কাছে সোপর্দ করে দেওয়া হল। হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণের কিছুকাল পূর্বে তুর্কান খাতুনকে মুসেলের মুসলিম শাসকের কাছে অর্পণ করে দিল, যেন শাসক মহোদয় তার পুত্র মালিক সালিহের সাথে তুর্কান খাতুনের বিয়ে দিয়ে দেয়। ফলে, ৬৫৫ হিজরি সনে এই কন্যার বিবাহ খুব ধুমধামের সাথে সম্পন্ন হয়েছিল।[৪৬০]

---

[৪৫৬] ইবনে খালদুন ৫/১১৯, ইবনে ওয়ার্দি ৩/২২৯

[৪৫৭] জাহাঁকুশা ১/১০৭

[৪৫৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩০৩, খাওয়ারিজম শাহি ১৮৯

[৪৫৯] জাহাঁকুশা ২/৩০১

[৪৬০] জাহাঁকুশা ৫/৩০০-৩০১

সুলতানের জানবাজ বিশ্বস্ত সাথি তৈমুর মালিক

তৈমুর মালিক খাওয়ারিজমের উত্তর-পূর্বের সীমান্ত শহর কুকন্দের হাকিম ছিলেন। তিনিই ছিলেন সেই প্রথম মর্দে মুজাহিদ, যিনি সীমান্তে বিপুল বিক্রমে তাতারদের মোকাবেলা করেছিলেন। বাহাদুর সৈন্যদলকে নিয়ে কয়েক মাস পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন তাতারদের সয়লাব। এর বিস্তারিত বর্ণনা এই বইয়ের প্রথম ভাগে অতিবাহিত হয়েছে।

কুকন্দের দীর্ঘ যুদ্ধের পর তৈমুর মালিক পালিয়ে রাজধানী আরগেঞ্চে চলে গিয়েছিলেন।[৪৬১] আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের মৃত্যুর পর যখন নতুন শাসক হিসেবে সুলতান জালালুদ্দীন রাজধানীতে পা রাখলেন, তৈমুর মালিক তখন সুলতানের সংবর্ধনা ও প্রতিরক্ষার জন্য বিপুল উত্তেজনায় সামনে এগিয়ে এসেছিলেন।[৪৬২] আরগেঞ্চ থেকে বেরিয়ে সুলতান যখন খোরাসানের দিকে রওনা দিলেন, তখন সুলতানের অগ্রগামী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তৈমুর মালিক।[৪৬৩]

সিন্ধুতীরের ঐতিহাসিক যুদ্ধে সুলতানের অধীনে তৈমুর মালিক শেষ পর্যন্ত প্রবল বিক্রমে লড়ে যাচ্ছিলেন। তারপর নদীর বুকে সুলতানের উড়ন্ত ঝাঁপ দেওয়ার পর যেসব বাহাদুর সিপাহি সর্বপ্রথম সুলতানের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে তৈমুর মালিকও ছিলেন।[৪৬৪]

সিন্ধুর এই ঘটনার পর থেকে সুলতানের হারিয়ে-যাওয়া পর্যন্ত, ইতিহাসে তৈমুর মালিকের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা আন্দাজ করতে পারি—তিনি হয়তো পূর্বের মতোই সুলতানের সঙ্গে থেকে জিহাদি মিশন আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন।

যা হোক, একসময় তৈমুর মালিক হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, এই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার পরিস্থিতি আর কখনোই সুস্থ হয়ে উঠবে না। তখন নিরাশ হয়ে তিনি দরবেশদের রূপ ধরে সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন। এক দীর্ঘ সময় সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

তার এই হিজরতের সময়টা কখন ছিল, ঐতিহাসিক বর্ণনাসূত্রগুলো নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি। তবে যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্য এটাই যে, এই ঘটনা হয়তো সুলতান জালালুদ্দীনের গোপন হয়ে-যাওয়ার পরই ঘটেছিল। কারণ, সুলতানের অবশিষ্ট যেসব আমির ও সঙ্গী ছিল, সুলতানের গুম হয়ে যাবার পর তাদের অধিকাংশ ঠিক

---

[৪৬১] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১১

[৪৬২] জাহাঁকুশা ২/১৩১

[৪৬৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪, দুটো বইতে 'দিমুর মালিক' লেখা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য তৈমুর মালিকই।

[৪৬৪] তারিখে নাহজতহায়ে মিল্লি ইরান ৫১৩

এভাবেই পার্শ্ববর্তী ইসলামি রাজ্যগুলোর দিকে হিজরত করে গিয়েছিল। আর এদের অধিকসংখ্যক লোক সেই সিরিয়া-অভিমুখেই গিয়েছিল।

মূলত, কুকন্দ থেকে বেরোবার পর তৈমুর মালিকের জীবনে কী ঘটেছে, ইতিহাস-লেখকরা তা সংরক্ষণ করতে পারেননি। তারিখে জাহাঁকুশা ও রওজাতুস সফার মতো গ্রন্থেও কুকন্দ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণের পর, তৈমুরের কেবল এই সিরিয়া-অভিমুখে হিজরত করে যাওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে ইতিহাস আমাদের আরেকটি ঘটনা জানায়, সেটি হল—চেঙ্গিজ খানের পুত্র উকতাই খানের শাসনামলে তৈমুর মালিক মাতৃভূমির ভালোবাসায় অপারগ হয়ে দু-দুবার সিরিয়া থেকে দেশে ফিরে এসেছিলেন। দেশে এসে দেখতে পেয়েছিলেন পূর্বেকার সবকিছুই বদলে গেছে। সমরকন্দ ও বোখারার মতো বিরাট শহরের ভেতর দেখেন হাতেগোনা কজন লোকের উপস্থিতি। তখন তৈমুর মালিক তার আত্মীয়স্বজনের খোঁজে উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-সেদিক ছুটে ফেরেন। তার আশা ছিল—তাদের মধ্যে কেউ হয়তো এখনো বেঁচে আছে।

তারপর কয়েক বছর তিনি ফারগানায় কাটান। তখন গোপনে বারবার কুকন্দে গিয়ে লোকজনকে তার পরিবারের সদস্যদের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। শেষমেশ অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে তিনি তার এক পুত্রের সন্ধান পেয়ে যান। সেই পুত্র কুকন্দে তাতারদের আক্রমণের সময় আত্মগোপন করে ছিল। সুযোগ পেয়ে তৈমুর মালিক তার পুত্রের সাথে গিয়ে দেখা করেন। বহুদিন পর পুত্রের চেহারা দেখে তার চোখ ভেঙে নেমে আসে অশ্রুর উষ্ণ ধারা। তিনি কান্না-কান্না গলায় দু-হাতে পুত্রের কাঁধ ধরে জিজ্ঞেস করেন—এখন তোমার বাবাকে যদি দেখো, চিনতে পারবে তুমি?

পুত্র খানিকটা বিতৃষ্ণ গলায় জবাব দিল—আমি যখন মায়ের দুধ পান করতাম, বাচ্চা ছিলাম, তখনই আব্বু আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন। তাকে আমি এখন কীভাবে চিনব, বলুন?

তৈমুর মালিক পুত্রের কাঁধ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছলোছলো চোখে আকাশের দিকে তাকান। সমুদ্রের প্রবল জোয়ার এসে যেন তার বুকের শক্ত পার ভেঙে দিচ্ছে; তবু নিজেকে তিনি সামলালেন।

হঠাৎ মাথা নেড়ে নেড়ে পুত্র বলে ওঠে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের একটা বুড়ো গোলাম আছে; ও বাবাকে চিনতে পারবে।

গোলামকে ডাকা হল। গোলাম এসে কপাল কুঁচকে গভীর দৃষ্টিতে তৈমুর মালিককে দেখতে লাগল। খানিক পরেই চিনে ফেলল মনিবকে। তৎক্ষণাৎ সে আবেগ-জর্জরিত হয়ে পড়ল—আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে-যাওয়া তার দয়ালু মনিব বহু বছর পর ঠিক তার সামনেই এখন দাঁড়িয়ে আছে। বহুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে নিষ্পলক চোখে সে তাকিয়ে রইল। পুত্রের জন্যও হারিয়ে-যাওয়া পিতার এই আচানক সাক্ষাৎ যেন পৃথিবীর সবচাইতে আনন্দদায়ক

ও বিস্ময়কর ঘটনা হয়ে ওঠে। সে ভাবে—এমন নামজাদা পিতার জন্য পূর্বে তার যতটা গর্ব হতো, তা কমই ছিল বলা যায়।

তারপর পুত্রের সাথে পরম শান্তিতে বেশিদিন কাটাবার সৌভাগ্য হল না তৈমুরের। কিছুদিন পরই তাকে তখনকার তাতার-সম্রাট উকতাই খানের দরবারে ডেকে নেওয়া হল। উকতাই খান তৈমুর মালিকের ব্যাপারে সবকিছু জেনে গিয়েছিল। তাই সে তৈমুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরম্ভ করল। সিংহহৃদয় তৈমুর মালিক তার আসল পরিচয় গোপন করলেন না। দুর্ধর্ষ সাহসিকতায় খুলে খুলে তিনি নিজের জিহাদের অনন্য কৃতিত্ব শোনালেন। তৈমুরের তিরের আঘাতে সেই যে কানা হয়ে গিয়েছিল এক তাতার-সিপাহি, সেও তাকে চিনে ফেলল। তৈমুর মালিকের হাতে তাতার-বাহিনী পূর্বে যতগুলো আঘাত খেয়েছে, তৈমুর উকতাইকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যেন তার কাটা ঘায়ে নুন ছিটাচ্ছিলেন।

বাধহীন জোয়ারের মতো তৈমুরের উদ্দাম সাহসিকতা বেড়েই চলল। শেষে ক্রুদ্ধতার চরমে পৌঁছে উকতাই খান এই মহান মুজাহিদকে শহিদ করে ফেলে।[৪৬৫]

মধ্য-এশিয়ার মুসলমান, বিশেষত তাজিকিস্তানের অধিবাসীরা, আজো তৈমুর মালিককে নিজেদের জাতীয় বীরসেনার মর্যাদায় ভূষিত করে থাকে।

জাহাঁ পাহলোয়ান উজবুক

এই লোক ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের বিশ্বস্ত সেনাপতিদের একজন। হিন্দুস্থানের বিজয়ধারায় তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একারণেই সুলতান জালালুদ্দীন তাকে হিন্দুস্থানের বিজিত এলাকাগুলোর গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। হিন্দুস্থান থেকে সুলতানের প্রত্যাবর্তনের পর ৭ বছর পর্যন্ত ভারতবর্ষে সুলতানের স্থলাভিষিক্ততার দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

এই দীর্ঘ সময়ে প্রিয় সুলতানের সাক্ষাৎ লাভের জজবা তাকে বারবার শাহি দরবারে হাজিরা দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলছিল। কিন্তু যখনই তিনি সুলতানের সাক্ষাতে সফর করবেন বলে ইচ্ছা করতেন, তখন জনসাধারণ (যারা তার ন্যায়বিচার দেখে মুগ্ধ হয়েছিল) তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত। বাধ্য হয়ে প্রতিবারই তাকে বদলাতে হতো নিজের সংকল্প।

তিনি খুবই ন্যায়বিচারক ও মহৎ শাসক ছিলেন। প্রজাকুল তার মনোযোগ ও অনুগ্রহে তার প্রতি ছিল খুবই প্রশান্ত। হিন্দুস্থানের তৎকালীন শাসক ইলতুৎমিশ জাহাঁ পাহলোয়ানের এই জনপ্রিয়তাকে নিজের ক্ষমতার জন্য কাল মনে করেছিলেন। ৬২৮ হিজরি সনের প্রথমদিকে সুলতান জালালুদ্দীনের ক্ষমতার চাঁদে যখন গ্রহণ লাগতে শুরু করেছিল, তখন ইলতুৎমিশ এই সুযোগটাকে

---

[৪৬৫] জাহাঁকুশা ১/৭২-৭৩

গনিমত মনে করে জাহাঁ পাহলোয়ানের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়ে তাকে হিন্দুস্থান ছাড়তে বাধ্য করেন।

জাহাঁ পাহলোয়ানের জানা ছিল—এ মুহূর্তে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রে সুলতান জালালুদ্দীনও বড় নাজুক অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য তিনি সিন্ধুনদ পার হয়ে সুলতানের খেদমতে হাজিরা দেওয়ার জন্য সোজা উত্তর ইরানে রওনা হয়ে গেলেন, যাতে সুলতানের সাক্ষাতে শীতল করতে পারেন তৃষিত আঁখিযুগল। তা ছাড়া নিজের সর্বশক্তি বিলীন করে যেন সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য সব খেদমত আঞ্জাম দিতে পারেন।

এই উদ্দেশে তার তহবিলে থাকা ২০ হাজার দিনার তিনি ইরাকের শাসক শারফুদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে এই অর্থ অতি দ্রুত সুলতানের খেদমতে প্রেরণ করা হয়। সুলতান জালালুদ্দীন যখন জাহাঁ পাহলোয়ানের আগমনের সংবাদ পেলেন, ইরাকের শাসককে নির্দেশ দিলেন—জাহাঁ পাহলোয়ান ও তার সাথিদের শীত মৌসুমটা ইরাকেই কাটাবার জন্য তাগিদ করো!

জাহাঁ পাহলোয়ানের মন সুলতানের সাক্ষাৎলাভের জন্য ডাঙায় তোলা মাছের মতন ছটফট করছিল। কিন্তু সুলতানের হুকুম তামিল করবার জন্য ইরাকেই রয়ে গেলেন তিনি। আল্লাহর মর্জি—কিছুদিন পরই কিছু দুশমন আক্রমণ চালিয়ে জাহাঁ পাহলোয়ানকে শহিদ করে ফেলে।[৪৬৬] বুকের মাঝে সুলতানের সাক্ষাতের তামান্না নিয়ে তিনি রওনা হয়ে যান অনন্ত আখেরাতের পথে।

আওর খান আলি নিশাপুরি

তিনি সুলতানের সেপাইদের মধ্যে জবরদস্ত যোদ্ধা, বীর ও আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন সেনা-অফিসার ছিলেন। বহু যুদ্ধে অনুপম বীরত্বের কারিশমা দেখিয়ে তিনি নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। গনজা, তারপর বিলকান, বারযা, সাকবির, শিজসহ বিভিন্ন বিজয়ে তার ভূমিকা ছিল সর্বাধিক প্রস্ফুটিত।

বাতেনিদের (ইসমাইলি) গ্রীবায় তার ধাতব পাকড়াও ছিল খুবই শক্ত। শেষে ক্রুদ্ধ ফেদাইরা তাকে শহিদ করে দিয়েছিল। এই শোকাকুল ট্রাজেডিই সুলতান জালালুদ্দীনকে বাতেনিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।[৪৬৭]

আওর খানের ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল আসির বলেছেন—তিনি খুবই ভালো আমির ছিলেন। নেকির কাজ বেশি করতেন। সচ্চরিত্রবান ছিলেন। সুলতানের সৈন্যদের লুটপাট ও অন্যান্য বাড়াবাড়িতে তিনি বাধা প্রদান করতেন।[৪৬৮]

নোট : সুলতান জালালুদ্দীনের আরো এক বিশ্বস্ত সিপাহসালারের নাম ছিল আওর খান। তার আলোচনা খানিক বাদেই আসবে।

---

[৪৬৬] ইবনে খালদুন ৫/১৩৭, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৪৬-৩৪৭, খাওয়ারিজম শাহি ২০৪

[৪৬৭] ইবনে খালদুন ৫/১২৪-১২৫, খাওয়ারিজম শাহি ১৬৪

[৪৬৮] ইবনে আসির ৭/৬৪০

মালিক নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ

মালিক নুসরাত উদ্দীন ছিলেন হাসান ইবনে খিরমিল নামের এক নামজাদা সরদারের পুত্র। ঘুরি শাসকদের যুগে তার পিতা হেরাতের হাকিম ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের উত্থানকালে খাওয়ারিজমি সিপাহিরা হেরাতে আক্রমণ করে হাসান ইবনে খিরমিলকে হত্যা করে ফেলেছিল। হেরাত অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল খাওয়ারিজমি সাম্রাজ্যের। তারপর থেকে হাসান ইবনে খিরমিলের সন্তানরা খাওয়ারিজমিদেরকে নিজেদের শত্রু ভাবতে শুরু করেছিল।

যখন তাতারদের হাতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, ধ্বংস ও বিধ্বস্ততার সেই তুফান রুখে দিতে সুলতান জালালুদ্দীন যখন কর্মমুখর ময়দানে নেমে এলেন, তখন নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ পূর্বের শত্রুতা ভুলে উম্মাহর কল্যাণে সুলতানের সহযোদ্ধা হয়ে উঠলেন।

বিভিন্ন নাজুক পরিস্থিতিতে নিরুপম একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। সিন্ধুতীরের যুদ্ধেও তিনি সুলতানের সঙ্গে ছিলেন। তারপর ভারতবর্ষের মাটিতে সুলতানের থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে সিন্ধের শাসক কিবাছার রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। কিছুদিন সেখানে থেকে শেষমেশ সুলতানের খেদমতেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন (এ বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

হিন্দুস্থান থেকে ফেরার সময় সুলতান তাকে ইস্পাহানের পুলিশপ্রধান নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। এবং জীবনধারণের উপকরণের চিন্তা থেকে মুক্ত করতে তার নামে লিখে দিয়েছিলেন বড় একটি জায়গির।

অভ্যাসের দিক থেকে অত্যন্ত চরিত্রবান, সদা হাস্যোজ্জ্বল ও মার্জিত রুচিবান ছিলেন তিনি। এজন্য সুলতান জালালুদ্দীন তাকে খুব ভালোবাসতেন। সুলতানের ভাই গিয়াসুদ্দীন একটি ব্যক্তিগত বিতর্কের জের ধরে তাকে হত্যা করে ফেলেছিল; সুলতানকে করেছিল একজন একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত নায়েব থেকে বঞ্চিত।[৪৬৯]

আমান মালিক

ইতিহাসবিদগণ আমান মালিককে আমিনুদ্দীন মুলক, আমিন মালিক, ইয়ামিন মালিক, মালিক খান ও খান মালিক নামে স্মরণ করে থাকেন। তিনি ৫০ হাজার সিপাহির আমির, তুর্কিদের কানকলি গোত্রগুলোর নেতা এবং সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের মামাতো ভাই ও তার শ্বশুর ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের সময়কাল থেকে হেরাতের শাসক ছিলেন তিনি। সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে সর্বতোভাবে জিহাদে শরিক হয়েছিলেন। খোরাসানের যুদ্ধগুলোতে সুলতানের বাহিনীর ডান বাহুর বেশি অংশ তারই অধীনস্থ তুর্কি

---

[৪৬৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৪১-২৪২; খাওয়ারিজম শাহি ১৭৪; জাহাঁকুশা ২/৩০৩

যুবকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। সিন্ধুর যুদ্ধে প্রাণ উজাড় করে দুশমনের মোকাবেলা করেছিলেন। বারবার তিনি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু শেষকালে ডান বাহু ও সেন্টারের মাঝখানে তাতাররা প্রতিবন্ধক হয়ে সুলতানের থেকে তাকে পৃথক করে দিয়েছিল। বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল ইসলামি বাহিনীর জমাটবদ্ধ শক্তি।

সেসময় আমান মালিক মধ্যখানে প্রতিবন্ধক হয়ে-ওঠা শত্রুদলকে কেটে-কুটে সুলতানের দিকে অগ্রসর হবার বদলে পেশোয়ারের দিকে পিছপা হয়ে গিয়েছিলেন। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগোচ্ছিলেন তিনি। তারপর পেশোয়ারের কাছাকাছি পৌঁছতেই তাতারদের কবলে পড়ে শহিদ হয়ে গেছিলেন।[৪৭০]

আমান মালিকের জিহাদি কীর্তিগাথা শেষদিকে, সুলতানকে যুদ্ধক্ষেত্রে দুশমনের কবলে ফেলে তিনি যে পলায়নপথ অবলম্বন করেছিলেন, এই ব্যাপারটা তার বিশ্বস্ততাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও যথেষ্ট সংশয়যুক্ত করে তোলে। তিনি কি তখন উম্মাহর কথা বাদ দিয়ে স্রেফ নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন? কিন্তু সম্ভাবনা আছে, আমান মালিক যখন সুলতানের সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন, তখন যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্রপট এতোটাই বিগড়ে গিয়েছিল যে, সুলতানের কাছে গিয়ে পৌঁছার এবং তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা ছিল তার পক্ষে অনর্থক। এই ভেবেই হয়তো তিনি খাওয়ারিজমি বাহিনীর সেন্টারের দিকে এগোননি।

আরেকটা সম্ভাবনাও আছে। সুলতান জালালুদ্দীন হয়তো পূর্বেই ফরমান জারি করে রেখেছিলেন, এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে নিষ্ফল সংঘর্ষে না জড়িয়ে সবাই যেন নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে এবং অন্য কোনো ময়দানে গিয়ে জড়ো হয়ে শত্রুদের উপর শক্ত আঘাত হানতে সংরক্ষণ করে নিজেদের শক্তি।

এরকম কোনো দিকনির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমান মালিক পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার এই পলায়ন 'লড়াইয়ের কৌশল অবলম্বনের জন্য, কিংবা অন্য কোনো বাহিনীর সাথে গিয়ে মেশার জন্য'[৪৭১] আয়াতের হুকুমের মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে সুধারণা রাখাই উত্তম। কারণ, এখানে সুধারণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

আতাবেগ আবু বকর বিন সাআদ

তিনি ছিলেন শিরাজের হাকিম সাআদ বিন জঙ্গির ছেলে। অত্যন্ত সাহসী, সচেতন ও হুঁশিয়ার ছিলেন। এই শাহজাদা প্রথমে খাওয়ারিজমি শাসকদের শক্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে স্রেফ এজন্য বিদ্রোহ করেছিলেন যে, তার

---

[৪৭০] জামিউত তাওয়ারিখ ৩৭৬, জাহাঁকুশা ২/১৩৫, ১৯২

[৪৭১] সুরা আনফাল, আয়াত ১৬

পিতা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বিদ্রোহের অপরাধে পিতা তাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নিক্ষেপ করেছিলেন। লম্বা সময় ধরে জেলখানার সাজা ভুগ করছিলেন তিনি। তারপর সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ যখন হিন্দুস্থান থেকে ফিরলেন, শিরাজে জিরোতে বসবার সময় সাআদ বিন জঙ্গিকে সুপারিশ করে আবু বকর বিন সাআদ বিন জঙ্গিকে তিনি মুক্ত করিয়ে দিলেন। আবু বকর বিন সাআদ সুলতানের এই উত্তম আচরণে এতটাই প্রীত হলেন যে, খাওয়ারিজমিদের প্রতি তার মনে এতদিন যে ঘৃণা ছিল, তা রূপ নিল পরম ভালোবাসায়। তিনি সুলতানের বাহিনীতে যোগ দিয়ে দীর্ঘ সময় জিহাদে মশগুল রইলেন। বিশেষত ইস্পাহানের যুদ্ধে তার প্রদর্শিত বীরত্ব ছিল প্রশংসনীয়।

সুলতান তাকে নিজের ভাইদের চেয়েও প্রিয় আসনে স্থান দিয়েছিলেন। প্রায় ৬ বছর পর্যন্ত সুলতানের সাথে ছিলেন তিনি। তারপর তার পিতা তাকে অলি আহাদ বানানোর জন্য শিরাজে ফিরিয়ে নেন। ৬২৭ হিজরি সনে পিতার মৃত্যুর পর তিনি শিরাজের শাসক হয়ে ওঠেন। অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। বিশ্ববিখ্যাত কবি শেখ সাদি শিরাজি আবু বকরের শাসনকালেই পৃথিবীখ্যাত কাব্যগ্রন্থ গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ রচনা করেছিলেন।[৪৭২]

আওর খান

উনি সুলতানের সেই গর্বিত জেনারেল, শেষ পর্যন্ত যিনি সুলতানের সঙ্গে ছিলেন। সুলতানের ছাউনিতে অতর্কিতভাবে নৈশ হামলা চালিয়েছিল যে তাতার-বাহিনী, আওর খানই তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে সুলতানকে গ্রেফতার হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন।

পরে তিনি সুলতানের আদেশে বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যকে তার সঙ্গে নিয়ে ইস্পাহানের দিকে চলে গিয়েছিলেন, যাতে সুলতান এই বড় দলটিতেই আছেন ভেবে তাতাররা বিভ্রমে পড়ে এবং তাদের পেছনেই ছুটতে শুরু করে আর এদিকে সুলতানের মিলে যায় বেঁচে যাবার সুযোগ। কিন্তু এই কৌশল সফল হয়ে ওঠেনি। তাতাররা দস্তুরমতো সুলতান জালালুদ্দীনের পিছু লেগে পড়ে। অন্যদিকে আওর খানের বাহিনী ইস্পাহান পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ পেয়ে যায়।

যা হোক, আওর খান যেহেতু সুলতানের হুকুম তামিল করেছিলেন, এজন্য তার এই মুক্তভাবে চলে যাওয়াতে কোনো প্রশ্ন ওঠে না।[৪৭৩] আওর খান ৬৩৯ হিজরি পর্যন্ত ইস্পাহানে বসবাস করেন। তারপর তাতাররা সেখানে চড়াও হয়ে শহর দখল করে ফেলে।[৪৭৪]

---

[৪৭২] জাহাঁকুশা ২/১৫১ পার্শ্বটীকা-সহ। খাওয়ারিজম শাহি ১৫২, ইবনে আসির ৭/৬৪৪

[৪৭৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৭৯, খাওয়ারিজম শাহি ২১৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯

[৪৭৪] ইবনে খালদুন ৭/১৪০

সুলতানের দরবারে আলেম ও সাহিত্যিকগণ

শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আন-নাসাবি

শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মদ আন-নাসাবি ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীনের রাজকীয় লেখক ও জীবনীকার। নাসার উপান্তবর্তী খারন্দিজ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যৌবনের শুরুতেই তার ইলমি যোগ্যতার প্রসিদ্ধি দূর-সুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আন-নাসাবির বাবা ছিলেন জায়গিরদার। বাবার মৃত্যুর পর স্বয়ং নাসাবিকেই সেই জায়গিরের পরিচালনার ভার সামলাতে হয়েছিল।

তখনকার কোনো এক দিনে তাতাররা খাওয়ারিজমে হামলা করে বসেছিল। তখন নাসাবির আমলাদের নিয়ে তাতারদের মোকাবেলা করার মতো সমর্থ ছিল না। তাই বদলা হিসেবে আক্রমণকারীদের ১০ হাজার কাপড়ের থান দেবেন বলে প্রস্তাব করেন। বদলার এ বিপুল সম্পত্তি এই লুটেরাদের আশার চেয়েও বেশি ছিল। এই ছোট্ট জায়গির থেকে তারা নিজেরা লুটপাট করে এতকিছু পেতও না। এজন্য বদলা উসুল করে নিয়ে তারা সামনে চলে গেল।

সাময়িকভাবে তো তারা চলে গেল; কিন্তু এই হাঙ্গামার সময় কোনো স্থানই নিরাপদ ছিল না। ফলে, অবশেষে নাসাতেও তাতারদের আক্রমণ ঘটে। এতে ধ্বংস হয়ে যায় সমস্ত শহর। নাসাবি তবু স্বদেশ ছাড়েননি। তাতারদের তুফান যখন চলে গেল, নাসার হাকিম নুসরাত উদ্দীন সেখানে নতুন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করে ফের দ্বিতীয়বার নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিলেন। এই রাজ্যে উজিরের সমমর্যাদা পেয়েছিলেন আন-নাসাবি। প্রায় ২ বছর এই রাজ্য সুলতান জালালুদ্দীনের ভাই গিয়াসুদ্দীন পিরশাহের অধীনে চলে। এর ভেতর একসময় নাসাবিকেও উম্মাহ ও স্বদেশের প্রতিরক্ষায় তরবারি ওঠাতে হয়। তিনি নশজোয়ান এলাকার এক রণক্ষেত্রে তাতারদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অংশগ্রহণ করেন।

সুলতান জালালুদ্দীন তখন হিন্দুস্থানে ছিলেন। নাসাবি এই মহাপুরুষকে উম্মাহ ও রাজ্যের ভাগ্য-তারকা মনে করতেন। এজন্য সুলতান যখন হিন্দুস্থান থেকে ফিরে এলেন, নাসাবি সুলতানের সংশ্রবে থাকবার জন্য তখন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সুলতান যখন মারাগেহ অভিযানে ব্যস্ত, নাসাবি তার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। সুলতান নাসাবির সঠিক যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা আঁচ করতে পেরে তাকে নিজের লেখক হিসেবে নিযুক্ত করে নেন।

নাসাবি প্রায় সব স্থানেই সুলতানের সাথে থেকেছেন। সবরকমের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একেবারে শেষ পর্যন্ত সুলতানের প্রকৃত বিশ্বস্ত হিসেবে ছিলেন। সুলতানও তার প্রতি অনেক ভরসা রাখতেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার কাছে অভিমত কিংবা পরামর্শ চাইতেন। একদা নাসার শাসনকার্যের জন্য যখন সুলতান কোনো উপযুক্ত লোক পাচ্ছিলেন না, তখন সে শহরের শাসনভার নাসাবিকেই প্রদান করেছিলেন। কিন্তু নাসাবির পক্ষে সুলতানের কাছ থেকে দূরে থাকা ছিল কষ্টকর। এজন্য সুলতানের অনুমতিক্রমে তিনি নাসা শহরে তার এক নায়েব নিযুক্ত করে সুলতানের খেদমতে এসে পড়েন।

নাসাবি সুলতানের জীবনের শেষ দিনগুলোতে দরবারে খাওয়ারিজমের দূত হিসেবে মুসলিম সুলতানদের তাতার-বিরোধী জিহাদে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাতে গিয়েছিলেন। তাদেরকে রাজি করাতে তিনি পূর্ণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আফসোস, কোথাও তার চেষ্টা সফল হয়নি।

শেষদিকে যখন সুলতানের ক্যাম্পে রাত্রিবেলা তাতাররা আক্রমণ করল, আর সুলতান তাদের কবল থেকে বাঁচার জন্য রাতের প্রগাঢ় অন্ধকারে অজানা মনজিলের দিকে বেরিয়ে পড়লেন, সেই রাতে আক্রমণের আগে সুলতানের সাথেই ছিলেন নাসাবি।

দুশমন আচানক আক্রমণ করে বসলে সবাই একেবারে দিকশূন্য হয়ে গেল। কে কোথায় ছুটছিল, কারুর কোনো হুঁশ ছিল না। অন্ধকারের ভেতর নাসাবিও জানতে পারেননি সুলতান কোথায়? ভোরের আলো ফুটে উঠলেও নাসাবি সুলতানের কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না। তিনি তখন খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সুলতানের প্রতি তার ছিল হৃদয় উজাড়-করা ভালোবাসা। প্রিয়তমের উপস্থিতিতে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। কিন্তু বন্ধু-বিচ্ছেদের পর তার সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে—এইবার কোনদিকে তিনি কদম ওঠাবেন!

কিছুকাল তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক ছুটে ফিরতে থাকলেন। একদিন তার সামনে পড়ে গেল তাতারদের একটি সৈন্যদল। তাতাররা তাকে গ্রেফতার করে নিল। তার থেকে গোপন তথ্য লাভের আশায় তাকে হত্যা না করে একটি জেলখানায় পুরে রাখল। দুই মাস বিভিন্ন কঠোরতা ও দুঃখ-যাতনা সইবার পর কোনো-না-কোনোভাবে জেলখানা থেকে তিনি পালাতে সক্ষম হলেন। পড়ি-কি-মরি করতে করতে পৌঁছে গেলেন মায়াফারকিন। সেখানে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে জানতে পারেন কিছুদিন আগে সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ এক কুর্দি ডাকাতের হাতে শহিদ হয়ে গেছেন।

আহমাদ আন-নাসাবি সুলতানের শাহাদাতের ১০ বছর পর, ৬৩৮ হিজরি সনে, প্রিয় বন্ধুর জীবনোপাখ্যান লিখতে শুরু করেছিলেন। এ গ্রন্থের শুরুতে তিনি

উল্লেখ করেছেন তাতারদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তারপর সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের শাসনকালের শেষদিকে আলাউদ্দীনের বাগদাদ আক্রমণের ঘটনা থেকে শুরু করে সুলতান জালালুদ্দীনের শাহাদাত পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই বইটি সহজবোধ্য গতিময় আরবি ভাষায় লেখা হয়েছে।

সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনকীর্তি নিয়ে রচিত এই গ্রন্থটিই এ বিষয়ে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উৎস। কারণ, এতে আন-নাসাবি সুলতান সম্পর্কিত সেসব ঘটনাই রচনা করেছেন, যা তার চোখের সামনে ঘটেছে কিংবা তিনি সুলতানের উজির ও আমিরদের থেকে শুনেছেন।[৪৭৫] এই গ্রন্থ রচনার কিছুকাল পরেই ৬৩৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন আন-নাসাবি।

আন-নাসাবি প্রণীত 'সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন' অষ্টম ও নবম হিজরি পর্যন্ত তো মুসলিমবিশ্বের সকলের কাছেই পরিচিত ছিল; কিন্তু তারপর সময়ের কঠিন ঘূর্ণাবর্ত এই বইটি দুষ্প্রাপ্য করে দিল। এমনকি একসময় এর নামও জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে হয়ে গেল চির অপরিচিত।

আঠারো এবং উনিশ শতকে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইসলামি রাজ্যগুলো দখল করে ধনসম্পত্তির পাশাপাশি ইলমের যে ভান্ডার লুট করেছিল, তার মধ্যে এই দুর্লভ গ্রন্থটির একটি কপিও ইউরোপে পৌঁছে গিয়েছিল। ওরিয়েন্টালিস্টরা বইটির উপর প্রচুর কাজ করেছে। এবং ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিস থেকে সেটিকে নতুন করে প্রকাশ করেছে। আর এভাবেই অবলুপ্ত হয়ে-যাওয়া এই মহা মুক্তো আহলে ইলমদের হাত পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

আল্লামা সাক্কাকি

আল্লামা আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ আস-সাক্কাকি আল-খাওয়ারিজমি ছিলেন খাওয়ারিজমি দরবারের বিশেষ আলেমদের একজন। সকল ইলম ও শাস্ত্র নিয়ে তিনি কাজ করতেন। এতেই ছিল তার রোজগার। তিনি ৫৫৪ হিজরিতে (১১৫৯ খ্রিষ্টাব্দ) খাওয়ারিজমে জন্মগ্রহণ করেন। তখন খাওয়ারিজমে সুলতান জালালুদ্দীনের পরদাদা ইল আরসালানের শাসন ছিল।

আল্লামা সাক্কাকির অমরকীর্তি তার লিখিত গ্রন্থ 'মিফতাহুল উলুম'। এই গ্রন্থটি সরফ, নাহু, বালাগাত, মাআনি, বাদি ও অন্যান্য আরবি ইলমের ভান্ডার। এ গ্রন্থের খোলাসা- তালখিসুল মিফতাহ ও খোলাসার ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুখতাসারুল মাআনি আজো দরসে নেজামির পাঠ্যভুক্ত।

আল্লামা সাক্কাকি বিভিন্ন তদবির ও ঝাড়ফুঁক প্রদানেও দক্ষ ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ বাগদাদে নিষ্ফল বাহিনী প্রেরণের পর সাক্কাকিকে

---

[৪৭৫] খাওয়ারিজম শাহি ২৬৭-২৭০, আবুল ফিদা ১২৯-১৫৪, ইবনে খালদুন ৫/১২১

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল খলিফা নাসিরকে ধ্বংস করে দেবার। তখন আল্লামা সাক্কাকি একটি পুতুল বানিয়ে ফেলেন। খাওয়ারিজম শাহ সেই পুতুল কাজি মুজিরুদ্দীন সাআদ ইবনে উমরের মাধ্যমে বাগদাদের কোনো-এক কোণে জমিনে পুঁতে দিলেন। কিন্তু এই ভেল্কি খলিফা নাসিরের কিছুই করতে পারেনি। উলটো কয়েক মাসের ভেতর স্বয়ং খাওয়ারিজম শাহের 'ভাগ্যতারকা'ই উলটে গিয়েছিল।

সুলতানের শাহাদাতের পর তাতাররা যখন চতুর্দিক দখল করে ফেলেছিল, চোগতাই বিন চেঙ্গিজ খান তখন আল্লামা সাক্কাকির জ্ঞানবিজ্ঞানের বিপুল প্রসিদ্ধির কথা শুনে নিজের কাছে তাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেল। আল্লামা সাক্কাকি গোপন ঝাড়ফুঁকের জোরে চোগতাই খানের সামনে নিজের এমন-এমন কামালিয়াত দেখালেন, চোগতাই খান বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। আল্লামাকে নৈকট্যভাজন বানিয়ে তার সম্মানপ্রদর্শনে কোনো কমতি করল না সে।

একদিন চোগতাই খান শিকারের জন্য বের হল। এক জায়গায় সে পাখিদের একটি দলকে কাতার বেঁধে সম্মোহিতের মতো বসে থাকতে দেখল। কামানে তির চড়িয়ে নিশানা ঠিক করতে লাগল। তখন আল্লামা সাক্কাকিও চোগতাইয়ের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন, কোন পাখিটি আপনার দরকার?

চোগতাই বলল, প্রথম, শেষ ও মাঝেরটি।

আল্লামা সাক্কাকি জমিনে আঙুলের মাথা দিয়ে একটি বৃত্ত টেনে সেখানে ফুঁক মারলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কাঙ্ক্ষিত তিনটে পাখি হুড়মুড় করে তার টানা সেই বৃত্তের ভেতর গড়িয়ে পড়ে। এ দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে দম বন্ধ হবার জোগাড় চোগতাইয়ের। আল্লামা একটা সময় পর্যন্ত তাতারদের দরবার থেকে আরাম-আয়েশের উপকরণ পেয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যলিখিত পরিণতি কারুরই পিছু ছাড়ে না। একদিন কোনো-এক হিংসুকের অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে চোগতাই খান আল্লামাকে বন্দি করে ফেলে। সেই বন্দিত্বের মধ্যেই ৬৫৫ হিজরি সনে তার মৃত্যু ঘটে।[৪৭৬]

নোট : ওফায়াতুল আ'লাম, খণ্ড ২ ও অন্যকিছু গ্রন্থে আল্লামা সাক্কাকির মৃত্যুসন ৬২৬ হিজরি বলা হয়েছে। এই বর্ণনা সঠিক নয়; কারণ, অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে ৬২৭ হিজরি সনে তিনি সুলতান জালালুদ্দীনের দরবারে ছিলেন এবং তার নির্দেশে বাগদাদে গিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি, সুলতান জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর চোগতাই খানের দরবারেও নির্দিষ্ট একটা সময় তিনি পার করেছিলেন। এ ধরনের বর্ণনাগুলো দেখে ৬২৬ হিজরিতে যে তার মৃত্যু ঘটেছে, সেই বর্ণনা বিশ্বাস করা যায় না।

---

[৪৭৬] মুজামুল উদাবা ২০/৫৫-৫৯, খাওয়ারিজম শাহি ২৭৪, রওজাতুস সফা ৫/৪৪, বৈরুত থেকে ছাপানো 'মুখতাসারুল মাআনি' গ্রন্থের হাশিয়া।

মাদ্রাসা ও মসজিদ
স্থাপিতঃ ২০২০ইং

শামসুল মুলক শিহাবুদ্দীন আলপ

উনি ছিলেন খুব জ্ঞানী লোক। সমস্যা-সমাধান ও পরিচালনার কাজে অভিজ্ঞ ছিলেন। জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে তার বিস্তৃত জানাশোনা ছিল। সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ যখন নিজের শাসনকালেই শাহজাদাদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ-বণ্টন করে দিয়েছিলেন, তখন শামসুল মুলকের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ করে জালালুদ্দীনের উজিরে আজম হিসেবে তাকে নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের মৃত্যুর পর যথারীতি তিনি জালালুদ্দীনের বিশ্বস্ত হয়েই থাকলেন। সিন্ধু-যুদ্ধের সময়ও সুলতানের সহযোদ্ধা ছিলেন তিনি। এই হাঙ্গামায় যখন সুলতানের অধিকাংশ সৈন্য শহিদ এবং বাকিরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, শামসুল মুলকও তখন সুলতানের থেকে পৃথক হয়ে সিন্ধু উপত্যকার দিকে চলে গিয়েছিলেন।

তারপর সেখানে সিন্ধের হাকিম কিবাছা তাকে নজরবন্দি করে ফেলে। কিছুদিন পর তাকে হত্যা করে ফেলে। কিবাছার এই কুকর্মে সুলতান জালালুদ্দীন অত্যন্ত রাগান্বিত হন। কিবাছার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ বিষয়ের সবিস্তার পর্যালোচনা হিন্দুস্থানের যুদ্ধ-আলোচনায় গেছে।[৪৭৭]

কামালুদ্দীন ইসমাইল

তিনি ফারসি ভাষার অত্যন্ত শক্তিমান একজন কবি ছিলেন। বড় বড় কবিদের তালিকায় তিনিও গণ্য হতেন। প্রথমে সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের তারপর সুলতান জালালুদ্দীনের আশ্রয়ে বসবাস করতেন। একদা সুলতান জালালুদ্দীন ইস্পাহানে অবস্থান করছিলেন। তখন সুলতানের শানে কামালুদ্দীন ইসমাইল নিম্নোক্ত স্মরণীয় কবিতাটি পাঠ করেন[৪৭৮] :

بسیط روئے زمین گشت باز آباداں

بیمن سیر سپاہ خدایگان جہاں

শাহে আলমের কর্মযজ্ঞের বরকতে নতুন করে আবাদ হয়েছে ভূপৃষ্ঠ।

کند تہنیت یکدگر ہمی بحیات

بقیتی کہ زانساں بماند واز حیواں

মানবকুল ও পশুশ্রেণি থেকে বেঁচে গিয়েছিল অবশিষ্ট যারা, আজ একে অন্যকে জানাচ্ছে নব জীবনের মোবারকবাদ।

---

[৪৭৭] ইবনে খালদুন ৫/১১৯, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬০

[৪৭৮] জাহাঁকুশা ২/১৬৫

زباغ سلطنت ایں یک نہال سر بکشید

کہ برگ او ہمہ عدل ست و بار او احساں

সাম্রাজ্যের বাগিচায় গজিয়ে-ওঠা এটি এমন এক কচি নবীন চারা, যার পাতা হল ন্যায়বিচার এবং ফল হল ইহসান।

برائے بندگیٔ رگہش دگر بارہ

ز سر گرفت طبیعت تو الد انساں

বিধি স্রেফ তার গোলামি করবার জন্য মানবসৃষ্টির ধারা ফের চালু করে দিয়েছেন।

جلال دنیا و دیں منکبرتی آں شاہے

کہ ایزدش بسزا کرد بر جہاں سلطاں

জালালে দুনিয়া ও দীন মুনকাবিরাতি হলেন সেই মহান বাদশাহ, যাঁকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ যোগ্যতার পাশাপাশি পৃথিবীর বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

زہے معراج قدرّت ورائے طور کمال

زہے معانی خوبت بروں ز حصر بیاں

বাদশাহে সালামত, আপনার মর্যাদার উচ্চতা তুর পাহাড়ের চাইতেও বেশি। কী বিপুল সেই মর্যাদা! আর আপনার নিষ্কলুষ উন্নত চরিত্র, তা তো বর্ণনা করবার শক্তি-সাধ্য নেই কারুর। কী মহিমময় সেই চরিত্র!

جہاں ستانا ایزد ترا فرستادست

کہ چار حد جہاں ملک تست رو بستاں

হে বিশ্ববিজেতা, আল্লাহ আপনাকে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত সীমানা তোমার বাদশাহির অধীনে, যাও এবং নিয়ে নাও সেই বাদশাহি।

گواہ ملک تو عدلست ہر کجا خواہی

بنیک محضری خود گواہ می گزراں

আপনার রাজত্বের সাক্ষী স্বয়ং আপনার ইনসাফ। এজন্য আপনি যখনই যেখানে চান, আপনার সচ্চরিত্রের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবেন।

تو عمر نوح بیابی از آنکہ در عالم

عمارت از تو پدید آمد از پس طوفاں

আপনি যেন নুহের বয়স পান! কারণ, আপনার জন্যই পৃথিবীতে তাতার-তুফানের পর উদ্ভব ঘটেছে নতুন জনপদের।

تو دادِ اسلام بستدی ز صلیب

تو بر گرفتی ناقوس راز جائے اذاں

আপনিই ক্রুসেডারদের থেকে ইসলামের বদলা নিয়েছেন। আপনিই আজানখানা থেকে শিঙ্গার কুসংস্কার ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন (এটা জর্জিয়ান খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সুলতানের জিহাদের দিকে ইঙ্গিত)।

حجاب ظلم تو برداشتی ز چہرہ عدل

نقاب کفر تو بکشادی از رخِ ایماں

আপনি ইনসাফের চেহারা থেকে জুলুমের গিলাফ খুলে ফেলে দিয়েছেন। আপনি ঈমানের চেহারা থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন কুফরের নেকাব অর্থাৎ মুনাফিকদের নেফাকি প্রকাশ করে দিয়েছেন।

ز بازوئے تو قوی گشت بازوئے اسلام

کہ از مصادم کفار گشت بدویراں

আপনার বাহুর বদৌলতে ইসলামের সেই বাহু শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, কাফেরদের উপর্যুপরি আক্রমণে যা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

براق عزم تو گامے لہ بر گرفت ز ہند

نہادِ گام دوم بر اقاصّی ارّاں

আপনার সংকল্পের বোরাক এতোই দ্রুতগতিসম্পন্ন যে, আপনি যখন হিন্দুস্থান থেকে এক পা ওঠান, তখন দ্বিতীয় পা আর্রান অর্থাৎ আজারবাইজানের শেষ সীমান্তে গিয়ে পড়ে।[৪৭৯]

کہ بود جز تو شاہان روزگار کہ داد

قضیم اسپ ز تفلیس و آب از عمّاں

আপনি ছাড়া এ যুগের বাদশাহদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি তিফলিসে ঘোড়াকে দানা খাইয়ে আম্মানে পৌঁছে তাকে পান করান পানি![৪৮০]

---

[৪৭৯] সুলতান জালালুদ্দীন হিন্দুস্তান থেকে ফেরার পরপরই, খুব অল্পসময়ের মধ্যেই, কিরমান থেকে শুরু করে আজারবাইজান পর্যন্ত সমস্ত এলাকার পরিভ্রমণ সম্পন্ন করেছিলেন, এখানে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

زلعب تیغ تو در ضرب خصم شہ ماتست

باسپ و پیل چہ حاجت یکے پیادہ براں

যুদ্ধে প্রতিপক্ষপকে ঘায়েল করবার জন্য আপনার তরবারির ভেল্কিই যথেষ্ট। আপনার কীসের প্রয়োজন হাতি-ঘোড়ার? যুদ্ধে ব্যস পায়ে হেঁটেই অগ্রসর হোন।

ز شوق نام تو منبر ہمیشہ در محراب

چو کودکان ہمہ آدینہ خواہد یزداں

আপনার নামের মহব্বতে মসজিদের মিম্বার-মিহরাবে বাচ্চাদের মতো অস্থির হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করি—সর্বদা যেন জুমআই থাকে (উদ্দেশ্য হল—জুমুআ বারবার আসুক, যাতে খুতবায় বারবার উচ্চারিত হয় সুলতানের নাম)।

سخاوتت بسلم در جہاں ہمی بخشد

زرے کہ نقش وجودش نگشت سکہ کاں

নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্তির সময় আপনার দানশীলতা পৃথিবীকে এমন স্বর্ণভাণ্ড প্রদান করে, কানের দুলের খাঁটি সোনা ঢেলে বানানো যে স্বর্ণমুদ্রা, তা আপনার স্বর্ণভাণ্ডের বাহ্যিক নকশাচিত্রের সমপরিমাণও হবে না

بعہد عدل تو گرگ از پے خوش آمدیش

جو خر س مصطبہ بازی کند بچوبِ شباں

আপনার ইনসাফের সময় ভেড়াও বকরির সাথে আনন্দপূর্ণ সম্পর্ক করে পরস্পরে মিলেমিশে পান করে (উদ্দেশ্য হল তার ইশারায় চলে এবং তাবেদার হয়ে থাকে সবসময়)।

মুনশি নুরুদ্দীন

সুলতানের দরবারে বসবাসকারী বক্তাদের মধ্যে নুরুদ্দীন মুনশির ছিল বিশেষ অবস্থান। মুনশি সাহেব ফারসি কবিতা ও গদ্যের এক অনুপম ভাষাভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন। সুলতানের প্রশংসায় প্রতিমুহূর্তে পঞ্চমুখ থাকতেন। তার একটি কাসিদা এমন[৪৮১] :

---

[৪৮০] সুলতান জালালুদ্দিনের পৃথক একটি বৈশিষ্ট্য ছিল দ্রুত যুদ্ধযাত্রা সম্পন্ন করা। এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[৪৮১] জাহাঁকুশা, ২/১৫৩

بیا جانا کہ شد عالم دگر بارہ خوش و خرم

بفرِّ خسروِ اعظم الغ سلطان جلال الدین

এসো আমার প্রাণ! এই পৃথিবী মহান বাদশাহ সুলতান জালালুদ্দীনের শান-শওকতে দ্বিতীয়বার আনন্দময়ী হয়ে উঠেছে।

খিলাত বিজয় নিয়ে নুরুদ্দীন মুনশি যে ফাতাহনামা (বিজয়গাথা) রচনা করেছিলেন, সেটি তার শক্তিশালী ফারসি গদ্যরীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ফাতাহনামা থেকে একটু[৪৮২] (অনুবাদ) উল্লেখ করছি।[৪৮৩] আমার এই অনুবাদকে বলা চলে মুনশি সাহেবের সূক্ষ্ম, নিটোল, মোলায়েম মখমলের সামনে চটের মোটা কাপড়।

ফাতাহনামা

অনুবাদ : 'আমরা সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর গভীর প্রশংসা নিবেদন করছি, যিনি আমাদের সাম্রাজ্য ও রাজ্যের উন্নতির জন্য বিজয় ও সাহায্য প্রদান করেছেন। বিপুল বাতাসে বিমলানন্দে উড়ে চলেছে আমাদের পতাকা। যিনি তার শক্তি ও ক্ষমতায় আমাদের এমন বরকতময় বিজয় ঘটিয়েছেন যে, অতি সাধারণ একটু চেষ্টায় অন্য একটি রাজ্য আমাদের রাজ্যের (আল্লাহ একে স্থায়ী রাখুন) বিশ্বস্ত সেনাদের আয়ত্তে এসে গেছে। এবং একটি ঠোকর খেয়েই পুরো সৈন্যদল অপারগ হয়ে আমাদের অনুগত হয়েছে। 'এ আমার রবের অনুগ্রহ, তিনি পরীক্ষা করতে চান, আমি তার শোকরগুজারি করি, নাকি অবাধ্যতা করি'।

আমাদের সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী পতাকা (আল্লাহ এটিকে বিপুল সাহায্যে ভরপুর করে দিন) আর্মেনিয়ার সীমান্তে দুলে চলেছে। খিলাত শহরের আশপাশে আটমাস পর্যন্ত অবস্থান করে প্রতিশ্রুতি ও হুঁশিয়ারির মাধ্যমে বারবার প্রতিপক্ষকে বুঝিয়েছি। তাদের কাছে বারবার ধমকধামক ও প্রতিশ্রুতি পাঠিয়েছি। ভেবেছি—এরা সম্ভবত গভীর দৃষ্টিতে খুঁজে নেবে নিজেদের নিরাপত্তার পথ। সেই অন্ধ ক্রোধ ও হুংকারের মুখে পতিত-হওয়া থেকে সরে পড়বে, যে কঠিন ক্রোধ কোনো পাহাড়ের পক্ষেও জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়; যাতে তারা মহান সুলতানের দাসদের ফুঁসে-ওঠা রুদ্রমূর্তির সামনে আনুগত্য ও দাসত্ব বরণ করে নিরাপদ থাকতে পারে, চায় ক্ষমা ও নিরাপত্তা এবং খুলে দেয় শহরের সব দরজা। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে কোনোভাবে 'হে আল্লাহ, আমার কওমকে হেদায়েত দিন, এরা নাদান' এমনতরো মনোবাঞ্ছাপূর্ণ কিছু কবুল হতে দেখা যায়নি।

---

[৪৮২] এটি তারিখে জাহাঁকুশা থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

[৪৮৩] জাহাঁকুশা ২/১৭৭-১৮০

প্রতিপক্ষ দিনদিন গোমরাহি ও অবাধ্যতায় কঠিনভাবে লেগে ছিল। 'যাতে আল্লাহ তায়ালা অবশ্য-ঘটিতব্য একটি বিজয়ের সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেন'। এই শহরে বাকির অঞ্চল, ফোরাতের তীর, মিশর, সিরিয়া, পূর্বদিকের কিছু এলাকা, তুর্কমান ও তুর্কিদের বহু সৈন্যদলের সমাবেশ ঘটেছিল। সব দিক থেকে বিভিন্ন সৈন্যদল এখানে এসে যূথবদ্ধ হয়েছিল।তারা নিজেদের বাহুর জোর, প্রাচীরের কাঠিন্য, তির, কামান, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল ও যন্ত্রনির্মাণবিদ্যায় তৈরি যুদ্ধোপকরণের আধিক্যের উপর ভরসা করেছি

সত্যকথা হল—এ শহরের লোকগুলো এতই উদ্ধত হয়ে উঠেছিল যে, তারা আকাশের বজ্রের সাথেও শক্তিমত্তা দেখাতে চাইছিল। অথচ তাদের খন্দক গভীরতায় ও গোপনীয়তায় একেবারে ষাঁড় ও মাছের পিঠের কাছে অবস্থিত (একটা কথা প্রসিদ্ধ আছে—এই ভূপৃষ্ঠ রয়েছে একটি ষাঁড়ের শিঙের উপর, আর ষাঁড়টি রয়েছে একটি মাছের পিঠের উপর, নুরুদ্দীন মুনশি বিজয়নামায় সেইদিকেই ইশারা করেছেন)।

আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কল্যাণজনক জিনিস এই শহরকে মজবুত করে তোলার ক্ষেত্রে বিপুল উপকরণ হিসেবে কাজ করেছে। এ শহরের প্রাচীর ও ভিত্তিপ্রস্তর নিঃসীম আকাশের ফাউন্ডেশনের মতোই ছিল শক্ত। বিদ্রোহীদের মনের গভীরে অবাধ্যতা এমন কঠিনভাবে বাসা বেঁধেছিল যে, তাদের মধ্যে কোনো নসিহতগ্রহণের সম্ভাবনাই বাকি ছিল না। প্রতিপক্ষের মগজে ভুল চিন্তা এমনভাবে জমাট বেঁধে গেছিল যে, নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তাদের সঠিক বিষয় ভেবে দেখবার যোগ্যতা।

শেষমেশ জুমাদাল উলার শেষদিনগুলোতে মহান সুলতানের সিপাহিরা (আল্লাহ তাকে সাহায্য করুন, তাকে শক্তিশালী করুন) যুদ্ধের অনুমতি পেয়ে গেল। আদেশ এল—সব লোক নিজ নিজ স্থানে প্রাচীরে সুরঙ্গ তৈরি করো। সব দল নিজেদের স্থানে রাস্তা বের করে নাও।

সিংহহৃদয় খাদেম ও সাহসী সৈন্যরা সেনাছাউনিতে অবস্থানের দীর্ঘসূত্রিতা দেখে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে যুদ্ধের অনুমতি লাভের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল। (অনুমতি মেলার পর) তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত বিরামহীনভাবে তারা যুদ্ধ করল। উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে গেল। বিভিন্নদিক থেকে শহরের ভেতর ঢুকবার পথ খুঁজতে লাগল।

জুমাদাল উলার ২৮ তারিখে, পূর্বেকার সব দিনের মতোই সূর্য ওঠার সময় শহরপ্রাচীরের চতুর্দিকের চূড়াগুলো পতাকা দিয়ে এমনভাবে সেজে উঠল, যেমন অজস্র নক্ষত্রের ভিড়ে ঝকঝকে হয়ে ওঠে সমস্ত আকাশ।

শহরের চতুষ্পার্শ্বে ঝনঝন করে বেজে উঠতে লাগল শোরগোল ও তাকবিরধ্বনি। শত্রুপক্ষ শহরের মাঝখানে স্থাপিত একটি দুর্গের ভেতর নিরাপদে

লুকিয়ে পড়ল। বিজয়ী সিপাহিরা (তারা সর্বদা যেন বিজয়ীই থাকে) লুটপাটে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। যদিও খিলাতের বাসিন্দারা নিজেদের জেদে গোঁ ধরে থেকেছিল বলে বঞ্চিত হয়েছিল অনুগ্রহ লাভের অধিকার থেকে, তবু দয়াশীল, স্নেহশীল ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্তকারী মহান বাদশাহ তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। হুকুম হল—সবাই বন্ধ করো লুটমার!

এই মজলুমরা ধারণারও অধিক অনুগ্রহ পেল। সবাই নিজ নিজ স্থানে শান্তি লাভ করে নিল, আর বিজয়ী বাহিনীর জন্য অনবরত দোয়া পড়তে লাগল (আল্লাহ এই বাহিনীর খুঁটি মজবুত করে দিন)। বিরোধীরা যখন দেখল পলায়নের পথ বন্ধ, কিন্তু সাধারণ ক্ষমা ও অনুগ্রহের দরজা খোলা, তখন 'হে আমাদের রব, আমরা জুলুম করেছি ইত্যাদি' বলতে-বলতে তাওবা ও ইসতিগফার করতে লাগল। ভুলত্রুটি মার্জনাকারী তাদের প্রতি দয়া করলেন। ক্ষমা করে দিলেন তাদের কৃত অনর্থক সেই জেদ। বিপুল অনুকম্পায় অপরাধীদের জন্য খুলে দিলেন আশার সমস্ত দরজা। আল-মালিকুল আশরাফের ভাই মুজিরুদ্দীন, তাকিউদ্দীন, ইজ্জুদ্দীন আইবেক, আরজানের হাকিম ও আকসামের আমির—এরা সবাই এবং আসাদ আবদুল্লাহ, এমনকি বনি আইয়ুবের রাজ্যের সকল সহযাত্রী আজকের দিনে বাধ্য হয়ে কিংবা খুশিখুশি মনে দাসানুদাস হয়ে পড়েছে। জীবনের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভের জন্য হাত ঊর্ধ্বে স্থাপন করে আমাদের শক্তি ও সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা বৃদ্ধির জন্য, আমাদের রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য এবং আমাদের সফলতার জন্য দোয়া করতে লেগে গেছে।'

ফারসি-জানা বন্ধুগণ নুরুদ্দীন মুনশির এই শক্তিমান, প্রাঞ্জল, গতিশীল পঙক্তিমালা থেকে তার বাক্য-বুননের ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা আঁচ করে উঠতে পারবেন।

মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ তরজুমান ও বিবি মুনজিমা

মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীনের দরবারের একজন আলেম সদস্য। মুনশি পদেও তিনি সফল ছিলেন। তার নামের সাথে যে তরজুমান শব্দটি রয়েছে, সেটিই প্রকাশ করে দেয় যে, তিনি দরবার ও দূতিয়ালির কাজে দোভাষীর দায়িত্বও আঞ্জাম দিতেন। বিবি মুনজিমা ছিলেন তার স্ত্রী। বিবি মুনজিমাও জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চায় খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশেষত, জ্যোতিষশাস্ত্রে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রসিদ্ধি।

৬২৭ হিজরি সনে যখন সিরিয়া ও রোমের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে সুলতান জালালুদ্দীনের পরাজয় ঘটেছিল, তখন এই দুই মিয়া-বিবি প্রথমে দামেশক তারপর রোমি সেলজুক রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের কামালুদ্দীন কিময়ার নামে এক বিশ্বস্ত দরবারির মধ্যস্থতায়

মাজদুদ্দীনও সেখানে জুটিয়ে ফেললেন দরবারের সদস্যপদ। ৬৬৭ হিজরিতে তার মৃত্যু ঘটেছিল।

তার পুত্র আল্লামা ইয়াহয়া ইবনে মুহাম্মদ—যিনি তার মায়ের দিকে সম্বন্ধিত হয়ে ইবনে বিবি উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন—সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের জীবনকথা নিয়ে الاوامر العلائية فى امور العلائية নামক একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। সেই গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনের মূল্যবান কিছু 'খণ্ডকথা'ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আল্লামা ইয়াহয়া ইবনে মুহাম্মদের মৃত্যু ৬৮০ হিজরি সনে হয়েছিল। তার জীবৎকালেই এ গ্রন্থের সংক্ষেপিত রূপ 'মুখতাসার সেলজুকনামা'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

এটিকে Houtsma নামের জনৈক প্রাচ্যবিদ ১৯০২ সালে হল্যান্ড থেকে প্রকাশ করেছে। পাকিস্তানে এর উর্দু অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ জাকারিয়া মায়েল, এই অনুবাদটিকে 'কেন্দ্রীয় উর্দু বোর্ড গুলবার্গ, লাহোর' ছাপিয়েছে।

তাজুদ্দীন কালিজ

সুলতান জালালুদ্দীনের বিশ্বস্তদের মধ্যে তার এক গোলামের নাম ছিল কালিজ। সুলতান জালালুদ্দীন যখন হিন্দুস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করে শিরাজ শহরে পৌঁছেন, তখন শিরাজের হাকিম সাআদ বিন জঙ্গি তাকে খুব সম্মান করেন। সঙ্গে এই সম্ভাবনাময় দাসটিকে (কালিজ) সুলতানের খেদমতে পেশ করেন। কালিজ ছিল অত্যন্ত চৌকস, সদালাপী, ভদ্র, মেধাবী, অভিজ্ঞ। সুলতানের সংশ্রবে থাকবার পর তার এই উত্তম গুণাবলি আরো বিপুলভাবে প্রকাশ পেতে থাকল। বিশ্বস্ততা, প্রতিরক্ষা, মার্জিত মনোরম ভদ্রতা ও বোধ-বিচারের কারণে খুব শিগগির সে সুলতান জালালুদ্দীনের বিশ্বস্ত ও অনুগত দাস হিসেবে গণ্য হতে লাগল।[৪৮৪] বহু গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক বিষয়, বিশেষত, ব্যক্তিগত জীবনঘনিষ্ঠ অনেক কাজ সুলতান জালালুদ্দীন কালিজের হাতে সোপর্দ করে যেতেন।

জালালুদ্দীনের কোনো ছেলেসন্তান যেহেতু বেঁচে ছিল না, এজন্য ধীরে-ধীরে সুলতানের মনে যে পিতৃস্নেহ ছিল, তা কালিজের দিকে ঘুরে গেল। কালিজ সুলতানের বিশেষ অনুকম্পা ও পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে উঠল। কালিজের এই খাতির-যত্ন কিছু কুচিন্তক সহচরের জন্য হিংসার কারণ হয়ে উঠেছিল। তারা সুলতান জালালুদ্দীন ও কালিজের এই সম্পর্ককে ভুলভালভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছিল।

সুলতানের পতনকালে নৈকট্যভাজন সঙ্গীরাও যখন তার সাথে গাদ্দারিতে মেতে উঠেছিল, মিত্র ও প্রতিবেশীরা এক-এক করে ছেড়ে গিয়েছিল সুলতানের সঙ্গ, চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছিল অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর চক্রান্তের ফিসফাস, ঠিক

---

[৪৮৪] জাহাঁকুশা ২/১৫২

সেই সময়েই ঘটে গেল আরেকটা ট্রাজেডি—সুলতানকে কালের কঠিন দুর্যোগের উত্তাল সমুদ্রে ফেলে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেল কালিজ। এতে সুলতান জালালুদ্দীনের হৃদয়ে ছেয়ে গিয়েছিল কল্পনাতীত বিষাদ।

বদরুদ্দীন হেলাল

এই লোকও ছিল সুলতানের এক বিশ্বস্ত দাস। সুলতানের পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজের দায়িত্ববান ছিল সে। চেঙ্গিজ খানের প্রথম আক্রমণে তুর্কান খাতুনের সাথে সে গ্রেফতার হয়েছিল। পরবর্তীতে সুযোগ পেয়ে জেলখানা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। ভীতবিহ্বল হয়ে, চারদিকে ছুটতে ছুটতে, শেষে সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে পৌঁছেছিল।[৪৮৫]

নাসিরুদ্দীন কাশাতমুর

নাসিরুদ্দীন কাশাতমুর ছিল রাজকীয় দাসদের নেগরান ও সুলতানের একজন বিশ্বস্ত অফিসার। সুলতানের বিরুদ্ধে জেগে-ওঠা বিদ্রোহের এক ভয়াবহ চক্রান্ত সে ভণ্ডুল করে দিয়েছিল।[৪৮৬]

কিছু অজ্ঞাত গোলাম

এ ছাড়াও সুলতান জালালুদ্দীনের বিশ্বস্ত দাসদের একটি দল সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তার জন্য বীরবিক্রমে কোরবানি দিয়ে গিয়েছিল। ৬২৫ হিজরিতে ইস্পাহানের যুদ্ধে যখন ইসলামি বাহিনীর বিজয় লাভের পরে আবার পরাজয় ঘটে গিয়েছিল এবং সুলতান পড়ে গিয়েছিলেন দুশমনের মুঠোর ভেতর, তখন ১৪জন জানবাজ গোলাম তরবারি হাতে সুলতানের সম্মুখভাগে মানবপ্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এদের দুর্ধর্ষ সাহসিকতায় দুশমনের ঘেরাও ভেদ করে বেরিয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন সুলতান।

এভাবে, সুলতান জালালুদ্দীন একেবারে শেষসময়ে যখন তাতারদের অতর্কিত আক্রমণ থেকে বেঁচে তাদের থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে অজানা গন্তব্যে রওনা দিয়েছিলেন, সেই কঠিন সময়েও তার দুই দেহরক্ষী দাস তার সঙ্গ ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না। পথে সুলতানকে হেফাজত করে যেতে যেতে তারা শহিদ হয়ে গিয়েছিল।[৪৮৭] রাহিমাহুমুল্লাহু রাহমাতান ওয়াসিয়াহ।

---

[৪৮৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৯২, ইবনে খালদুন ৫/১২৪

[৪৮৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৬৫, খাওয়ারিজম শাহি ২১০

[৪৮৭] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭২, তারিখে মুখতাসারুদ-দুওয়াল ২৪৭

সুলতানের গাদ্দারশ্রেণি

কিতলুগ খান

কিতলুগ খান খাওয়ারিজমের রাজধানী আরগেঞ্চে ৯০ হাজার সিপাহির সেনাপতি ছিল। পৃথিবী থেকে সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের গত হয়ে যাবার পর, রাজধানীতে এই তুর্কি সরদার সুলতান জালালুদ্দীনের সিংহাসনারোহণ মেনে নেয়নি। সে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত করবার কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। সুলতান জালালুদ্দীনের পরিবর্তে তার ভাই কুতুবুদ্দীন আযলাককে রাজ্যের মসনদে উপবিষ্ট দেখতে চাচ্ছিল। কিতলুগ ও কিতলুগের সমবর্গীয় আমিরদের ষড়যন্ত্রের কারণে পরিশেষে সুলতানকে খাওয়ারিজমের প্রাণকেন্দ্র আরগেঞ্চ ছাড়তে হয়েছিল।[৪৮৮]

সাইফুদ্দীন আগরাক খলজি ও তার অনুগত বাহিনী

আগরাক সাইফুদ্দীন ছিল খলজি ও তুর্কমান গোত্রগুলোর শক্তিমান এক সরদার। সে ছিল খুবই উদ্দীপ্ত, দাম্ভিক, চতুর ও সমরশাস্ত্রে পারদর্শী। তাতারদের সাথে জিহাদ করার জন্য সুলতান যখন খোরাসানের পাঠান গোত্রগুলোতে পৌঁছেন, তখন সাইফুদ্দীন পেশোয়ারে গোত্রগুলোকে একত্র করে নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির গণ্ডি প্রশস্ত করায় ব্যস্ত ছিল।

সুলতান গজনি পৌঁছুলে সাইফুদ্দীন আগরাক একটি বড় সৈন্যদল নিয়ে সুলতানের সাথে এসে দেখা করল। তারপর যথাযথভাবে জিহাদেও শরিক থাকল। কিন্তু পরবর্তীতে এক অনভিপ্রেত ঝগড়া তার ও সুলতান জালালুদ্দীনের আরেক সেনাপতি আমান মালিকের মাঝে প্রজ্বলিত করেছিল বৈরিতার এক অগ্নিলাভা। বিস্তারিত আলাপ ইতিপূর্বে গিয়েছে।

পরিশেষে সাইফুদ্দীন আগরাক ও তার কিছু সহযাত্রী সরদার নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে সুলতানের থেকে পৃথক হয়ে গেল। তাদের এই অপরিণামদর্শিতার কারণে যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্রটাই পালটে গেল মুহূর্তখানিকের মধ্যে। সুলতান জালালুদ্দীন প্রায় জিতে-যাওয়া সেই যুদ্ধটিও হেরে গেলেন এবং উম্মতে মুসলিমার বিপদাপন্ন দিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল।

---

[৪৮৮] রওজাতুস সফা ৪/৮২৭, জাহাঁকুশা ২/১৩২, খাওয়ারিজম শাহি ১৪০

সাইফুদ্দীন আগরাকের সঙ্গ-দোষে সুলতানের সাথে গাদ্দারি-করা খলজি, তুর্কমান ও ঘুরি আমিররা সুলতানের ছাউনি থেকে বেরিয়ে নাঙ্ঘার প্রদেশে পৌঁছে গেল। এই এলাকা ছিল আজম মালিক খলজির। সুলতানের সাথে গাদ্দারি-করা সরদারদের একজন সে। এই গাদ্দার আমিরদের সে নিজের কাছে ঠাঁই দিয়ে খুব আদর-আপ্যায়ন করল। গাদ্দার আমিরদের মধ্যে নুহ জাহান্দরও ছিল। সে ছিল ৫ হাজার খলজি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান। তার ও সাইফুদ্দীন আগরাকের মাঝে কিছু একটা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল।

এজন্য সাইফুদ্দীন যখন নাঙ্ঘার থেকে পেশোয়ার-অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করল, তখন আত্মকলহের কারণে নুহ জাহান্দর তার সঙ্গে না গিয়ে 'বাহন জন্তুগুলোকে ঘাসপানি খাওয়াতে হবে' ওজর পেশ করে সেখানেই থেকে গেল।

তার এই কাণ্ড দেখে সাইফুদ্দীন আগরাক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। কিন্তু কিছু করতে পারল না তখন। নাঙ্ঘার থেকে এক মনজিল দূরে গিয়ে তার মনে হল—আচ্ছা, নুহ জাহান্দরের খেল চিরতরে খতম করে দিলে কেমন হয়? কপালে মোটা বলিরেখা জাগে সাইফুদ্দীনের—'এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য আজম মালিককেই মাধ্যম বানাতে হবে।' যেই ভাবনা সেই কাজ। সেখান থেকেই তৎক্ষণাৎ সে আজম মালিকের কাছে চিঠি পাঠাল—আমি আর তুমি পিতা-পুত্রের মতো। আমি পিতা, তুমি পুত্র। তুমি যদি আমাকে খুশি করতে চাও, নুহ জাহান্দরকে তোমার ওখানে থাকবার অনুমতি দিয়ো না।'

আজম মালিক এই চিঠির নিগূঢ় উদ্দেশ্য ঠাওর করতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে আজম মালিক সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে গাদ্দারি-করা এই লোকদের মধ্যে শরিক ছিল। সে-হিসেবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়—এই লোক ছিল উম্মাহর ঐক্যের বিপুল কল্যাণের ব্যাপারে গাফেল। উম্মাহর কল্যাণের অনুভূতিই ছিল না তার ভেতর। কিন্তু ওদিকে নিজের দেশীয় ও গোত্রীয় কল্যাণ-চিন্তায় ছিল খুবই সতর্ক। সে ভাবল—সাইফুদ্দীন ও নুহ জাহান্দরের মাঝে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা খুবই অনুচিত ব্যাপার। এদের মধ্যে আপস করিয়ে দেওয়া জরুরি। ফলে, এটিকে সময়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে ৫০জন অশ্বারোহী দেহরক্ষী দল নিয়ে সে সাইফুদ্দীনের বাহিনীর কাছে গিয়ে পৌঁছল। বড়ই কষ্ট-ক্লেশের সাথে নুহ জাহান্দরের সাথে সন্ধি করার প্রতি তাকে রাজি করাতে চেষ্টা করল।

সাইফুদ্দীন আগরাকের মেজাজ তখন উন্মত্ত থাকায় আজম মালিকের এই নসিহতে ঘটল উলটো প্রতিক্রিয়া। আজমের কথা তো সে মানলই না, বরং সেই মুহূর্তেই মাতাল হয়ে বলতে লাগল—এক্ষুনি গিয়ে নুহ জাহান্দরকে হত্যা করে ফেলব আমি। ওকে একহাত দেখে নেব। তারপর কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সঙ্গে শতজন অশ্বারোহী নিল সাইফুদ্দীন। ঘোড়া দৌড়িয়ে গিয়ে সোজা নুহ জাহান্দরের ছাউনিতে পৌঁছল।

নুহ জাহান্দর দূর থেকে সাইফুদ্দীনকে সংক্ষিপ্ত একটি বাহিনী-সমেত ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসতে দেখেছিল। তখন তার মনে হয়েছিল—'আজম মালিকের চেষ্টা বোধহয় সফল হয়েছে। তার সুপারিশ মঞ্জুর হয়েছে। এখন সাইফুদ্দীন নিজে থেকেই আমার সাথে আপসের মোলাকাত করতে আসছে।'

সাইফুদ্দীন কাছাকাছি চলে এলে নুহ জাহান্দর তার পুত্রদের নিয়ে সামনে এগিয়ে এল। সাইফুদ্দীনকে সে খুবই সম্মানজনক অভিবাদন জানাল। কিন্তু... সাইফুদ্দীন তো বোধকরি পাগলই হয়ে গিয়েছিল। নুহ জাহান্দরকে সামনে পাওয়ামাত্র, ঘোড়ার পিঠে বসেই, ঝপাং করে তলোয়ার বের করে কোপ বসিয়ে দিল নুহের গায়ে। নুহ জাহান্দরের জীবনের আরো কিছু নিঃশ্বাস বাকি ছিল ফেলবার। এজন্য আচানক এই হামলা খেয়েও বেঁচে গেল সে। তার রক্ষীবাহিনী সাইফুদ্দীনকে আর বেশি কিছু করবার সুযোগ দিল না। সেখানেই সাঙ্গ করে দিল সাইফুদ্দীনের ভবলীলা।

সাইফুদ্দীন আগরাকের বাহিনীতে যখন তার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছল, সঙ্গে সঙ্গে তারা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তাদের জানাই ছিল না—তাদের সরদার কী উদ্দেশ্যে ওখানে গিয়েছিল এবং তার সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে? ফলে তাদের মনে এই সন্দেহটাই দানা বেধে উঠল যে, এ হল আজম মালিকের চক্রান্ত। আজমই সাইফুদ্দীনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠিয়ে মৃত্যুমুখে ফেলেছে।

আজম মালিক তখনো মেহমান হিসেবে সাইফুদ্দীনের ক্যাম্পেই অবস্থান করছিল। সাইফুদ্দীনের সৈন্যরা নিজেদের এই সংশয়ের ভিত্তিতে আজমকে সেখানেই হত্যা করে ফেলল। সাইফুদ্দীনের সিপাহিদের প্রতিশোধের আগুন তবু শীতল হল না। কারণ, কুদরত নুহ জাহান্দরকেও সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে গাদ্দারি করার সাজা দিতে চাচ্ছিল তখনো। ফলে, আগরাকের সৈন্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নুহ জাহান্দরের সেনাশিবিরে গিয়ে ফেটে পড়ল। শুরু হল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে নুহ জাহান্দর তার পুত্রদের নিয়ে মারা গেল। এমনকি ধ্বংস হয়ে গেল দুইদিকের সিপাহিদেরই একটা বড় সংখ্যা। ঘুরি সিপাহিদের একটা বড় সংখ্যাও দুদিক থেকেই মারা গেল।

এই বিক্ষিপ্ত হয়ে-যাওয়া গাদ্দার-বাহিনীর অবশিষ্ট যারা ছিল, তাদেরও বেশিদিন বাঁচবার সুযোগ মেলেনি। উত্তাল সমুদ্রের পাহাড়সম ঢেউয়ের মতো তাতারদের যে সয়লাব ধেয়ে আসছিল, তা একদিন এদের সবাইকে ঘিরে ফেলল। সব-কটাকে মৃত্যুর তিক্ত পানীয় গিলতে বাধ্য করল; একজনও বাদ পড়েনি।

মোটকথা, সেই ৩০ হাজার খলজি, ঘুরি ও তুর্কমান সিপাহি, যারা সুলতানের সাথে ঘৃণিত গাদ্দারিতে মেতেছিল, এই বিরাট অপরাধের পর দুইতিন মাসও ভূপৃষ্ঠে থাকতে পারেনি; সবাই বরণ করেছিল নিজেদের নিকৃষ্ট পরিণতি।[৪৮১]

---

[৪৮১] জাহাঁকুশা ২/১৯৫-১৯৮

বুরাক হাজিব

শুরুতে বুরাক হাজিব ছিল তুর্কানেখাতা রাজ্যের বিশ্বস্ত অনুচর। তারপর সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ যখন উপর্যুপরি তুর্কানেখাতাকে পরাজিত করে তাদের সর্বশক্তি পিষে দিলেন, তখন বুরাক হাজিব নিজের কল্যাণের কথা ভেবে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সে ছিল খুব হুঁশিয়ার, চতুর। এজন্য খুব দ্রুতই উন্নতি করে হাজিব তথা সেনা-অফিসারের পদমর্যাদায় পৌঁছে গেল।

সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের মৃত্যুর পর কিরমান ও কিরমানের উপকণ্ঠের কিছু এলাকা সে জয় করে নিয়েছিল, যাতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ভেতর একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলে নিজের মনের সেই আশা সে পূর্ণ করতে পারে, যা বহুকাল ধরে তার ভেতরে-ভেতরে আকুলিবিকুলি করছিল। কিন্তু তখনই হঠাৎ করে হিন্দুস্থান থেকে সুলতান জালালুদ্দীন ইরানে এসে গেলেন। বুরাক হাজিব তখন নিজেকে দাবিয়ে রাখতে বাধ্য হল। সে সুলতানের সামনে বিশ্বস্ততা প্রকাশ করার পরও গোপনে সুলতানের বিরুদ্ধে আঁটতে থাকল ষড়যন্ত্র।

একবার সুযোগ পেয়ে সে স্পষ্ট বিদ্রোহেও নেমে এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের আগমন ও আক্রমণে ঘাবড়ে গিয়ে আবারও নতুন করে মুনাফিকসুলভ ওজরখাহি প্রকাশ করে ক্ষমা পেয়ে গেল।

সুলতান জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর বুরাক হাজিব তাতারদের ছত্রছায়ায় কিরমান ও কিরমানের আশপাশে ইজারাদারি গঠন করে নিয়েছিল। ৬৪২ হিজরি সনে সে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছিল। তারপর ক্ষমতা গ্রহণ করে তার দুই ছেলে রোকনুদ্দীন ও কুতুবুদ্দীন। তারপর এই পুরো এলাকার পরিচালনা তাতাররা সরাসরি নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়।[৪৯০]

শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন

সে ছিল সুলতানের বৈমাত্রেয় ভাই। আস্তিনের নিচে লুকিয়ে-থাকা সাপ হয়ে বারবার সে সুলতানকে ছোবল মেরেছে। প্রতিবার সুলতান তার ঘৃণিত কুকর্ম ক্ষমা করে গিয়েছেন।

ইস্পাহানের যুদ্ধ চলাকালে মূল হাঙ্গামার সময়টাতেই সে ইসলামি বাহিনীর একদিক খালি করে পালিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর সাহায্য যদি সেদিন সুলতানের সঙ্গে না থাকত, গিয়াসুদ্দীনের এই অপরাধমূলক কাজের কারণে মুসলিমদের নিশ্চিত কঠিন পরাজয় ঘটত।

---

[৪৯০] জাহাঁকুশা ২/১৪৯, ১৫০, ১৬৫, ২১১-২১৪

গিয়াসুদ্দীন সুলতানের সঙ্গ ছেড়ে আলামুতের হাকিমের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। কিছুকাল পর সেখান থেকে এসে বুরাক হাজিবের কাছে কিরমানে আবাস বানিয়ে নিয়েছিল। পরে বুরাক তার উপর ষড়যন্ত্রের অপরাধ আরোপ করে তাকে হত্যা করে ফেলে।[৪৯১] বিস্তারিত পেছনে গেছে।

আতর খান

এই লোক ছিল শেষ পর্যন্ত সুলতানের সঙ্গে-থাকা অফিসারদের একজন। কিন্তু, সেই শেষদিনগুলোতেই সে আশপাশের শাসকদের সাথে আঁতাত করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল সুলতানের সঙ্গ ছাড়বার। এজন্যই নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বে সে অলসতা দেখাতে শুরু করেছিল। তাতার-বাহিনী যে একদম মাথার উপর এসে গিয়েছিল, তা শেষসময়ে এই লোকের ভুল সংবাদ-সরবরাহের কারণে সুলতান জানতে পারেননি।

সুলতানের সেই সংকটাপন্ন মুহূর্তে আতর খান তাকে কিছু না জানিয়েই মায়াফারকিনের দরবারে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আফসোস, সেখানে গৃহীত হয়নি সে। মায়াফারকিনের শাসক তাকে বন্দি করে ফেলে। কিছুদিন পর সেখান থেকে মিশরের জেলখানায় তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। আর সেই বন্দিজীবনের ভেতরেই তার মৃত্যু ঘটে।[৪৯২]

শারফুল মুলক খাজা জাহাঁ

তার নাম ছিল শারফুদ্দীন ইয়ালদারজি। তাকে শারফুল মুলক ও খাজা জাহাঁ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের যুগে সাধারণ সেবায়েতি থেকে উন্নতি করে সংবাদ-লেখকের পদ পর্যন্ত পৌঁছেছিল সে। পরবর্তীতে খাওয়ারিজম শাহ তাকে বাহিনীর উজির বানিয়েছিলেন। ৪ বছর সে এই পদেই বহাল ছিল। যখন সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ শাসক হয়ে গজনিতে পৌঁছলেন, শারফুল মুলক তার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে সে সেনাপ্রধানের পদ পেল।

যখন হিন্দুস্থানে সুলতানের উজির শামসুল মুলক শিহাবুদ্দীন হারাবি কিবাছার হাতে নিহত হন, সুলতান তখন উজিরের দায়িত্ব সোপর্দ করেন শারফুল মুলকের হাতে।[৪৯৩] শারফুল মুলক আরবি, ফারসি ছাড়াও তুর্কি ভাষাও জানত। রাজ্যের বিষয়াদিতে গভীর জানাশোনা ছিল তার। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাবদ্ধতা, সৈন্য-পরিচালনা

---

[৪৯১] জাহাঁকুশা ২/২০১-২০৭

[৪৯২] ইবনে খালদুন ৫/১৪০, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮০, খাওয়ারিজম শাহি ২১৫

[৪৯৩] ইবনে খালদুন ৫/১২১-১২২

ও রাজনীতি খুব ভালো বুঝত। সে ছিল খোলামেলা প্রকৃতির লোক। সবার সাথেই অকৃত্রিমভাবে মিশত। ধোঁকাবাজি, অহংকার থেকে সবসময় অনেক দূরে থাকত। খুব দানশীল ছিল। না গুণেই সীমাতিরিক্ত দান করে চলে যেত। কিন্তু, এতসব ভালো গুণের পাশাপাশি সে ছিল অস্থিরচিত্ত, অমিতব্যয়ী, উচ্ছৃঙ্খল ও খামখেয়ালি ধরনের লোক। অল্পতেই নারাজ হয়ে যেত, আবার অল্পতেই সব মেনে নিত। সে কোনোকিছুর নির্দিষ্ট হিসাব রাখার প্রতি একটুও খেয়াল রাখত না। নিয়মানুযায়ী তাকে রাষ্ট্রীয় মুনাফার দশভাগের এক ভাগ প্রদান করা হতো। খুব মোটা অংকের অর্থ ছিল সেটা। কিন্তু এতেও সে সন্তুষ্ট ছিল না। অতিরিক্ত অনেক অর্থ লুট করে নিত।

যেহেতু সুলতানকে বশ করতে পারা ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করতে পারার সূক্ষ্ম গুণ ছিল তার মধ্যে, এজন্য তার সমস্ত কুকর্ম সত্ত্বেও একটা সময় পর্যন্ত সুলতান জালালুদ্দীন তার প্রতি সন্তুষ্টই ছিলেন। কিন্তু ধীরে-ধীরে উজিরের মুখোশ খুলে যেতে লাগল। আর তখনই সুলতান তার প্রতি নারাজ হয়ে গেলেন[৪৯৪] (শারফুল মুলকের সেসব কুকর্মের বিস্তারিত আলোচনা পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোতে গেছে)।

শেষে তার দুর্নীতির পানি যখন বাঁধ উপচে বাইরে গিয়ে পড়তে লাগল, তখন এই বদ লোকটা আর শুদ্ধ হবে না ভেবে সুলতান তাকে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। কিন্তু তারপরও সে যখন ক্ষমা চেয়ে নিল, সুলতান তার জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। তবু কমপক্ষে তাকে নজরবন্দি করে রাখা জরুরি ছিল। নজরবন্দি করার পর তাকে সন্তুষ্ট রাখতে সাময়িকভাবে সুলতান দেখেও না দেখার ভান করেছিলেন। উজিরে আজমের মন তাতে প্রশান্ত হয়ে গিয়েছিল যে, যাক, আমার প্রতি পুষে রাখা সুলতানের ক্রোধ খতম হয়ে গেছে।

তারপর মওকা পেয়ে একদিন উজিরকে সুলতান আর্রানের উপকণ্ঠে জারিবার্দ দুর্গে নিয়ে গেলেন। দুর্গপতিকে গোপনে আদেশ দিয়ে উজিরকে সেখানে নজরবন্দি করে রাখলেন। মুনশি শিহাবুদ্দীন আন-নাসাবির বর্ণনা—সুলতান তাতারদের নিশ্চিহ্ন করবার আগ পর্যন্ত উজিরে আজমকে নজরবন্দি করে রাখতে চাচ্ছিলেন। তার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কোনো পদক্ষেপ নেননি আর। বরং তিনি তো এজন্যও প্রস্তুত ছিলেন যে, পরবর্তীতে উজিরকে স্বপদে বহাল করে দেবেন।

অবশ্য উজির যাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় না করে, সেজন্য মনে করেছিলেন—আব্বাসি খেলাফতের উজিরদের মতো এখানেও উজিরে আজমের জন্য মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে দেবেন। রাষ্ট্রের মুনাফা থেকে বর্তমানে উজিরকে যে অংশ দেওয়ার প্রচলিত ব্যবস্থা আছে, তা ভেঙে ফেলবেন। এটি ছিল সুলতানের চূড়ান্ত

---

[৪৯৪] ইবনে খালদুন ৫/১৩৭, খাওয়ারিজম শাহি ২১১-২১২

দয়ার্দ্রতা ও কোমল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত। এত এত অপকর্ম সামনে চলে আসার পরও উজিরে আজমের বিরুদ্ধে তিনি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি।

সুলতান উজিরে আজমকে নজরবন্দি করে তাকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব সালমান বেগ নামের এক কঠোর তুর্কি অফিসারের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। সালমান বেগ কিছুকাল নিজের দায়িত্ব খুব ভালোভাবে আঞ্জাম দিয়ে গেল। কিন্তু পরবর্তীতে উজিরে আজম তাকে নিজের মতাদর্শী বানিয়ে ফেলল। সালমানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে সুলতানের বিরুদ্ধে আবারও চক্রান্ত শুরু করে দিল উজির।

সে-যুগে সাম্রাজ্যের রাজমহলে শাহি গোলামদেরও একটা কার্যকর প্রতিপত্তি ছিল। উজিরে আজম যখন উজির ছিল—বলা যায়—তখন এই গোলামদের গোপন আশ্রম ছিল উজিরের দরবার। উজির আশা করতে লাগল, এখনো সেই গোলামদের দিয়ে নিজের কাজ করাতে পারবে সে। এই চিন্তা থেকেই সে সালমান বেগের সাথে জোট বেঁধে চক্রান্তধর্মী একটি পরিকল্পনা সাজাল। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমে সালমান বেগের তরফ থেকে গোলামদের নামে একটি চিঠি প্রস্তুত করা হল যে, 'সুলতান তোমাদের মনিব শারফুল মুলককে অকারণে বন্দি করে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিচ্ছেন। সুলতান এখন এই বেচারাকে হত্যা করবেন বলে ইচ্ছা করেছেন। যদি তোমাদের পূর্ববর্তী মনিবের প্রতি সমবেদনা থাকে তোমাদের ভেতর, তা হলে জিরবার্দ দুর্গে এসে তার সাথে দেখা করো, যাতে তার মুক্তির জন্য কিছু একটা করতে পারো। তা ছাড়া, আমি মনে করি, তোমাদের জন্য উচিত হল জর্জিয়ানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করা।

সালমান বেগের নাম দিয়ে লেখা এই চিঠি উজিরে আজম তার খাস আংটি-সহ গোপনে শাহি গোলামদের প্রধান অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিল। শাহি গোলামদের প্রধান অফিসারের নাম ছিল কাশাতমুর। উজিরে আজমের আংটি ও চিঠি পেয়ে নিজের করণীয় নিয়ে সে ভাবনায় পড়ে গেল। শেষে তার মন তাকে সুলতানের বিরুদ্ধে কোনো কর্মে অংশগ্রহণের অনুমতি দিল না।

সে এই দুটো জিনিস খাওয়ারিজমি মহলের আমির আতর খানের কাছে অর্পণ করে এই চক্রান্ত সম্পর্কে তাকে জানাল। আতর খান গিয়ে সুলতানকে শুনিয়ে দিল পুরো কাহিনি। এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে সুলতান খুবই মর্মাহত ও রাগান্বিত হলেন। একই সময়ে ভেতরের ও বাইরের যুদ্ধে লড়াই করা তার পক্ষে ছিল সহ্যাতীত। আবার শারফুল মুলককে অবকাশ দেওয়ার অর্থ ছিল ষড়যন্ত্রের শেকড় না কেটে ধীরে-ধীরে তা বাড়তে দেওয়া। ফলে সুলতান ভাবলেন, তাকে আর বেশি সুযোগ দেওয়া বোকামি। তাই তাকে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। যদিও এই চক্রান্তে সালমান বেগও জড়িত ছিল, তবে সুলতানের বিশ্বাস

ছিল—এতে আসল ভূমিকা উজির শারফুল মুলকের; এতে সালমান বেগকে স্রেফ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এজন্য সালমান বেগের ব্যাপারে কিছুটা কোমলতা অবলম্বন করলেন সুলতান। তিনি তৎক্ষণাৎ সালমান বেগের পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। সালমান বেগের পুত্র ছিল সুলতানের বিশেষ সেনাদলে ভর্তি। পুত্রের সামনে তার বাবার চিঠিটা সুলতান খুলে দেখালেন। পিতাকে গাদ্দারদের কাতারে শামিল দেখে পুত্র খুবই ব্যথিত হল। ছটফটিয়ে উঠল সে। সে জানত—এই অপরাধে তার বাবাকে হত্যাও করা হতে পারে। কিন্তু সালমান বেগের পুত্রের ঘাবড়ে-যাওয়া অবয়ব দেখে সুলতানের মনে খুব মায়া হল। তিনি অনুকম্পা-সিক্ত ভঙ্গিতে বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, বাবার সাথে দেখা করে তাকে এই ভুলের জন্য লজ্জিত হতে বলো; যাও।

সালমান বেগের পুত্র তক্ষুনি গিয়ে পিতার সাথে দেখা করল। এই বোকামির পরিণতি কী কঠিন হতে পারে—পিতাকে সেই ভয় দেখাল সে। ফলে খুবই অনুশোচিত বোধ করল সালমান। পুত্রকে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। সালমানের পুত্রকে সুলতান বললেন, তোমার বাবা প্রকৃতই ফিরে এসেছে কি-না, তা আমি তখনই বিশ্বাস করব, যখন সে শারফুল মুলকের মাথা কেটে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

সুলতানের এই পয়গাম শুনে সালমান তৎক্ষণাৎ ৫ জন জল্লাদকে সঙ্গে নিয়ে শারফুল মুলকের কামরায় গিয়ে পৌঁছল। শারফুল মুলক বুঝে গেল—হত্যাকাণ্ড ঘটানো ব্যতীত কোনো উদ্দেশ্যে এখানে জল্লাদ আসবার কথা না। তাই সে উঠে অজু করল। দুই রাকাত নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ তেলাওয়াত ও তাওবা-ইসতিগফার করল। তারপর আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগল—যে লোক কাফেরদের উপর ভরসা করে, তার সাজা তো এটাই হয়।

তারপর ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে জল্লাদদের বলতে লাগল—নাও, এইবার তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করে নাও।

জল্লাদরা খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল—জনাব, আপনার মাথা কি তলোয়ার দিয়ে উড়িয়ে দেব, না আপনাকে গলায় রশি বেঁধে দম আটকিয়ে মারব? আপনার কী ইচ্ছা?

উজির নিরাবেগ গলায় বলল—আমার মত হল, তরবারি দিয়েই ভালো হবে। এটা অপেক্ষাকৃত কম কষ্টদায়ক।

জল্লাদরা ঠোঁট কামড়ে ধরে কপালে ছোট্ট ভাঁজ ফেলে কিছু একটা ভাবতে লাগল। তারপর বলল—'জনাব, বড় ব্যক্তিদের তো গলায় রশি পেঁচিয়ে মারাই নিয়ম। তলোয়ার দিয়ে মাথা কাটার বিধান তো শুধু চোর-ডাকাতদের জন্য নির্দিষ্ট।' এই বলেই তারা এক মুহূর্তও দেরি করল না। এগিয়ে এসে হুড়মুড় করে

শারফুল মুলকের গলা রশি দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলল। এবং এত শক্তভাবে আটাতে লাগল যে, শারফুল মুলকের চোখ বড় হয়ে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এল।

শারফুল মুলক বিছানায় তড়পাতে তড়পাতে খানিক পরেই মরে স্থির-নিশ্চল হয়ে গেল। জল্লাদরা তাকে সেখানেই ফেলে রেখে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। একটু পরে লাশ ঠান্ডা হয়ে গেলে মাথা কেটে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এ-ই ছিল তাদের সংকল্প।

কিছুক্ষণ পর লাশ ওঠাবার জন্য কামরায় এসে জল্লাদরা যে দৃশ্যটি দেখল, তার জন্য মোটেই তারা প্রস্তুত ছিল না। দেখল—শারফুল মুলক সহি-সালামতে জ্যান্ত তাদের চোখের সামনে বসে আছে। যে জল্লাদদের জীবন থেকে ভয় শব্দটি কবেই মুছে গেছে, সেই তারাও এখন ভয়ে-বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। শারফুল মুলকের শারীরিক শক্তি, মজবুতি ও সহনশীলতা দেখে তারা হয়রান হয়ে গেল। শেষে তরবারি দিয়ে হত্যা করারই অনুমতি দেওয়া হল এবং এক আঘাতেই উজিরের ধড় থেকে মুণ্ডু পৃথক করে সুলতানের দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হল।[৪৯৫]

ওয়াফা মালিক

সুলতান জালালুদ্দীন যখন চেঙ্গিজীয় বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে হিন্দুস্থানে পৌঁছে গেছিলেন, তখন হিন্দুস্থান উপকণ্ঠের ভবঘুরে যুবকদের মধ্য থেকে হাসান মুযলিফ নামের এক লোক এসে সুলতানের খাদেমদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। নিজের উৎকৃষ্ট কাজকর্ম ও খেদমতের বদৌলতে অল্পদিনের ভেতর সুলতানের মনোযোগ ও অনুকম্পা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল সে। সুলতান তাকে ওয়াফা মালিক উপাধি দিয়েছিলেন।

হিন্দুস্থান থেকে ইরাকে চলে আসার সময় হিন্দুস্থানের দখলীকৃত এলাকায় জাহাঁ পাহলোয়ানের পাশাপাশি ওয়াফা মালিককেও নায়েবের পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু, ৬২৭ হিজরি সনে ইয়াসি চমনের ময়দানে সুলতান জালালুদ্দীনের পরাজয়ের কারণে কেন্দ্রীয় শাসন যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন ওয়াফা মালিক সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে গাদ্দারি করে নিজের সহচরদের নিয়ে সুলতান ইলতুৎমিশের দাসানুদাস হয়ে যায়।

সুলতান ইলতুৎমিশের সাথে জোট বেঁধে সুলতান জালালুদ্দীনের বিশ্বস্ত গভর্নর জাহাঁ পাহলোয়ানকে সিন্ধ ও পাঞ্জাবের বিজিত এলাকাগুলো থেকে উৎখাত করে ফেলে।[৪৯৬] ওয়াফা মালিকের পরিণতি কী হয়েছিল, সে ব্যাপারে কোনো বর্ণনা চোখে পড়েনি।

---

[৪৯৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৬৪-৩৬৭, খাওয়ারিজম শাহি ২১০-২১২

[৪৯৬] সেলজুকনামা ১৫৩, ইবনে খালদুন ৫/১১৯, আবুল ফিদা ৩/১৫০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আল-মালিকুল মুজাফফর সাইফুদ্দীন মাহমুদ কুতুজ

হকের মুখপাত্র হিসেবে বাতিলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কেউ-না-কেউ সর্বযুগেই বিদ্যমান থাকেন। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও বীরত্বের সংকল্পবদ্ধ মহাপুরুষদের ঐশ্বর্য থেকে মুসলিম উম্মাহ কোনোকালেই বঞ্চিত থাকেনি, বঞ্চিত থাকবে না।

ইতিহাসে, যখনই কোনো দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ কাফেলার নেতা ইসলামের জন্য নিজের জীবনের নাজরানা পেশ করেছেন, তখন আল্লাহ তায়ালা সেই নেতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করে তুলবার জন্য দ্রুতই, নাহয় খানিকটা বিলম্বে, সংগ্রামের ময়দানে তার কোনো দুর্ধর্ষ স্থলাভিষিক্ত দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যে স্থলাভিষিক্তের হাতে প্রিয় নেতার প্রভুপ্রেমের সেই অমর ইতিহাস সুন্দর একটা পরিণতি লাভ করেছে। সাইফুদ্দীন মাহমুদ কুতুজ ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের ভাগ্নে।[৪৯৭] ইতিহাসের অমর ক্যানভাসে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতো সংক্ষিপ্ত একটা সময়ের জন্য তিনি জেগে উঠেছিলেন, বিপুল আলোয় চমকেছিলেন, তারপর হয়ে গিয়েছিলেন অদৃশ্য।

প্রথমে আমরা তার নাম নাজমুদ্দীন আইয়ুব মালিক আস-সালিহের সেবায়েতদের তালিকায় লেখা থাকতে দেখি। তা হলে কুতুজ কী করে খাওয়ারিজম থেকে মালিক আস-সালিহের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন?

এই প্রশ্নের জবাব জানতে আমাদেরকে ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত অনেক শেকল একসঙ্গে জোড়া লাগাতে হবে।

টুকরো-টুকরো বিক্ষিপ্ত ইতিহাস

সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের হারিয়ে যাবার (মৃত্যু) পর তার আমির, সিপাহি ও অনুগতরা বিক্ষিপ্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। লম্বা সময় পর্যন্ত তারা দিকশূন্যের মতো পাহাড়ে-জঙ্গলে ছুটে ফিরেছে। তাদের কেউ কেউ তখন লুটতরাজ করে নিজেদের পেটের যোগান দিচ্ছিল। আশপাশের রাজ্যগুলোর জন্য হয়ে উঠেছিল এক কঠিন ব্যাধি। অনেকেই আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। শত শত লোককে (এদের মধ্যে বাচ্চাকাচ্চাই ছিল বেশি) দাস বানিয়ে হাটে-বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল।

---

[৪৯৭] আল-ইবার ৩/২৯১, সিয়ারু আলামিন নুবালা ২৩/২০০, তারিখে মিল্লাত ২/৯০৩, কুতুজের মা, যিনি সুলতান জালালুদ্দিনের সহোদরা কিংবা সতাই বোন ছিলেন, তাঁর জীবনকাহিনি জানা যায় না।

খাওয়ারিজম থেকে আসা এই তুর্কি দাসদের মধ্যে ছিল খুবই কম বয়সের একটি বাচ্চা। তার নাম মাহমুদ। সে বাজারে-বাজারে বিক্রি হতে হতে, দাসত্বের চাবুক সইতে-সইতে, শেষে দামেশকের এক ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে গিয়েছিল।[৪৯৮] জন্ম থেকে স্বাধীন এই বাচ্চাটিকে শরিয়তবহির্ভূত পন্থায় দাস বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। দাসত্বের কয়েকটি স্তর পেরিয়ে গেলে লোকদের থেকে গোপন হয়ে গেল তার আসল অতীত।

তা ছাড়া একটি দাসের বংশপরম্পরা জানবার কার-ইবা অতো আগ্রহ জাগে? সবাই এটাই মনে করত যে, 'এই ছেলে কোনো কাফের রাজ্যে জন্ম নিয়েছে। সে কাফেরের সন্তান। যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে বাজারে বাজারে বিক্রি হতে হতে এখান পর্যন্ত এসেছে।'

তোর বাপ কে?

দামেশকের ব্যবসায়ীর পর ছেলেটির কপালে জুটল নতুন সরদার ইবনুয যাইমের দাসত্ব। কোনো-কারণে একদিন এই নতুন মনিবের মেজাজ বিগড়ে গেল। রক্তিম চোখে ছেলেটির গালে ভারী হাতের এক শক্ত থাপ্পড় বসিয়ে দিল সে। ব্যথার তীব্রতায় ছোট্ট মাহমুদ হেঁচকি তুলে গা দুলিয়ে দুলিয়ে কাঁদতে লাগল। পাশ থেকে কেউ কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে লজ্জা দেবার জন্য বলে উঠল—'আরে, মিয়া দেখি এক থাপ্পড় খেয়েই কাঁদতে লেগেছে!'

কান্নার গমকের ভেতর কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে মাহমুদ জবাব দিল—'আমি থাপ্পড়ের ব্যথায় কাঁদছি না। আমি আমার বাপ-দাদাদের অপমানে কাঁদছি।'

প্রশ্নকর্তা শ্লেষাত্মক গলায় বলল—'তোর বাপ আবার কে? কোনো কাফেরই তো, নাকি?' খুব বাজেভাবে নাক সিঁটকাল সে।

মাহমুদ দু-হাতের তালু দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে উত্তর দিল—'আমি শুধু এবং শুধুই মুসলিম ঘরানার লোক। আমার নাম মাহমুদ বিন মাওদুদ। আমি জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের বোনের ছেলে।'[৪৯৯]

মাহমুদের এই বাস্তবতার মুখোশ উন্মোচন করে-দেওয়ার ব্যাপারটা লোকদের জন্য ছিল বিস্ময়জনক। কিন্তু কেউ ছিল না তখন তার কথায় বিশ্বাস করবার। লোকেরা ধারণা করল—পিচ্চিটা হয়তো দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য বাহানা তৈরি করছে। কেউ ওর কথার সত্যতা ঘেঁটে দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না।

---

[৪৯৮] আল-ইবার ৩/২৯১

[৪৯৯] হুসনুল মুহাজারা ২/৩৮ আল্লামা সুয়ুতি রহ. প্রণীত

আল-মালিকুস সালিহের খেদমতে...

মিশরে তখন আল-মালিকুল কামিলের শাসন ছিল। তার পুত্র শাহজাদা আল-মালিকুস সালিহ খাওয়ারিজমিদের বীরত্ব এবং তাদের যুদ্ধ-দক্ষতা সম্পর্কে অবগত ছিল। একদিন তার খাওয়ারিজমিদের যোগ্যতা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার কথা চিন্তা করল। তারপর পিতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তখনকার যাযাবর খাওয়ারিজমি সিপাহিদের জন্য সৈন্যদলে ভর্তি হবার দরজা উন্মুক্ত করে দিল।

আল-মালিকুল কামিলের মৃত্যুর ২ বছর পর ৬৩৭ হিজরি সনে আল-মালিকুস সালিহ মিশরের বাদশাহ বনে গেলেন। তার শাসনকালে তুর্কি সিপাহিদের ছাড়াও তুর্কি দাসদেরও খরিদ করে সৈন্যদলে ভর্তি করে দেওয়া হতে লাগল। এভাবে কিছুকাল পরে মিশর সাম্রাজ্যের সেনাশক্তিতে খাওয়ারিজমি তুর্কিরা হয়ে উঠল একটা প্রধান উৎস। আল-মালিকুস সালিহও স্থানীয় সিপাহিদের তুলনায় এদের উপর বেশি ভরসা রাখতেন।

সেই ছোট্ট মাহমুদের ভাগ্য জেগে উঠল। সৈন্যদলের জন্য ক্রয়কৃত কমবয়সি খাওয়ারিজমি দাসদের ভেতর তার নামও এসে গেল। এভাবে আল-মালিকুস সালিহের খেদমতে মিশর পৌঁছে গেল সে। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও বুকভর্তি সাহস, বিশ্বস্ততা ও আদব-তমিজের জন্য শিগগিরই সে আল-মালিকুস সালিহের খাদেমদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসন জয় করে নিল।

বরকতপূর্ণ স্বপ্ন

বাল্যকালে মাহমুদ নিজ চোখে তাতার-তাণ্ডবের হৃদয়ে-মোচড়-তোলা যেসব চিত্রপট দেখেছিল, তা তার বুকের দেয়ালে স্থায়ীভাবে খোদিত হয়ে গিয়েছিল। এই কঠিন নির্যাতনের কথা একটিবারের জন্যও সে ভুলে থাকতে পারেনি। বিশেষত, রাতে ঘুমোতে গেলে চোখের সামনে একসঙ্গে সমস্ত দৃশ্য এসে ছায়াচিত্রের মতো ভেসে উঠতে থাকত। আর নিজের অজান্তেই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠত মাহমুদের হাত। তার জানা ছিল—তার খানদান ও ভাইবোনদের হত্যাকারী তাতাররাই। সে জানত—তাতার ছাড়া কেউ তার দেশ উজাড় করেনি। তাতারা ব্যতীত কেউ তাকে হিজরত করতে বাধ্য করেনি। সে জানত—এই চেঙ্গিজীয় কাফেররাই তার মতো হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বাচ্চাকে এতিম বানিয়েছে।

এইসব ভাবতে ভাবতে সে কঠিন প্রতিশোধ নেবে বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। তারপর দিনদিন যতই তার বয়স বাড়ছিল, প্রতিশোধের সেই জজবাও পাল্লা দিয়ে স্ফীত হয়ে উঠছিল।

বালক-বেলার এই দিনগুলোরই কোনো একটি দিনের ঘটনা। একদিন এক বিস্ময়জাগানিয়া স্বপ্ন দেখল মাহমুদ। এই স্বপ্ন ছিল তার সৌভাগ্য ও সফলতার পূর্বাভাস। স্বপ্নের ভেতর সে রহমতে আলম, সাকিয়ে কাউসার, শাফিয়ে মাহশার

রাসুল মুহাম্মদ ﷺ এর সাক্ষাৎ লাভ করল। রাসুল তাকে সুসংবাদ প্রদান করে ইরশাদ করলেন—তুমি মিশরের বাদশাহ হবে এবং তাতারদের পরাজিত করবে।

বিপুল আনন্দ নিয়ে ঘুমের ভেতর থেকে জেগে উঠল বালক মাহমুদ। তার সারাদেহে খুশি ও উত্তেজনার ঢেউ খেলে যেতে লাগল। সৌভাগ্যের চিহ্ন কপালজুড়ে জ্বলজ্বল করে ফুটতে লাগল। বুকের পুরো ভেতরটা দৃঢ় বিশ্বাসের স্থায়ী উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। পৃথবীর সাধারণ নিয়মে নতুন দিনকে স্বাগত জানিয়ে পেছনে সরে যেতে লাগল পুরোনো দিন। আগমন ঘটতে লাগল নতুন সময়ের। কিন্তু সেই স্বপ্নের প্রতি মাহমুদের দৃঢ় বিশ্বাস এক পলকের জন্যও তার মন থেকে অবলুপ্ত হল না।

নিষ্পাপ প্রতিশ্রুতি

মাহমুদের বয়স কম দেখে স্নেহবৎসল মনিব তার দেখভালের জন্য একজন সিপাহি নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। একবার মাহমুদের মাথায় খুশকি পড়ে গিয়েছিল। খাদেম সিপাহি মাহমুদের সেই খুশকি পরিষ্কার করতে করতে তাকে তিরস্কার ও অভিশাপ দিত। মাহমুদ কিছুদিন ধরে সিপাহির এই অপমানজনক কথাবার্তা শুনে যেতে থাকল। কিন্তু একদিন আর পরোয়া করল না। সিপাহির ভর্ৎসনার জবাবে নিষ্পাপ ক্রোধ নিয়ে সে বলে উঠল—সর্বনাশ হোক তোমার! বলো, তুমি আমার থেকে কী নিতে চাও? আমি যখন মিশরের বাদশাহ হয়ে যাব, তখন যা নেবার নিয়ে নিয়ো। বালকের মুখে এত বড় কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল সিপাহি। বলল—'তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

তৎক্ষণাৎ মাহমুদ বলল—'জি না। বরং, স্বপ্নে আমি রাসুলুল্লাহর জিয়ারত লাভ করেছি। তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন—তুমি মিশরের বাদশাহ হয়ে তাতার-জাতির পরাজয় ঘটাবে। আর আকায়ে নামদার ﷺ এর ইরশাদ সন্দেহমুক্ত, অকাট্য এবং সুদৃঢ়।'

সিপাহি একথা শুনতেই একটুক্ষণের জন্য যেন অজ্ঞান হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই হুঁশ ফিরে পেয়ে ঝট করে বলে উঠল—'আমি তো ৫০জন অশ্বারোহীর নেতৃত্বের পদ নিতে চাই।'

মাহমুদ তৎক্ষণাৎ স্মিতমুখে বলল—'নগদ খোশখবর নাও, এই পদ তুমি পেয়ে যাবে!'

দাস থেকে বাদশাহ হয়ে ওঠার কাহিনি

দিন কেটে যেতে লাগল। গায়ে পাখা লাগিয়ে উড়ে যেতে লাগল মহাকাল। উড়ন্ত সেই মহাকালের পিঠে চড়ে মাহমুদ পৌঁছে গেল প্রগাঢ় যৌবনের গহীন মৌবনে। এর ভেতর সিরিয়া ও মিশরে অব্যাহত রইল রাজনৈতিক বিভিন্ন পটপরিবর্তনের

ধারা। ৬৪৭ হিজরি সনে মাহমুদের মুরুব্বি সরদার আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দীন আইয়ুব যখন আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেলেন (মৃত্যুবরণ করলেন), মিশরের রাজনীতি ওলট-পালট হয়ে নতুন একটি ধারা গড়ে উঠল। এর পরিণতি ছিল—আইয়ুবি শাসনের অবসান এবং ইজ্জুদ্দীন আইবেক তুর্কমানি নামে এক তুর্কি আমিরের সিংহাসনে আরোহণ।

ইজ্জুদ্দীন আইবেক আল-মালিকুল মুয়াজ্জাজ উপাধি ধারণ করে সামলে নিলেন মিশর রাজ্য। তিনি নিজেও যেহেতু সেই তুর্কি মুহাজির ছিলেন, যাদেরকে আল-মালিকুস সালিহ আশ্রয় দিয়ে নিজের খাদেম বানিয়েছিলেন; একারণে তার শাসনকালে মিশরে তুর্কিদের অবস্থান অনেক পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল। মাহমুদও দ্রুত উন্নতির স্তর ডিঙিয়ে বাদশাহর বিশ্বস্ত খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

আল-মালিকুল মুয়াজ্জাজ ইজ্জুদ্দীন কয়েক বছর ধরে খুব সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় রাজ্য পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন। ৬৫৬ হিজরিতে তাতারদের বাধাহীন সয়লাব—যা এক দীর্ঘ সময় ধরে বাগদাদ-সীমান্তে আঘাত হানছিল—সবকিছু ভেঙেচুরে সামনে অগ্রসর হয়ে গেল। এবং দেখতে দেখতেই বিধ্বস্ত হয়ে গেল রাজধানী বাগদাদ। পুরো মুসলিমবিশ্বে বেজে উঠল বিষাদিত মাতমের ধ্বনি। হালাকু খানের অবর্ণনীয় নির্যাতন চেঙ্গিজীয় হিংস্রতার সেই অধ্যায়কে ফের তাজা করে তুলল। ইরাকের পর সিরিয়া ও মিশরের সাধারণ মুসলিমদের নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে ভালো কোনো উপলব্ধিই ছিল না। কিন্তু আফসোস যে, তখনো শাসকশ্রেণি ছিল নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত।

৬৫৭ হিজরি সনে আল-মালিকুল মুয়াজ্জাজ, সম্রাজ্ঞী শাজারাতুদ-দুরের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হয়ে গেলেন। এর পালটা শোধ হিসেবে আল-মালিকুল মুয়াজ্জাজের বিশ্বস্ত দাসশ্রেণি সম্রাজ্ঞী শাজারাতুদ-দুরকে হত্যা করে ফেলল। ফের একবার খালি পড়ে রইল মিশরের সিংহাসন। সাধারণ ও বিশিষ্ট—সকল শ্রেণির লোকই হয়রান হয়ে একে অন্যের মুখ দেখতে লাগল। সবার চোখেমুখে ছিল একই প্রশ্ন, একই জিজ্ঞাসা; অভিন্ন আকুতি। পূর্বদিক থেকে তখন প্রচণ্ড ঝড়ের মতো উড়ে আসছিল তাতার-বাহিনী।

আল-মালিকুল মুয়াজ্জাজের পর তার সন্তানদের মধ্যে রাজ্য সামলাবার মতো যোগ্য কেউ ছিল না। শেষে রাজ্যের আমিরগণ পরামর্শ করে নুরুদ্দীন নামে মুয়াজ্জাজের অল্পবয়সি এক পুত্রকে আল-মালিকুল মানসুর উপাধি দিয়ে মিশরের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। আর সেই মাহমুদকে—যিনি সাম্রাজ্যের রাজমহলে সাইফুদ্দীন কুতুজ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন—এই অল্পবয়সি শাসকের প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হল। আল-মালিকুল মানসুর কিছুদিন কুতুজের নেগরানিতে রাজ্য পরিচালনা করে গেল।

সাইফুদ্দীন মাহমুদ কুতুজের সিংহাসনারোহণ

তাতারদের যুদ্ধপ্রস্তুতির খবর একের পর এক এসে পৌঁছছিল মিশরে। আর কুতুজের মনে হচ্ছিল—তার স্বপ্নপূরণের সময় প্রতিনিয়ত সন্নিকটবর্তী হচ্ছে। তিনি আরো লক্ষ করছিলেন—আল-মালিকুল মানসুরের মতো নবীন, স্বল্পবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞ শাসকের অধীনে তাতারদের মতো বিরাট শত্রুর বিরুদ্ধে সফলতা লাভের চিন্তাও করা যায় না, এই শাসকের অধীনে সফল হবার ভাবনা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

এই বিষয়গুলো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে তিনি রাজ্যের আমিরদের একটি সভা ডাকলেন। তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগাতে চেষ্টা করলেন যে, তাতার-ফেতনার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ মেহনত-মুজাহাদার জন্য বর্তমান শাসককে বরখাস্ত করা অত্যাবশ্যক।

রাজ্যের আমিরগণ—যারা দ্রুত পরিবর্তিত হতে-থাকা সময় ও পরিস্থিতির ভয়ংকর বিবর্তন দেখতে পেয়েছিলেন—কুতুজের এই চিন্তায় ঐকমত্য পোষণ করলেন। সবাই কুতুজের হাতে বাইয়াত হয়ে তার নেতৃত্বে তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবার শপথ করলেন। তারপর কুতুজ ৬৫৭ হিজরির জিলকদ মাসে মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাকে আল-মালিকুল মুজাফফর সাইফুদ্দীন কুতুজ উপাধিতে স্মরণ করা হয়।

সিংহাসনে উপবেশন করার পর ছোটবেলাকার সেই খাদেম সিপাহির সাথে কৃত ওয়াদাটি তিনি পূরণ করলেন। তাকে পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর অফিসার নিযুক্ত করে দিলেন। এই অফিসার মিশরীয় বাহিনীর মধ্যে আমির জালালুদ্দীন নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।[৫০০]

কিতবুগা নৈয়ানের রক্তপাত

বাগদাদের পর ধ্বংসাত্মক তাতার-জাতি খানিকটা বিরতি দিয়ে সিরিয়ায় এসে আক্রমণ চালাল। তাদের ঠেকাবার মতো শক্তি সিরিয়ান শাসক আল-মালিকুন নাসিরের ছিল না। তাতাররা একের-পর-এক সিরিয়ার ছোট-বড় সমস্ত শহর পিষ্ট করে চলে গেল। এই অভিযানে তাতারদের নেতৃত্ব যদিও হালাকু খান দিচ্ছিল, কিন্তু বাহিনীর কমান্ড সরাসরি তার প্রশিক্ষিত দক্ষ জেনারেল কিতবুগা নৈয়ানের হাতে ছিল।

এই জেনারেলের রক্তপাত ও যুদ্ধ-চাতুর্যের কিসসা জনমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকে তার নাম শুনেই ভয়ে কেঁপে উঠত। তাকে মনে করত—সে এক আসমানি ক্রোধানল। কিতবুগা নৈয়ান হালাকু খানের দাদা চেঙ্গিজ খানের সময়কাল থেকে

---

[৫০০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/২৬৩-২৬৪

তাতার-বাহিনীর মধ্যে সবার চেয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার লোক ছিল। হালাকু খানের সমস্ত বিজয় এই জেনারেলের সহায়তায়ই হয়েছিল।

হাফেজ ইবনে কাসির বলেন—এ-ই ছিল সেই খবিশ, যে হালাকু খানের জন্য অনারব দেশগুলো থেকে শুরু করে সিরিয়া পর্যন্ত সমস্ত এলাকা দখল করে নিয়েছিল। এই বদবখত মুসলমানদের মোকাবেলায় এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল, যার দৃষ্টান্ত থেকে পূর্বেকার ইতিহাস শূন্য। যেমন : সে এক শহর জয় করার পর সেখানকার লড়াইয়ের উপযুক্ত লোকদেরকে সাথে নিয়ে অন্য শহরে গিয়ে অবরোধ তৈরি করে ফেলত। তারপর অবরুদ্ধদের কাছে দাবি করত—আমাদের সঙ্গে আসা মুসলিমদের তোমাদের শহরে জায়গা দাও, যাতে এদের থাকবার কোনো ব্যবস্থা হয়।

তার এই আবদার মুসলিমদের জন্য বাহ্যত হামদর্দি মনে হতো। বরং, কখনো অবরুদ্ধরা নিজেদের জনশক্তি বৃদ্ধির কথা ভেবে ব্যাপারটাকে তাদের জন্য কল্যাণকরই মনে করত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল অবরুদ্ধদের বশীভূত করবার একটা পরিকল্পনা ও চাল। যদি অবরুদ্ধরা জেনারেলের কথামতো তার সাথে আসা মুসলিমদেরকে শহরে জায়গা দিয়ে দিত, তখন অনিবার্যভাবে অবরুদ্ধদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে খাদ্য-খোরাকির ভান্ডার খুব দ্রুতই ফুরিয়ে যেত। অন্যদিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে যেত অবরোধের সময়সীমা।

আর যদি অবরুদ্ধরা এই জেনারেলের চাল বুঝে গিয়ে তার আবদার না মানত, তা হলে কিতবুগা নৈয়ান সঙ্গের মুসলিমদেরকে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তাদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দিত। তাদের দিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করাত, যতক্ষণ না তারা জয় করে নিতে পারত শহর, অথবা লড়তে লড়তে নিজেরা খতম হয়ে যেত। যদি তারা শহর জয় করতে সক্ষম হতো, তা হলে তো কিতবুগা নৈয়ানকে নিজের একজন লোককেও নষ্ট করতে হতো না, কষ্ট ছাড়াই হাসিল হয়ে যেত তার উদ্দেশ্য। যদি তারা লড়তে লড়তে নিঃশেষ হয়ে যেত, এতেও সেই মুসলিমদের জনসংখ্যাই কমত। এতে কিতবুগা নৈয়ান মুসলিমদের একটি মনোরম তামাশা দেখে গভীর আনন্দ পেত মনে।

এমনকি মুসলিমদের এই পারস্পরিক যুদ্ধে অবরুদ্ধদের শক্তিও কমে আসতে থাকত, যার পরে এই ধোঁকাবাজ কিতবুগা কম জনশক্তির ক্ষতিসাধন করেও বড়-বড় শহর সহজেই জয় করে নিত।

তার আরেকটি চাল এ-ও ছিল যে, সে কখনো অবরুদ্ধদের কল্যাণ চেয়ে এরকম চিঠি পাঠাত—'হে শহরবাসী, তোমাদের নিকটে জমানো পানি খুবই কম। এই পানি অতি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। এতে তোমাদের কারুর জীবনের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা থাকবে না। আমরা তোমাদের সমস্ত পুরুষকে হত্যা করে ফেলব।

নারীদের ও বাচ্চাদের গ্রেফতার করে সেবিকা ও দাস বানিয়ে নেব। এজন্য উত্তম এটাই যে, এই দুঃসময় সামনে আসবার আগেই সন্ধি করে শহর আমাদের হাতে অর্পণ করো; বাঁচিয়ে নাও নিজেদের প্রাণ।'

শহরবাসী যদি এই ধমকি শুনে সন্ত্রস্ত না হতো এবং প্রতিউত্তরে একথা বলে দিত যে, তোমরা ভুল বুঝছ, আমাদের কাছে জমানো পর্যাপ্ত পানি আছে। আমরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমাদের মোকাবেলা করতে পারব। তা হলে কিতবুগা নৈয়ান তাদেরকে বলত—তোমাদের কাছে যে পর্যাপ্ত পানি আছে, সেটা যাচাইয়ের সুযোগ আমাকে দাও। কারণ, আমার ধারণা যদি ভুল হয়, বাস্তবেই তোমাদের কাছে যদি বেশি পরিমাণ পানি থাকে, তা হলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাদের অবরোধের কষ্ট পোহাবার কী দরকার? আমরা অবরোধ উঠিয়ে চলে যাব।

শহরবাসী এই প্রস্তাব অনাকাঙ্ক্ষিত নেয়ামত ভেবে জবাবি চিঠিতে লিখত—আপনি নিজ আগ্রহে আপনার কিছু বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে আমাদের পানির অধিক সঞ্চয়ের সত্যতা যাচাই করে নিন।

তখন কিতবুগা নৈয়ান তার কিছু সিপাহিকে শহরের ভেতরে পাঠিয়ে দিত। এই সিপাহিদের সাথে থাকত লম্বা লম্বা বর্শা। বাহ্যত এই কয়েকজনকে শহরবাসীদের জন্য কোনো আশঙ্কার কারণ মনে হতো না। কিন্তু এই কজনের মধ্যেই লুকোনো থাকত সারা শহরের মৃত্যুর পয়গাম।

তারা যে বর্শাগুলো নিয়ে যেত, সেগুলো ছিল একধরনের ইঞ্জেকশন। বর্শার যে দণ্ডটি থাকত, ভেতর থেকে সেটি হতো ফাঁপা। সেই ফাঁপা অংশে অত্যন্ত বিষাক্ত তরল পদার্থ ভরে দেওয়া হতো। বর্শাগুলো এমন গঠনশৈলী দিয়ে বানানো হয়েছিল যে, প্রয়োজনের সময় ভেতরের বিষটাকে এক বিশেষ কায়দায় বার করা যেত।

শহরবাসী এই বর্শাধারীদের ক্ষতিকর না-ভেবে তাদের জন্য খুলে দিত শহরের ফটক। তাদেরকে নিজেদের পুকুর, কুয়া ও হাউজগুলোতে নিয়ে যেত। আর এই ধোঁকাবাজ তাতাররা তাদের বর্শাগুলোকে পানির ভেতর ডুবিয়ে ডুবিয়ে বাহ্যিকভাবে পানির গভীরতা মেপে দেখত; কিন্তু সাথে সাথে পানির মধ্যে ছড়িয়ে যেত বিষ। এভাবে বিষাক্ত হয়ে যেত শহরের সমস্ত পানি।[৫০১]

পরবর্তীতে শহরবাসী যখন পানি ব্যবহার করত, সেই ব্যবহারে তাদের বহুসংখ্যক লোক ধ্বংস হয়ে যেত। বাকিরা নিরুপায় হয়ে হাতিয়ার ফেলে দিয়ে শত্রুদের জন্য খুলে দিত শহরের সব দরজা।

---

[৫০১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/২৬৫

তাতারদের দামেশক দখল

৬৫৮ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে তাতার বিজেতারা দামেশক শহরও দখল করে ফেলে। শহরের মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর ভেঙে পড়ে কেয়ামত। আর ওখানকার খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের এই পরাজয়ে উৎসবের আয়োজন করে। শহরের বাইরে বের হয়ে তারা আক্রমণকারী তাতারদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তাদের জন্য পেশ করে উপঢৌকন। তারা তাতারদের এই বিজয়কে, বলা যায়, নিজেদের বিজয় মনে করে খুশির বাদ্যবাজনা বাজাতে বাজাতে শহরে ফিরে আসে।

ইবনে কাসির লিখেছেন—খ্রিষ্টানরা বাবে-তাওমা দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। তখন তারা মাথার উপর উঁচিয়ে ধরেছিল ক্রুশচিহ্ন। তারা তখন বিশেষ ধরনের জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। হেঁকে হেঁকে বলছিল—ইয়াসু মাসিহের বিজয়ের দিন এসে গেছে! তারা ইসলাম ও মুসলিমদের স্পষ্ট ভাষায় গালিগালাজ করছিল। তাদের হাতে ছিল মদের পাত্র। যে-মসজিদের পাশ দিয়েই তারা যেত, সেখানেই পাত্র থেকে মদ ছিটাত। আর ছিল কিছু মদের বোতল। সেগুলোকে তারা লোকদের চেহারা ও কাপড়ে ছিটাচ্ছিল। অলিগলি ও বাজারে আসা লোকদের দেখে আদেশ দিত ক্রুশের সম্মান দেখাবার। তারা মদ নিয়ে মসজিদে ঢুকত এবং এই সিদ্ধান্ত নিতে থাকত যে, এখানে তাতারদের অবস্থান যদি বেশি দীর্ঘ হয় তবে অনেক মসজিদ আমরা ধসিয়ে ফেলব।[৫০২]

তাতারদের দামেশক দখলের সাথে সাথেই সিরিয়াও পুরোপুরিভাবে তাদের মুঠোয় চলে গেল। তখন তারা মিশরের ফটকের মুখে। ক্রমাগতভাবে অনেক বিজয় লাভ করে ফেলেছিল বলে তাতার নরপশুদের মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন ও তাড়াহুড়োপূর্ণ আক্রমণের একটা উন্মত্ততা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিতবুগা নৈয়ান ও হালাকু খানের মনে এবারও তাদের বিজয় ঘটবে বলে পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল।

যুদ্ধের দামামা

মিশরের সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুজ তাতারদের মুখোমুখি হবার জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। তাতারদের অগ্রযাত্রার সংবাদ পেতেই তিনি সৈন্যদল নিয়ে মিশরের সীমান্ত পেরিয়ে এলেন। তার হুঁশিয়ার মেজাজে মনে হল—তাতারদের মিশরের সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ করে দেওয়া ক্ষতিকর। তাই মিশরীয় বাহিনী খুব তড়িঘড়ি যুদ্ধযাত্রা করল। কয়েক মনজিল পেরিয়ে এসে ঢুকে পড়ল সিরিয়া-সীমান্তের ভেতর।

---

[৫০২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২৫৭

সুলতানের বাহিনীতে তুর্কমান আমিরগণ এবং শাহিমহলের নামজাদা কয়েকজন যুবকের একটি দল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পাশাপাশি সাইফুদ্দীন কুতুজ হিমাতের হাকিম আল-মালিকুল মানসুরকে নিম্নোক্ত কথা লিখে ডেকে পাঠালেন যে, 'এবার দস্তরখান সজ্জিত করবার চিন্তা বাদ দাও। ব্যস, প্রত্যেক সিপাহিকে গোশতের একেকটি টুকরো দিয়ে দাও এবং জলদি জলদি এসে পৌঁছোও।'[৫০৩]

কিতবুগা নৈয়ান যখন সাইফুদ্দীন কুতুজের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পেল, এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিপ্রেক্ষিত ও কুতুজের দুর্ধর্ষ সাহসিকতা দেখে একমুহূর্তের জন্য বিস্ময় ও দুশ্চিন্তায় বিমূঢ় হয়ে গেল সে। তবু অবিলম্বে তার বাহিনীকেও সে সামনে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিল। কিতবুগা নৈয়ানের সাথে অংশগ্রহণকারী উম্মাহর গাদ্দার মুসলিম আমিররা তাকে পরামর্শ দিল—আপনি এখানে থেমে দ্রুত হালাকু খানের কাছে আরো সেনা-সাহায্য তলব করুন। কিন্তু কিতবুগা নৈয়ানের মনে নিজের বর্তমান শক্তি, সংখ্যাধিক্য, নিজের মকরবাজি ও অভিজ্ঞতার প্রতি পুরো ভরসা ছিল। এজন্য সে থামল না।

আইনজালুতের যুদ্ধ

দু-পক্ষের বাহিনীই বহু মনজিল পেরোতে পেরোতে একে অন্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অবশেষে ২৫ রমজান ৬৫৮ হিজরি সনের জুমার দিন আইনজালুত নামের ঐতিহাসিক স্থানে হক-বাতিলের এক অবিস্মরণীয় যুদ্ধ সংঘটিত হল। তাতার-বাহিনীর মাঝে কয়েকজন মুসলিম আমিরও নিজেদের সৈন্যদল নিয়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে আল-মালিকুস সাঈদ (আল-মালিকুল আদিলের নাতি) ও আশরাফের (হিমসের শাসক) নাম শীর্ষচূড়ায়।

দু-দিকের সৈন্যদল মুখোমুখি হল। তখন সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুজ নিজের প্রধান সেনা-অফিসারদের বললেন—খবরদার, যতক্ষণ সূর্য ঢলে না যায়, ছায়া লম্বা হতে না থাকে, কেউ লড়াই শুরু করার চেষ্টা করবে না। আমি চাচ্ছি দুশমনের উপর সেই সময়টায় আঘাত হানব, যখন লোকেরা জুমার নামাজে মশগুল হবে এবং খতিব সাহেবরা আমাদের জন্য দোয়া করবেন।[৫০৪]

দিন ঢলতেই আরম্ভ হয়ে গেল যুদ্ধ। দুদিক থেকেই শুরু হয়ে গেল তরবারি ও বর্শা চালনার জাদুকরি খেল। বীরপুরুষরা প্রদর্শন করতে লাগল নিজেদের অপূর্ব বীরত্ব। মিশরীয় বাহিনী তখন একই সময়ে তাতার ও তাদের মিত্র মুসলিম শাসকদের সাথে যুদ্ধ করছিল। তবু দুঃসাহসী সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুজের মনে

---

[৫০৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/২৬৪

[৫০৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/২৬৫

কোনোপ্রকার ভয় ছিল না। তিনি একটুও ঘাবড়াননি। আকায়ে নামদার, তাজদারে রিসালাতের সুসংবাদের প্রতি তার পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল।

লড়াই হয়ে উঠেছিল তুঙ্গস্পর্শী। দুইপক্ষ তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়ে যাচ্ছিল। আইনজালুতের মাটি রক্তে লাল হয়ে উঠছিল। স্তূপ পড়ে যাচ্ছিল অগণন লাশের। তাতাররা তাদের বিগত অর্ধশতাব্দীর অর্জন-করা বিভিন্ন বিজয়ের দম্ভে অত্যন্ত জোশ, জজবা, ক্রোধ ও ক্ষোভ নিয়ে তেড়ে তেড়ে এসে আক্রমণ করছিল। তাদের সঙ্গে যেসব মুসলিম শাসক ছিল, তাদের বাহিনীও নিজেদের কাফের ও মুশরিক মনিবদের মনোরঞ্জনের জন্য এবং পার্থিব ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার ভিক্ষা লাভের আশায় নিজেদেরই মুসলিম ভাইদের রক্ত প্রবাহিত করতে মাতাল হয়ে উঠেছিল।

এই বাতিলপূজারিদের মোকাবেলায় মুহাজির তুর্কি সিপাহি ও মিশরের জানবাজ মুসলমানরা সত্যধর্মের প্রতিরক্ষার জন্য জীবনবাজি লাগিয়ে এই মহা সয়লাবের সম্মুখে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান ছিল।

এ পর্যন্ত লড়াইয়ে দু-পক্ষের পাল্লাই ছিল বরাবর। আচমকা কিতবুগা নৈয়ান যুদ্ধের একটি কৌশল অবলম্বন করে মুসলিমদের বাম বাহুতে এত প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসল যে, ওদিকের মুসলিম-সৈনিকদের পা হড়কে খানিকটা পিছিয়ে এল। বাধ্য হয়েই খানিকটা পেছাতে হল তাদের। তখন তুর্কি ও মিশরীয় জেনারেলদের চেহারায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল অস্থিরতা ও ছটফটানি। আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে অস্থির হয়ে গিয়েছিল তারা। তাতারদের প্রচণ্ড আঘাতে মিশরীয় সেনাদলগুলোর সব যুদ্ধসারি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল লড়াইয়ের নাটাই পুরোপুরিভাবে তাতারদের হাতে চলে গেছে। কিন্তু সেই নাজুক সময়েও আল-মালিকুল মুজাফফর সাইফুদ্দীন কুতুজের কপালজুড়ে সূর্যালোকের ন্যায় ঝকঝক করছিল সুদৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতা।

তিনি দুশমনের ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক অগ্রসরতা ও নিজের সঙ্গীদের পিছু-হটা যখন দেখলেন, প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধে ধাতব শিরস্ত্রাণটি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এবং ভয়ংকর গর্জন দিয়ে-ওঠা সিংহের মতো সেন্টারের বিশেষ দলটিকে নিয়ে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।[৫০৫]

পিছু হটতে-থাকা মিশরীয় সিপাহিরা নেতার এই দুর্ধর্ষ সাহস যখন দেখল, উত্তেজিত হয়ে উঠল তাদের ঈমানি অগ্নিস্পৃহা; এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ফের একবার তারা মজবুত করে নিল নিজেদের পা। সেই প্রচণ্ড যুদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যেককে ভুলিয়ে দিয়েছিল ডানে-বামে কী ঘটছে। সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুজ আগে বাড়তে বাড়তে একদম একাই তাতারদের সেই স্থানে পৌঁছে গেলেন, যেখানে চলছিল হাতাহাতি পর্যায়ের কঠিন যুদ্ধ। সবাই একে অন্যকে পিছে ঠেলে দিচ্ছিল।

---

[৫০৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২৩/২০১

এর মধ্যে দুশমনের সৈন্যরা সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুজের কাছে পৌঁছবার সুযোগ পেয়ে গেল। অকস্মাৎ এক তাতার-সিপাহি এসে সুলতানের উপর আক্রমণ করে বসল। কুতুজ ঠিক সময়ে হুঁশিয়ার হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ঘোড়া থেকে ঝাঁপ লাগালেন।

দুশমনের তরবারির কোপটি তার উপর না-পড়ে তার ঘোড়ার গায়ে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই মারা গেল ঘোড়াটি। আশপাশে কোনো সিপাহির কাছেই অতিরিক্ত কোনো ঘোড়া চোখে পড়ছিল না সুলতান কুতুজের। কিন্তু তবু সাহায্যের জন্য তার প্রতি কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করা সমীচীন মনে করেননি তিনি। পদাতিকভাবেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এর মধ্যেই তার উপর চোখ পড়ে এক আমিরের। আমির ঘোড়ার পিঠে গুঁতো লাগিয়ে তির-বেগে সুলতানের দিকে ছুটে আসে। কাছে এসে নেমে পড়ে ঘোড়া থেকে এবং ঘোড়াটি সুলতানের জন্য পেশ করে ব্যস্ত অথচ বিনীত ভঙ্গিতে বলে ওঠে—সরদার, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি এটির উপর সওয়ার হয়ে যান।

সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুজ মায়াবী একটা হাসি দিয়ে প্রশান্ত গলায় বললেন—এমনটা হতে পারে না। এই বিপদের সময় তোমাকে পায়দল করে মুসলিম উম্মাহকে তোমার বিপুল খেদমত থেকে বঞ্চিত করবার আশঙ্কা আমি মেনে নিতে পারছি না। তবু জোরাজুরি করতে থাকে আমির। কিন্তু এর উপর নিজের নফসকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারটা মনঃপূত হল না কুতুজের। কিছুক্ষণ পরেই তার একটি দল বাড়তি ঘোড়া নিয়ে ওখানে পৌঁছে গেল।

সুলতান কুতুজ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে সেগুলোর মধ্য থেকে একটি ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে সওয়ার হয়ে গেলেন। তখন এক অফিসার সুলতানকে সম্বোধন করে অনুযোগের সুরে বলল—হুজুরওয়ালা, আপনি এই আমিরের ঘোড়ায় কেন সওয়ার হননি? আল্লাহ না করুন, যদি দুশমন সেই পরিস্থিতিতে আপনাকে পেয়ে যেত, আপনাকে শহিদ করে দেওয়ার আশঙ্কা ছিল। তা হলে আপনার পরে ইসলামের এই শত্রুদের হাতে পৃথিবী থেকে মুছে যেত দীন ইসলাম। সুলতান তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—না! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন থাকত, লড়তে লড়তে শহিদ হয়ে জান্নাতে চলে যেতাম; ভূপৃষ্ঠে থেকে যেত ইসলাম। এই ইসলামের প্রভু মহান আল্লাহ বিদ্যমান আছেন, যিনি কখনোই ইসলাম মুছে যেতে দেবেন না। দেখো, ইসলামের কত বড়-বড় প্রতিরক্ষাকারী পৃথিবী থেকে চলে গেছেন আর আল্লাহ তায়ালা তাদের স্থলে অন্য লোকদের ইসলামের হেফাজতের জন্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ইসলামকে তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেননি।[৫০৬]

---

[৫০৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/২৬৪

এই আলাপের ভেতরেও সুলতান কুতুজ সজাগ দৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশে লক্ষ রাখছিলেন। পাশাপাশি প্রধান সেনা-অফিসারকে যথাযথ নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপর অকস্মাৎ তিনি আল্লাহর সাহায্য অবতরণের দৃশ্য অনুভব করতে পারলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা গেল। আল্লাহর অপার সাহায্য এসে তাওহিদি সেনাদের কপালে চুমু দিতে লাগল। তাতার-বাহিনী আচমকা হারিয়ে ফেলল একটু আগের সেই বাহুর জোর।

মুসলিম বাহিনীর চিকচিকে তরবারির ভয় তাদের আত্মায় ছেয়ে গেল। মুজাহিদদের তাজা আতঙ্ক প্রকটভাবে তাদের উপর চড়াও হয়ে গেল। গোবি মরুভূমির গাঢ়-কৃষ্ণ পাশবিক অন্ধকারের ভেতর থেকে জেগে-ওঠা এই অগ্নিঝড়ের পশ্চাৎপদতা আকাশের খাতায় লেখা হয়ে গিয়েছিল।

আল্লামা সুয়ুতি তারিখুল খুলাফায় এ যুদ্ধের ফল বর্ণনা করে বলেন—তাতারদের অত্যন্ত লজ্জাজনক পরাজয় ঘটল। আল্লাহর অপার অনুকম্পায় মুসলিমদের অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত বিজয়। তাতারদের গণহারে হত্যা করা হয় এবং তারা এমনভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভেগে যেতে থাকে যে, মুসলিমদের হিম্মত বহুগুণে বেড়ে যায়। তারা খুব সহজে তাদের গ্রেফতার করতে থাকে এবং লুণ্ঠন করতে থাকে।[৫০৭]

যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে যেসব কয়েদিকে আল-মালিকুল মুজাফফর সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুজের সামনে পেশ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে আল-মালিকুস সাউদ বিন আবদুল আজিজ বিন আল-মালিকুল আদিলও ছিল। তাতারদের সহযোগিতা-কর্মে একে খুব অগ্রগামী দেখা গিয়েছিল। কুতুজ ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করার অপরাধে তার গর্দান উড়িয়ে দেন।

কিতবুগা নৈয়ানের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সুলতান কুতুজকে থেকে-থেকে এই বিষয়টা অস্থির করে তুলছিল যে, ওই হতভাগা বেঁচে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি তো!

এর মধ্যেই তার সামনে এক তাতার যুবককে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হল। সুলতানকে বলা হল—এই যুবক কিতবুগা নৈয়ানের ছেলে।

কুতুজ অস্থির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাবা কি পালিয়ে গেছে?

যুবক জবাব দিল—সে পালাবার মতো লোক না।

এ কথা শুনে কুতুজ সিপাহিদের হুকুম দিলেন—খুব ভালোভাবে নিহতদের লাশ নিরীক্ষণ করা হোক!

সিপাহিরা এই যুবকটিকে সঙ্গে করে যুদ্ধক্ষেত্রে সেখানে নিয়ে গেল, যেখানে একটির উপর আরেকটি পড়ে-পড়ে অজস্র লাশের টিলা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

---

[৫০৭] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ১৯

যুবক বহুক্ষণ পর্যন্ত একেকটি লাশ ওলটপালট করে দেখতে লাগল। লাশ ওলটাতে ওলটাতে যুবকের সারা দেহ হয়ে গেল ঘর্মসিক্ত। আচমকা কিছু নিহতের মাঝখান থেকে ভেসে উঠল এক বুড়ো লোকের লাশ।

সেই লাশ দেখে যুবক কয়েদি তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠল নিজের অজান্তেই। সে জারজার করে কেঁপে কেঁপে কাঁদতে লাগল। জানা গেল—এই বুড়োই হচ্ছে কিতবুগা নৈয়ান। যে তার বদআমল সঙ্গে নিয়ে জাহান্নামে পৌঁছে গেছে। তারপর অনুসন্ধান-বিশ্লেষণ করে জানা গেল—তাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিল আমির আকুশ শামসি।

সাইফুদ্দীন কুতুজের কাছে যখন কিতবুগা নৈয়ানের ধ্বংসের নিশ্চিত সংবাদ পৌঁছল, তখন মহান আল্লাহর কুদরতি পায়ে তিনি সিজদাতুশ শোকর আদায় করলেন। গভীর তৃপ্তি নিয়ে বললেন—এবার আমি একটু প্রশান্তির ঘুম ঘুমোতে পারব।

তার এই কথা সঠিক সাব্যস্ত হল। কুদরতি হাত তাকে যে মহান কাজের জন্য সৃষ্টি করেছিল, তা পূরণ হয়ে গিয়েছিল। রাসুল মুহাম্মদ ﷺ এর পক্ষ থেকে বাল্যকালে তিনি যে সুসংবাদ পেয়েছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে পূরণ হয়ে গিয়েছিল। এবার তার সময় এসে পড়েছিল আপন নীড়ে ফিরবার। ফলে, এই মহা বিজয়ের কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে পাড়ি জমালেন।[৫০৮] রাহিমাহুল্লাহু রাহমাতান ওয়াসিয়া।

আল্লামা যাহাবি বলেন—তার গায়ের রঙ ছিল গাঢ় লাল, ফর্সা। মুখে ছিল ঘন দাড়ি। যুবক ছিলেন তিনি। চেহারার গঠন ছিল চমৎকার। ১৬ জিলকদ ৬৫৮ হিজরি সনে মিশরের দিকে ফিরছিলেন। তখন গারাবি ও সালিহিয়্যাহ নামক স্থানের মাঝামাঝি যখন পৌঁছলেন, কিছু আমির অতর্কিতে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলল। তখনো তার বাদশাহির ১ বছরও তিনি পূরণ করেননি। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।[৫০৯]

আইনজালুতের যুদ্ধে পরাজিত হবার পর তাতারদের গায়ে যেন অধঃপতনের সিলমোহর পড়ে গিয়েছিল। তাদের আর খুব বেশি যুদ্ধযাত্রা করবার সাহস হয়নি।

পরবর্তীতে মিশরের বাদশাহ আল-মালিকুজ জাহের বাইবার্স একের-পর-এক যুদ্ধে তাতারদের পরাজিত করে পুরো সিরিয়া থেকে তাদের বেদখল করে দেন। এভাবে তাদের সেই দানবীয় ধ্বংসাত্মক শক্তি ভেঙে একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়, যে শক্তি বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে পৃথিবীকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছিল এবং

---

[৫০৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/২৫৮-২৬৫

[৫০৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২৩-২০০-২০১

যাদের শহরের পর শহর বিরান করে-দেওয়া আগ্রাসন দেখে আশঙ্কা জেগে উঠেছিল যে, পৃথিবী থেকে পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মুসলমান।[৫১০]

পরবর্তীকালে মুসলিম মুবাল্লিগদের প্রচেষ্টায় দল বেঁধে তাতাররা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এভাবে এক শতকেরও কম সময়ে চীন সীমান্ত থেকে শুরু করে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত মোগল সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে মুসলিমবিশ্বের একটা বড় অংশ।[৫১১]

---

[৫১০] সাইফুদ্দীন কুতুজকে নিয়ে এখানকার আলোচনার অধিকাংশ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭ম খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে।

[৫১১] তাতারদের ভেতর ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত' (সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.) গ্রন্থটি উপকারী। আমিও (ইসমাইল রেহান) এই গ্রন্থটি নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছি, যা 'সাকারাত সে হায়াত তক' শিরোনামে ছাপা হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

কষ্টিপাথরে সুলতান জালালুদ্দীন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা বহু রকমের খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, কিছু ধারণা নিশ্চয় গুনাহ।[৫১২]

সুলতান জালালুদ্দীনকে নিরীক্ষণের প্রেক্ষাপট

নবী ব্যতীত কোনো মানুষই, যতই নিরুপম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোক না কেন, ভুল-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ ও পবিত্র হতে পারে না। তবে এটি নিশ্চিত সত্য যে, সব মানুষেরই যেসব অভ্যাসের পাল্লা ভারী হয়ে উঠতে দেখা যায়, সেদিকটি লক্ষ করেই তার উপর প্রয়োগ করা হয় মন্দ কিংবা অমন্দের বিধান। যদি কারুর কর্মের অধিকাংশ হয় পাপাচার; অসৎকর্ম ও ফেতনা-ফাসাদে থাকে ভর্তি, তাকে খারাপ লোকদের মধ্যে গণ্য করা হয়। কিন্তু তার চরিত্রের অধিকাংশই যদি নেকি ও সৎকর্মের উপর গড়ে ওঠে, মনে করা হয় যে, সে নেকবান মানুষদের অন্তর্ভুক্ত।

সুলতান জালালুদ্দীন রক্তমাংসের জলজ্যান্ত একজন মানুষ ছিলেন। অনিবার্য মানবিক ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন না তিনি। তার কিছু অভ্যাস, বলা যায়, পছন্দসই হয়নি। তার কিছু সিদ্ধান্তে পোষণ করা যেতে পারে ভিন্নমতও। কিন্তু তার প্রাণ বিকিয়ে-দেওয়া কষ্ট-মুজাহাদা, কোরবানি, দেশপ্রেম, বাহাদুরি ও আত্মিক পরিশুদ্ধি দেখে আমরা এটাই বুঝে উঠি যে, তার মধ্যে ভালোর দিকটি ছিল প্রধান, প্রোজ্জ্বল। সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভালো মানুষ, অত্যন্ত ভালো মুসলিম এবং অত্যন্ত ভালো শাসক।

যারা আপত্তি তুলেছেন, তারা তাদের সুলতান-সম্পৃক্ত বিশ্লেষণের পর সুলতানের উপর যেসব অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন, সেগুলোর সারাংশ হচ্ছে—সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ :

১. ছিলেন, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টের অপারাধে জড়িত, স্বজনপ্রীতিতে পরিপূর্ণ এবং বোধবুদ্ধিহীন অপরিণামদর্শী।

২. প্রজাদের জন্য তিনি জালেম, নিপীড়ক ও কষ্টদায়ক প্রমাণিত হয়েছিলেন।

৩. 'নওল-কিশোরদের সাথে কামভাব চরিতার্থকরণে' লিপ্ত ছিলেন।

---

[৫১২] সুরা হুজুরাত, আয়াত ১২

৪. মদ্যপান ও নাচগানে পরিব্যাপ্ত ছিলেন।

৫. ধোঁকাবাজ, প্রতারক ও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গকারী ছিলেন।

আরোপিত এসব অপরাধের কোনো একটিকেও সত্য বলে ধরে নেবার পূর্বে আমাদের অবশ্যই লক্ষ রাখা উচিত যে, সুলতানের জীবৎকালে তার সম্পর্কে মুসলিমবিশ্বজুড়ে মন্দ ধারণার এক বিরাট মাঠ কায়েম হয়ে গিয়েছিল।

এর প্রধান কারণ ছিল—জীবৎকালে সুলতানের পিতা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ মুসলিমবিশ্বের ছোট-বড় অনেক রাজ্য নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে প্রতিবেশীদের একধরনের দুশ্চিন্তা ও হয়রানির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। ফলে, এই প্রতিবেশীরা সুলতান জালালুদ্দীনের বিজয়ের ক্রমধারাকেও পূর্ববৎ দুশ্চিন্তাজনক ও মন্দধারণার দৃষ্টিতেই দেখছিল এবং সুলতানের ব্যাপারে তারা শিকার হয়েছিল ক্রোধ, হিংসা, জিঘাংসা ও বিদ্বেষের।

এইমতো ধারণা কেবল শাসকশ্রেণির মধ্যেই ছিল না; বরং শাসকদের সাধারণ-বিশিষ্ট সকল প্রজাই ডুবে গিয়েছিল এই মন্দ ধারণার প্রবল ঢেউয়ের ভেতর। ফলে এই প্রচলিত সাধারণ মানসিকতার প্রভাব থেকে সে-যুগের ইতিহাসবিদরাও মুক্ত থাকতে পারেননি। সুলতান সম্পর্কে তারা যা-কিছু লিখেছেন, তা এই ভুল ধারণা ও ভুল মানসিকতার উপজাত হিসেবেই তাদের কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এই ইতিহাসবিদদের অধিকাংশের সম্পর্কই ছিল সেসব রাজ্যের সাথে, সুলতানের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তুমুল দ্বন্দ্বমুখর। সেসময়কার অধিকাংশ ইতিহাস মিশর, সিরিয়া, আলজেরিয়া ও এশিয়া মাইনরে বসে লেখা হয়েছে। কিছু বইয়ের রচয়িতা ছিল তাতার-হুকুমতের উজির কিংবা পরামর্শদাতা। আর কিছু বাগদাদের জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যারা শুরু থেকেই খাওয়ারিজমি শাসকদেরকে নিজেদের শত্রু মনে করে আসছিল।

এ ধরনের সব ইতিহাসবিদ নিজেদের পুঁজি ও সামর্থ্যানুযায়ী সুলতানের ব্যাপারে যা-কিছুই জানতে পেরেছেন, নিজেদের জ্ঞানের সংকুচিত ভান্ডার থেকে তা-ই কাগজের বুকে লিখে বসেছেন। পরবর্তীকালে ক্রমধারায় চলে-আসা এই ভুল বর্ণনাগুলোকেই লোকেরা টেনে টেনে আরো সুদূরে নিয়ে গেছে। এই লেখকরা সুলতানের সমকালীন হওয়ার পরও কাছ থেকে তার যাপিত দিবস-রজনীগুলো দেখেননি, জানেননি।

সুলতান-সম্পর্কিত তাদের আহরিত সব তথ্য ছিল অগভীর, উড়ো-উড়ো, ভাসা-ভাসা। কারণ, এদের অধিকসংখ্যকের বইয়ে সুলতানের জীবনালেখ্য বিধৃত হয়েছে অতি সংক্ষিপ্তভাবে,; যা কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। এমনকি সেগুলোতে সুলতানের কিছু জরুরি বিষয়েরও উপস্থিতি নেই। এজন্য

সুলতানের উপর উত্থাপিত দোষগুলো সম্পর্কে নিশ্চিন্তে-নির্ভাবনায় এই ইতিহাসবিদদের বিশ্বাস করে-বসা স্পষ্ট অমনোযোগিতা ও অসতর্কতা।

অন্যদিকে, যারা সুলতানের জীবনপদ্ধতি কাছ থেকে অবলোকন করেছিলেন কিংবা জেনেছিলেন এবং সুলতানের প্রকৃত অবস্থা ও বিস্তারিত বিষয়াদি জনসাধারণের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই তাদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বক্তব্য হল—তাতার আগ্রাসনের ফলে মুসলিমবিশ্বের সমস্ত অঞ্চল বিরানভূমিতে পরিণত হলে কোথাও তারা স্বস্তিতে একটুখানি বসে এই জরুরি খেদমতটি যে আঞ্জাম দেবেন, সেই সময় ও সুযোগ পেয়ে ওঠেননি।

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের প্রায় সব প্রসিদ্ধ লোকই; আলেম, সাহিত্যিক, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, কোনো-না-কোনোভাবে তাতার আগ্রাসনের আতঙ্কে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। ভয়ে তারা এদিক-সেদিক ছুটে বেড়িয়েছিলেন। তাতারদের প্রথম ও দ্বিতীয়বারের তাণ্ডবে শহিদ হয়ে গিয়েছিল তাদের অধিকাংশই। একটা বড় জনসংখ্যা হয়ে গিয়েছিল লাপাত্তা। বহুলোক প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে দূরদূরান্তে ছুটে ফিরছিল। কোথাও ফুরসত পাচ্ছিল না একটুখানি বসবার। বহু লোক তাতারদের জিন্দানখানায় লাঞ্ছনাকর জীবন যাপন করে যেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল।

এইরকম মর্মান্তিক তুফানের ভেতর সুলতানের ব্যাপারে নিজের অবলোকিত অভিজ্ঞতা লিখবার সুযোগ কার কপালেই-বা জুটতে পারে, শুনি? তবে হ্যাঁ, একজন ছিলেন, যিনি এই মহা দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার জন্য চেষ্টা করেছেন। তিনি সুলতানের কাতেব ও খাস পরামর্শদাতা শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আন-নাসাবি। তিনি সুলতানের শাহাদাত কিংবা গুপ্ত-জীবনের কয়েক বছর পর, প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থে সুলতানের নির্ভরযোগ্য অবস্থা একত্র করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন 'সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি'। কিন্তু আফসোস, কালের সেই দুর্যোগের ভেতর এই গ্রন্থটির তেমন প্রচার ঘটেনি। এবং গ্রন্থনার দুই শতাব্দী পর থেকে এই বইটি প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল; খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর।

ইতিহাসবিদদের মধ্য থেকে আল্লামা ইবনে খালদুন, হাফেজ যাহাবির মতো দুয়েকজন ছাড়া কারুরই নাসাবির এই কিতাবটি পাঠের সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এজন্য তারা সুলতান-সম্পর্কে অন্য মাধ্যমগুলো থেকে অর্জিত এমন-কিছু তথ্যও নিজেদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যা সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনচরিতের নির্ভরযোগ্য উৎসগুলোর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। এ কারণে সুলতানের বহু সত্য ও বাস্তবতা পর্দার আড়ালেই থেকে গেছে; উত্থাপিত মিথ্যা অপবাদ ও ভুল উপস্থাপনগুলোরও জট খোলেনি।

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুলতান সম্পর্কে কোনো অনুচিত ঐতিহাসিক-বর্ণনায় বিশ্বাস স্থাপনের পূর্বে কঠিন সতর্কতা ও হুঁশিয়ারির আঁচল আঁকড়ে ধরা জরুরি। আমার উদ্দেশ্য কখনোই এমন নয় যে, সুলতানের বিষয়ে অন্যান্য ঐতিহাসিকের মন্তব্য একদম দৃষ্টির আড়ালে ছুঁড়ে ফেলা হোক কিবা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হোক। বরং আমার চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ স্রেফ এই যে, সুলতানের উপর আরোপিত অপবাদগুলোকে উল্লিখিত নিয়মের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই না করেই পাওয়ার সাথে সাথেই যেন গ্রহণ করে ফেলা না হয়। একজন মর্দে মুজাহিদকে ভুলভাবে উপস্থাপনের গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি 'হুসনে যন' (উত্তম ধারণা) রাখলে যে বিপুল কল্যাণ লাভ করা যায়, সেটিই যেন করা হয়।

যেহেতু নিছক সুলতান জালালুদ্দীনের ট্রাজেডিকে ফুটিয়ে তোলাই আমার এই রচনার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল না; বরং তাতারদের আগ্রাসন রুখে দেবার ক্ষেত্রে তিনি যে প্রাণান্তকর চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যয় করেছিলেন, সেদিকটি স্পষ্ট করে তোলাই ছিল মূল উদ্দেশ্য আর সার্বিক দৃষ্টিতে সেই উদ্দেশ্যটি এতক্ষণে পূরণ হয়ে গেছে এজন্য ইতিহাসবিদদের আরোপিত আপত্তিগুলো নিয়ে বিস্তারিত লিখবার, তারপর সেসব আপত্তির সমর্থনে কিংবা প্রত্যাখ্যানে দলিল-প্রমাণের ভান্ডার খুলে বসবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখছি না। তবু হালকা-হালকা ইশারা করে কয়েকটি লাইন শুধু এজন্যই লিখতে হচ্ছে। আমি আশঙ্কা করছি যে, সুলতানকে নিয়ে কিছু লোকের এমন অসংলগ্ন বিশ্লেষণে পাঠকবৃন্দ হয়তো প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারেন, এবং সুলতান জালালুদ্দীনকে একজন মুজাহিদের পরিবর্তে মুজরিম (অপরাধী) ভাবতে শুরু করতে পারেন।

এই গ্রন্থের উৎসগুলোর দিকে যারা ফিরে যাবেন, তারা সুলতানের ব্যাপারে কিছু ইতিহাসকারের দোষারোপ দেখে সেগুলোকে যেন শক্তিশালী মনে করে না বসেন; বরং সেটিকে বর্ণনা ও যৌক্তিকতার কষ্টিপাথরে ভালোভাবে যাচাই করে নেন।

যাক, এই ভূমিকাটুকু টানবার পর, আমরা এখন সংক্ষেপে সুলতানের উপর আরোপিত উল্লিখিত অপবাদগুলোর সঠিক জবাব পূর্বোক্ত বিন্যাস-অনুসারে লিপিবদ্ধ করব।

ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টকারী, স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন ও অপরিণামদর্শী

কিছু ঐতিহাসিক সুলতানকে তাদের লেখায় মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্টকারী, স্বজনপ্রীতিপূর্ণ ও অপরিণামদর্শী নির্বোধ শাসক বলে উল্লেখ করেছেন। সুলতানের উপর অপরাধ আরোপ করেছেন যে, তিনি নাকি সমস্ত প্রতিবেশী রাজ্যের সাথে লড়াই-ঝগড়া করে নিজের শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিকরা সুলতানের ভুলকর্মের ফিরিস্তি টানতে গিয়ে লিখেছেন :

১. তিনি খলিফার দখলীকৃত শহরগুলিতে হামলা করেছেন
২. আজারবাইজানের হাকিম উজবুক মুজাফফর বিন বাহলোয়ানের সাথে লড়াই করেছেন
৩. জর্জিয়ানদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন
৪. আল-মালিকুল আশরাফ ও আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সাথে শত্রুতা করেছেন
৫. এমনকি বাতেনি সাম্রাজ্যের সাথেও সংঘাতে লিপ্ত হয়েছেন।

সুলতানের উপর এসব আপত্তি উত্থাপন করেছেন একাধিক ইতিহাসবিদ। বলা যায়—এভাবে তারা সুলতানকে একজন মুজাহিদ না বলে মুসলিম-ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টকরণের দায়ে একজন অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু উল্লিখিত অবস্থাগুলোর প্রাথমিক যে পটভূমি ছিল, সে-সম্পর্কে বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ নিয়ে উঠলে পুরোপুরিভাবে এদের এই আপত্তির নিরসন ঘটে যায়। এবং স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, শত্রুতা ও বিরুদ্ধতার এই আগুনে সুলতানের প্রতিবেশী শাসকরাই হাওয়া যুগিয়েছিল; তারাই অধিক অপরাধী।

খলিফার সাথে শত্রুতা : আপত্তিটুকুর বাস্তবতা

খলিফার শহরগুলোতে সুলতান নিজে থেকে আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন বলে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তা শুধু ইবনে কাসিরের বর্ণনা।[৫১৩] অন্যথায়, অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থ থেকে (জাহাঁকুশা জুয়াইনি, ইত্যাদি) জানা যায়—সুলতান সন্ধি-স্থাপন এবং সাহায্য কামনার ইচ্ছায় খলিফা নাসিরের সাথে সাক্ষাৎ করবার উদ্দেশে বাগদাদে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু খলিফা তখন নিজে থেকে যুদ্ধ শুরু করে দিলে বাধ্য হয়ে সুলতানকেও তলোয়ার ওঠাতে হয়েছিল।

খলিফার বাহিনীকে পরাজিত করবার পর সামানপত্র, রসদ ইত্যাদির প্রচণ্ড প্রয়োজন-বোধে খেলাফেতে আব্বাসিয়ার কিছু শহরও—বাকুবা প্রভৃতি—তিনি দখল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার এই দখলটা ছিল সাময়িক, অস্থায়ী। যুদ্ধের উপকরণ ও খোরাকি অর্জন করে নেবার পর এই শহর খালি করে দেওয়া হয়েছিল।[৫১৪]

খলিফার শহরগুলোতে সুলতানের নিজে থেকে গিয়ে আক্রমণ না-করার বর্ণনাটি একারণেও প্রাধান্যযোগ্য যে, এ অভিযানে সুলতান তার ৩০-৪০ হাজার সৈনিকের মধ্য থেকে নিছক ২ হাজার লোককে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলেন। এই

---

[৫১৩] পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের মধ্য থেকে যারা এটি উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ইবনে কাসির থেকেই বর্ণনা করেছেন।

[৫১৪] ইবনুল আসির ৭/৬২২ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাদরাসা ও

সৈন্যসংখ্যা বাগদাদের সৈন্যদের সমপরিমাণ হওয়া তো দূরের কথা, তাদের দশভাগের একভাগও ছিল না। তবে, যুদ্ধ-ময়দানে যে সুলতানের হেকমতপূর্ণ কর্মপন্থায় বাগদাদের সেনাবাহিনী দিশেহারা হয়ে উলটো-পথে পালিয়ে এসেছিল। সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন আলাপ।

সুলতান যদি সেখানে লড়বার ইচ্ছায় যেতেন, তার তখনকার সঞ্চিত পুরো সেনা-শক্তি ছাড়াও বাহিনীতে আরো অতিরিক্ত সৈনিক ভর্তি করে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তারপর যেতেন; এভাবে অধিকসংখ্যক সৈন্য ছাউনিতে ফেলে রেখে সঙ্গে শুধু ২ হাজার নিয়েই বেরিয়ে পড়তেন না। কারণ, বাগদাদের বাহিনী তখন ছোটখাটো কোনো বাহিনী ছিল না।

আচ্ছা ধরুন, খেলাফতে আব্বাসিয়ার শাসনভুক্ত এলাকাগুলোতে সুলতান জালালুদ্দীন আক্রমণ করেছেন বলে যদি আমরা মেনেও নিই, তখনো যদি ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানো হয়, তা হলেও কি মনে হয় যে, এই আক্রমণের কারণে দীনের পথে সুলতান জালালুদ্দীনের ক্লান্তিহীন সমস্ত কষ্ট-মুজাহাদা ও জীবন-বিসর্জনকে অস্বীকার করা ঠিক হয়ে যাবে? ঠিক হবে কি তার জিহাদকে ফাসেদ বলে গণ্য করা?

একটুখানি ভাবুন তো—একদিকে আছেন একজন মাত্র মর্দে মুজাহিদ, যিনি পুরো মুসলিমবিশ্বকে তাতার-জাতির আগ্রাসন থেকে বাঁচাবার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত বিশাল মোর্চা গড়ে চলেছেন। অন্যদিকে আছে এমন এক প্রাণহীন মৃত খেলাফত, যার অস্তিত্ব মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষার বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের পেছনে, যার খলিফার মধ্যে নেই কোনো বীরত্ব, পৌরুষ ও বৈশ্বিক চিন্তাভাবনা এবং আকিদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের থেকে আলাদা, এইরকম পরিস্থিতিতে উম্মাহর জন্য সবকিছু উজাড় করে-দেওয়া-কোনো-মর্দে-মুজাহিদ যদি পুরো উম্মাহকে শক্তিধর কাফের বাহিনীগুলো থেকে নিরাপদ রাখবার জন্য এই অস্তিত্ব ও অনুভূতিশূন্য খেলাফতের কিছু এলাকা সাময়িকের জন্য কবজা করে নেন, এবং সেখান থেকে নিজের মুজাহিদদের জন্য সেনাশক্তি ও রসদপত্রের ব্যবস্থা করেন, ইসলামের চির শত্রুদের রুখতে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে তোলেন মোর্চা ও দুর্গ, তা হলে—একে বিদ্রোহ গণ্য করা সত্ত্বেও—উম্মাহর জন্য তার এই দুর্দান্ত সাহসিকতা ও কর্মোদ্দীপনাকে কি আমরা এড়িয়ে যেতে পারব?

ঐতিহাসিকদের কি এটা দায়িত্ব না যে, তারা সেই কঠিনতর অবস্থা, আন্দোলন ও পরিপ্রেক্ষিতগুলোও অবলোকন করবেন, যে-কারণে সুলতান জালালুদ্দীনের মতো একজন লোক চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে এইরকম একটা অগ্রযাত্রার জন্য বাধ্য হয়ে ওঠেন?

এই ভূপৃষ্ঠ কারুর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নয়; বরং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একক মালিকানা। কোনো শাসক—বংশমর্যাদায় যত উচ্চেই হোক না কেন তার অবস্থান—যদি তিনি আল্লাহর দীন সমুন্নত করে তুলবার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে না দেন, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য বুক চিতিয়ে ময়দানে নেমে না আসেন, জমিনে প্রতিষ্ঠা না করেন কুরআন ও সুন্নাহর নেজাম, তখন তিনি খেলাফতের হকদার থাকেন না।

খলিফা নাসির এই পর্যায়েরই একজন শাসক ছিলেন। অথচ, এই অযোগ্য খলিফার সৈন্যদলের হাত থেকে নিজের সুরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে সুলতান তলোয়ার উঠিয়েছিলেন বলে তাকে এমন সাজাই দেওয়া হয়েছে যে, তাকে জালেম ও গাসেব (অত্যাচারী ও ছিনতাইকারী) বলা হয়েছে। ইসলামের সুরক্ষাকারী না বলে বিদ্রোহী ও খারেজি বলা হয়েছে।

অথচ তারপরও, শুধু উম্মাহকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে অবিলম্বে সুলতান খেলাফতে আব্বাসিয়াহর সাথে নিজের সম্পর্ক ভালো বানিয়ে নিয়েছিলেন। এই অযোগ্য নেতৃত্বকেও তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তবু তার উপর দোষ ও অপবাদ আরোপ অব্যাহত থেকেছে। জবানে ও কলমে সবাই তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। কারুর জবান ও কলম থামানো হয়নি।

অন্যান্য শাসকের সাথে শত্রুতা : বাস্তবতার আলোকপাত

সুলতানের আজারবাইজান দখলকেও দোষ ও অপরাধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই আচরণ কখনোই ইনসাফপূর্ণ নয়। আজারবাইজানের হাকিম ছিল একজন বিলাসী, অযোগ্য ও পর্বতপ্রমাণ অলস শাসক। ছিল তাতারদের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। এইরকম এক ক্ষতিকর শাসকের কবল থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে মুক্ত করার ঘটনাটি সুলতান জালালুদ্দীনের বড় কৃতিত্বের বিষয়; অপরাধ নয়।

এমনিভাবে জর্জিয়ান ও বাতেনিদের সাথে যুদ্ধের যে পদক্ষেপ সুলতান গ্রহণ করেছিলেন, তার একমাত্র কারণ ছিল এদের অন্যায় আগ্রাসন, মুসলিমদেরকে কষ্টদান ও সীমাতিরিক্ত ফেতনাবাজি। সুলতান তা সহ্য করতে না পেরে এদেরকে এক কঠিন সবক শেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই দুই চরিত্রহীন সম্প্রদায় প্রথম থেকেই সমস্ত মুসলমানের, বিশেষত, সুলতান জালালুদ্দীনের শক্ত দুশমন ছিল। সুলতান এদের সাথে জিহাদ করে নিজের শত্রুদের সংখ্যায় নতুন কোনো প্রবৃদ্ধি ঘটাননি; বরং এরা পূর্ব থেকে শত্রু হয়েই ছিল। সুলতান পূর্বের সেই শত্রুদেরকেই শায়েস্তা করেছিলেন। এটা ছিল তার বড় দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন।

বাকি রইল আল-মালিকুল আশরাফ ও আলাউদ্দীন কায়কোবাদের বিষয়। সুলতান জালালুদ্দীন ও আশরাফ-কায়কোবাদের মাঝে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবার

যত কারণ ছিল, বিগত অধ্যায়গুলোতে আমরা সেগুলো উল্লেখ করে এসেছি। সেই কারণগুলো দেখলে একদম জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে যে, এই দুঃখজনক বৈরিতার মধ্যে সুলতানের তুলনায় বেশি হাত ছিল তার অপরিণামদর্শী নির্বোধ প্রতিবেশীদের।

আচ্ছা যাক, সব আলাপ বাদ দিয়ে আমাদের এটি ভেবে দেখা উচিত যে, মুসলিম উম্মাহর মহান বিজেতাদের অনেককেই নিজেদের সম-আকিদার শাসক ও সরদারদের বিরুদ্ধেও একাধিকবার তরবারি ধারণ করতে হয়েছিল। এই কাজ তারা নিজেদের অপারগতা থেকেই করেছিলেন। সেই অপারগতা ও বাধ্যবাধকতাগুলো সম্পর্কে তারাই বেশি জানতেন। বাহ্যত কাজটা যদিও মনে হয় অনুচিত; কিন্তু এই কাজে মহান বিজেতারা পুরোপুরি মুখলিস ছিলেন।

দীন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সমুন্নত মর্যাদা, ঈমানের দাবি পূরণ ও শরিয়াহ বাস্তবায়নের জন্য এই মহান ব্যক্তিদের উপর বহুবার এমন অবস্থা আবর্তিত হয়েছে যে, না চাইতেও তারা সেই মুসলিমদের মোকাবেলায় নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, যারা তাদের সুউচ্চ সব সংকল্পের পথে ছিল কঠিন বাধা। এই মহান ব্যক্তিরা যদি নিজেদের এ সিদ্ধান্তে ভুলের মধ্যেও থাকেন, তবু ইনশাআল্লাহ এজন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। সুলতান মাহমুদ গজনবি, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি, শিহাবুদ্দীন ঘুরি, শেরশাহ শুরি, আওরঙ্গজেব আলমগির, আহমদ শাহ আবদালিসহ অন্য অনেক মুসলিম সুলতানের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা আমরা প্রতিফলিত হতে দেখেছি।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান জালালুদ্দীনও যদি নিতান্ত অপারগ হয়ে এমনই কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন কখনো এবং তার সম-মতাদর্শী শাসকদের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে থাকেন, যারা তার নেক ইচ্ছাগুলোর পূর্ণতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা হলে তার এ কাজের জন্য তার জিহাদকে ফাসাদ গণ্য করাটা কোথাকার কোন ইনসাফ, শুনি?

'জুলুম, নিপীড়ন ও কষ্টদান'র অপবাদ : স্পষ্ট জবাব

কিছু ইতিহাসবিদ পাঠকদের কাছে সুলতানকে একজন জালেম, উৎপীড়ক, কষ্টদাতা ও কঠোরতা-আরোপকারী শাসক হিসেবে পরিচিত করিয়েছেন। মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে প্রজাদের উপর জুলুম-নির্যাতন, লুট-মার ও কঠোরতার বিভিন্ন ঘটনাকে তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন।

এখানে প্রথমেই আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যে, সুলতান জালালুদ্দীন সর্বদা নিজের অধীনস্থ রাজ্যগুলোতে অত্যন্ত ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে শাসন করেছিলেন। তিনি জনাসাধারণকে কোনো-প্রকার কষ্ট দেননি। লুটপাট ও কঠোরতামূলক দুঃখজনক ঘটনাগুলো স্রেফ এমন কিছু পরিস্থিতির মধ্যে দেখা

দিয়েছিল, যখন সুলতানের সৈন্যরা কোনো শহর জয় করে নেবার পর উদ্দাম-গতিতে সেখানে ঢুকে পড়েছিল।

দ্বিতীয়ত এ বিষয়টিও এড়িয়ে গেলে চলবে না যে, লুটতরাজ ও তাণ্ডবের ঘটনাগুলো সুলতানের মর্জির বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। সৈন্যবাহিনী তাদের উত্তেজনা ও অবাধ্যতার কারণে মনমতো সেগুলো ঘটিয়ে বসেছিল। যতদূর সুলতানের সক্ষমতা ছিল, এইরকম কর্মকাণ্ড থেকে সৈন্যদেরকে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করে গেছেন। এর দৃষ্টান্ত পেছনে সুলতানের ন্যায় ও ইনসাফের ঘটনাগুলোতে উল্লেখ হয়েছে।

তারপর সুলতানের বাহিনী থেকে যখন তার নির্ভরযোগ্য সহযোদ্ধারা চিরতরে বিদায় হয়ে গিয়েছিল এবং সাধারণ-ভর্তির সুযোগে সৈন্যদলে বহু আওয়ারা লোক ঢুকে দলের প্রধান একটা অংশ হয়ে উঠেছিল, তখন এ-ধরনের ঘটনা থামানো খুব মুশকিল হয়ে গিয়েছিল সুলতানের জন্য। যদিও শাসক হবার কারণে শাসিতদের এই কুকর্মের দায় থেকে সুলতানকে মুক্ত বলে গণ্য করা যায় না; তবে এটা নিশ্চিত সত্য যে, তাকে যেরকম অতিরঞ্জনের সাথে জালেম ও নিপীড়ক বলা হয়েছে, বাস্তবতার সাথে এর মোটেই সম্পর্ক নেই। খাওয়ারিজমি সেনা-অফিসার ও সিপাহিদের এই ভুল কাজের ব্যাপারে সুলতান যে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকেও জানা যায়।

একদা আল্লামা মুহিউদ্দীন ইউসুফ ইবনে জাওযি বাগদাদের খলিফার দূত হিসেবে সুলতানের সাথে নির্জন কক্ষে এসে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সুলতান তখন আল্লামা ইবনে জাওযির সামনে অত্যন্ত পরিতাপ, অনুশোচনা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেছিলেন—আমার সৈন্যদল তাদের নিজেদের অবাধ্যতার কারণে আমার করতলের বাইরে চলে গেছে। আমি যে তাদের লুটতরাজ থেকে আটকে রাখব, সেক্ষেত্রে আমি অক্ষম হয়ে গেছি।[৫১৫]

সুলতানের পতনের কারণগুলোতে আমরা লিখেছি, তার সেনাবাহিনীর অবাধ্যতা, আমিরদের প্রতারণা ও উজিরদের অনির্ভরযোগ্য কর্মকাণ্ডই ছিল সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হওয়া এবং সুলতানের পতন ঘটার সবচেয়ে বড় কারণ।

খিলাত ট্রাজেডি

ঐতিহাসিকরা যেসব ক্ষেত্রে সুলতানের জুলুম-নিপীড়নের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে খিলাত-যুদ্ধের ঘটনাটিকে। খিলাতে সুলতানের বাহিনীর অবরোধ জারি ছিল আটমাস। এই অবরোধের দীর্ঘতা

---

[৫১৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/৩২৮

ও মৌসুমের প্রতিকূলতা সৈন্যদলের মেজাজ একদম খিটখিটে বানিয়ে দিয়েছিল। তারপর বহুদিন পর যখন শহর বিজিত হয়েছিল, সেনা-অফিসার ও সৈন্যরা সুলতানকে অনেক চাপাচাপির মধ্যে ফেলে লুটপাটের অনুমতি লাভ করে নিয়েছিল। তারপর শহরের মধ্যে গরম করে তুলেছিল কঠোরতা-আরোপ ও কঠিন তাণ্ডবের বাজার। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ঘটনায় সৈন্যদল ও সৈন্যদলের অফিসারদের পাশাপাশি সুলতানের পদক্ষেপটিও আপত্তিযোগ্য—তিনি কেন এদের জোরাজুরি গ্রহণ করে নিয়ে লুটপাটের অনুমতি দিয়েছিলেন?

কিন্তু কতক ইতিহাসবিদ এই ঘটনাটিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যে ভাষাভঙ্গি নিয়ে বর্ণনা করেছেন, তা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। খিলাতবাসীর উপর খাওয়ারিজমি বাহিনীর যে কঠোরতা ছিল, সে-সম্পর্কে তারা অতিরঞ্জনের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে বলেছেন—

১. খাওয়ারিজমিরা শহরবাসীর সাথে যে রক্তক্ষয়ী ধ্বংসাত্মক আচরণ করেছে, সেক্ষেত্রে তারা হিংস্র তাতারদেরও ছাড়িয়ে গেছে।
২. পুরো শহরটিকে তারা ভূলুণ্ঠিত ও ধূলিসাৎ করে ফেলেছে।
৩. সমস্ত লোককে ধরে ধরে হত্যা করেছে।
৪. অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, আমরা বুঝে গেছি—খাওয়ারিজমিদের তাণ্ডবলীলা থেকে সার্বিক দৃষ্টিতে তাতারদের চরিত্র বহুগুণ উত্তম ইত্যাদি ইত্যাদি।

অথচ বাস্তবতার সাথে তাদের এ কথার কোনো মিল নেই। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী শিহাবুদ্দীন আহমাদ আন-নাসাবি প্রকৃত অবস্থা বয়ান করেছেন। তিনি লিখেছেন—সুলতানের নামে যে কথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, শহরের সব লোককে তিনি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা সঠিক নয়। হ্যাঁ, এটা নিশ্চিত সত্য যে, খাওয়ারিজমিদের ক্রোধের কারণে অনেকে তাদের হাতে মারা গিয়েছিল। তা ছাড়া কঠিন অভাব ও দুর্ভিক্ষও শহরবাসীকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।[৫১৬]

হ্যাঁ, জুলুম সর্বাবস্থায়ই জুলুম; হোক তা অল্প কিংবা বেশি—এটি আমরা কখনোই অস্বীকার করি না। মহান আল্লাহ এই জুলুম কখনো পছন্দ করেন না। কিন্তু, যে খাওয়ারিজমি বাহিনী নিজেদের অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও সেই কঠিন সময়ে মুসলিমবিশ্বের হাজার-হাজার মাইল দীর্ঘ উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণের সমস্ত সীমান্তের প্রতিরক্ষা করে যাচ্ছিল, তাদেরকে তাতারদের চাইতেও অধিক জালেম ও আগ্রাসী বলে দেওয়া এবং কাফের তাতারদের এই মুসলিমদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া, নিশ্চয় কোনো লেখকসুলভ আচরণ নয়।

---

[৫১৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ৩২৩

'বালকের সাথে কামভাব চরিতার্থ করা'র জঘন্য অপবাদ ও তার জবাব

সুলতান জালালুদ্দীনের উপর অত্যন্ত জঘন্য ও দুঃখজনক একটা অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল; তিনি নাকি 'নওলকিশোরদের সাথে কামভাব চরিতার্থকরণ' রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এই অপবাদটাকে প্রমাণিত করার জন্য গোলাম কালিজের সাথে সুলতান জালালুদ্দীনের যে স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সেটিকে ভিত্তি বানানো হয়েছে। এবং কালিজের মৃত্যুর পর সুলতানকে জড়িয়ে বিভিন্ন মিথ্যা ঘটনা ছড়ানো হয়েছে। এই মিথ্যা ঘটনাগুলো থেকে স্রেফ ধারণাপ্রসূতভাবে সুলতানের উন্মাদনা, স্বল্পবুদ্ধিতা ও নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে—'কালিজের মৃত্যুতে সুলতান জালালুদ্দীন পুরো তিবরিজবাসীকে জানাজায় শরিক হতে ও মাতম করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কালিজের লাশ দাফন না-করে সঙ্গে নিয়ে হা-হুতাশ করতে-করতে ঘুরে ফিরছিলেন।' ইত্যাদি।

আমি মনে করি—সুলতানকে নিয়ে এই অপবাদ মূলত সেসব বিকৃত মস্তিষ্কের লোক সৃষ্টি করেছে, যারা তখন বানিয়ে-বানিয়ে সুলতানের নামে অপকর্ম ছড়ানোর ক্ষেত্রে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সুলতানের থেকে বিমুখ রাখতে, তাদের ভেতর সুলতানের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তুলতে, নীচতার চাইতেও নীচতার পথ অবলম্বন করতে মোটেই পরোয়া করত না। এজন্য তারা সুলতানের উন্নত চরিত্রের যে শাখাটি ছিল, সেটিকে ক্ষতবিক্ষত করবার জন্য তার উপর এমন-সব গুরুতর অপবাদ লাগাতে আরম্ভ করেছিল, যেগুলো কল্পনা করতে গেলেও একজন শরিফ লোকের গা গুলিয়ে আসে ঘৃণায়।

কোনো শরয়ী প্রমাণ ছাড়া কারুর উপর এত বড় অপবাদ আরোপ করা জুলমুন আজিম—মহা অন্যায়।

যেসব ঐতিহাসিক নিজেদের জ্ঞানের প্রশস্ততা, সদগুণ ও পরহেজগারি সত্ত্বেও এটা বর্ণনা করে গেছেন, তারা তাদের আশপাশে সুলতানের ব্যাপারে যে বিষাক্ত প্রোপাগান্ডার জাল ছড়ানো হয়েছিল, সেই জালের ভেতর আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। এই প্রোপাগান্ডায় তাদের উপর খুব বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। এজন্য এই বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা কোনো চিন্তাভাবনা করে দেখেননি।

বর্ণনা ও যৌক্তিকতার কষ্টিপাথরে রেখে সুলতান জালালুদ্দীনকে তার সমস্ত জীবনে এ ধরনের ঘৃণ্য ও নীচ কাণ্ড থেকে আমরা পবিত্র দেখতে পেয়েছি। তার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার ঈমানি শক্তি, হুঁশিয়ারি, পরিচ্ছন্ন চিন্তাভাবনা, উন্নত সাহস, অক্লান্ত পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও সাদাসিধেভাবে যাপিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। দেখতে পাই—তিনি সর্বদা আয়েশ-বিলাস, প্রবৃত্তিপূজা, ভোগ-সম্ভোগ ও সর্বপ্রকার হীন-নীচ কর্ম থেকে দূরে থেকেছেন। এজন্য এই মহাপুরুষের ব্যাপারে দায়বোধহীনভাবে এ-ধরনের বর্ণনা গ্রহণ করে-ফেলা নিশ্চয় কোনো ইনসাফপূর্ণ কাজ নয়।

আরেকটা কথা বলি। 'বালকের সাথে কামভাব চরিতার্থ করা'র কঠিন অপবাদ যে শুধু সুলতান জালালুদ্দীনের উপরই লাগানো হয়েছে, তা নয়। আরো কিছু আজিমুশ শান মর্দে মুজাহিদ ও বিজেতা এমন ছিলেন, যাদের বদনাম করবার জন্য তাদের নামে এই নাপাক অপবাদ ছড়ানো হয়েছিল। সুলতান মাহমুদ গজনবির গোলাম আয়াজের সাথে তার যে স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তা ইতিহাসের পৃথক একটা অংশ। কিন্তু এতে কখনোই কোনো ইশকবাজি ও প্রবৃত্তির স্থান ছিল না। দীনের এই মহান মুজাহিদের ব্যাপারে এরকম নিকৃষ্ট কর্মের কল্পনাও করে উঠতে পারে না কেউ। কিন্তু ইরানি কবিসাহিত্যিকরা তাদের নিজেদের যে স্বভাবজাত লাম্পট্য, সুলতান মাহমুদ গজনবিকেও তার টার্গেট বানিয়েছে; মাহমুদ ও আয়াজের 'প্রেম'র কিসসা লোকদের ভেতর ছড়িয়েছে। নাউজুবিল্লাহ।

আমি তখন খুবই দুঃখ পেয়েছি, বিষাদ-কৃষ্ণ ছায়ায় ছেয়ে গেছে আমার সমস্ত হৃদয়, যখন নিকটবর্তী সময়ের এক ইরানি লেখকের নিম্নোক্ত লেখাটি পড়েছি—'সুলতান জালালুদ্দীন তার গোলামের জন্য যে আশেক ছিলেন, সেটা তো কোনো নতুন বিষয় না। মুসলিম বাদশাহদের মধ্যে এই কর্ম ব্যাপকভাবে ঘটেছে। মাহমুদ গজনবি যে আয়াজের জন্য আশেক হয়েছিলেন, সে-কথা তো সবাই জানে।' ইত্যাদি।

এ-ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কুচক্রীরাই ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। মর্যাদাশীল বড়-বড় বিজেতাদের শানে এমন ঘৃণিত অপবাদ আরোপ করেছে। তাদের সমুজ্জ্বল কীর্তিমালা ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চেয়েছে।

اللّٰهم انا نجعلك فى نحورهم و نعوذ بك من شرورهم

মদ্যপান ও নৃত্যগানের অপবাদ : স্পষ্ট জবাব

তদ্রুপ সুলতানের উপর তার জীবনের শেষদিনগুলোতে মদ্যপান, নৃত্যগান ও বাদ্যবাজনার আসর সাজিয়ে বসবার অপবাদও আরোপ করা হয়েছে।

এই রিওয়ায়াতকেও দিরায়াতের কষ্টিপাথরে যাচাই না-করে আদৌ গ্রহণ করা যাবে না।

সুলতানের পুরো জীবন-ইতিহাসের বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ নিয়ে-ওঠার পর তার জীবনের অসংখ্য চড়াই-উৎরাইয়ের ভেতর এমনতরো একটি বাঁকও আমরা পাই না, যেখানে কোনো ইতিহাস-লেখক সুলতানের মদ্যপান ও নাচগানের রসালো বর্ণনা জুড়তে পারেন। বরং, অনর্থক ও ফালতু কর্মকাণ্ডের প্রতি সুলতানের যে স্বভাবজাতভাবেই কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না, উলটো সেই প্রমাণই আমরা পাই। তা হলে কী করে বিশ্বাস করা যায় যে, এরকম একজন শক্ত ঈমানদার মানুষ, যিনি জিহাদের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চেপে ঈমান ও মারেফাতের অসংখ্য মনজিল

ডিঙিয়ে বহুদূরে এগিয়ে গিয়েছিলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অসংখ্যবার জীবন-বিসর্জনের নজরানা পেশ করবার জন্য উদ্দাম-গতিতে অগ্রে বেড়ে গিয়েছিলেন, হৃদয়ের গোপন প্রকোষ্ঠে অনুভব করে উঠেছিলেন কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর সুমিষ্ট স্বাদ, শাহাদাতের সুতীব্র আনন্দ-লাভের আকাঙ্ক্ষায় হয়ে উঠেছিলেন অস্থির, তিনি কি মদ ও গানবাজনার মতো তুচ্ছ-নিকৃষ্ট পার্থিব মত্ততায় আসক্ত হয়ে যাবেন??

এই অধঃপতিত যুগে ফিল্ম, বার ও নাইটক্লাবে চেতনাহীন পড়ে-থাকা কিছু যুবকের জীবনের যদি কখনো বাঁক বদল ঘটে, এবং সৌভাগ্যক্রমে তারা জিহাদের কোনো ময়দানে গিয়ে পৌঁছে, তখন সেখানে কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের ঈমান এতোটা উন্নত হয়ে ওঠে যে, তারা উল্লিখিত সর্বপ্রকার শয়তানি বস্তু থেকে নিজেদেরকেই শুধু শত-শত মাইল দূরে রাখে না; বরং অন্য মুসলিম ভাইদেরকেও এই ধ্বংসাত্মক আসক্তি থেকে বাঁচাবার পরিপূর্ণ চেষ্টা করে। তা হলে, যে মুজাহিদের পুরো জীবনটাই বরাদ্দ থাকে জিহাদের জন্য, তার সম্পর্কে কীভাবে এই ধারণা করা যায় যে, তার বুকের ঈমান তাকে এই কিসিমের নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ড থেকে বাধা দেবে না?

সত্য হল—ইসলামের খলিফা ও সুলতানদের সম্পর্কে ইতিহাস ও সাহিত্যের বইগুলোতে মদ্যপানের যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, সবগুলোতেই রয়েছে বিরাট প্রশ্ন ও আপত্তি। একজন সাধারণ পাঠক যখন এগুলো পড়ে, এই ধারণাই তার ভেতর প্রোথিত হয়ে যায় যে, 'আরে, ওই যুগে দেখছি মদের এতোই আধিক্য ছিল, যা আমাদের আজকালকার নামে-মাত্র মুসলিমদের ভেতরেও নেই।' অথচ এটি কোনো সুস্থ-সঠিক ধারণা নয়।

গভীরভাবে চিন্তা করুন—এই যে এখন হাজারো মন্দ কাজের ছড়াছড়ি, এই দুর্যোগপূর্ণ যুগেও তো মুসলিম সোসাইটিগুলোতে মদ এরকমভাবে পান করা হয় না, এবং এই ফেতনা-ফাসাদের যুগে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর শাসকশ্রেণিও তো এতোটা প্রকাশ্যে মদ পান করে না যে, দুনিয়াজুড়ে তাদের এই মদপানের কথা ছড়িয়ে দেবার অবকাশ পেতে পারে মানুষ। সবাই প্রকাশ্যে মদ-সেবন করাকে ভয় করে। অথচ এই মডার্ন বিশ্বে মদ-সেবনের বিষয়টাকে সকলেই একটা এলিট অভ্যাস হিসেবে মেনে নিয়েছে।

তা সত্ত্বেও আমাদের শাসকগোষ্ঠী ও সরকারি অফিসাররা যদি কখনো মদ পান করেও, এতোটাই প্রাইভেসি রক্ষা করে নেয় যে, তারা নিজেদের চরিত্রের আঁচলে কোনো দাগ লাগতে দেয় না; অথচ সবধরনের প্রচার-মাধ্যমের আসল টার্গেট থাকে তারাই। তবু সুন্দরভাবেই তারা ভদ্র সেজে যায়, এসব মন্দাচার সম্পর্কে কেউ জানতেও পারে না।

এখন একবার ভাবুন—ওই যুগে, যখন মুসলিম-রাজ্যগুলোর ভেতর আজকের তুলনায় অনেক বেশি নেকআমল হতো, সমাজ ছিল আজকের নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতা থেকে অনেক দূরে, সেই অপেক্ষাকৃত সুন্দর যুগে এমনকিছু ঘটতে-পারা কি সম্ভব যে, শাসকশ্রেণি নির্বিঘ্নে মদ পান করত এবং তাদের এই মদ-সেবনের কথা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ত?

মেনে নিচ্ছি যে, বহু মুসলিম শাসকের; বরং খলিফাদের মদ-সেবনের গল্প ইতিহাসের বইগুলোতে অনেক পাওয়া যায়; কিন্তু এ-ধরনের বর্ণনাগুলো কি অক্ষরে-অক্ষরে আপনি বিশ্বাস করে নেবেন? একটিবারও গভীর চিন্তাভাবনা ও গবেষণা চালিয়ে দেখবেন না?

ইতিহাসে খুব সাধারণ জানাশোনাও যার আছে, সেও এতে একমত হবেন যে, মুসলিম সুলতান ও খলিফাদের সেই যুগ অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা থাকার পরও আমাদের আজকের এই যুগ থেকে ছিল হাজার স্তর ঊর্ধ্বে। সে-যুগের অধিকাংশ শাসক নামাজ, রোজা, জিকির ও তেলাওয়াতের পাবন্দ হতেন। সকলেই নির্দিষ্ট কোনো স্তর পর্যন্ত দীনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন। অন্যায় ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে বর্তমানের অনেক দীনদার লোকের চাইতেও উৎকৃষ্ট ছিলেন। সুতরাং, এতকিছুর পরও তাদের মাঝে মদ-সেবনের ব্যাপারটা (হাদিসে যেটাকে উম্মুল খাবাইস (সমস্ত গুনাহের মূল) বলা হয়েছে) কি এতটাই ব্যাপক হয়ে পড়েছিল? এটা কি কখনো সম্ভব?

অতএব, এ-ধরনের বর্ণনাগুলোকে বর্ণনা ও যৌক্তিকতার কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করা এবং এগুলোকে উলটেপালটে পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করি।

হিজরি অষ্টম শতকের বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুনও খলিফা ও সুলতানদের মদ-সেবন-সংক্রান্ত এসব বর্ণনাকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন—'এ-ধরনের মনগড়া কথা সমাজের লোকেরা এজন্য ছড়িয়ে রেখেছিল, যাতে তারা নিজেদের জন্য উন্মুক্ত করে নিতে পারে হারাম আসক্তির পথ।' [৫১৭]

আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য—মুসলিম ইতিহাসবিদদের মধ্যে ইবনে খালদুন সুলতান জালালুদ্দীনের জীবন-ইতিহাস নিয়ে যে পরিমাণ পাঠ ও গবেষণা করেছিলেন, সম্ভবত অন্যকেউ সে-রকম করতে পারেননি। পাশাপাশি, তারিখে ইবনে খালদুন গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আন-নাসাবি প্রণীত সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন থেকে যে পরিমাণ ফায়দা গ্রহণ করা হয়েছে, ইতিহাসের অন্যকোনো

---

[৫১৭] মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা : ২০

প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বোধহয় তেমনটি করা হয়নি। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ আরবি গ্রন্থগুলোতে সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনবৃত্তান্তের সর্বাধিক বিস্তৃত ব্যাখ্যাও তারিখে ইবনে খালদুনেই পাওয়া যায়।

লক্ষণীয় বিষয় হল—আল্লামা ইবনে খালদুন তার তথ্যাবলির এতো প্রশস্ততা সত্ত্বেও সুলতান জালালুদ্দীন সম্পর্কে কোথাও ইশারা-ইঙ্গিতেও মদ্য-সেবনের অপবাদের কথা উল্লেখ করেননি। এটুকুই শুধু নয়, বরং কোথাও সুলতানের কর্মপন্থার কোনো দোষত্রুটি অথবা দুর্বলতার দিকেও কোনো ইশারা করেননি।

সুলতানের ব্যাপারে ছড়ানো এই বর্ণনাগুলোর খানিকমাত্র ওজনও যদি থাকত, তা হলে ইবনে খালদুন কেন এগুলোকে উল্লেখ করলেন না? তার এই বিমুখতার অর্থ হল—দিরায়াতের মূলনীতি অনুযায়ী (ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনে খালদুন যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন) এই বর্ণনাগুলোর কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নেই।

আরেকটি বিষয়ের প্রতিও আমাদের গভীর দৃষ্টি রাখা উচিত, এখন আমাদের কাছে ইতিহাসের যে বিপুল ভান্ডার জমা হয়েছে, তার মধ্যে একটা বড় অংশ নেওয়া হয়েছে সেইসব বইপত্র থেকে, যেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী গোপন হয়ে থাকবার পর ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা বের করে এনে মূল ট্যাক্সটের বিশুদ্ধীকরণের মাধ্যমে আমাদের সামনে তা পেশ করেছে।

স্বয়ং সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনীগ্রন্থ 'সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি'ও (যা সুলতানের জীবনবৃত্তান্তের প্রধান উৎস) প্রাচ্যবিদদের হাত হয়েই আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। তা হলে কি সম্ভব নয় যে, ইসলামি লিটারেচারগুলোতে মদ-সেবনের যেসব বর্ণনা জুড়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো এই প্রাচ্যবিদদেরই কারসাজি?

সাধারণ কোনো পানীয়কে, বিশেষত নাবিজকে খমর দ্বারা ও নাশাতকে সাকার দ্বারা বদলে ফেলা তো প্রাচ্যবিদদের বাঁ-হাতের খেলমাত্র।

বাস্তবতা জানার জন্য উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ আল্লামা শাহ মুঈনুদ্দীন নদবির অভিমতটি একটু গভীর দৃষ্টিতে পড়ে দেখুন। তিনি লেখেন—'একটি ভুল ধারণা দূর করে দেওয়া জরুরি মনে করছি। আরবি ভাষায় শরাব সাধারণত পানীয়-জাতীয় সব জিনিসকেই বলা হয়। সুতরাং শরবত বোঝানোর জন্যও আসে শরাব শব্দ। তদ্রূপ শরাব নিরঙ্কুশভাবে সবকিছু পান করাকেই বলা হয়। এমনকি জমজমের পানি পানের ক্ষেত্রেও এই শব্দই আসে। উর্দু ভাষার শরাব (মদ, নেশাজাতীয় দ্রব্য) বোঝাতে আরবিতে ব্যবহৃত হয় খমর শব্দ। কিন্তু যেসব লোক আরবি সম্পর্কে অবগত নয়, তারা শুরব বা শরাব শব্দ দেখে উর্দুর শরাব তথা খমর (মদ, নেশাজাতীয় দ্রব্য) মনে করে ধোঁকা খায়। অথচ এটা সঠিক নয়।

এবং তারা ধোঁকা খুব ভালোভাবেই খায়। ফলে নাবিজ পান করাকে মদপান মনে করে বসে।

কিছু আব্বাসি খলিফা ছাড়া (যাদের মদ-সেবনের কথা স্বীকৃত) অধিকাংশ খলিফা, বরং প্রায় সকলেই এই উম্মুল খাবাইস (সকল গুনাহের মূল) মদ্যপান থেকে দূরে ছিলেন। অবশ্য হালকা ধরনের নাবিজের কিছু প্রকার—যেগুলো নেশাকর ছিল না—ইরাকের কিছু আলেমের নিকট জায়েয ছিল। এগুলো প্রায় সকল খলিফা ও আমিরই গুরুত্বের সাথে পান করতেন।'[৫১৮]

শাহ মুঈনুদ্দীন নদবির এই অভিমতটি খুবই ওজনদার। ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে যেখানে শরাবখানা শব্দটি আসে, সেখানেই একদম সুনির্দিষ্ট করে খমর বা মদ উদ্দেশ্য হয়ে যায় না। বরং, যেকোনো ধরনের পানীয় পান করা ও পান করানোর ব্যবস্থাপক মজলিশ বা ডিপার্টমেন্টকে শরাবখানা বলা হয়।[৫১৯]

আল্লামা ইবনে খালদুনও হারুনুর রশিদ ও মামুনুর রশিদের মতো খলিফাদের ব্যাপারে মদ্যপানের যে বর্ণনাগুলো রয়েছে, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে একথাই বলেছেন যে, তারা 'নাবিজ' পান করতেন। তিনি লেখেন—তারা খেজুর-ভেজানো পানি পান করতেন, যা পান করা ইরাকের মুফতি সাহেবদের মাজহাব অনুযায়ী বৈধ ছিল; আর সে-কথা সবার কাছেই ছিল পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট।

এখানে তাদের উপর মদপানের অপবাদ লাগাবার কোনো সুযোগ নেই। তাদের সম্পর্কে বর্ণিত এই নিকৃষ্ট বর্ণনাগুলোর উপর নির্ভরও করা যায় না।[৫২০] সুলতান জালালুদ্দীনের মতো মর্যাদাবান মুসলিম সুলতানদের পান করা ও পান করানো সম্পৃক্ত বর্ণনাগুলো যদি কোনো স্তরে এসে সাব্যস্ত হয়ে যায়, তা হলে সেগুলোকে ইবনে খালদুনের এই বক্তব্যের উপরেই প্রয়োগ করতে হবে।

ধোঁকাবাজি ও ওয়াদাখেলাফি : আসল বাস্তবতা

এই অপবাদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে এটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, একজন সিপাহির জন্য চালবাজি হচ্ছে নৈপুণ্য। এতে দোষ বলে কিছু নেই।

একটা বাস্তব কথা আছে—'যুদ্ধ এক ধোঁকা বা কৌশলের নাম'। সে-হিসেবে একজন সফল সেনাপতির মধ্যে মৌলিক যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক, তার ভেতর একটি হচ্ছে তাকে অবশ্যই সুচতুর ও চালবাজ হতে হবে। সাদাসিধা আলা-ভোলা কোনো লোক যুদ্ধক্ষেত্রেও সৈন্যদলের কমান্ড করতে পারে না, নিরাপত্তার সময়ও সামলাতে পারে না রাষ্ট্রীয় রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনার হাল।

---

[৫১৮] তারিখে ইসলাম, শাহ মুঈনুদ্দীন নদবি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৩০; দারুল ইশায়াত, করাচি থেকে ছাপা

[৫১৯] দেখুন : সুবহুল আ'শা, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৫৪, ৪৬০, ৪৬৯

[৫২০] মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা : ১৮

সুলতান জালালুদ্দীন ছিলেন মুসলিমবিশ্বের একজন প্রথম সারির সেনাপতি। এই প্রথম সারির সেনাপতি কেন এতটা বেখেয়ালি ও সাদাসিধে হতে যাবেন? তিনি সূক্ষ্ম চাতুর্য ও তীক্ষ্ণ সতর্কতার গুণ থেকে কেন মুক্ত হতে যাবেন?

বাকি আছে অপবাদ আরোপকারীদের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণের বক্তব্য। তো বলি—রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সময় সুলতানের সাথে কোনো সম্প্রদায়ের বিধিবদ্ধ সন্ধিচুক্তি হয়েছে, আর পরে সেই চুক্তি তিনি কোনোভাবে ভঙ্গ করেছেন—এরকম একটি ঘটনাও ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবু যদি কোনো ইতিহাসবিদ ইতিহাসের কোনো আবরণে এ-ধরনের কোনো ঘটনা রেখে যান, যা থেকে তার ওয়াদাখেলাফি প্রকাশিত হয়, তা হলে প্রমাণ হিসেবে বলা হবে, এটি ছিল একটি বিরল কিংবা আকস্মিক ঘটনা। এরকম কোনো-একটি ঘটনাও যদি পাওয়া যায়, তা হলে সেটার সূত্র ধরে সুলতানকে সামগ্রিকভাবে ওয়াদা-ভঙ্গকারী বলে দেওয়া কি শুদ্ধ হবে?

সুলতান জালালুদ্দীন কি একজন ব্যর্থ নেতা ছিলেন?

সুলতান জালালুদ্দীনের ব্যাপারে সাধারণ প্রতিক্রিয়া হল—'নিজের প্রচেষ্টায় তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। তার সমস্ত দৌড়ঝাঁপ বিফলে গেছে। নিজের কোনো লক্ষ্য তিনি অর্জন করে নিতে পারেননি।' কিন্তু যদি গভীরভাবে প্রকৃত বাস্তবতা নিরীক্ষণ করে দেখা হয়, তা হলে অনেকগুলো পয়েন্ট এই সাধারণ প্রতিক্রিয়াকে ভুল প্রমাণ করে।

যদি রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও উপনিবেশবাদই হতো সুলতান জালালুদ্দীনের কর্মব্যস্ততার আসল উদ্দেশ্য, তা হলে এর মধ্যে তাকে নিশ্চিতভাবে নিষ্ফল গণ্য করা যেত। কিন্তু সুলতানের পুরো জীবন-ইতিহাসে এমন-সব প্রমাণ পাওয়া যায়, ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে প্রমাণগুলোই বলে ওঠে—এই পার্থিব বস্তুনিচয় থেকে সুলতানের দৃষ্টি ছিল বহু ঊর্ধ্বে।

বাস্তব কথা হল—তার পুরো জীবনের সীমাহীন কষ্ট-পরিশ্রমের আসল এবং একমাত্র অভীষ্ট ছিল উম্মাহর সুরক্ষা, পবিত্র হারামাইন শরিফাইনের প্রতিরক্ষা ও পৃথিবীর সমস্ত সম্প্রদায়কে মানবতার চিরশত্রু তাতার-জাতির আগ্রাসন থেকে বাঁচানো। এই বিষয় ও উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল সুলতানের প্রতিষ্ঠা ও শক্তিমত্তা। এসবের প্রতি সুলতানের দৃষ্টি অবশ্যই ছিল; কিন্তু এগুলোই তার আসল লক্ষ্য ছিল না; সুলতানের জীবনের মূল টার্গেট অর্জনের একটি মাধ্যম ও উপকরণ ছিল মাত্র।

আফসোসের কথা হল—সুলতানের টার্গেট অর্জনের এই মাধ্যমগুলো বেশিদিন পর্যন্ত থাকেনি, উত্তম পন্থায় তার ভাগ্যে তা জোটেনি। এই মহাপুরুষ পর্যন্ত এসে খাওয়ারিজমি শাসন আচমকা এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল যে,

শত্রুমহল ও হিংসুকদের ভেতর তখন ধুমধাম বেজে উঠেছিল খুশির বাজনা। আর আপন লোকদের ভেতর থেকে জেগে উঠেছিল আফসোস ও শোকের মাতম। তবে ইতিহাস আজো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাতারদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য রুখে দেবার ও হারামাইন শরিফাইনের প্রতিরক্ষা করবার যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট তিনি নিয়েছিলেন, সেই টার্গেট দুটি অর্জনে তিনি পুরোপুরি সফল হয়েছিলেন। এ কথার সাক্ষ্য আল্লামা যাহাবিও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি সুলতান জালালুদ্দীন না হতেন, তাতাররা পুরো পৃথিবী পদপিষ্ট করে ফেলত।'

সুলতানের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হবার কারণ

এইমাত্র আমরা একটি পয়েন্ট উল্লেখ করে দিয়েছি। তাই সুলতানের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল নাকি বিফল, সে নিয়ে আর অতিরিক্ত আলোচনা করতে যাচ্ছি না। এখন স্রেফ এ নিয়ে আলাপ করব যে, সেই কার্যকারণগুলো কী, যার ভিত্তিতে সুলতানের সাম্রাজ্য পতনের শিকার হয়েছিল? এবং কোন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য একসময়কার বিশাল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যও হয়ে গিয়েছিল স্মৃতিপট থেকে বিমোচিত এক পুরাকথার উপাখ্যান। প্রকৃত বাস্তবতা বুঝে ওঠার জন্য আমরা এই কার্যকারণসমূহ দুই ভাগ করতে পারি—

১. অনৈচ্ছিক কার্যকারণ

২. ইচ্ছাগত কার্যকারণ

যে বিষয়গুলো ছিল অনৈচ্ছিক, সেগুলো সুলতানের হুকুমত মজবুত হয়ে-ওঠার পথে প্রথম থেকেই বাধা হয়ে ছিল। আর ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর কিছু পদস্খলন সুলতানের শাসনকালের শেষদিকে ঘটে গিয়েছিল। চলুন, প্রথমে অনৈচ্ছিক কার্যকারণগুলো নিয়ে নিরীক্ষা চালাই। তারপর ঐচ্ছিক বিষয়গুলো।

অনৈচ্ছিক কার্যকারণ

অনৈচ্ছিক কার্যকারণগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হল সেসব অবস্থা, ঘটনা ও আপতিত ব্যাপার, যেগুলোর উপর সুলতানের কোনো প্রায়োগিক হস্তক্ষেপ ছিল না। সেগুলোর কিছু ট্রাজেডি সুলতানের সিংহাসনে উপবেশনের পূর্বেই প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। সেগুলোকে প্রতিরোধ করবার সময় ও সুযোগ সুলতানের হাতে ছিল না। আর কিছু ঘটেছিল সুলতানের শাসন চলাকালে। কিন্তু সেগুলো ছিল আসমানি বালা-মুসিবত ও প্রাকৃতিক বিষয়, যার উপর মানবজাতির কোনো কর্তৃত্ব চলে না। সেগুলো হল গোত্রীয় রাজনীতির কিছু ব্যাপার। বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত প্রয়োগের শক্তি ও কার্যকর ক্ষমতা সুলতান জালালুদ্দীনের ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ অনৈচ্ছিক কারণগুলো হল—

১. দগ্ধ হতে থাকা আধমরা সাম্রাজ্য :

সুলতান জালালুদ্দীন উত্তরাধিকারসূত্রে যে সাম্রাজ্য পেয়েছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে কোনো সাম্রাজ্য ছিল না; মূলত ছিল অজস্র ভগ্নস্তূপ ও নিস্তব্ধ গোরস্থানেরই একটা সামগ্রিক রূপ। এরকম এক বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ নতুনরূপে গড়ে ওঠার জন্য সুদীর্ঘ কালপ্রবাহের দরকার ছিল। এরকম বিধ্বস্ত হয়ে-যাওয়া রাজ্যকে নিজ পায়ে দাঁড় করানো, সফলভাবে চালানো এবং উন্নতি ও মজবুতির শীর্ষচূড়ায় নিয়ে যাবার সমস্ত সম্ভাবনা শুরু থেকেই ছিল অনেক কম। ফলে সুলতানের সাধ্যানুপাতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই চূর্ণিত রাজ্য ও খণ্ডবিখণ্ড রাজ্যগুলো কোনোভাবেই পূর্বের শান-শওকতে গড়ে উঠতে পারেনি। তারপর নব উদ্ভূত ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে যেসব হামলা ঘটেছিল, সেগুলো এই সাম্রাজ্যকে আশু ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য করেছিল।

২. বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা :

যেকোনো রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির ভিত্তি থাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। সুলতানের দুর্ভাগ্য ছিল, তিনি পেয়েছিলেন এক বিপর্যস্ত রাজ্য। সেই রাজ্যের কোষাগার অধিকাংশই ছিল শূন্য। আরগেঞ্চ, গজনি, হিন্দুস্থান ও ইরানে এক-এক করে ৪ বার নতুনভাবে গড়ে উঠেছিল সুলতানের রাজ্য। প্রত্যেকবার বিভিন্ন দুর্যোগ এসে তার রাজ্য নিশ্চিহ্ন করে দিত। আর সুলতানকে তার পথচলা প্রথম থেকে শুরু করতে হতো। এবং এসব পথচলা শুরু হতো অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া অবস্থায়।

১২ বছরের শাসনামলে একবার নয়, পুরো চারবার সম্পূর্ণভাবে ওলট-পালট হয়ে-যাওয়া একটি রাজ্যের পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। কারণ, সর্বদা থাকত বড়-বড় যুদ্ধাভিযান ও দীর্ঘতর সব সফরের ভারী খরচাদির প্রশ্ন।

লাগাতার যুদ্ধের খরচাপাতি, সৈন্যদলের বেতনভাতা, মাসোহারা, খোরাকি, রসদপত্র, নগরবাসীর প্রয়োজনসামগ্রী, বিপর্যস্ত বস্তি ও শহর আবাদের কাজসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়খাতগুলো যদি দেখা হয়, তা হলে মনে হয়, পৃথিবীর যেকোনো রাজ্যের চাইতে অধিক আর্থিক উপাদানের প্রয়োজন ছিল সুলতানের। কিন্তু অবস্থা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। তার অর্থনৈতিক অবস্থা সিরিয়া ও ইরাকের ছোট ছোট রাজ্যগুলো থেকেও অধিক দুর্বল ছিল। এরকম দেউলিয়া-অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সুলতানের সৈন্যদেরকে বেতনভাতা প্রদানের কোনো বিধিবদ্ধ আইনই গড়ে উঠতে পারেনি। সৈন্যদলের সদস্যদের খোরাকি লাভের খাত ছিল একটাই; তা হল গনিমতের মাল।

যদিও পরবর্তীতে খেরাজ-উশর ও অন্যান্য সরকারি অর্থ উঠে আসার যেসব খাত থাকে, সেগুলো সুলতান জারি করেছিলেন; কিন্তু সেখান থেকে শুধু অবশ্যম্ভাবী খরচগুলো আদায়ের অর্থটাই আসত; এর বেশি নয়।

সম্ভবত এই সংকটের কারণেই ইতিহাসে সুলতানের দানশীলতার গল্প তেমন পাওয়া যায় না। যদি আর্থিক উপকরণ অধিক পরিমাণে হতো, অসম্ভব ছিল না যে, সুলতান নিজের রাজ্য মজবুত করে গড়ে তো তুলতেনই, লোকদের স্বর্ণ-রুপার চমকানি দেখিয়ে সর্বমহলে লাভ করে নিতেন গাম্ভীর্যপূর্ণ বহু স্তর। হয়তোবা শত্রুদেরকেও বন্ধু বানাতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তিনি প্রবল দৈন্যদশায় এতই সংকটের মুখে পড়েছিলেন, যেন এই দীনতার কারণেই তার প্রধান মহৎকর্মগুলো চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং স্বার্থপর বন্ধুদেরকেও তা শত্রুতে পরিণত করেছিল। অভাবের দিনে হিংসুকরা তার বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যদি অর্থনৈতিকভাবে সুলতানের উন্নতি থাকত, আর্থিক অনুগ্রহের ঝলক দেখিয়ে এইসব হিংসুটের মুখ বন্ধ রাখা যেত।

৩. গাদ্দারদের আধিক্য :

সুলতানের পিতা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের পরাজয়ে এবং তাতারদের সাফল্যে গাদ্দার-চাটুকার দরবারিদের ঘৃণিত কুকীর্তির বড় ভূমিকা ছিল। সুলতান জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধেও এরা পুরোদমে তৎপর থেকেছে। এই গাদ্দারদের আলোচনা আমরা পৃথকভাবে একটি অধ্যায়ে করে এসেছি। সুলতানের রাজ্যের পতনে এদের বিরাট ভূমিকা ছিল। তবে এটা ঠিক—গাদ্দারদের অনেককেই কোনোভাবে জব্দ রাখা যেত। সোনা-রুপার চকচকানি দেখালেই এদের ওয়াফাদারি (গাদ্দারির বিপরীত) কিনে ফেলা যেত।

সাধারণত যতটুকু দামে এরা নিজেদের বিকোয়, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ বুলি কপচালেই সবসময়ের জন্য এদেরকে মুঠোর মধ্যে রাখা যেত। কিন্তু সুলতানের যে পরিমাণ পুঁজি ছিল, তা তার বিরোধীদের অর্থসম্পদের চেয়ে কখনোই বেশি ছিল না। ফলে গাদ্দারদের সাথে এই কৌশল প্রয়োগের সুযোগ তিনি পাননি।

আরেকটা পন্থা ছিল—গাদ্দারদের চিরতরে খতম করে দেওয়া। কিন্তু এই পন্থা অবলম্বনে সবসময় বাধা হয়ে দাঁড়াত সুলতানের সহজাত কোমলপ্রাণ স্বভাব। ভেতর থেকে তিনি এরকম কিছু করবার সায় পেতেন না। ফলে গাদ্দার-শ্রেণিকে বরাবর তিনি ক্ষমাই করে গেছেন।

এ তো গেল নামজদা সুস্পষ্ট গাদ্দারদের কথা। কিন্তু কিছু গাদ্দার থাকে এমন সূক্ষ্ম, যাদের উপর কারুর সন্দেহ জাগে না কখনো। কিন্তু তলে-তলে ঠিকই তারা শক্ত গাদ্দার। সুতরাং এদের বিরুদ্ধে সুলতানের পদক্ষেপ গ্রহণের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

৪. মুসলিম শাসকদের বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র :

সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের বিজয়ের ক্রমধারা মুসলিম শাসকদের অন্তরাত্মায় খাওয়ারিজমি শাসনের প্রতি শক্ত ভীতি ও ঘৃণাবোধ জাগিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সুলতান জালালুদ্দীনকেও মুসলিম শাসকদের এই ভীতি ও ঘৃণার টার্গেটে পরিণত হতে হয়েছিল। অথচ সুলতানের মেজাজ ছিল পিতার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু তবু মুসলিম শাসকরা তার থেকে দূরে থেকেছেন। এমনকি সুলতানের রাজ্যকে নিজেদের মসনদের জন্য তারা জ্বলন্ত আতঙ্ক মনে করতেন। সাময়িকভাবে কয়েকজন সুলতানের ঐক্যের আহ্বান কবুলও করেছিলেন; কিন্তু খুব দ্রুতই তারা আলাদা হয়ে গিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে অপতৎপরতায় মেতে উঠেছিলেন। এদের বিভিন্ন ধরনের গোপন চক্রান্ত সুলতানের রাজ্যের খুঁটি প্রতিনিয়ত দুর্বল করে যাচ্ছিল। শেষে এদের পক্ষ থেকে খোলা প্রান্তরে যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল, যে যুদ্ধে সুলতানের অবশিষ্ট শক্তি এরা ভেঙে দিয়েছিল।

৫. আত্মীয় ও নৈকট্যভাজনদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চনা :

সে যুগে প্রত্যেকটি রাজ্যের বংশীয় ও গোত্রীয় ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির খুব গুরুত্ব ছিল সর্বমহলে। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন প্রথম থেকেই স্বীয় জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। শুরুতেই তার ক্ষমতা-লাভের অধিকারের সামনে নিজের ভাইয়েরা বাগড়া দিয়ে বসেছিল। ভাই গিয়াসুদ্দীনও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছে। নিজের গোত্রের এই বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধতা সুলতানের রাজ্য পোক্ত হয়ে উঠতে দেয়নি। বারবার তা সাম্রাজ্যের উন্নয়নের পথে বিঘ্ন হয়ে কাজ করেছে।

আর যেসব একনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন থেকে সুলতানের সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাদের অধিকাংশই তাতারদের সাথে সুলতানের যুদ্ধ শুরুর আগেই পৃথিবী থেকে গত হয়ে গিয়েছিল। আর জীবনের শেষদিনগুলোতে যখন স্বীয় গোত্রের সহযোগিতা ও নির্ভরতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তখনকার চিত্রপট ছিল এমন : তেমন খড়কুটোই ছিল না তার কাছে, যা দ্বারা তিনি ছোট্ট একটা বাসা বাধতে পারেন।

৬. পুত্রসন্তানদের শহিদ হয়ে যাওয়া :

সাম্রাজ্যের পতনের একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ জাগতিক কারণ হল—সুলতানের কোনো পুত্রসন্তান বেঁচে ছিল না। সিন্ধুতীরের যুদ্ধে সবাই শহিদ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে আরেকটি পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছিল; কিন্তু কয়েক বছর বয়সেই সে মারা যায়। যদি তার পুত্ররা বেঁচে থাকত, তারা হয়ে উঠতে পারত পিতার সহযোগী ও ভরসার কেন্দ্র। কমপক্ষে সুলতানের জিহাদি প্রচেষ্টার সেই উত্তেজনাকর

অধ্যায়টি এমন করুণভাবে বন্ধ হয়ে যেত না। ছেলেরাই সেটিকে জিইয়ে রাখত। যদি তার কোনো স্থলাভিষিক্ত থাকত, আশা ছিল—সেই স্থলাভিষিক্তের পতাকাতলে সুলতানের একনিষ্ঠ সিপাহিরা একত্র হয়ে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের খুঁটি মজবুত রাখত। কিন্তু প্রকৃতিগত বিষয়াবলিতে কারুর কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না। তাকদিরের লিখন এটাই ছিল যে, সুলতান জালালুদ্দীন পর্যন্ত এসে চিরদিনের জন্য নিঃশেষিত হয়ে যাবে খাওয়ারিজমি শাসন।

ইচ্ছাগত কার্যকারণ

এবার আমরা ঐচ্ছিক কার্যকারণগুলোর দিকে মনোনিবেশ করব। অন্যভাবে বললে, এগুলো ছিল সুলতানের পতনের এমন কারণ, যেসব ছিল সুপরিকল্পিত, চাতুর্য ও সূক্ষ্ম কর্মপন্থাগত। মূলত, এই ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর ভাবনায় নিজেদের নিবদ্ধ করা আমাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী। কারণ, মানুষের ইচ্ছা কিংবা ক্ষমতাবহির্ভূত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা, সেগুলো সুস্পষ্ট করে তোলা উপকারী বটে, কিন্তু তাতে আমাদের জন্য শিক্ষা, উপদেশ কিংবা আমল-যোগ্য কোনো দিক বেরিয়ে আসে না। কিন্তু আমাদের ক্ষমতার আওতাভুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা চালালে কী কী পদক্ষেপ ভুল ছিল, যে পদক্ষেপগুলোর কারণে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল, বেরিয়ে আসবে সেগুলো এবং সেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে বর্তমানকালে ও ভবিষ্যতে আমরা এ ধরনের ভুলত্রুটি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাতে পারব।

তো, এবার চলুন, সুলতানের অভ্যাসরীতি, কর্মপদ্ধতি, রাষ্ট্রের রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনায় এমন কোন কোন দিক প্রকাশ পেয়েছিল, যেগুলোর সংশোধন ছিল জরুরি।

১. চঞ্চলতা, দীর্ঘ পরিকল্পনাহীনতা ও তড়িঘড়িতে গৃহীত কিছু সিদ্ধান্ত :

সুলতানের স্বভাবের মধ্যে কাজের তাড়াহুড়ো ছিল খুব বেশি। একটা কথা আছে, 'হয়তো এখনোই পেতে হবে, নয়তো কখনোই না', ইংরেজিতে যাকে বলে Now or Never, সুলতান জালালুদ্দীন যেন সর্বদা এই নীতিতেই কাজ করে গেছেন। কিছু ইতিহাসবিদের বর্ণনায় তার কঠোরতা, দ্রুতগতিপূর্ণ মেজাজ কিংবা তাড়াহুড়োপ্রিয়তার কথা দেখা যায়। তবে এর সঠিক অর্থ এই নয় যে, তিনি শক্ত পাকড়াওকারী, জালেম কিংবা চরিত্রহীন ছিলেন। বরং এর প্রকৃত অর্থ হল—তিনি ব্যক্তিগত কাজে তাড়াহুড়োপ্রিয় মানুষ ছিলেন। খুব কম সময়ের মধ্যে বিরাট কাজ সেরে ফেলতে চাইতেন।

তার পুরো জীবনচরিত নিয়ে গবেষণা করে দেখা যায় যে, তিনি মৌলিকভাবে ছিলেন একজন সহিষ্ণু ও ধৈর্যসম্পন্ন লোক। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এবং

সাজিয়ে নিতেন, তা হলে আগত দিনের বহু বিপদ ও শঙ্কা থেকে নিরাপদ হয়ে যেতে পারতেন।

এই শশব্যস্ত প্রকৃতি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বিন্যস্তকরণের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য সুলতান কমপক্ষে দুবার তাড়াহুড়ো ও ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের শিকার বনেছিলেন।

প্রথমবার, যখন তিনি সুলতান ইলতুৎমিশের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে তরবারি ধরেছিলেন। তবে ইলতুৎমিশের সেসময়কার সুস্থির বুদ্ধি এই যুদ্ধকে সাময়িকভাবে থামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সুলতানের এ সিদ্ধান্তের কারণে হিন্দুস্থানি আমিরদের মধ্যে সুলতান জালালুদ্দীন-বিরোধী গোপন বৈরিতার শেকড় মজবুত হয়ে উঠেছিল।

শশব্যস্ত দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হল, সিরিয়ার শাসকরা যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল, তার মধ্যে সুলতানের অংশগ্রহণ এবং সেখানে একপক্ষের সাথে তার জুড়ে যাওয়া। এই একটি সিদ্ধান্তের কারণেই পরবর্তীতে উন্মোচিত হয়েছিল আরো কয়েকটি অনুচিত সিদ্ধান্তের রাস্তা।

একদিকে সুলতানের সঙ্গ পেয়ে মজবুত হয়ে গিয়েছিল আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের পা। কিন্তু অন্যদিকে সুলতানের শত্রু বনে গিয়েছিল মুয়াজ্জমের ভাই আল-মালিকুল আশরাফ। এই শত্রুতাই ছিল পরবর্তীকালের ইয়াসি চমনের যুদ্ধের মূল ভিত্তি।

সেখানেও সুলতানের থেকে আরো একবার প্রকাশ পেয়েছিল চপলতাপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত। তিনি যখন অসুস্থতায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেই অবস্থায়ও সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিলেন। যদি দু-চারটে শহর সিরিয়ার শাসকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ থেকে নিজের আঁচল বাঁচিয়ে নিতেন, তা হলে বড় একটি ক্ষতি থেকে বেঁচে তো যেতেনই, তার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ়তার যে স্বপ্ন তিনি লালন করেছিলেন, তাও বাস্তবায়িত হবার একটা সম্ভাবনা দেখা যেত।

২. পরামর্শ ক্রমানুসারে সংঘটিত না হওয়া :

সুলতানের ওখানে উন্মুক্ত পরামর্শের সিস্টেম ছিল। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে আলাপ করবার জন্য দরবারি ও পরামর্শদাতাদের থেকে অভিমত গ্রহণ করা হতো। কিন্তু এই পরামর্শের মজলিশ কখনোই ক্রমাগতভাবে চালু থাকত না। তাৎক্ষণিকভাবে এক-দুই বৈঠকেই সম্পন্ন হয়ে যেত অধিকাংশ সিদ্ধান্ত। আর শেষবছরগুলোতে সুলতানের কাছে পরামর্শদাতা যেন থেকেও না-থাকার মতো ছিল।

বিরাট গুণ। এই দুর্দান্ত আত্মনির্ভরশীলতাই সুলতানের অধিকাংশ অপ্রত্যাশিত বিজয়ের কারণ হয়ে উঠছিল।

সন্দেহ নেই—যদি সুলতানের ভেতর এই গুণ অণুমাত্রও কম হতো, তা হলে চেঙ্গিজ খানের মোকাবেলায় বেরোবার পরিবর্তে বছরের-পর-বছর শুধু দূরবর্তী পরিকল্পনাই তিনি সাজিয়ে যেতেন; বিপুল কর্মযজ্ঞের মাঠে নেমে আসতেন না। কিন্তু এটাও রূঢ় বাস্তবতা যে, এই চরম আত্মনির্ভরতার কারণে শেষে তাকে শক্ত ক্ষতিও পোহাতে হয়েছিল। ইয়াসি চমনের ময়দানে সিরিয়ার শাসকদের সাথে যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল, তা থেকে চাইলে বিরত থাকতে পারতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াই যখন বেধেই উঠল, তখন সম্ভাব্য বাহ্যিক যত উপকরণ আছে, তার কোনো প্রস্তুতি না নিয়েই সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছিলেন সুলতান। ফলে এ যুদ্ধই হয়ে ওঠে সুলতানের নেতৃত্বে লড়ে-যাওয়া সর্বশেষ বড় যুদ্ধ।

এই মাত্রাতিরিক্ত আত্মনির্ভরতার কারণেই সুলতান তার ক্ষমতার শেষ বছরে যখন তাতার সরদার জিরমাগুনের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পেয়েছিলেন, তখন যথাসময়ে প্রস্তুতি শুরু করেননি তিনি। এই প্রস্তুতিহীনতায় তার পুরো শীতকাল কেটে গিয়েছিল। যখন বসন্তকাল এসে দরজায় কড়া নাড়িয়ে দিল, দূরদূরান্তে চলে-যাওয়া-সৈন্যদের একত্র করবার উপযুক্ত সময় তখন সুলতানের হাতে ছিল না। এজন্য অল্পকিছু সিপাহিকে নিয়ে তিনি দ্রুত স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৪. সংবাদ সরবরাহ ও গোয়েন্দা বিভাগের দুর্বলতা :

আরেকটা বাস্তবতা হল—শেষ ক-বছরে সুলতানের গোয়েন্দা-বিভাগ খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। চক্রান্তকারী ও গাদ্দাররা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল সংবাদ সরবরাহের সমস্ত মাধ্যম। গোয়েন্দাদের ভেতরকার বিশ্বস্ততায় পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। গোয়েন্দা বিভাগে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল বহু গাদ্দার। গোয়েন্দা বিভাগ যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তার কিছু দৃষ্টান্ত নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে :

একদিন সুলতান জালালুদ্দীন পোলো খেলার ময়দানে খেলা চলাকালেই গিয়াসুদ্দীনের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পেলেন। ফলে দ্রুত সৈন্যদল নিয়ে তিনি গিয়াসুদ্দীনকে রুখবার জন্য রওনা দিলেন। কিন্তু সামনে অগ্রসর হয়ে জানতে পারলেন—এই সংবাদটা ছিল ভুয়া।

৬২৮ হিজরি সনের বসন্তকালে তাতাররা যখন সুলতানের বিরুদ্ধে সর্বশেষ যুদ্ধযাত্রা শুরু করেছিল, তখনো সুলতানের গোয়েন্দা বিভাগ শত্রুদলের সঠিক সংখ্যা জানাতে পারেনি। এজন্য তাতারদের মোকাবেলা করার জন্য তৎক্ষণাৎ সঠিক কোনো পরিকল্পনা আঁটতে পারেননি সুলতান।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে, কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে সুলতান উত্তর ইরান ও কুর্দিস্তানের ভেতর ঘুরে ফিরছিলেন। তখন তাতারদের একটি সেনাদল তার

পিছু লেগে গিয়েছিল। সেই নাজুক পরিস্থিতিতেও সুলতানের গোয়েন্দারা তৎপর ছিল না। সুলতানকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তাতাররা মানজিকার্ট পর্যন্ত এসে ফের উলটো পথে ফিরে গেছে। অথচ তখন রীতিমতো তারা সুলতানের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। সুলতান যদি সঠিক তথ্যটি পেতেন, উপযুক্ত কোনো রণাঙ্গনে এই সেনাদলের সাথে শক্ত যুদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু ভুল সংবাদ সরবরাহের কারণে সুলতান নিজের ছোটখাটো সৈন্যদলটিও হারিয়ে বসেছিলেন।

৫. অতিরিক্ত ক্ষমা ও মার্জনা :

খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, কিছু ইতিহাসবিদ সুলতান জালালুদ্দীনকে শক্ত পাকড়াওকারী বলে মন্তব্য করেছেন। বলেছেন—সুলতান নাকি জনসাধারণকে কষ্ট দিতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তারা এই অপবাদের প্রমাণস্বরূপ কোনো তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি। বিপরীত দিকে, সুলতানের কোমলপ্রাণতা, ক্ষমা ও মার্জনার রয়েছে অসংখ্য ঘটনা, যেগুলো প্রমাণ করে—সুলতান ক্ষমার এই গুণটিতে পূর্ণতার সর্বোচ্চ-সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন।

তার ভেতর এই গুণটি এতই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তিনি বড় বড় গাদ্দার ও শত্রুকেও ক্ষমা করে গেছেন বারবার। কিন্তু পরবর্তীকালে এ গুণটিই সুলতানের জন্য জটিল কিছু সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। তিনি বুরাক হাজিব, গিয়াসুদ্দীন ও শারফুল মুলকের মতো বিষধর সর্পগুলোর মাথা থেঁতলে না দিয়ে বারবার তাদের শুধরে যাবার সুযোগ দিচ্ছিলেন।

উপমহাদেশের শহিদ টিপু সুলতানের মতো সুলতান জালালুদ্দীনের ওখানেও একেকটা মির সাদেক, পুর্নিয়া ও গোলাম আলি প্রতিপালিত হচ্ছিল। আর সুলতান সবকিছু জেনে-শুনেও না-দেখার ভান করছিলেন। সুলতানের সহজাত কোমলপ্রাণতা ও অনুগ্রহশীলতার সুযোগে এসব বিষাক্ত নাগ শেষ পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যের শেকড় উপড়েই ছেড়েছে।

৬. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে উদাসীনতা :

সুলতানের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সহস্র ঝঞ্ঝাট ও হাঙ্গামার ভেতর দিয়ে কেটেছে। এরকম পরিস্থিতির ভেতর তিনি দীর্ঘমেয়াদি কোনো প্রকল্প গড়ে তুলতে পারেননি। তবে, অন্য প্রকল্পগুলো থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি যদি গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখায় বিশেষ দৃষ্টিপাত করতে পারতেন, সে তাওফিক যদি তার হতো, তা হলে শেষদিকে এতোটা নিঃসঙ্গ ও নিঃশক্তি হতেন না তিনি। সেই শাখাটি হল—আমজনতা ও সৈন্যদলের ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও চারিত্রিক দিকগুলোর বিশেষ প্রশিক্ষণ। অত্যন্ত জরুরি ছিল এই প্রকল্পটিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পুরো রাজ্যজুড়ে এর হাওয়া বইয়ে দেওয়া।

আমরা দেখি যে, তাতারদের ভয়ংকর আগ্রাসনের পর সুলতানের শাসনাধীন রাজ্যে আবাদ হয়ে উঠেছিল যেসব বস্তি ও শহর, সেখানে কিছু মাদরাসার ভিত্তিই কেবল স্থাপন করা হয়েছিল। সুলতান ইস্পাহানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটি ছাড়া বাকি দু-চারটে মাদরাসার যাত্রা শুরু করেছিল সুলতানের কিছু আমির। কিন্তু সাম্রাজ্যের এই অল্প কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র সময়ের সব প্রয়োজন পূরণ করার মতো ছিল না। বিশেষত, সুলতানের সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা টিকিয়ে রাখবার এবং প্রজাদের ভেতর কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা জাগিয়ে তুলবার জন্য এ-ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তখনকার খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ভেতরে প্রজাদের আত্মিক যোগ্যতা তৈরীর এরকম কোনো প্রকল্প ফুটে উঠতে দেখা যায় না। এমনিভাবে সৈন্যদলের দীনি ও রুহানি শিক্ষা ও দীক্ষা এবং তাদের মধ্যে শিক্ষাগত উন্নতি সাধনের কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না।

সৈন্যদলের প্রথম দিককার আমিররা ছিলেন আহলে ইলম ও অভিজ্ঞ। কিন্তু তারা এক-এক করে শহিদ হয়ে যাচ্ছিলেন। আর বাধ্য হয়ে তাদের স্থলে এনে দাঁড় করাতে হচ্ছিল অযোগ্য লোকদের। কারণ, যারা রবের কাছে চলে যাচ্ছিলেন, তাদের পরে তাদের সমবর্তী কোনো লোক ছিল না। এবং তাদের সমবর্তী কাউকে গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল না।

মাদরাসা, খানকা এবং জ্ঞান ও নৈপুণ্যের অন্য মারকাজগুলো থেকে বিগত সময়ের স্মরণীয় যে দলটি গড়ে উঠেছিল, তাতারদের গণহত্যায় নিহত হয়ে গিয়েছিল তাদের একটা বড় অংশ। বাকি কিছু লোক তরবারি হাতে সুলতানের সাথে ছিল, তারাও কয়েক বছরের ভেতর উধাও হয়ে গিয়েছিল।

শেষকালে সুলতানের পাশে জমে গিয়েছিল এমন অনেক সৈন্য, যাদের বাপ-দাদাদের সারাজীবন অন্যের সম্পত্তি লুটপাট করতে-করতে কেটেছিল। এই লোকগুলো জিহাদকেও লুটতরাজের একটা 'বিধিবদ্ধ মাধ্যম' মনে করেছিল। আর সে উদ্দেশ্যেই তারা সুলতানের কাছে এসে ভিড়েছিল।

এ-ধরনের লোকগুলোর হাতেই প্রকাশ পেয়েছিল খিলাত শহরের ট্রাজেডি। আর সুলতানের বিরোধীরা দুনিয়াকে একথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছিল যে, সুলতানের বাহিনী মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করা এবং ধনদৌলত লুট করে নেওয়াকে নিজেদের অধিকার বলে মনে করে। হায়, সুলতান জালালুদ্দীন যদি সাম্রাজ্যের আমির-উমারা, সৈন্যদল ও জনসাধারণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বাস্তবসম্মত স্থায়ী প্রকল্পের দিকে মনোনিবেশ করতে পারতেন, তা হলে জন্ম নিত না এই কাহিনি।

কোনো স্থলাভিষিক্ত না-থাকা

সুলতানের জিহাদি মিশন আঁকড়ে ধরার মতো কোনো পুত্রসন্তান বেঁচে ছিল না। তবু কোনো স্থলাভিষিক্ত তিনি রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের কোনো ঘোষণা তিনি দেননি। ফলে সুলতানের আত্মগুপ্তি বা মৃত্যুর পর তার সৈন্যদলের পক্ষে সম্ভব হয়নি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে টিকে থাকা। ফলে একেবারে শেকড় থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল খাওয়ারিজমি শাসন। এবং তাতার-জাতির সাথে জিহাদের যেই ক্রমধারা চলে আসছিল, তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

একটি ভুল প্রতিক্রিয়া ও তার খণ্ডন

সুলতানের ব্যাপারে নিরঙ্কুশভাবে এমনতরো প্রতিক্রিয়া গ্রহণ ঠিক নয় যে, তার সমস্ত আপনজন ও সাথিবর্গ তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে কিছু লোক প্রমাণ করতে চায়—'সুলতান চরিত্রহীন ও বদমেজাজি ছিলেন; নতুবা অধীনস্থদের হৃদয় জয় করবার যোগ্যতা তার ছিল না। একারণেই তাকে সবাই ছেড়ে গিয়েছিল।' কিন্তু বাস্তবতা হল—যেসব লোক মতাদর্শগতভাবে জিহাদকে একটি ফরজ দায়িত্ব ও মিশন মনে করত এবং সুলতানকে সঙ্গ দিয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তারাই কেবল সঙ্গে ছিল তার। শিহাবুদ্দীন নাসাবি, আমান মালিক, জাহাঁ পাহলোয়ান উজবুক ও নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ হলেন এর স্পষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু একটা প্রশ্ন এখনো থেকে যায় যে, জীবনের শেষদিনগুলোতে এই লোকগুলিকে সুলতানের পাশে দেখা যায়নি কেন? এর স্পষ্ট উত্তর হল—সুলতানের খাস সহচরদের অধিকাংশ লোক ৬২৫ হিজরি সনের ইস্পাহান যুদ্ধে শহিদ হয়ে গিয়েছিল। এ যুদ্ধের পর সুলতানের সেনা-কাউন্সিল ও মন্ত্রিপরিষদ প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছিল। যারা বেঁচে ছিল, তারা ৬২৭ হিজরি সনের ইয়াসি চমনের যুদ্ধে মারা গিয়েছিল।

যা হোক, সুলতানের অধিকাংশ জানবাজ আমির ও একনিষ্ঠ দায়িত্বশীল লোক নিজেদের জীবন থাকা পর্যন্ত তার থেকে পৃথক হননি।

এখন বলি সেসব লোকের কথা, যারা ধনদৌলত ও পদপদবির লোভে আটকে ছিল। এই লোকগুলোর ভেতরের আনুগত্য গাদ্দারিতে রূপান্তরিত হলেও সুলতানের ব্যক্তিত্বে তা কোনো আঁচড় ফেলতে পারেনি। সাইফুদ্দীন আগরাক মালে গনিমতের ঝগড়া বেধে যাবার কারণেই যদি আলাদা হয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা সুলতানের ভাই গিয়াসুদ্দীন যদি তার বিরোধী হয়ে থাকে ক্ষমতার অন্ধ মোহে, তা হলে এটা তাদেরই অপরিণামদর্শিতা ও নীচতার প্রমাণ। এখানে সুলতানের উপর কোনো প্রশ্ন কিংবা আপত্তি তোলার সুযোগ নেই।

কিছু কর্মী যে-দিক থেকে বৃষ্টি আসত সেদিকেই মেলে ধরত ছাতা। এই নীতিতেই তারা কাজ করে গেছে। তারা যখন দেখেছিল সুলতানের পতন ঘটতে

চলেছে, তখন, একেবারে শেষদিকে, নিজেদের বিশ্বস্ততা খুইয়ে ভিন্ন রাজ্যের সাথে মিশে যাচ্ছিল। এদের ভেতর বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় উজিরে আজম শারফুল মুলকের নাম।

কিছু আমির সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল স্রেফ এ কারণে যে, ক্রমাগত আবর্তিত হওয়া অতিরিক্ত বিপদ-মুসিবত ও পরীক্ষা মোকাবেলা করার হিম্মত তাদের ছিল না। ভেতর থেকে তাদের সাহসের শেকড় উপড়ে গিয়েছিল। অথবা সুলতানের তাবৎ চেষ্টা-প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলদায়ক হয়ে উঠবে কিনা, সেই বিশ্বাস তাদের ছিল না। ভেতর থেকে তারা মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছিল। বাকিটা জীবন তারা কোনো শান্ত-নিরাপদ স্থানে গিয়ে কাটিয়ে দিতে চাচ্ছিল। এর স্পষ্ট উদাহরণ হল আতর খান। সে একদম শেষ পর্যায়ে সুলতানের সঙ্গ ত্যাগ করে অন্য জায়গায় গিয়ে উঠেছিল।

পরিশিষ্ট

এই আলোচনা শেষ করবার আগে আমরা ফের একবার বলব যে, সুলতান জালালুদ্দীন ছিলেন আমাদের মতোই জলজ্যান্ত রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তিনি কুরুনে উলারও (ইসলামের প্রথমদিকের সোনালি যুগ) লোক ছিলেন না। ছিলেন হিজরি সপ্তম শতকের অজস্র ফেতনায় ভরপুর এক কঠিন সময়কালের।

তা ছাড়া তিনি সাম্রাজ্যের হাল ধরেছিলেন যৌবনের প্রবল উত্তাল সময়ে। তারপর যুবাবয়সেই পৃথিবী থেকে তিরোহিত হয়েছিলেন। এজন্য তার প্রতিটি পদক্ষেপে তার থেকে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক পাকাপোক্ত চিন্তার লোকের মতো বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার আশা করা যেত না। সেই কঠিন সময়ে সাম্রাজ্যের ও সৈন্যদলের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে বাঁচা এক উদ্দাম নওজোয়ান শাসকের জন্য কোনো সহজ কাজ ছিল না। তা সত্ত্বেও সুলতান যে পরিমাণ কোরবানি দিয়ে গেছেন, এবং সূক্ষ্ম পন্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেছেন, তা কম আশ্চর্যের কথা নয়। মানছি যে, সুলতানের সত্তা ও জীবন ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত নয়; কিন্তু এতে কাফের শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যে মহান জিহাদ আঞ্জাম দিয়েছিলেন, দীনের জন্য যে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে?

যিনি মুসলিম উম্মাহকে কাফেরদের গোলামি থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের পুরো জীবন কোরবান করে দিয়েছেন, ইতিহাসের অমর ক্যানভাসে একজন দুর্ধর্ষ মুজাহিদের আসন তার অবশ্য-প্রাপ্য। আমরা সুলতানকে আল্লাহর একজন ওলি প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগিনি; কিন্তু তিনি একজন সাহসী নেতা অবশ্যই ছিলেন।

এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের শুধু এটুকু প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, সুলতান জালালুদ্দীন ছিলেন উম্মাহর ইসলামি মর্যাদাবোধ ও চেতনাসমৃদ্ধ এক বিরলপ্রজ বাহাদুর, যার পাহাড়-সম দৃঢ়তা ও সাহসিকতায় আমাদের জন্য রয়েছে দাওয়াতে আমল—দীনের সুরক্ষায় তার মতো বিপুল সাহসে অগ্রসর হবার আহ্বান।

আল্লাহর এই বান্দা মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষায় নিজের উপর আবর্তিত দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। উম্মাহর প্রতিরক্ষার জন্য দিয়েছেন বড়-বড় কোরবানি। শেষ পর্যন্ত এ-পথেই নিজেকে পুরোপুরি বিলীন করে দিয়েছেন। আমরা প্রত্যাশা রাখি—মহান আল্লাহও তার এই বান্দার সাথে পরম ক্ষমা ও মার্জনাপূর্ণ আচরণ করবেন। তিনি আমাদের খুঁত ও ত্রুটিগুলোও ক্ষমা করে দেবেন। আমাদেরও তাওফিক দেবেন উম্মাহর কল্যাণে কিছু করে যাবার। আমিন।

ইতিহাসের শিক্ষা

শেষদিকে উল্লেখ করছি পূর্বের সমস্ত অনুসন্ধিৎসা ও কর্মযজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পঙক্তি। বিগত পাতাগুলোয় যা-কিছু পড়েছেন, এখনকার পঙক্তিমালাকে তার নিংড়ানো সারবত্তা মনে করতে পারেন। এই শেষধাপে ইতিহাসের সেই শিক্ষণীয় দিকগুলোতে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে চিন্তাযুদ্ধ চালাব, হিজরি সপ্তম শতকের এই রক্তাক্ত দাস্তানের ভেতর থেকে উঠে আসে যে সূক্ষ্ম দিকগুলো। এসব শিক্ষণীয় প্রেক্ষাপট ও ঘটনা আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর পথনির্দেশ প্রদান করে :

১. জিহাদ জারি রাখা :

এই সত্য দাস্তানের আলোকোজ্জ্বল একেকটি হরফ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য আমাদেরকে আহ্বান করছে। পবিত্র হাদিসে জিহাদকে বলা হয়েছে 'ইসলামের সুউচ্চ শিখর'। জিহাদ ইসলামের স্থায়িত্ব ও সুরক্ষা, প্রসার ও বিস্তারের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যম।

মুসলিমদের জন্য নেতার অধীনে জিহাদের জন্য প্রতিমুহূর্তে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিতে থাকা আবশ্যক। ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে প্রতিরোধ ও অগ্রগামী জিহাদের জন্য সর্বদা বদ্ধপরিকর হয়ে থাকা উচিত। নিজেদের সীমান্ত-রক্ষার পাশাপাশি ইসলামের পয়গাম অন্যান্য রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার উদ্দীপনা সর্বদা স্থির-নিশ্চল থাকা উচিত।

মুসলিম লিডাররা কোনো রাষ্ট্র কিংবা সম্প্রদায়কে, বিশেষত প্রতিবেশী অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে দুর্বল এবং অ-ক্ষতিকর মনে করে নিজেদের যুদ্ধ-দক্ষতায় প্রবৃদ্ধি ঘটানো থেকে গাফেল থাকতে পারে না। এই কাজ তাদের জন্য কখনোই সমীচীন নয়।

স্মরণ রাখা উচিত—যত জায়গায় কুফর ও ইসলামের মাঝখানে সীমান্তরেখা রয়েছে, তা তেমনই অস্থায়ী প্রমাণিত হয়েছে, যেমন অস্থায়ী ছাইয়ের স্তূপ দিয়ে নির্মিত সীমান্ত-দেয়াল। ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখার স্থায়িত্ব সবসময় ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। চৌদ্দ শতাব্দী ধরে আলো ও অন্ধকারের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত আজো অব্যাহত রয়েছে।

মুসলিমদের অগ্রাভিযানের স্রোতধারা যেখানেই গিয়ে আটকে পড়েছে, সেখান থেকেই তাৎক্ষণিকভাবে নাহয় ধীরে-ধীরে শুরু হয়ে গেছে তাদের পিছু হটতে-থাকা। খাওয়ারিজম থেকে বাগদাদ, স্পেন থেকে বিলকান এবং আলজেরিয়া থেকে ভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত আমরা এই বাস্তব চিত্রেরই প্রতিফলন ঘটতে দেখেছি।

হিজরি প্রথম শতকে চীনের দিকে অগ্রসরমান কুতায়বা ইবনে মুসলিমের বিজয়ধারা যদি থেমে না পড়ত, তা হলে নিশ্চিতভাবে সম্ভাবনা ছিল যে, তাতাররা সেই সময় থেকেই ঢুকে পড়ত ইসলামের ছত্রছায়ার ভেতর।

স্পেনের মুসলিম-বিজেতা যদি ফ্রান্স সীমান্তে আটকে না পড়তেন, তা হলে ইউরোপও হয়তোবা মুসলিমবিশ্বের তাহজিব-তামাদ্দুনের উৎকৃষ্ট আমানতদার হয়ে উঠত। দীনের দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে ইউরোপ হয়ে উঠত এক জাগ্রত নকিব। এটা অসম্ভব কিছু ছিল না।

মধ্য-এশিয়ায় বহু শতাব্দী ধরে রাজত্ব করে-আসা মুসলিমজাতি যদি মস্কো বিজয় করা থেকে থেমে না-পড়ত, মস্কোর যুদ্ধাভিযানে যেতে অবহেলা প্রদর্শন না করত, সোভিয়েত ইউনিয়নের আকৃতিতে গড়ে-ওঠা বিগত শতাব্দীর ইসলামের সর্ববৃহৎ শত্রুশক্তির উদ্ভব ঘটত না।

কালকের খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতন থেকে শুরু করে আজকের রক্তাক্ত আফগানিস্তান, প্রজ্বলিত ইরাক ও বিধ্বস্ত পাকিস্তান পর্যন্ত যা কিছু আমাদের দেখতে হচ্ছে, তা আমাদের নিজেদের কর্মেরই প্রতিফল ও শাস্তি। এসব আমাদের চৈন্তিক, আদর্শিক, রাজনৈতিক ও যুদ্ধাভিযান-সংক্রান্ত তাবৎ ভুলের সুতীব্র সাজা। এই সাজা আমাদের ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ না-করার কারণেই ভুগতে হচ্ছে।

২. দাওয়াতে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা :

মুসলমান উন্নতির সর্বোচ্চ শিখড়ে থাকুক কিংবা পতনের সর্বনিম্ন পাতালে, সর্বকালে-সর্বাবস্থায় অমুসলিমদের দোরগোড়ায় ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজটি বিরামহীনভাবে অব্যাহত রাখা তাদের জন্য জরুরি। কালো-ধলো, ছোট-বড়, দুর্বল-সবল, উন্নত-অনুন্নত সমস্ত গোত্রের মধ্যে কোনোধরনের পার্থক্য সূচিত না-করে পুরো মানববিশ্বটাকে দীনের দাওয়াতের টার্গেট বানানো উচিত।

আমাদের জন্য আফ্রিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলে ও এন্টার্কটিকার বরফাচ্ছিদ কোণে গুপ্ত-জীবনযাপন-করা-মানুষদের কাছে দীন-ইসলামের মহা নেয়ামত পৌঁছে দেওয়া ততটাই জরুরি, যতটা জরুরি প্যারিস ও নিউইয়র্কের ভেতর অসংখ্য ইসলামি মারকাজ গড়ে তোলা। আশ্চর্যের কিছু না যে, কিছুকাল পরেই পৃথিবীর বাগডোর এই পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়গুলোর হাতেই হতে পারে এবং কাল তারা উপহার দিতে পারে এক উন্নত ও শক্তিশালী বিশ্ব।

যদি তাদের অন্তর পর্যন্ত ইসলামের আলো পৌঁছে থাকে, তা হলে কিছুকাল পরে বিশ্বরাজনীতিতে জেগে ওঠার পর তারা হয়ে উঠবে ইসলামের শক্ত বাহু। কিন্তু এর ব্যত্যয় হলে 'ইসলাম-বৃক্ষ'টি পুড়িয়ে ভস্মীভূতও করে দিতে পারে।

কার জানা ছিল—হিজরি সপ্তম শতকে মোঙ্গলিয়ার মরুচারী লোকগুলো তখনকার সভ্য পৃথিবীটাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার মতো শক্তি অর্জন করে উঠবে? যদি ইসলামের মুবাল্লিগরা এর এক-দুই শতক আগে থেকেই এই অন্ধকারাচ্ছন্ন

তাতার-জাতির ভেতর দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিতেন, তা হলে হিজরি সপ্তম শতকের প্রথমভাগে মুসলিমদের উপর নেমে আসত না সেই ভয়ংকর কেয়ামত।

আন্দালুস, মরক্কো, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার আরবজাহান এবং সেখানকার অধীনস্থ শাসকরা আটলান্টিক মহাসাগরের পারে আমেরিকা নামে আবাদ হয়ে-ওঠা এক নতুন পৃথিবীর কথা যখন জানতে পেরেছিলেন, তখন যদি সেখানে ইসলামের পরিপূর্ণ প্রচার-প্রসারের গুরুত্ব অনুভব করতে পারতেন, তা হলে হয়তো এত নিকৃষ্ট তাগুত হিসেবে আজকের আমেরিকার আত্মপ্রকাশ ঘটত না।

এর অর্থ এই নয় যে, আমরা কেবল পশ্চাৎপদ বিশ্বে দাওয়াতি কাজ করতে থাকব আর উন্নত সম্প্রদায়ের কথা ভুলে যাব। না, বিশ্বরাজনীতিতে প্রতিপত্তিশীল যেসব সম্প্রদায়, তাদের মধ্যেও ইসলামের দাওয়াত দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমাদের এই দাওয়াতে জাতিভেদে কোনো পার্থক্য সূচিত করা উচিত নয়। এটা আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস যে, ইসলাম পৃথিবীর সকলের জন্য যথোপযুক্ত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। ইসলাম যেখানেই প্রবেশ করে, আলোকিত করে তোলে তার চতুর্পাশ। দাওয়াতের এই মহান মিশন যদি সঠিক ও ধারাবাহিকভাবে জারি থাকে, তা হলে ইউরোপ-আমেরিকারও সুবিশাল মুসলিম মহাদেশে রূপান্তরিত হওয়া কোনো অসম্ভব বিষয় নয়।

হিজরি সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুসলিমরা পুরোপুরিভাবে তাতারদের অনুগ্রহ ও অনুকম্পার মাঝে দিন গুজরান করছিল। যাপন করছিল এক দাসত্বের জীবন। এশিয়ার ভেতরে মুসলিমদের রাজনৈতিক ভূমিকা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাতার-আধিপত্য রুখে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ, সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুজ ও আল-মালিকুয যাহের বাইবার্সের মতো দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ শাসকদের সীমাহীন প্রচেষ্টার দখল তো ছিলই, পাশাপাশি ইসলামের সেসমস্ত দাঈ ও মুবাল্লিগের সাধনারও একটা বড় ভূমিকা ছিল, যাদের ইখলাস ও হেকমতপূর্ণ দাওয়াতের পদ্ধতি তাতার শাহজাদাদের মনন ঘুরিয়ে দিয়েছিল। শেষে তাতাররা এক শতাব্দীর মধ্যেই ইসলামের খাদেম বনে গিয়েছিল।

৩. শাস্ত্রীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি কীর্তিমান মর্দে মুমিন হওয়াও আবশ্যক :

ইতিহাসের এই আলোকিত পাতাগুলোতে আমরা হিজরি সপ্তম শতকে শাস্ত্রীয় জ্ঞানে মুসলিমদের সাফল্য-লাভের বিস্ময়কর কিছু ঝলক দেখতে পাই। তবু তখন মুসলিমদের পতন ঘটেছে। সুতরাং মানতেই হয় যে, কেবল চারিত্রিক উন্নতি ও পুঁথিগত বিদ্যার অগ্রগতিই মুসলিমদের স্থায়িত্ব, সুরক্ষা ও ঊর্ধ্বগতির নির্ণায়ক হতে পারে না, যতক্ষণ না এসবের পাশাপাশি ঈমানের শক্তি, আমলের দৌলত ও সুকীর্তির পুঁজি থাকে।

আমরা দেখেছি, সে যুগে ইলম ও হেকমতের প্রতিটি অঙ্গনে পৃথিবীর সমস্ত সম্প্রদায় থেকে মুসলিমরা ছিল অগ্রসর। একদিকে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত আকাশে চমকাচ্ছিল শায়েখ বোরহানুদ্দীন মুরগিনানি,[৫২১] আল্লামা কাসানি,[৫২২] ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি[৫২৩] ও ইমাম নববির[৫২৪] মতো উজ্জ্বল সব নক্ষত্র, অন্যদিকে আবিষ্কারের জগতে ছিল মুসলিম বিজ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞদের জয়জয়কার। খাওয়ারিজম, বাগদাদ, সিরিয়া ও কায়রোর যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর সকল কারখানায় তৈরি হচ্ছিল পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। বিজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় মুসলমান ছিল তখন যুগের ইমাম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পৃথিবীতে তাদের সমবর্তী কেউ ছিল না।

রাজনীতি-সমাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাহজিব-তামাদ্দুন থেকে শুরু করে কারিগরি, শিল্প-সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি পর্যন্ত যত ক্ষেত্র আছে, সবক্ষেত্রেই পৃথিবী ছিল মুসলিমদের উপর নির্ভরশীল।

এই সবকিছুই ছিল, কিন্তু মুসলিমদের ভেতর থেকে হারিয়ে গিয়েছিল সেই রুহ ও রুহানিয়াত, সেই শক্তি ও কুওয়াত, সেই দরদ ও মর্মব্যথা, যা ছিল তাদের ঊর্ধ্বগতি ও স্থিতিশীলতার মৌলিক উপাদান ও উপকরণ। মরহুম ইকবালের ভাষায় :

رہ گئی رسمِ اذاں روحِ بلالی نہ رہی
فلسفہ رہ گیا، تلقینِ غزالی نہ رہی

রয়ে গেছে আজো মিনারে আজানধ্বনি, নেই তাতে সেই বেলালি সঞ্জীবনী
বইয়ের পাতায় রয়ে গেছে দর্শন, নেই গাজালির জ্ঞানের প্রতিধ্বনি।

এই বিদ্যা এবং শাস্ত্রীয়, অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক উন্নতিকে ব্যবহার করার কথা ছিল ইসলামের সুরক্ষা ও পয়গাম প্রচারের জন্য; কিন্তু তা কেবল সভ্যতার জাঁকজমকতা ও চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। মুসলিমদের তাহজিব-তামাদ্দুন ছিল পৃথিবীতে সর্বাধিক অগ্রসর ও সুবিধাজনক, এজন্য তারা খুবই আরামপ্রিয় ও বস্তুবাদী হয়ে পড়েছিল। حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ (দুনিয়ার ভালবাসা ও মৃত্যুর ভয়)-এর ব্যাধি পুরোপুরিভাবে তাদের কাবু করে ফেলেছিল। রাসুল ﷺ স্পষ্ট ভাষায় এই রোগটিকে ভবিষ্যতের মুসলিমদের জন্য লাঞ্ছনাকর পশ্চাৎপদতা ও অসহায়ত্বের কারণ হবে বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি

---

[৫২১] হিদায়া গ্রন্থের রচয়িতা
[৫২২] বাদাইউস সানায়ে গ্রন্থের রচয়িতা
[৫২৩] তাফসিরে কাবির গ্রন্থের রচয়িতা
[৫২৪] সহিহ মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাতা

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—এই রোগ যখন মুসলিমদের আক্রান্ত করবে, পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায় তাদেরকে দস্তরখানে সাজানো খাদ্যস্তূপের মতোই এক ঢোকে গিলে ফেলবে।

ঠিক এমনটিই ঘটেছিল তখন। দ্বিপ্রহরের সূর্যের মতোই আলোকিত ও সত্য প্রমাণিত হয়েছিল তার এই ভবিষ্যদ্বাণী। গোবি মরুভূমির ক্ষুধার্ত তাতাররা যখন মুসলিমদের উপর তাণ্ডব চালিয়েছিল, মুসলিমদের সকল বৈষয়িক উন্নতি, শাস্ত্রীয় দক্ষতা-কৃতিত্ব, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং শিল্পকর্মের সফলতা নিষ্ফলভাবেই রয়ে গিয়েছিল।

মুসলমান তখন সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও তাতারদের সয়লাব রুখতে পারেনি, জ্ঞানবিজ্ঞানের স্তূপ লাগিয়েও তাদের সম্মুখে গড়ে তুলতে পারেনি কোনো বাঁধ। মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা, তাদের ইলমের সংকীর্ণতা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোতে ক্রমাগত ভুল পদক্ষেপগ্রহণ ও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ কোথাও তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে দেয়নি।

খাওয়ারিজম থেকে বাগদাদ পর্যন্ত ছয়শত বছরের গড়ে-ওঠা জ্ঞানবিজ্ঞানের তাবৎ ভান্ডার কয়েক বছরের মধ্যে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। এগুলো রক্ষা করার যোগ্যতা তখন মুসলিমদের মধ্যে ছিল না। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সরকারি কোষাগারগুলোতে জমে উঠেছিল যে সহস্র মণ স্বর্ণরৌপ্য, শেষকালে তা তাতারদের পায়ের কাছে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। অথচ এগুলোকে ইসলামের বাণী বিস্তারের এবং জিহাদের জন্য ব্যয় করা হয়নি। বড্ড কৃপণতা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে জ্ঞানবিজ্ঞান মুসলিম উম্মাহর হারানো সম্পদ। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে পৃথিবীর অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিযোগিতা করা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি প্রাসাদ, তাহজিব ও তামাদ্দুনের প্রতিটি তাজমহল রক্ষা করার জন্য একেকজন মর্দে মুমিনের উত্তপ্ত অন্তর ও দুঃসাহসী মুজাহিদের খাপমুক্ত তলোয়ার আবশ্যক।

৪. খেলাফতের প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা :

বংশ-গোত্র-বর্ণ—সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে মুসলিমদের পরিপূর্ণ ঐক্যের জন্য আবশ্যক হল ইসলামি খেলাফতের প্রতিষ্ঠা, স্থিতিশীলতা ও সুদৃঢ়তা। কারণ, একমাত্র এই খেলাফতই পারে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এক কাতারে দাঁড় করাতে।

বহিঃশত্রুর আশঙ্কা ও ভেতরের কুটচক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকা এবং বিশ্ব-মানচিত্রে মুসলিমজাতি একটি প্রভাবক-শক্তি হয়ে-ওঠা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না খেলাফত-ব্যবস্থাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং খেলাফত-ব্যবস্থার দৃঢ়করণকে আঞ্চলিক ও গোত্রীয় স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাতারদের আকস্মিক আক্রমণে মুসলিমবিশ্ব যে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল,

এর একটি বড় কারণ এ-ও ছিল যে, খেলাফতের মারকাজ তখন দৃঢ় ও কর্মতৎপর ছিল না। কিন্তু এর বিপরীতে বাগদাদের পতন ও খেলাফতে আব্বাসিয়ার পরিসমাপ্তির পর মুসলিমবিশ্বের যে দ্বিতীয়বার উত্থান ঘটেছিল, এর সবচেয়ে বড় কারণ এই ছিল যে, মুসলমানরা তাৎক্ষণিকভাবে মিশরে খেলাফত-ব্যবস্থাকে কার্যকর হিসেবে গড়ে নিয়েছিল।

এ যুগেও আমরা খেলাফত থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রায় এক শতাব্দী ধরে সামনে অগ্রসর হবার জন্য যার-যার মতো করে কাজ করে যাচ্ছি; কিন্তু মুক্তির কোনো পথ চোখে ভাসছে না। যদি আমরা খেলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা থেকে শত ক্রোশ দূরে থাকি, তা হলে অনর্থক প্রমাণিত হতে থাকবে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা।

৫. কোনো শিয়াকে অনুসরণীয় না বানানো :

তাতার-তাণ্ডবের সময় খেলাফতের মসনদে বসে ছিল এক শিয়া মতাদর্শী লোক। খেলাফতের দায়িত্বকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে বসে-বসে সে তামাশা দেখছিল। এ থেকে শিক্ষা পাই—শিয়া আকিদা ও আদর্শধারী লোকগুলো মুসলিমবিশ্বের সর্বজনীন কল্যাণের জন্য বদ্ধপরিকর ও নিষ্ঠাবান থাকে না। সাধারণত এদের কাছে নেতৃত্বের আসন হয়ে যায় শিশুদের খেলনা। তারা কেবল নিজেদের স্বজনপ্রীতির আবদ্ধ গণ্ডির ভেতরে থেকে কাজ করে। প্রশস্ত দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত এরা বড় বড় ট্রাজেডির জন্ম দেয়।

যদি আব্বাসি খলিফা নাসির তার পূর্বপুরুষদের মতো সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ধারক হতেন, তা হলে মুসলমানদের সর্বজনীন কল্যাণচিন্তা থেকে এতোটা সম্পর্কহীন থাকতেন না তিনি। তাতারদের মতো নিষ্ঠুর দুশমনকে মুসলিমদের উপর আক্রমণের আহ্বান জানাতে গিয়ে নিজের প্রতি লজ্জা ও ঘৃণা জাগত তার মধ্যে। এখানে তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাজ্যের ধ্বংস ও বিধ্বস্ততার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা উচিত, যা ইসলামি ইতিহাসের বড় একটি ট্রাজেডি। এটা নিশ্চয় আব্বাসিদের 'পরিবারতান্ত্রিক' দৃষ্টিভঙ্গির চরম পরাকাষ্ঠা ছিল যে, তাদের এক লোক ছিল আকিদা ও আদর্শে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর। তবু কেবল একজন খলিফার পুত্র হবার সুবাদে সে খেলাফতের পদ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। লোকেরা তার 'যোগ্যতা' নিয়ে টু শব্দটিও করেনি। সবাই মুখ তালাবদ্ধ করে রেখেছিল। অথচ এই পরিবারতন্ত্র-নীতির পক্ষাবলম্বনের কারণেই মুসলিমদেরকে যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল, সে নিয়ে মাতম করবার জন্য সহস্র আহাজারিও যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি।

৬. নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা :

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুদূরে পিছিয়ে-থাকা-মুসলমান যদি ইসলামের শত্রুশক্তির সামনে সিসাঢালা প্রাচীর না-ও হয়ে উঠতে পারে, তবু কমপক্ষে নিজেদের মধ্যে একে-অন্যের বিরোধী হয়ে ওঠা উচিত নয় কখনো। সাধারণ অবস্থায়ও উম্মাহর ঐক্যবদ্ধতা আবশ্যক। কিন্তু বিশেষত দুর্যোগের কালে তো বহুগুণ বেড়ে যায় এই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা। আর ঐক্য যদি নাও সয়, তবু পরস্পরের মাথা ফাটাবার কোনো অবকাশই নেই।

قوت نیکی نداری بد مکن

ভালো কাজ করতে না পারলেও মন্দ করো না।

কিন্তু খাওয়ারিজম, বাগদাদ, মিশর ও সিরিয়ার মতো মুসলিম রাজ্যগুলি তাতার আগ্রাসনের সময়ও পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তার উপর এসব রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও অব্যাহত ছিল ঝগড়াঝাঁটি। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে তাতারদের আক্রমণ চলাকালেও মধ্য-এশিয়ার আমিররা মার্ভ, নাসা ও গজনি দখলের জন্য একে অন্যের রক্ত ঝরাচ্ছিল। এইরকম পরিস্থিতির ভেতর প্রবল ঝড়ে দুলতে থাকা তরী পৌঁছবে কী করে পার পর্যন্ত?

যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো, মুসলিম বোর্ড ও দলগুলো উম্মাহর যৌথ টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে, তা হলে তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু এক প্লাটফর্মে না এসেও যদি যার-যার মতো করে কাজ করে যায়, তবু খানিকটা কম হয় আমাদের অধঃপতনের গতি। ব্যক্তিস্বার্থ, সময় বুঝে আত্মরক্ষা এবং মামুলি মতভিন্নতার কারণে একে অন্যের বিরুদ্ধে পুরোপুরি যুদ্ধে নেমে আসার অপয়া অভ্যাস থেকে মুক্তি না পেলে উন্নতির পথে আমরা এক কদমও হাঁটতে পারব না। মনের মধ্যে যারা মুসলিমবিশ্বের দ্বিতীয় উত্থানের জজবা ও আকাঙ্ক্ষা পোষেন, একে-অন্যের পা টেনে ছিঁড়ে ফেলবার জেদি মনোভাব তাদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ, যদি এই বদ অভ্যাস হতো, সুলতান জালালুদ্দীনের মতো একজন মুজাহিদ জীবনবাজি লাগিয়েও নিজের সকল লক্ষ্য অর্জন করে নিতে পারতেন না। এই এক ঘৃণ্য অভ্যাস যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, আশা করা যায়, উম্মাহর কর্মী ব্যক্তিরা সুচারুরূপে নিজেদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যেতে পারবেন।

৭. আমাদের মধ্যে বিজাতীয় কাউকে অনুপ্রবেশের ও কর্তৃত্ব খাটাবার সুযোগ দেওয়া যাবে না :

মুসলিমদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত যতদূরেই গড়াক না কেন, নিজেদের ঝগড়াঝাঁটির ভেতর বিজাতীয়দের অনুপ্রবেশ করবার ও কলকাঠি নাড়বার সুযোগ দেওয়া উচিত নয় কখনোই। অন্যথায় তা-ই প্রকাশ পাবে—যা খাওয়ারিজম ও

বাগদাদের সংঘাতের মাঝখানে তাতারদের অন্তর্ভুক্ত করার কারণে দেখা দিয়েছিল, যা পশ্চিম ও পূর্বপাকিস্তানের দ্বন্দ্বের ভেতর ভারতের কাছে বাঙালিদের সাহায্য তলব করার কারণে দেখা দিয়েছিল; যা ইরাক ও কুয়েতের ঝগড়ার ভেতর আমেরিকা ও তার যূথবদ্ধ দলের অনুপ্রবেশের কারণে দেখা দিয়েছিল।

এ যুগে তো বিজাতীয়দের কাছে মীমাংসা চাওয়ার ব্যাপারটাও তাদেরকে অনুপ্রবেশের আহ্বান করার নামান্তর বলে প্রমাণিত হচ্ছে। মুসলিমরা তো নিজেদের দ্বন্দ্ব সমাধানের কর্তৃত্ব ও শক্তি বিশ্ব-তাগুতদের হাতে দিয়ে দিয়েছে। ফলে ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে চলেছে এর ভয়ানক ফল।

৮. বহিঃরাষ্ট্রের সাথে রাজনীতি ও চুক্তি করার মধ্যে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক :

এ বইয়ের সারাংশ থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিজাতির সাথে সম্পর্ক-স্থাপন ও রাজনীতি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা-অবলম্বন ও বোধবুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। তাদের সাথে দূতিয়ালি ও বাণিজ্যিক সম্পর্কগুলো মেপে মেপে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় কায়েম করা উচিত। সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আবেগের স্থান কমও হবে না, বেশিও হবে না।

বাণিজ্য, শিক্ষা ও সুরক্ষা-মূলক কর্মকাণ্ডের আড়ালে বিজাতীয়দের আসল উদ্দেশ্য কী—সেদিকেও সর্বদা সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, সাধারণত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এ ধরনের শিরোনামের আবরণেই নিজেদের গোপন উদ্দেশ্যগুলো লালন করে এবং সেগুলো সফলও করে তোলে। যেমন : চেঙ্গিজ খান খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সাথে স্থাপিত বাণিজ্যিক সম্পর্ককে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

৯. দুশমনকে দুর্বল মনে করা যাবে না :

যতক্ষণ নিজেদের সুরক্ষা-শক্তির দৃঢ়তার প্রতি পুরোপুরি ভরসা, নিজেদের সহ্যশক্তির প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস ও আগে বেড়ে আক্রমণ করলে সাফল্য আসবে বলে প্রবল ধারণা সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো শক্তিশালী শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মতো ভুল করে বসা উচিত নয়। বরং আগে পুরোপুরি আন্দাজ করে নিতে হবে দুশমনের শক্তির পরিমাণ কতটুকু। যদি যুদ্ধ আবশ্যকও হয়ে পড়ে, তবু প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সময় ও মনোযোগ ব্যয় করা জরুরি। দুশমনকে দুর্বল মনে করার পরিণতি সর্বদা ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে, আর তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত হয়ে ওঠে ক্ষতিকর।

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের থেকে এমনতরো ভুলগুলোই প্রকাশ পেয়েছিল। তাতারদের তিনি সাধারণ জংলি লুটেরা ও দস্যু ভেবে শক্তিপরীক্ষার জন্য তাদের আহ্বান করে বসেছিলেন। কিন্তু তা পুরো মুসলিমবিশ্বের

বিরুদ্ধে এক অসমাপ্ত যুদ্ধের দিকে মোড় নিয়েছিল, তা হয়ে উঠেছিল আল্লাহর বান্দাসমস্তের ধ্বংসের কারণ।

১০. দুশমনের জন্য কর্তৃত্ব খাটানোর বৈধ পথ খুলে দেওয়া উচিত নয় :
যদি মনে হয়—প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো গোপনে ভয়াবহ কোনো সংকল্প আঁটছে, তখন তাদের সাথে রাষ্ট্রীয় ও দূতিয়ালির কাজে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন পড়ে। বিশেষত, এরকম পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষ যদি শক্তিতে সমপরিমাণ কিংবা দ্বিগুণ হয়, তা হলে তো অনেক বেশি হুঁশিয়ারি ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এরকম অবস্থায় দুশমনের সামনে কোনো ধরনের অপারগতা ও অসহায়ত্বও প্রকাশ করা যাবে না। অন্যথায় তা হয়ে উঠবে ধ্বংসাত্মক। পাশাপাশি কোনোপ্রকার দম্ভ ও অহমিকাও প্রকাশ করা যাবে না, তাও মারাত্মক ক্ষতিকারক।

খেয়াল রাখা উচিত—এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে এমন কোনো ভুল যেন না ঘটে, প্রতিপক্ষ-রাষ্ট্র যেটাকে পৃথিবীবাসীর চোখে আক্রমণের বৈধ সার্টিফিকেট হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। যেমন : খাওয়ারিজম শাহের হাতে তাতার পত্রবাহকের নিহত হওয়ার ঘটনাটি চেঙ্গিজ খানকে আক্রমণের একটা 'বৈধ বাহানা' এনে দিয়েছিল।

এটা ঠিক যে, ইসলামি নীতিমালা থেকে কোনো অবস্থাতেই আমরা সরে পড়তে পারব না। এটাও ঠিক যে, নিজেদের সম্মান, স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের উপর কোনো অবস্থাতেই কারুর সাথে আপস করা উচিত নয়। এটাও স্বীকৃত যে, বিজাতিদের সাথে কোনো পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য অত্যন্ত চিন্তাসমৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনই রক্ষা করতে পারে আমাদের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার। কিন্তু রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক নীতির দাবি হল—আমরা কখনো বোকামি, তাড়াহুড়ো ও দর্প-অহংকারের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে বসব না, যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শত্রুদের জন্য উন্মোচিত হয়ে উঠতে পারে যুদ্ধ-চক্রান্তের পথ।

১১. যুদ্ধ যেখানে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, সেখানে প্রয়োজন প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা :
শক্তিতে অগ্রসর—এমন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা যদি আবশ্যক হয়ে পড়ে, তা হলে সে যুদ্ধের জন্য খুব গভীর ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা বিন্যস্ত করা উচিত। এ পরিস্থিতিতে অগভীর পরিকল্পনা নিয়ে যুদ্ধে নামা নিষ্ফল গণ্য হয়ে থাকে। আগপিছ না দেখে অন্ধের মতো নেমে যাওয়া যুদ্ধযাত্রা হয়ে ওঠে বিধ্বংসী। কিন্তু সুগভীর পরিকল্পনা ও অভিনব সব কৌশল অবলম্বন করে স্বল্পশক্তি নিয়েও কাজ করে ওঠা যায় অধিক। চেঙ্গিজ খানের মোকাবেলায় আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ নিজের অর্জিত কিছু তথ্যের ভিত্তিতে এক অগভীর ও ফাঁপা পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন। এজন্য তিনি পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করছিলেন।

ওদিকে সুলতান জালালুদ্দীন অপেক্ষাকৃত কম সেনাশক্তি নিয়ে চেঙ্গিজ খানের সাথে সংঘর্ষ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ উৎকৃষ্ট কর্মপন্থা বিন্যস্ত করে অর্জন করে নিয়েছিলেন শানদার সব সফলতা।

১২. আসমানি বালা-মুসিবত দেখে নিজেদের ভেতর সংশোধন জরুরি :
ইতিহাসের এই উপাখ্যান আমাদের বলছে—যদি ক্রমান্বয়ে নেমে আসতে থাকে অসংখ্য আসমানি বালা-মুসিবত, তা হলে ক্ষমতাবান সমাধানকারীদের দ্রুত একসঙ্গে বসা ও নিজেদের সমস্ত আমলের যাচাই-বাছাই করে দেখা উচিত। এক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে পুরো উম্মাহকেই নিজেদের চালচলন ও রঙঢঙ বদলে ফেলা জরুরি হয়ে পড়ে। তবু যদি সম্প্রদায়ের ভুল সংশোধিত না হয়, তা হলে সেই সমরকন্দ ও বোখারার মতোই বরণ করতে হয় করুণ পরিণতি।

হিজরি সপ্তম শতকের মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ও আমজনতা ক্রমাগত ঘটতে-থাকা সেই বজ্রবিদ্যুৎ, আকাশ-ফাটানো মেঘপুঞ্জের হাঁকডাক, ঝড়-তুফান ও ভূমিকম্প থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি, যা তাতার-তাণ্ডব নামবার আগে ১০ বছর ধরে তাদের টনক নাড়াতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে সতর্ক হয়ে ওঠেনি। ফলে শেষ পর্যন্ত নেমেই এসেছিল সেই কঠিন প্রলয়, যা বর্ণনা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল সমস্ত ইতিহাসবিদের কলম।

আজো, আসমানি বিপদ ও আকস্মিকভাবে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্যোগ আমাদের সতর্ক করে চলেছে। ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি আমাদের জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে। আমরা কি চোখ খুলবার, নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক আমলের হিসাবনিকাশ করবার জন্য প্রস্তুত আছি?

১৩. ইলম ও মারিফাতের বোর্ডগুলো হতে পারে যোগ্য উম্মাহ গঠনের শক্ত ভিত্তি :
আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের শাসনকাল এই বাস্তবতাকে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, যেসব শিক্ষাঙ্গন, কুতুবখানা ও মাদরাসার হেফাজতের জন্য উম্মাহর যুবকদের তরবারি খাপ থেকে বেরিয়ে আসে না, সেগুলো দুশমনের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের যুগ থেকে আরেকটা বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যদি নিজেদের সমস্ত শক্তি শুধু যুদ্ধে-যুদ্ধেই নিঃশেষ যায়, উম্মাহর সদস্যদের ইলম ও মারেফাতে সুসজ্জিত করে তোলে যে কেন্দ্রগুলো, সেগুলো যদি আলোকিত হয়ে না ওঠে, তা হলে শেষকালে জাতি সঠিক নেতা ও সুষ্ঠু নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। ক্ষমতার বাগডোর চলে যায় সেসব অযোগ্য-মূর্খ লোকের হাতে, যারা গহীন সমুদ্রের মধ্যখানে ডুবিয়ে দেয় স্বজাতির ভারী তরী।

জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ ও তার প্রকৃত সঙ্গীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন ইমাম রাজি, শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরা ও খাজা ফরিদুদ্দীন-এর মতো ইলম ও মারেফাতের উজ্জ্বল নক্ষত্ররা। কিন্তু যখন সুলতান জালালুদ্দীনের শাসনকালের

সূচনা ঘটে, তখন থেকে কখনোই তার রাজ্যের শিক্ষাবোর্ড ও খানকাগুলোর কোনো অগ্রগতি হয়নি। এক্ষেত্রে বাধা ছিল সুলতানের বিপুল কর্মব্যস্ততা, হাঙ্গামা-গোলযোগ, সংঘাত-যুদ্ধ ও আসবাবপত্রের দুষ্প্রাপ্যতার মতো ব্যাপারগুলো। কিন্তু পরিণতিতে ঘটেছিল সেই অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা; শেষকালে খোদ সুলতানের কাছেই কোনো যোগ্য লোক ছিল না। থমকে দাঁড়িয়েছিল তার জিহাদি আন্দোলন।

১৪. রাজনৈতিক ভুলত্রুটির কোনো ক্ষমা নেই :

ইতিহাসের এই অম্লান কাহিনি আমাদের জানাচ্ছে—আল্লাহর নিয়মে কোনো সম্প্রদায়েরই রাজনৈতিক ভুলত্রুটির কোনো ক্ষমা নেই। এই ভুলের সঠিক ফল প্রকাশিত হয়েই ছাড়ে। ব্যক্তিগত গুনাহ তো তাওবার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা যায়, সামাজিক গুনাহগুলো পরিত্যাগ করে সন্তুষ্টি লাভ করে নেওয়া যায় রবের, কিন্তু সম্প্রদায়ের শাসক যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ভুল ঘটিয়ে বসেন, তখন এর উপজাত হিসেবে নেমে আসে যে ধস ও বিধ্বস্ততা, তার সঠিক প্রতিবিধান মুশকিল হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক ভুলত্রুটি হল এমন একটি তির, যা একবার ধনুক থেকে বেরিয়ে গেলে, কখনোই ফিরে আসে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যদি লাগাতার পদস্খলন ঘটতেই থাকে, তখন এর অর্থ কেবল একটাই যে, এ সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতি সন্নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ প্রথম রাজনৈতিক ভুলটি করেছিলেন চেঙ্গিজ খানের শক্তিমত্তা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জোগাড় না করে; খলিফা নাসিরের সাথে শত্রুতামূলক যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার দ্বিতীয় ভুল; আতরারে বণিকদের ব্যাপারটাকে শরিয়াহ আদালতে সোপর্দ না করে সীমান্তপ্রদেশের হাকিম ইয়ান্নাল খানকে বণিক-হত্যার এখতিয়ার প্রদানের মাধ্যমে করেছিলেন তৃতীয় ভুল, চেঙ্গিজ খানের পত্রবাহককে হত্যা করে সম্পন্ন করেছিলেন নিজের চতুর্থ ভুল। নাজমুদ্দীন কোবরার মতো অলিদের উপস্থিতি সত্ত্বেও এসব ভুলের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়েই ছেড়েছে।

ওদিকে খলিফা নাসির যে চেঙ্গিজ খানকে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে আক্রমণের দাওয়াত দিয়ে বড় এক রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা দেখিয়েছিলেন, তার ফল হিসেবে ধুলোয় মিশে গিয়েছিল পুরো বাগদাদ রাজ্য। বাগদাদের হাজার-হাজার ফকিহ ও শায়েখের হৃদয়বিগলিত প্রার্থনাও সেই ভয়ানক পরিণতি থেকে খেলাফতের প্রাণকেন্দ্রকে বাঁচাতে পারেনি।

সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ তার বীরত্ব, দীন-রক্ষার অপূর্ব স্পৃহা ও জিহাদের জজবা সত্ত্বেও শেষবছরগুলোতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক

ভালো রাখবার খুব একটা প্রয়োজন অনুভব করে ওঠেননি। তিনি যখন আলজেরিয়া, সিরিয়া ও মিশরের শাসকদের খানদানি ঝগড়াঝাঁটিতে পক্ষ নিয়েছিলেন, তখন অন্য শাসকরা তাতার-বিরোধী জিহাদে তার সঙ্গে থাকবে না বলে খাসা একটা বাহানা পেয়ে গিয়েছিল।

সুলতান একেবারে শেষদিকে আরজানুররোমের হাকিম রোকনুদ্দীনের কাছে কাবু হয়ে গিয়ে এশিয়ামাইনরের সুলতান কায়কোবাদকেও দ্বন্দ্ব বাধাবার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। এতে মুসলিমরাজ্যগুলোর মাঝে বেধে উঠেছিল সেই যুদ্ধ, যা তাতারদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা সুলতানের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছিল।

যদি উপযুক্ত দূতিয়ালির মাধ্যমে মাঝখান থেকে এই সংঘাত দূর করে ফেলা যেত, তা হলে সুলতান জালালুদ্দীনের তাবৎ প্রচেষ্টা তার জীবৎকালেই ফলদায়ক হয়ে উঠতে পারত। তাতারদেরকে বাগদাদ ও সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে চিরদিনের জন্য রুখে দেওয়া যেত। কিন্তু সুলতানের অসতর্কতায় গৃহীত সেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো রুদ্ধ করে দিয়েছিল সমস্ত সম্ভাবনার পথ। যে-কারণে অনিবার্য রীতি হিসেবে এর একটা কঠিন ফল প্রকাশ পেয়েই ছেড়েছে। কথা সেই ওটাই—'কুদরত রাজনৈতিক ভুলবিচ্যুতি কখনো ক্ষমা করে না।'

১৫. এক হও মুসলিম :

ইতিহাসের অজস্র গলিঘুপচিকে বুকের ভেতর আগলে-রাখা এ গ্রন্থের পাতাগুলো চিৎকার করে করে আমাদের বলে চলেছে—হে মুসলিমজাতি, পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধতাতেই কেবল নিহিত রয়েছে তোমাদের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির আবেহায়াত, তোমাদের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতা হল তোমাদের পতন ও ধ্বংসের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ। তাতার-তাণ্ডবের প্রতিটি পদক্ষেপ ও সুলতান জালালুদ্দীনের দুর্দান্ত প্রচেষ্টার প্রতিটি বাঁক আমাদের এই পয়গাম শোনাচ্ছে—

ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لئے

نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکِ کاشغر

এক হও হে মুসলিম, পবিত্র হেরেমের প্রতিরক্ষার জন্য
নীলনদের তীর থেকে কাশগর পর্যন্ত।

হৃদয়ের আকুতি

এ বিষাদময় সত্য ইতিহাস এমন একটি কালপর্বে বসে লেখা হয়েছে, যখন ইসলাম ও কুফরের মাঝে নিষ্পত্তিমূলক এক চূড়ান্ত যুদ্ধ খুবই নিকটবর্তী হয়ে গেছে। কাফেরশক্তি—হোক তা প্রাচ্যের কিংবা পাশ্চাত্যের—ইসলাম ও

মুসলিমদের নাস্তানাবুদ করবার জন্য একত্র করে ফেলেছে নিজেদের তূণীরের সমস্ত তির। হিন্দু দানবগুলো নিজেদের লোক-লশকর নিয়ে খোদাপ্রদত্ত ভূখণ্ড পাকিস্তানের উপর হামলে পড়বার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মা-ওয়ারাউন-নাহারের মুসলমানরা ফের একবার চৈন্তিক ও আদর্শিক যুদ্ধে এমন প্রবল ঝড়ের মুখোমুখি হয়ে আছে, যা আজ থেকে ৮০০ বছর পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে ঘটে-যাওয়া ট্রাজেডির চাইতে কোনো অংশে কম নয়। কাফকাজের মুসলমানরা আজাদির সেসব স্মরণীয় দৃশ্যপটেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে, যা এককালে সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের নেতৃত্বে যুগের বাহাদুর মুসলিম যুবকরা আঞ্জাম দিয়েছিল।

বাইতুল মাকদিস আজ ফের কাফেরদের নখরথাবার ভেতর রয়েছে। কাবাতুল্লাহ ও রওজাতুর রাসুলকে বুকে আগলে-রাখা জাজিরাতুল আরবের চারপাশে অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ ক্রমাগত শক্ত হয়ে উঠছে। ইসলামিবিশ্বের পরিত্যক্ত কোনো অঞ্চলও আজ কাফের সৈন্যদের হাত থেকে সুরক্ষিত নয়। আজ একদিকে কাফের শক্তির সরদারদের ভেতর চেঙ্গিজ খানের কুৎসিত প্রেতাত্মার জাগরণ ঘটতে দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে ফের একবার সুলতান জালালুদ্দীনের দুঃসাহসী জিহাদের প্রতিধ্বনিও গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে। সুলতানের সেই অমরকীর্তি মুসলিমদের আজ অস্ত্র ও আদর্শিক যুদ্ধের ময়দানগুলোতে নেমে আসতে আহ্বান করছে। তো, এখনো কি মুসলমান তাদের ফরজ দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থাকবে? ফের একবার ইসলামের নয়নাভিরাম সবুজ বাগিচাকে বিরানভূমি করে দেওয়া হবে??

চোখ খুলুন! দেখুন! কাশ্মিরে এই সবকিছুই ঘটে গেছে। চেচনিয়াতেও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একই কাহিনির। বসনিয়াসহ বিভিন্ন প্রান্তের সহস্র মজলুমের কণ্ঠ স্বজাতিকে দোহাই দিতে দিতে এবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আফগানিস্তান, ইরাক ও ফিলিস্তিনের মুসলমানরা তাদের সাহায্য করবার জন্য আমাদেরকে ডাকছে। আসুন হে মুসলমান, এখনো কি সুকোমল ঘুমের সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকবে তোমরা? এখনো কি তোমরা পারস্পরিক মতভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার শিকার হবে? এখনো কি... এখনো কি... এখনো কি...? পরিস্থিতি তোমাদের সুতীব্র চিৎকারে বারবার জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছে। নিশ্চয়ই কাল কেয়ামতের দিন তোমাদের কাছে পেশ করার মতো কোনো ওজর থাকবে না!!

একনজরে ঘটনাপ্রবাহ

২০ শাওয়াল ৫৯৬ (১৩ আগস্ট ১২০০) সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ সিংহাসনে বসেন।

৬১৪ হিজরি (নভেম্বর ১২১৭) সুলতান আলাউদ্দীন বাগদাদ আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হন।

জিলকদ ৬১৫ (ফেব্রুয়ারি ১২১৮) চেঙ্গিজ খানের সাথে খাওয়ারিজম শাহের বাণিজ্য-চুক্তি সম্পন্ন হয়।

মহররম ৬১৬ (মার্চ ১২১৯) চেঙ্গিজ খানের দূতকে হত্যা করা হয়।

রজব ৬১৬ (জানুয়ারি ১২২০) তাতার-সেনারা খাওয়ারিজমের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

জিলকদ ৬১৬ (জানুয়ারি ১২২০) জোচি খানের বাহিনীর সাথে সুলতান আলাউদ্দীনের লড়াই।

জিলহজ ৬১৬ (ফেব্রুয়ারি ১২২০) কুকন্দ ও আতরার শহরে তাতারদের হামলা।

মহররম ৬১৭ (মার্চ ১২২০) তাতারদের হাতে বোখারার পতন।

রবিউল আউয়াল ৬১৭ (মে ১২২০) তাতারদের হাতে সমরকন্দের পতন।

শাবান ৬১৭ (অক্টোবর ১২২০) সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের মৃত্যু।

রমজান ৬১৭ (নভেম্বর ১২২০) সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ সিংহাসনে বসেন।

শাওয়াল ৬১৭ (ডিসেম্বর ১২২০) সুলতান জালালুদ্দীন আরগেঞ্চ থেকে হিজরত করেন এবং তাতাররা আরগেঞ্চ শহর অবরোধ করে।

৫ জিলহজ ৬১৭ (১০ ফেব্রুয়ারি ১২২১) সুলতান জালালুদ্দীন শাদইয়াখ শহর থেকে রওনা হন।

মহররম ৬১৮ (মার্চ ১২২১) তাতাররা মার্ভ ধ্বংস করে দেয়।

সফর ৬১৮ (এপ্রিল ১২২১) তাতারদের হাতে আরগেঞ্চের পতন ঘটে।

১২ সফর ৬১৮ (এপ্রিল ১২২১) তাতারদের হাতে নিশাপুরের পতন ঘটে।

রবিউল আউয়াল ৬১৮ (এপ্রিল ১২২১) তাতারদের হাতে বলখের পতন। এই মাসের মাঝামাঝি সময়ে পতন ঘটে হেরাতের।

রজব ৬১৮ (আগস্ট ১২২১) হামাদানের যুদ্ধ। এই মাসের মাঝামাঝি সংঘটিত হয় গজনির যুদ্ধ।

৬-৮ শাওয়াল, ৬১৮ (২২-২৪ নভেম্বর, ১২২১) সিন্ধুতীরে বাগ নিলাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৮ শাওয়াল সুলতান জালালুদ্দীন ভারতবর্ষের সীমান্তে প্রবেশ করেন।

৬১৮ হিজরি থেকে ৬১৯ হিজরি (ডিসেম্বর ১২২১-মার্চ ১২২২) স্থানীয় হিন্দুরাজাদের বিরুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীনের কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

রবিউস সানি ৬১৯ (মে ১২২২) সুলতান জালালুদ্দীন দিল্লির কাছাকাছি পৌঁছে যান।

সফর ৬২০ (মার্চ ১২২৩) পাঞ্জাব ও সিন্ধের স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীনের যুদ্ধ।

জুমাদাল উলা ৬২১ (জুন ১২২৪) সুলতান জালালুদ্দীন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

রজব ৬২১ থেকে জিলহজ ৬২১ (আগস্ট ১২২৪ থেকে জানুয়ারি ১২২৫) এ সময় সুলতান কিরমান খোস্ত, শিরাজ, ইস্পাহান ও শাহপুর সফর করেন।

সফর ৬২২ (মার্চ ১২২৫) সুলতান জালালুদ্দীন বাগদাদের উদ্দেশে রওনা হন।

১৭ রজব ৬২২ (২৫ জুলাই ১২২৫) সুলতান জালালুদ্দীন তিবরিজ জয় করেন।

শাবান ৬২২ (আগস্ট ১২২৫) জর্জিয়ার প্রথম যুদ্ধ।

৩০ রমজান ৬২২ (১৫ অক্টোবর, ১২২৫) খলিফা নাসির মারা যান।

মহররম ৬২৩ (জানুয়ারি ১২২৫) জর্জিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ।

৮ রবিউল আউয়াল ৬২৩ (৮ মার্চ, ১২২৬) সুলতান জালালুদ্দীনের তিফলিস জয়।

১৪ রজব (১১ জুলাই ১২২৬) খলিফা জাহির ইনতেকাল করেন।

রমজান ৬২৩ (সেপ্টেম্বর ১২২৬) জর্জিয়ার তৃতীয় যুদ্ধ।

শাওয়াল ৬২৩ (অক্টোবর ১২২৬) আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের সাথে সুলতানের দ্বন্দ্বের সূচনা।

রজব ৬২৪, (জুন ১২২৭) বাতেনিদের সাথে লড়াই।

শাবান ৬২৪ (জুলাই ১২২৭) রায় শহরে তাতারদের সাথে লড়াই।

৪ রমজান ৬২৪ (১৮ আগস্ট ১২২৭) চেঙ্গিজ খানের মৃত্যু।

২২ রমজান ৬২৫ (২৪ আগস্ট ১২২৮) ইস্পাহানে তাতারদের সাথে লড়াই।

শাওয়াল ৬২৫ (সেপ্টেম্বর ১২২৮) ইস্পাহানের দ্বিতীয় লড়াই।

শাওয়াল ৬২৬ (আগস্ট ১২২৯) খিলাতে আক্রমণ। ৬২৭ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে খিলাত জয়।

মহররম ৬২৮ (নভেম্বর ১২৩০) তাতারদের নতুন আক্রমণ।

শাওয়াল ৬২৮ (মধ্য আগস্ট ১২৩১) সুলতানের অন্তর্ধান কিংবা শাহাদাত।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কুরআন মাজিদ

২. বয়ানুল কুরআন, মাওলানা আশরাফ আলি থানবি, মির মুহাম্মদ কুতুবখানা।

৩. সহিহ বোখারি শরিফ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারি, (মৃত্যু : ২৫২ হিজরি) কাদিমি কুতুবখানা, করাচি।

৪. সহিহ মুসলিম শরিফ, ইমাম মুসলিম নিশাপুরি (মৃত্যু : ২৬১ হিজরি) কাদিমি কুতুবখানা, করাচি।

৫. সুনানে নাসায়ি, ইমাম আবদুর রহমান নাসায়ি (মৃত্যু : ৩০৩ হিজরি) কাদিমি কুতুবখানা, করাচি।

৬. মিশকাতুল মাসাবিহ, শায়েখ আবু আবদুল্লাহ খতিবে তিবরিযি, এইচএম সাঈদ কোম্পানি করাচি।

৭. উমদাতুল কারি, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি।

৮. আল-মিনহাজ (শরহে মুসলিম), ইমাম মুহিউদ্দীন নববি (মৃত্যু : ৬৭৬) কাদিমি কুতুবখানা, করাচি।

৯. আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসি মুসলিম (শরহে মুসলিম), ইমামুল আব্বাস কুরতুবি (মৃত্যু : ৬৫৬) দারু ইবনি কাসির, বৈরুত।

১০. মিরকাতুল মাফাতিহ, শায়েখ আলি ইবনে সুলতান মুহাম্মদ কারি হারাবি (মৃত্যু : ১০১৪ হিজরি) মাকতাবাতু ইমদাদিয়া, মুলতান।

১১. মুজামুল বুলদান, ইয়াকুত হামাবি (মৃত্যু : ৬২৬ হিজরি) দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

১২. মুজামুল উদাবা, ইয়াকুত হামাবি (মৃত্যু : ৬২৬ হিজরি) দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

১৩. আল-কামিল ফিত-তারিখ, ইবনুল আসির (মৃত্যু : ৬৩০ হিজরি) দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

১৪. সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আন-নাসাবি (মৃত্যু : ৬৩৯ হিজরি) দারু ফিকরিল আরাবি, কায়রো।

১৫. তারিখে জাহাঁকুশা, আতা মালিক জুয়াইনি (মৃত্যু : ৬৮১ হিজরি) ফটোস্ট্যাট কপি।

১৬. তারিখু মুখতাসারিদ দুওয়াল, ইবনুল ইবারি (মৃত্যু : ৬৮৫ হিজরি), মুআসসাসাতু মানাবিয়িস সাকাফাহ, কুম, ইরান।

১৭. ওফায়াতুল আইয়ান, ইবনে খাল্লিকান (মৃত্যু : ৬৮১ হিজরি), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
১৮. আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার, ইসমাইল ইবনে আলি আবুল ফিদা (মৃত্যু : ৭৩২ হিজরি) দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
১৯. তাতিম্মাতুল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার, ইবনুল ওয়ার্দি (মৃত্যু : ৭৩৯ হিজরি) দারুল মারিফাহ, বৈরুত।
২০. জামিউত তাওয়ারিখ, রশিদ উদ্দীন ফজলুল্লাহ হামদানি (মৃত্যু : ৭১৮ হিজরি) ফটোস্ট্যাট কপি।
২১. তারিখে গুজিদাহ, হামদুল্লাহ কাজবিনি (মৃত্যু : ৭৩০ হিজরি) পাণ্ডুলিপি থেকে।
২২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসির (মৃত্যু : ৭৭৪ হিজরি) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
২৩. তারিখুল ইসলাম, ইমাম যাহাবি (মৃত্যু : ৭৪৮ হিজরি) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
২৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবি (মৃত্যু : ৭৪৮ হিজরি) মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।
২৫. আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার, ইমাম যাহাবি (মৃত্যু : ৭৪৮ হিজরি) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
২৬. আল-ঈ'লাম ফি ওফায়াতিল আ'লাম, হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবি (মৃত্যু : ৭৪৮ হিজরি) দারুল ফিকর, বৈরুত।
২৭. কিতাবুয যাইল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা, ইবনে রজব হাম্বলি (৭৯৫ হিজরি) দারুল মারিফা, বৈরুত।
২৮. তারিখু ইবনে খালদুন, আল্লামা ইবনে খালদুন (৮০৮ হিজরি) বৈরুত।
২৯. আন-নুজুমুয যাহারা, ইবনে তাগরি বারদি (মৃত্যু : ৮৭৪ হিজরি) উজারাতুস সিকাফাহ ওয়াল ইরশাদ, কায়রো।
৩০. রওজাতুস সফা, মুহাম্মদ ইবনে খাওয়ান্দ শাহ (মৃত্যু : ৯০৩ হিজরি) ফটোস্ট্যাট কপি।
৩১. তারিখুল খুলাফা, আল্লামা আবদুর রহমান সুয়ুতি (মৃত্যু : ৯১১ হিজরি)
৩২. তাবাকাতে নাসিরি, কাজি মিনহাজুস সিরাজ।
৩৩. নিহায়াতুল আরব, আল্লামা নুয়াইরি।
৩৪. চেঙ্গিজ খান, হ্যারল্ড ল্যাম্ব।
৩৫ . শাযারাতুয যাহাব, ইবনে ইমাদ হামবলি (মৃত্যু : ১০৮৯ হিজরি) দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
৩৬. কাশফুয যুনুন, মুসতফা হাজি, নুর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি।
৩৭. মুজামুল মাতবুআতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াল মুআররাবাহ, ইউসুফ আলিয়ান সার্কিস, মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দীনিয়্যাহ, কায়রো।

৩৮. তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, গোলাম রব্বানি আজিজ, মজলিশে তরক্কি আদব, লাহোর, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ।
৩৯. তারিখে ইসলাম, আল্লামা আকবর শাহ নজিবাবাদী, নাফিস একাডেমি, করাচি।
৪০. তারিখে ইসলাম, শাহ মুঈনুদ্দীন নদবি, দারুল ইশাআত, করাচি।
৪১. আয়নায়ে হাকিকতনামা, আকবর শাহ নজিবাবাদী, নাফিস একাডেমি, করাচি।
৪২. তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান, ডক্টর অ্যাডওয়ার্ড ব্রাউন।
৪৩. হাসান ইবনে সাব্বাহ, মৌলভী আবদুল হালিম শারার, সিদ্দিকী ট্রাস্ট।
৪৪. ইমাম রাজি, মাওলানা আবদুস সালাম নদবি, এদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর।
৪৫. বাররে সগির অওর আরব মুআররিখিন, খুরশিদ আহমদ ফারুকি, নাফিস একাডেমি, করাচি।
৪৬. তারিখে মিল্লাত, মুফতি যাইনুল আবিদীন সাজ্জাদ, মুফতি ইনতিজামুল্লাহ শিহাবি, এদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর।
৪৭. বানভুর, পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, করাচি।
৪৮. দুনিয়া কে জালিম হুকুমরান, আমানুল্লাহ খান আরমান, শায়েখ গোলাম আলি পাবলিশার্স, লাহোর।
৪৯. গোলামানে ইসলাম, আল্লামা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, এইচএম সাঈদ কোম্পানি, করাচি।
৫০. তাকবিমে তারিখি, আবদুল কুদ্দুস হাশেমি, এদারায়ে তাহকিকাতে ইসলামি, ইসলামাবাদ।
৫১. ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া, সাইয়েদ কাসেম মাহমুদ, শাহকার বুক ফাউন্ডেশন, করাচি।
৫২. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত, সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি, মজলিশে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচি।
৫৩. মিরআতুল আসরার, শায়েখ আবদুর রহমান চিশতী।
৫৪. হাজার সাল পেহলে, মাওলানা মানাজির আহসান গিলানি, নাফিস একাডেমি, করাচি।
৫৫. নুযহাতুল খাওয়াতির, শায়েখ আবদুল হাই হাসানি, (মৃত্যু : ১৩৪১ হিজরি) তাইয়িব একাডেমি, করাচি।
৫৬. তারিখে নিগারিস্তান, ফারসি পাণ্ডুলিপি, পুরাতন কপি।
৫৭. করাচি স্যা খায়বার তক, ইউনুস হাসানি, মজলিশে নশরিয়াতে ইসলাম, করাচি।
৫৮. দাররায়ে খায়বার, হাকিম মুহাম্মদ সাঈদ, হামদর্দ ফাউন্ডেশন, করাচি।
৫৯. হাশিয়ায়ে মুখতাসারুল মাআনি, মানশুরাতুল হিকমাহ, কুম, ইরান।
৬০. আতলাসু তারিখিল ইসলাম, হুসাইন মুআন্নিস, কায়রো।
৬১. জামে তারিখে হিন্দ, প্রফেসর খলিক আহমাদ নিজামি ও মুহাম্মদ হাবিব। তাখলিকাত, লাহোর।

৬২. নাফহাতুল উনস (উর্দু তরজমা), মোল্লা আবদুর রহমান জামি (মৃত্যু : ৬৮০ হিজরি) মদীনা পাবলিকেশন কোম্পানি, করাচি।
৬৩. সেলজুকনামা, আল্লামা ইবনে বিবি (মৃত্যু : ৬৮০ হিজরি) মারকাজে উর্দু বোর্ড, লাহোর।
৬৪. আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ, মির গোলাম মুহাম্মদ গুবার, পয়গামে মুহাজির, কুম, ইরান।
৬৫. মুকাদ্দিমায়ে মাসনবি ও মানবি খণ্ড ৫, কাজি সাজ্জাদ হুসাইন, লাহোর।
৬৬. জফারুল মুহাসসিলিন, মাওলানা মুহাম্মদ হানিফ গাঙ্গুহি, দারুল ঈশাআত করাচি।
৬৭. তারিখে ফারিশতা, মুহাম্মদ কাসেম ফারিশতা।
৬৮. তারিখে নাহজতহায়ে মিল্লি ইরান, আবদুর রফি হাকিকত, ইরান।
৬৯. উর্দু ডাইজেস্ট এপ্রিল ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ, লাহোর।

সমাপ্ত


আল মদিনা মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স
مجمع المدرسة والمسجد المدني
স্থাপিতঃ ২০২০ইং

নাশাত
পাবলিকেশন

নাশাত

cover : faisal mahmud, 01843249893